PART- 19

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

www.banglabookpdf.blogspot.com

আন নাবা

৭৮

নামকরণ

দ্বিতীয় আয়াতের عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ বাক্যাংশের 'আন্‌ নাবা' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর এটি কেবল নামই নয়, এই সূরার সমগ্র বিষয়বস্তুর শিরোনামও এটিই। কারণ নাবা মানে হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাতের খবর। আর এই সূরায় এরি ওপর সমস্ত আলোচনা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরা আল মুরসালাতের ভূমিকায় আগেই বলে এসেছি, সূরা আল কিয়ামাহ থেকে আন্‌ নাযিআ'ত পর্যন্ত সবক'টি সূরার বিষয়বস্তুর পরস্পরের সাথে একটা মিল আছে এবং এ সবগুলোই মক্কা মুআয্‌যমার প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

সূরা আল মুরসালাতে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে এখানেও সেই একই বিষয়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও কিয়ামত ও আখেরাত অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ এবং তা মানা ও না মানার পরিণতি সম্পর্কে লোকদের অবহিত করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দিকে মক্কা মুআয্‌যমায় তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন। এক, আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করা যাবে না। দুই, তাঁকে আল্লাহ নিজের রসূলের পদে নিযুক্ত করেছেন। তিন, এই দুনিয়া একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর শুরু হবে আর এক নতুন জগতের। সেখানে আগের ও পরের সব লোকদের আবার জীবিত করা হবে। দুনিয়ায় যে দৈহিক কাঠামো ধারণ করে তারা কাজ করেছিল সেই কাঠামো সহকারে তাদের উঠানো হবে। তারপর তাদের বিশ্বাস ও কাজের হিসেব নেয়া হবে। এই হিসেব নিকেশের ভিত্তিতে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল প্রমাণিত হবে তারা চিরকালের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করবে। যারা কাফের ও ফাসেক প্রমাণিত হবে তারা চিরকালের জন্য প্রবেশ করবে জাহান্নামে।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্য থেকে প্রথমটি আরবদের কাছে যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। তারা আল্লাহকে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও সর্বশ্রেষ্ঠ রব এবং স্রষ্টা ও রিজিকদাতা বলেও মানতো। অন্য যেসব সত্তাকে তারা ইলাহ

ও মাবুদ গণ্য করতো তাদের সবাইকে আল্লাহরই সৃষ্টি বলেও স্বীকার করতো। তাই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতায় এবং তাঁর ইলাহ হবার মূল সত্তায় তাদের কোন অংশীদারীত্ব আছে কি নেই এটিই ছিল মূল বিরোধীয় বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি মক্কার লোকেরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তবে নবুওয়াতের দাবী করার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে চল্লিশ বছরের যে জীবন যাপন করেছিলেন সেখানে তারা কখনো তাঁকে মিথ্যুক, প্রতারক বা ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে পায়নি। এ বিষয়টি অস্বীকার করার কোন উপায়ই তাদের ছিল না। তারা নিজেরাই তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, শান্ত প্রকৃতি, সুস্থমতি ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাই হাজার বাহানাবাজী ও অভিযোগ–দোষারোপ সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব ব্যাপারেই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। কেবলমাত্র নবুওয়াতের দাবীর ব্যাপারে নাউযুবিল্লাহ তিনি ছিলেন মিথ্যুক, এ বিষয়টি অন্যদের বুঝানো তো দূরের কথা তাদের নিজেদের পক্ষেও মেনে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ছিল।

এভাবে প্রথম দু'টি বিষয়ের তুলনায় তৃতীয় বিষয়টি মেনে নেয়া ছিল মক্কাবাসীদের জন্য অনেক বেশী কঠিন। এ বিষয়টি তাদের সামনে পেশ করা হলে তারা এর সাথে সবচেয়ে বেশী বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার করলো। এ ব্যাপারে তারা সবচেয়ে বেশী বিস্ময় প্রকাশ করলো। একে তারা সবচেয়ে বেশী অযৌক্তিক ও অসম্ভব মনে করে যেখানে সেখানে একথা ছড়াতে লাগলো যে তা একেবারে অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়। কিন্তু তাদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আসার জন্য আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসকে তাদের মনের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া অপরিহার্য ছিল। কারণ আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী না হলে হক ও বাতিলের ব্যাপারে চিন্তার ক্ষেত্রে তারা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারতো না, ভালো–মন্দ ও ন্যায়–অন্যায়ের ব্যাপারে তাদের মূল্যমানে পরিবর্তন সূচিত হওয়া সম্ভবপর হতো না এবং দুনিয়া পূজার পথ পরিহার করে তাদের পক্ষে ইসলাম প্রদর্শিত পথে এক পা চলাও সম্ভব হতো না। এ কারণে মক্কার প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে আখেরাত বিশ্বাসকে মনের মধ্যে মজবুতভাবে বদ্ধমূল করে দেয়ার ওপরই বেশী জোর দেয়া হয়েছে। তবে এ জন্য এমনসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যার ফলে তাওহীদের ধারণা আপনা আপনি হৃদয়গ্রাহী হতে চলেছে। মাঝে মাঝে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের সত্যতা প্রমাণের যুক্তিও সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ যুগের সূরাগুলোতে আখেরাতের আলোচনা বারবার আসার কারণ ভালোভাবে অনুধাবন করার পর এবার এই সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয়া যাক। কিয়ামতের খবর শুনে মক্কার পথেঘাটে অলিগলিতে সর্বত্র এবং মক্কাবাসীদের প্রত্যেকটি মাহফিলে যেসব আলোচনা, সমালোচানা, মন্তব্য ইত্যাদি শুরু হয়েছিল এখানে সবার আগে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারপর অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তোমাদের জন্য যে জমিকে আমি বিছানা বানিয়ে দিয়েছি তা কি তোমাদের নজরে পড়ে না? জমির মধ্যে আমি এই যে উঁচু উঁচু বিশাল বিস্তৃত পর্বত শ্রেণী গেঁড়ে রেখেছি তা কি তোমাদের নজরে পড়ে না? তোমরা কি নিজেদের দিকেও তাকাও না, কিভাবে আমি তোমাদের নারী ও পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি? তোমরা নিজেদের নিদ্রাকে

দেখো না, যার মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে তোমাদেরকে কাজের যোগ্য করে রাখার জন্য আমি তোমাদের কয়েক ঘন্টার পরিশ্রমের পর আবার কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছি? তোমরা কি রাত ও দিনের আসা–যাওয়া দেখছো না, তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যাকে যথারীতি ধারাবাহিকভাবে জারী রাখা হয়েছে? তোমরা কি নিজেদের মাথার উপর মজবুতভাবে সংঘবদ্ধ আকাশ ব্যবস্থাপনা দেখছো না? তোমরা কি এই সূর্য দেখছো না, যার বদৌলতে তোমরা আলো উত্তাপ লাভ করছো? তোমরা কি বৃষ্টিধারা দেখছো না, যা মেঘমালা থেকে বর্ষিত হচ্ছে এবং যার সাহায্যে ফসল, শাক–সব্জি সবুজ বাগান ও ঘন বন–জংগল সৃষ্টি হচ্ছে? এসব জিনিস কি তোমাদের একথাই জানাচ্ছে যে, যে মহান অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর এসব সৃষ্টি করেছেন, তিনি কিয়ামত অনুষ্ঠান ও আখেরাত সৃষ্টি করতে অক্ষম? এই সমগ্র কারখানাটিতে যে পরিপূর্ণ কলাকূশলতা ও বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট স্ফূরণ দেখা যায়, তা প্রত্যক্ষ করার পর কি তোমরা একথাই অনুধাবন করছো যে, সৃষ্টিলোকের এই কারখানার প্রতিটি অংশ, প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি কর্ম একটি উদ্দেশ্যের পেছনে ধাবিত হচ্ছে কিন্তু মূলত এই কারখানাটি নিজেই উদ্দেশ্যবিহীন? এ কারখানায় মানুষকে মুখপাত্রের (Foreman) দায়িত্বে নিযুক্ত করে তাকে এখানে বিরাট ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে কিন্তু যখন সে নিজের কাজ শেষ করে কারখানা ত্যাগ করে চলে যাবে তখন তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, ভালোভাবে কাজ করার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে না ও পেনশন দেয়া হবে না এবং কাজ নষ্ট ও খারাপ করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং শাস্তি দেয়া হবে না; এর চাইতে অর্থহীন ও বাজে কথা মনে হয় আর কিছুই হতে পারে না। এ যুক্তি পেশ করার পর পূর্ণ শক্তিতে বলা হয়েছে, নিশ্চিতভাবে বিচারের দিন তার নির্ধারিত সময়ে অবশ্যি আসবে। শিংগায় একটি মাত্র ফুঁক দেবার সাথে সাথেই তোমাদের যেসব বিষয়ের খবর দেয়া হচ্ছে তা সবই সামনে এসে যাবে। তোমরা আজ তা স্বীকার করো বা না করো, সে সময় তোমরা যে যেখানে মরে থাকবে সেখান থেকে নিজেদের হিসেব দেবার জন্য দলে দলে বের হয়ে আসবে। তোমাদের অস্বীকৃতি সে ঘটনা অনুষ্ঠানের পথ রোধ করতে পারবে না।

এরপর ২১ থেকে ৩০ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, যারা হিসেব–নিকেশের আশা করে না এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ গুণে গুণে আমার এখানে লিখিত হয়েছে। তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য জাহান্নাম ওঁৎপেতে বসে আছে। সেখানে তাদের কর্মকাণ্ডের পুরোপুরি বদলা তাদেরকে চুকিয়ে দেয়া হবে। তারা ৩১ থেকে ৩৬ পর্যন্ত আয়াতে এমন সব লোকের সর্বোত্তম প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যারা নিজেদেরকে দায়িত্বশীল ও আল্লাহর কাছে নিজেদের সমস্ত কাজের জবাবদিহি করতে হবে মনে করে সবার আগে দুনিয়ার জীবনে নিজেদের আখেরাতের কাজ করার কথা চিন্তা করেছে। তাদের এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের কার্যাবলীর কেবল প্রতিদানই দেয়া হবে না, বরং তার চাইতে যথেষ্ট বশী পুরস্কারও দেয়া হবে।

সবশেষে আল্লহার আদালতের চিত্র আঁকা হয়েছে। সেখানে কারোর নিজের জিদ নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে যাওয়া এবং নিজের সাথে সম্পর্কিত লোকদের মাফ করিয়ে নেয়া তো দূরের কথা, অনুমতি ছাড়া কেউ কথাই বলতে পারবে না। আর অনুমতি হবে এ শর্ত সাপেক্ষে যে, যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে একমাত্র তার জন্য সুপারিশ

করা যাবে এবং সুপারিশে কোন অসংগত কথাও বলা যাবে না। তাছাড়া একমাত্র তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে যারা দুনিয়ায় সত্যের কালেমার প্রতি সমর্থন দিয়েছে এবং নিছক গুনাহগার আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহভাবাপন্ন কোন সত্য অস্বীকারকারী কোন প্রকার সুপারিশ লাভের হকদার হবে না।

তারপর এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে দিনের আগমনী সংবাদ দেয়া হচ্ছে সেদিনটি নিশ্চিতভাবেই আসবে। তাকে দূরে মনে করো না। সে কাছেই এসে গেছে। এখন যার ইচ্ছা সেদিনটির কথা মেনে নিয়ে নিজের রবের পথ অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু এ সাবধানবাণী সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করবে একদিন সমস্ত কর্মকাণ্ড তার সামনে এসে যাবে। তখন সে কেবল অনুতাপই করতে পারবে। সে আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়! যদি দুনিয়ায় আমার জন্মই না হতো। আজ যে দুনিয়ার প্রেমে সে পাগলপারা সেদিন সেই দুনিয়ার জন্যই তার মনে এ অনুভূতি জাগবে।

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۚ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ﴿٢﴾ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ﴿٦﴾ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

এরা কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? সেই বড় খবরটা সম্পর্কে কি, যে ব্যাপারে এরা নানান ধরনের কথা বলে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফিরছে?[১] কখ্খনো না,[২] শীঘ্রই এরা জানতে পারবে। হাঁ কখ্খনো না, শীঘ্রই এরা জানতে পারবে।[৩]

একথা কি সত্য নয়, আমি যমীনকে বিছানা বানিয়েছি?[৪] পাহাড়গুলোকে গেঁড়ে দিয়েছি পেরেকের মতো?[৫] তোমাদের (নারী ও পুরুষ) জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি?[৬] তোমাদের ঘুমকে করেছি শান্তির বাহন,[৭] রাতকে করেছি আবরণ এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময়?[৮]

১. বড় খবর বলতে কিয়ামত ও আখেরাতের কথা বুঝানো হয়েছে। মক্কাবাসীরা অবাক হয়ে কিয়ামত ও আখেরাতের কথা শুনতো। তারপর তাদের প্রত্যেকটি আলাপ-আলোচনায়, বৈঠকে, মজলিসে এ সম্পর্কে নানান ধরনের কথা বলতো ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। জিজ্ঞাসাবাদ বলতেও এ নানা ধরনের কথাবার্তা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের কথাই বোঝানো হয়েছে। লোকেরা পরস্পরের সাথে দেখা হলে বলতো, আরে ভাই, শুনেছো নাকি? মানুষ নাকি মরে যাবার পরে আবার জীবিত হবে? এমন কথা আগে কখনো শুনেছিলে? যে মানুষটি মরে পচে গেছে, যার শরীরের হাড়গুলো পর্যন্ত মাটিতে মিশে গেছে, তার মধ্যে নাকি আবার নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হবে, একথা কি মেনে নেয়া যায়? আগের পরের সব বংশধররা জেগে উঠে এক জায়গায় জমা হবে, একথা কি যুক্তিসম্মত? আকাশের বুকে মাথা উঁচু করে পৃথিবী পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকা এসব বড় বড় পাহাড় নাকি পেঁজা তুলোর মতো বাতাসে উড়তে থাকবে? চাঁদ, সুরুজ আর তারাদের আলো কি নিভে যেতে পারে? দুনিয়ার এই জমজমাট ব্যবস্থাটা কি ওলটপালট হয়ে যেতে পারে? এই

মানুষটি তো গতকাল পর্যন্তও বেশ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিল, আজ তার কি হয়ে গেলো, আমাদের এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত খবর শুনিয়ে যাচ্ছে? এ জান্নাত ও জাহান্নাম এতদিন কোথায় ছিল? এর আগে কখনো আমরা তার মুখে একথা শুনিনি কেন? এখন এরা হঠাৎ টপকে পড়লো কোথা থেকে? কোথা থেকে এদের অদ্ভুত ধরনের ছবি এঁকে এনে আমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে?

هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ আয়াতাংশটির একটি অর্থ তো হচ্ছে ঃ "এ ব্যাপারে তারা নানান ধরনের কথা বলছে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফিরছে।" এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে, দুনিয়ার পরিণাম সম্পর্কে তারা নিজেরাও কোন একটি অভিন্ন আকীদা পোষণ করে না বরং "তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।" তাদের কেউ কেউ খৃস্টানদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিল। কাজেই তারা মৃত্যুর পরের জীবন স্বীকার করতো। তবে এই সংগে তারা একথাও মনে করতো যে, এই জীবনটি শারীরিক নয়, আত্মিক পর্যায়ের হবে। কেউ কেউ আবার আখেরাত পুরোপুরি অস্বীকার করতো না, তবে তা ঘটতে পারে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ ছিল। কুরআন মজীদে এ ধরনের লোকদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ اِنْ نَّظُنُّ اِلاَّ ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ "আমরা তো মাত্র একটি ধারণাই পোষণ করি, আমাদের কোন নিশ্চিত বিশ্বাস নেই।" [আল জাসিয়াহ, ৩১] আবার কেউ কেউ একদম পরিষ্কার বলতো ঃ اِنْ هِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ "আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটিই সবকিছু এবং মরার পর আমাদের আর কখনো দ্বিতীয়বার উঠানো হবে না।" [আল আন'আম, ২৯] তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ সবকিছুর জন্য সময়কে দায়ী করতো। তারা বলতোঃ مَا هِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ "আমাদের এই দুনিয়ার জীবনটিই সব কিছু। এখানেই আমরা মরি, এখানেই জীবন লাভ করি এবং সময়ের চক্র ছাড়া আর কিছুই নেই যা আমাদের ধ্বংস করে।" [আল জাসিয়া, ২৪] আবার এমন কিছু লোকও ছিল, যারা সময়কে সবকিছুর জন্য দায়ী না করলেও মৃত্যুর পরের জীবনকে অসম্ভব মনে করতো। অর্থাৎ তাদের মতে, মরা মানুষদের আবার জীবিত করে তোলার ক্ষমতা আল্লাহর ছিল না। তাদের বক্তব্য ছিল ঃ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ "এই হাড়গুলো পঁচেগলে নষ্ট হয়ে যাবার পর আবার এগুলোকে জীবিত করবে কে?" [ইয়াসীন, ৭৮] তাদের এসব বিভিন্ন বক্তব্য একথা প্রমাণ করে যে, এ বিষয়ে তাদের কোন সঠিক জ্ঞান ছিল না। বরং তারা নিছক আন্দাজ-অনুমান ও ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্ধকারে তীর ছুঁড়ে যাচ্ছিল। নয়তো এ ব্যাপারে তাদের কাছে যদি কোন সঠিক জ্ঞান থাকতো তাহলে তারা সবাই একটি বক্তব্যের উপর একমত হতে পারতো (আরো বেশী জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আয্ যারিয়াতের ৬ টীকা দেখুন)।

২. অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে যেসব কথা এরা বলে যাচ্ছে এগুলো সবই ভুল। এরা যা কিছু মনে করেছে ও বুঝেছে তা কোনক্রমেই সঠিক নয়।

৩. অর্থাৎ যে বিষয়ে এরা নিজেরা নানা আজেবাজে কথা বলছে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফিরছে সেটি যথার্থ সত্য হয়ে এদের সামনে ফুটে ওঠার সময় মোটেই দূরে নয়। সে সময় এরা জানতে পারবে, রসূল এদেরকে যে খবর দিয়েছিলেন তা ছিল সঠিক এবং আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে এরা যেসব কথা তৈরী করছিল তা ছিল ভিত্তিহীন অসার।

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝١٣ وَأَنزَلْنَا مِنَ
الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝١٤ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝١٥ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝١٦
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝١٧ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝١٨
وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝١٩ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝٢٠

তোমাদের ওপর সাতটি মজবুত আকাশ স্থাপন করেছি[৯] এবং একটি অতি উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত বাতি সৃষ্টি করেছি?[১০] আর মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা, যাতে তার সাহায্যে উৎপন্ন করতে পারি শস্য, শাক সব্জি ও নিবিড় বাগান?[১১]

নিসন্দেহে বিচারের দিনটি নির্ধারিত হয়েই আছে। যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে।[১২] আকাশ খুলে দেয়া হবে, ফলে তা কেবল দরজার পর দরজায় পরিণত হবে। আর পর্বতমালাকে চলমান করা হবে, ফলে তা মরীচিকায় পরিণত হবে।[১৩]

৪. যমীনকে মানুষের জন্য বিছানা অর্থাৎ একটি শান্তিময় আবাস ভূমিতে পরিণত করার মধ্যে আল্লাহর যে নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীচের স্থানগুলো দেখুন ঃ তাফহীমুল কুরআন, আন নাম্‌ল ৭৩, ৭৪ ও ৮১ টীকা, ইয়াসীন ২৯ টীকা, আল মু'মিন ৯০ ও ৯১ টীকা, আয্‌ যুখ্‌রুফ ৭ টীকা, আল জাসিয়াহ ৭ টীকা এবং কাফ ১৮ টীকা।

৫. পৃথিবীতে পাহাড় সৃষ্টির কারণ এবং এর পেছনে আল্লাহর যে কল্যাণ স্পর্শ রয়েছে তা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আন নাহল ১২ টীকা, আন নম্‌ল ৭৪ টীকা এবং আল মুরসালাত ১৫ টীকা দেখুন।

৬. মানব জাতিকে নারী ও পুরুষের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার যে মহান কল্যাণ ও উদ্দেশ্য রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আল ফুরকান ৬৯ টীকা, আর রুম ২৮ থেকে ৩০ টীকা, ইয়াসীন ৩১ টীকা, আশ্‌ শূরা ৭৭ টীকা, আয্‌ যুখরুফ ১২ টীকা এবং আল কিয়ামাহ ২৫ টীকা দেখুন।

৭. মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার যোগ্য করার জন্য মহান আল্লাহ অত্যন্ত কর্মকুশলতা সহকারে তার প্রকৃতিতে ঘুমের এক অভিলাষ বা চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। প্রতি কয়েক ঘন্টা পরিশ্রম করার পর এই চাহিদা আবার তাকে কয়েক ঘন্টা ঘুমাতে বাধ্য করে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআনের সূরা আর রুম ৩৩ টীকা।

৮. অর্থাৎ রাতকে অন্ধকার করে দিয়েছি। ফলে আলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তার মধ্যে তোমরা সহজেই ঘুমের প্রশান্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে দিনকে আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছি। ফলে তার মধ্যে তোমরা অতি সহজেই নিজেদের রুজি–রোজগারের জন্য কাজ করতে পারবে। পৃথিবীতে রাত–দিনের নিয়মিত ও নিরবছিন্ন আবর্তনের মধ্যে অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু তার মধ্য থেকে মাত্র এই একটি কল্যাণের দিকে ইংগিত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ একথা বুঝাতে চান যে, এখানে যা কিছু ঘটছে এগুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে বা ঘটনাক্রমে ঘটছে না। বরং এর পেছনে একটি মহান কল্যাণকর উদ্দেশ্য কাজ করছে। তোমাদের নিজেদের স্বার্থের সাথে এ উদ্দেশ্যের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তোমাদের অস্তিত্বের গঠন প্রকৃতি নিজের আরাম ও প্রশান্তির জন্য যে অন্ধকারের অভিলাষী ছিল তার জন্যে রাতকে এবং তার জীবিকার জন্য যে আলোর অভিলাষী ছিল তার জন্য দিনকে সরবরাহ করা হয়েছে। তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদিত এই ব্যবস্থাপনা নিজেই সাক্ষ্য দিয়ে চলছে যে, কোন জ্ঞানময় সত্তার কর্মকৌশল ছাড়া এটা সম্ভবপর হয়নি। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ৬৫ টীকা, ইয়াসীন ৩২ টীকা, আল মু'মিন ৮৫ টীকা এবং আয্ যুখ্রুফ ৪ টীকা)।

৯. মজবুত বলা হয়েছে এ অর্থে যে, আকাশের সীমান্ত অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ, তার মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও কখনো হয় না। এ সীমানা পেরিয়ে উর্ধজগতের অসংখ্য গ্রহ–নক্ষত্রের মধ্য থেকে কোন একটিও কখনো অন্যের সাথে সংঘর্ষ বাধায় না এবং কোনটি কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর বুকে আছড়েও পড়ে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল বাকারাহ ৩৪ টীকা, আর রা'দ ২ টীকা, আল হিজর ৮ ও ১২ টীকা, আল মু'মিনুন ১৫ টীকা, লুকমান ১৩ টীকা, ইয়াসীন ৩৭ টীকা, আস্ সাফ্ফাত ৫ ও ৬ টীকা, আল মু'মিন ৯০ টীকা এবং কাফ ৭ ও ৮ টীকা)।

১০. এখানে সূর্যের কথা বলা হয়েছে। মূলে وَهَّاج শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে অতি উত্তপ্ত আবার অতি উজ্জ্বলও। তাই আয়াতের অনুবাদে আমি দু'টো অর্থই ব্যবহার করেছি। এ ছোট বাক্যটির মধ্যে মহান আল্লাহর শক্তি ও কর্মকুশলতার যে বিরাট নিদর্শনটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে সে নিদর্শনটির অর্থাৎ সূর্যের ব্যাস পৃথিবী থেকে ১০৯ গুণ বেশী এবং তার আয়তন পৃথিবীর তুলনায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার গুণ বড়। তার তাপমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও তার আলোর শক্তি এত বেশী যে, মানুষ খালি চোখে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। তার উত্তাপ এত বেশী যে, পৃথিবীর কোথাও তার উত্তাপের ফলে তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও সৃষ্টিকুশলতার মাধ্যমে পৃথিবীকে সূর্য থেকে এক ভারসাম্যপূর্ণ দূরত্বে স্থাপন করেছেন। পৃথিবী তার বর্তমান অবস্থানের চাইতে সূর্যের বেশী কাছাকাছি নয় বলে অস্বাভাবিক গরম নয়। আবার বেশী দূরে নয় বলে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডাও নয়। এ কারণে এখানে মানুষ, পশু–পাখি ও উদ্ভিদের জীবন ধারণ সম্ভবপর হয়েছে। সূর্য থেকে শক্তির অপরিমেয় ভাণ্ডার উৎসারিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এ শক্তিই পৃথিবীর বুকে আমাদের জীবন ধারণের উৎস। তারি সাহায্যে আমাদের ক্ষেতে ফসল পাকছে। এবং পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী তার আহার লাভ করছে। তারি উত্তাপে সাগরের

পানি বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায়, তারপর বাতাসের সাহায্যে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে বারি বর্ষণ করে। এ সূর্যের বুকে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এমন বিশাল অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছেন যা কোটি কোটি বছর থেকে সমগ্র সৌরজগতে আলো, উত্তাপ ও বিভিন্ন প্রকার রশ্মি অব্যাহতভাবে ছড়িয়ে চলছে।

১১. পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভিদের তরতাজা হয়ে ওঠার মধ্যে প্রতিনিয়ত আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টিকুশলতার যে বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশ ঘটে চলছে সে সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনের নিম্নোক্ত স্থানসমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে ঃ সূরা আন নাহল ৫৩ টীকা, আল মু'মিনুন ১৭ টীকা, আশ্ শূ'আরা ৫ টীকা, আর রুম ৩৫ টীকা, ফাতের ১৯ টীকা, ইয়াসীন ২৯ টীকা, আল মু'মিন ২০ টীকা, আয যুখরুফ ১০–১১ টীকা এবং আল ওয়াকিয়াহ ২৮ থেকে ৩০ টীকা।

এ আয়াতগুলোতে একের পর এক বহু প্রাকৃতিক নিদর্শন ও যুক্তি–প্রমাণ পেশ করে কিয়ামত ও আখেরাত অস্বীকারকারীদেরকে একথা জানানো হয়েছে যে, যদি তোমরা চোখ মেলে একবার পৃথিবীর চারদিকে তাকাও, পাহাড়–পর্বত, তোমাদের নিজেদের জন্ম, নিদ্রা, জাগরণ এবং দিন–রাত্রির আবর্তনের এই ব্যবস্থাপনাটি গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করো; বিশ্ব–জাহানে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক ব্যবস্থা, আকাশ রাজ্যে প্রদীপ্ত সূর্য, মেঘপুঞ্জ থেকে বর্ষিত বৃষ্টিধারা এবং তার সাহায্যে উৎপন্ন তরুলতা ও বৃক্ষরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করো, তাহলে এসবের মধ্যে তোমরা দু'টি জিনিস সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। এক, একটি জবরদস্ত শক্তির সহায়তা ছাড়া এসব কিছু অস্তিত্বশীল হতে পারে না এবং এ ধরনের নিয়ম-শৃংখলার আওতাধীনে জারীও থাকতে পারে না। দুই, এসব জিনিসের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি বিরাট হিকমত তথা প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ কর্মকুশলতা সক্রিয় রয়েছে এবং উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোন একটি কাজও হচ্ছে না। যে মহাশক্তি এসব জিনিসকে অস্তিত্ব দান করতে পারে, এদেরকে ধ্বংস করে দেবার এবং ধ্বংস করার পর আবার নতুন করে অন্য আকৃতিতে সৃষ্টি করার তার ক্ষমতা নেই, এ ধরনের কথা এখন কেবলমাত্র একজন মূর্খই বলতে পারে। আর একথাও কেবলমাত্র একজন নির্বোধই বলতে পারে যে, যে জ্ঞানময় সত্তা এই বিশ্ব–জাহানের কোন একটি কাজও বিনা উদ্দেশ্যে করেননি, তিনি নিজের এ জগতে মানুষকে জেনে বুঝে ভালো ও মন্দের পার্থক্য, আনুগত্য ও অবাধ্যতার স্বাধীনতা এবং নিজের অসংখ্য সৃষ্টিকে কাজে লাগাবার ও ইচ্ছা মতো ব্যবহার করার ক্ষমতা বিনা উদ্দেশ্যেই দান করেছেন। একথাও কেবলমাত্র একজন নির্বোধই বলতে পারে। মানুষ তার সৃষ্ট এ জিনিসগুলোকে ভালোভাবে ব্যবহার করুক বা খারাপভাবে উভয় অবস্থার পরিণাম সমান হবে, একজন ভালো কাজ করতে করতে মারা যাবে, সে মাটিতে মিশে খতম হয়ে যাবে, আর একজন খারাপ কাজ করতে করতে মারা যাবে সেও মাটিতে মিশে খতম হয়ে যাবে, যে ভালো কাজ করবে সে তার ভালো কাজের কোন প্রতিদান পাবে না এবং যে খারাপ কাজ করবে সে ও তার খারাপ কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে না এবং কোন প্রতিফল পাবে না, এ ধরনের কথা একজন জ্ঞানহীন মানুষই বিশ্বাস করতে পারে। মৃত্যুর পরের জীবন, কিয়ামত ও আখেরাত সম্পর্কিত এসব যুক্তিই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, তাফহীমুল কুরআনের নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন ঃ আর রা'আদ ৭ টীকা, আল হজ্জ ৯ টীকা, আর রুম ৬ টীকা, সাবা ১০ ও ১২ টীকা এবং আস্ সাফ্ফাত ৮ ও ৯ টীকা।

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

আসলে জাহান্নাম একটি ফাঁদ।[১৪] বিদ্রোহীদের আবাস। সেখানে তারা যুগের পর যুগ পড়ে থাকবে।[১৫] সেখানে তারা গরম পানি ও ক্ষতঝরা ছাড়া কোন রকম ঠাণ্ডা এবং পানযোগ্য কোন জিনিসের স্বাদই পাবে না।[১৬] (তাদের কার্যকলাপের) পূর্ণ প্রতিফল। তারা কোন হিসেব-নিকেশের আশা করতো না। আমার আয়াতগুলোকে তারা একেবারেই মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল।[১৭] অথচ প্রত্যেকটি জিনিস আমি গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম।[১৮] এখন মজা বুঝ, আমি তোমাদের জন্য আযাব ছাড়া কোন জিনিসে আর কিছুই বাড়াবো না।

১২. এখানে শিংগার শেষ ফুঁকের কথা বলা হয়েছে। এর আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই সমস্ত মরা মানুষ অকস্মাৎ জেগে উঠবে। "তোমরা বলতে শুধুমাত্র যাদেরকে তখন সম্বোধন করা হয়েছিল তাদের কথা বলা হয়নি বরং সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো লোক দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে তাদের সবার কথা বলা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম ৫৭ টীকা, আল হাজ্জ ১ টীকা, ইয়াসীন ৪৬ ও ৪৭ টীকা এবং আয্ যুমার ৭৯ টীকা)।

১৩. এখানে মনে রাখতে হবে, কুরআনের অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও একই সাথে কিয়ামতের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে, প্রথম আয়াতটিতে শেষ দফায় শিংগায় ফুঁক দেবার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর পরবর্তী দু'টি আয়াতে দ্বিতীয় দফায় শিংগায় ফুঁক দেবার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনের সূরা আল হাক্কার ১০ টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। "আকাশ খুলে দেয়া হবে" এর মানে হচ্ছে উর্ধজগতে কোন বাধা ও বন্ধন থাকবে না। সব দিক থেকে সব রকমের আসমানী বালা ও মুসিবতের এমন বন্যা নেমে আসতে থাকবে যেন মনে হবে তাদের আসার জন্য সমস্ত দরজা খুলে গেছে এবং তাদের বাধা দেবার জন্য কোন একটি দরজাও বন্ধ নেই। আর পাহাড়ের চলার ও মরীচিকায় পরিণত হবার মানে হচ্ছে, দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে পর্বতমালা স্থানচ্যুত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে। তারপর ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, যেখানে একটু আগে বিশাল পর্বত ছিল সেখানে দেখা যাবে বিশাল বালুর সমুদ্র। এ অবস্থাকে সূরা ত্বাহায় নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেদিন এ পাহাড়

কোথায় চলে যাবে? এদের বলে দাও, আমার রব তাদেরকে ধূলোয় পরিণত করে বাতাসে উড়িয়ে দেবেন এবং যমীনকে এমন একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন যে, তার মধ্যে কোথাও একটুও অসমতল ও উঁচুনীচু জায়গা এবং সমান্যতম ভাঁজও দেখতে পাবে না।" (১০৫–১০৭ আয়াত এবং ৮৩ টীকা)।

১৪. শিকার ধরার উপযোগী করে যে জায়গাটিকে গোপনে তৈরী করা হয় এবং নিজের অজ্ঞাতসারে শিকার যেখানে চলে এসে তার মধ্যে আটকে যায়, তাকেই বলে ফাঁদ। জাহান্নামের ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা অবলম্বন করে তারা জাহান্নামের ভয়ে ভীত না হয়ে দুনিয়ায় এ মনে করে লাফালাফি দাপাদাপি করে ফিরছে যে, আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব তাদের জন্য একটি ঢালাও বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এখানে তাদের পাকড়াও হবার কোন আশংকা নেই। কিন্তু জাহান্নাম তাদের জন্য এমন একটি গোপন ফাঁদ যেখানে তারা আকস্মিকভাবে আটকা পড়ে যায় এবং সেখান থেকে বের হবার আর কোন উপায় থাকে না।

১৫. মূলে আহকাব (أَحْقَاب) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, একের পর এক আগমনকারী দীর্ঘ সময়। এমন একটি ধারাবাহিক যুগ যে, একটি যুগ শেষ হবার পর আর একটি যুগ শুরু হয়ে যায়। এ থেকে লোকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, জান্নাতের জীবন হবে চিরন্তন কিন্তু জাহান্নাম চিরন্তন হবে না। কারণ এ যুগ যতই দীর্ঘ হোক না কেন, এখানে যখন যুগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তখন এ থেকে একথাই বুঝা যাচ্ছে যে, এ সময় অশেষ ও অফুরন্ত হবে না। বরং একদিন না একদিন তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দু'টি কারণে এই যুক্তি ভুল। এক, আরবীতে 'হাকব' শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যেই এ ভাবধারা রয়েছে যে, একটি হাকবের পিছনে আর একটি হাকব রয়েছে। কাজেই আহকাব অপরিহার্যভাবে এমন যুগের জন্য বলা হবে যা একের পর এক আসতেই থাকবে এবং এমন কোন যুগ হবে না যার পর আর কোন যুগ আসবে না। দুই, কোন বিষয় সম্পর্কে কুরআন মজীদের কোন আয়াত থেকে এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা নীতিগতভাবে ঠিক নয়, যা সেই একই বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের অন্যান্য বর্ণনার সাথে সংঘর্ষশীল হয়। কুরআনের ৩৪ জায়গায় জাহান্নামবাসীদের জন্য 'খুলুদ' (চিরন্তন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তিন জায়গায় কেবল "খুলুদ" বলেই শেষ করা হয়নি বরং তার সাথে "আবাদান" "আবাদান" (চিরকাল) শব্দও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে, "তারা চাইবে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যেতে। কিন্তু তারা কখ্খনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।" (আল মায়েদাহ ৩৭ আয়াত) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "যতদিন পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে ততদিন তারা এ অবস্থায় চিরকাল থাকবে, তবে তোমার রব যদি অন্য কিছু চান।" জান্নাতবাসীদের সম্পর্কেও এ একই কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ "যতদিন পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে ততদিন জান্নাতে তারা চিরকাল থাকবে, তবে তোমার রব যদি অন্য কিছু চান।" (হুদ ১০৭–১০৮ আয়াত) এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর 'আহকাব' শব্দের ভিত্তিতে একথা বলার অবকাশ আর কতটুকু থাকে যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীরা জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে না বরং কখনো না কখনো তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে?

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾

২ রুকূ'

অবশ্যি মুত্তাকীদের[১৯] জন্য সাফল্যের একটি স্থান রয়েছে। বাগ-বাগিচা, আঙুর, নবযৌবনা সমবয়সী তরুণীবৃন্দ[২০] এবং উচ্ছসিত পানপাত্র। সেখানে তারা শুনবে না কোন বাজে ও মিথ্যা কথা।[২১]

১৬. মূলে গাস্সাক (غَسَّاق) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয় ঃ পুঁজ, রক্ত, পুঁজ মেশানো রক্ত এবং চোখ ও গায়ের চামড়া থেকে বিভিন্ন ধরনের কঠোর দৈহিক নির্যাতনের ফলে যেসব রস বের হয়। এছাড়াও এ শব্দটি ভীষণ দুর্গন্ধ ও পঁচে গিয়ে উৎকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এমন জিনিসের জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১৭. এ হচ্ছে তাদের জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব ভোগ করার কারণ। প্রথমত, দুনিয়ায় তারা এ মনে করে জীবন যাপন করতে থাকে যে, আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজেদের আসনের হিসেব পেশ করার সময় কখনো আসবে না। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ নিজের নবীদের মাধ্যমে তাদের হিদায়াতের জন্য যেসব আয়াত পাঠিয়েছিলেন সেগুলো মেনে নিতে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে এবং সেগুলোকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে।

১৮. অর্থাৎ তাদের সমস্ত কথা ও কাজ, তাদের সব রকমের উঠাবসা-চলাফেরা এমনকি তাদের চিন্তা, মনোভাব, সংকল্প ও উদ্দেশ্যাবলীর পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড আমি তৈরি করে রাখছিলাম। সেই রেকর্ড থেকে কোন কিছুই বাদ যেতে পারেনি। অথচ সেই নির্বোধদের এ সবের কোন খবর ছিল না। তারা নিজেদের জায়গায় বসে মনে করছিল, তারা কোন মগের মুল্লুকে বাস করছে, নিজেদের ইচ্ছে মতো তারা এখানে যাচ্ছেতাই করে যাবে এবং তাদের এসব স্বেচ্ছাচারের জন্যে কারোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

১৯. এখানে মুত্তাকী শব্দটি এমন সব লোকের মোকাবিলায় ব্যবহার করা হয়েছে যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের দুনিয়ার কার্যক্রমের হিসেব দেবার কোন ধারণা পোষণ করতো না। এবং যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই নিশ্চিতভাবেই এ আয়াতে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর আয়াতকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল এবং একথা মনে করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছিল যে, কিয়ামতের দিন তাদের দুনিয়ায় সমস্ত কাজের হিসেব দিতে হবে।

২০. এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে । আবার এ অর্থও হতে পারে যে, তাদেরকে যেসব পুরুষের স্ত্রী হিসেবে দেয়া হবে তারা সে সব স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। ইতিপূর্বে সূরা সা'দ-এর ৫২ আয়াতে এবং সূরা ওয়াকিয়ার ৩৭ আয়াতেও এ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ
لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ
فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۖۚ يَّوْمَ
يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

প্রতিদান ও যথেষ্ট পুরস্কার[২২] তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, সেই পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহের এবং তাদের মধ্যবর্তী প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক, যার সামনে কারো কথা বলার শক্তি থাকবে না।[২৩]

যেদিন রূহ[২৪] ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যে ঠিক কথা বলবে, সে ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না।[২৫] সেদিনটি নিশ্চিতভাবেই আসবে। এখন যার ইচ্ছা নিজের রবের দিকে ফেরার পথ ধরুক।

যে আযাবটি কাছে এসে গেছে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম।[২৬] যেদিন মানুষ সেসব কিছুই দেখবে যা তার দু'টি হাত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কাফের বলে উঠবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম।[২৭]

২১. জান্নাতে মানুষ কোন বাজে, নোংরা, মিথ্যা ও অর্থহীন কথা শুনবে না। মানুষের কান এ থেকে সংরক্ষিত থাকবে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টিকে জান্নাতের বিরাট নিয়ামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। জান্নাতে কোন কটূকথা ও আজেবাজে গপসপ হবে না। কেউ কারোর সাথে মিথ্যা কথা বলবে না এবং কারোর কথাকে মিথ্যাও বলবে না। দুনিয়ায় গালিগালাজ, মিথ্যা দোষারোপ, অভিযোগ, কুৎসা প্রচার ও অন্যের ওপর মিথ্যা দোষ চাপিয়ে দেবার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা মানুষের সমাজে চলছে তার ছিটে ফোটাও সেখানে থাকবে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মারয়াম ৩৮ টীকা এবং আল ওয়াকিয়াহ ১৩ ও ১৪ টীকা।)

২২. প্রতিদান শব্দের পরে আবার যথেষ্ট পুরস্কার দেবার কথা বলার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তারা নিজেদের সৎকাজের বিনিময়ে যে প্রতিদান লাভের অধিকারী হবে কেবলমাত্র ততটুকুই তাদেরকে দেয়া হবে না বরং তার ওপর অতিরিক্ত পুরস্কার এবং অনেক বেশী পুরস্কার দেয়া হবে। বিপরীত পক্ষে জাহান্নামবাসীদের জন্য কেবলমাত্র এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদের যে পরিমাণ

অপরাধ তার চেয়ে বেশী শাস্তি দেয়া হবে না এবং কমও দেয়া হবে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউনুস ২৬–২৭ আয়াত, আন নাম্‌ল ৮৯–৯০ আয়াত, আল কাসাস ৮৪ আয়াত, সাবা ৩৩ আয়াত এবং আল মু'মিন ৪০ আয়াত।

২৩. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারের শান–শওকত, প্রভাব ও প্রতিপত্তি এমন পর্যায়ের হবে যার ফলে পৃথিবী বা আকাশের অধিবাসী কারোর আল্লাহর সামনে কথা বলার অথবা তাঁর আদালতের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার সাহস হবে না।

২৪. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে জিব্রীল আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর দরবারে তিনি উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবার কারণে এখানে অন্যান্য ফেরেশতাদের থেকে আলাদাভাবে তাঁর কথা বলা হয়েছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আল মা'আরিজ ৩ টীকা)

২৫. এখানে কথা বলা মানে শাফায়াত করা বলা হয়েছে, কেবলমাত্র দু'টি শর্ত সাপেক্ষে সেদিন এ শাফায়াত সম্ভব হবে। এক, যে ব্যক্তিকে যে গুনাহগারের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হবে একমাত্র সে–ই তার জন্য শাফায়াত করতে পারবে। দুই, শাফায়াতকারীকে সঠিক ও যথার্থ সত্য কথা বলতে হবে। অন্যায় সুপারিশ করতে পারবে না। দুনিয়ায় কমপক্ষে সত্যের কালেমার সমর্থক অর্থাৎ নিছক গুনাহগার ছিল, কাফের ছিল না, এমন ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করতে হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ ২৮১ টীকা, ইউনুস ৫ টীকা, হূদ ১০৬ টীকা, মারয়াম ৫২ টীকা, ত্বা–হা ৮৫–৮৬ টীকা, আল আম্বিয়া ২৭ টীকা, সাবা ৪০–৪১ টীকা, আল মু'মিন ৩২ টীকা, আয যুখ্‌রুফ ৬৮ টীকা, আন নাজম ২১ টীকা এবং আল মুদ্‌দাস্‌সির ৩৬ টীকা)

২৬. আপাতদৃষ্টিতে এক ব্যক্তি এখানে একথা চিন্তা করতে পারে যে যাদেরকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছিল তারা চৌদ্দ'শ বছর আগে দুনিয়া থেকে চলে গেছে এবং এখনো বলা যেতে পারে না, কিয়ামত আগামী কত শত, হাজার বা লক্ষ বছর পরে আসবে, তাহলে একথাটি কোন্ অর্থে বলা হয়েছে যে, যে আযাবটি কাছে এসে গেছে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম? তাছাড়া সূরার সূচনায় কেমন করে একথা বলা হলো যে, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে? এর জবাব এই যে, মানুষ যতক্ষণ এ দুনিয়ার স্থান ও কালের সীমানায় রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে অবস্থান করে কেবল ততক্ষণই তার মধ্যে সময়ের অনুভূতি থাকে। মরণের পরে যখন শুধুমাত্র রূহই বাকি থেকে যাবে তখন আর সময়ের চেতনা ও অনুভূতি থাকবে না। আর কিয়ামতের দিন মানুষ যখন পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠবে তখন তার মনে হবে যেন এখনি ঘুমের মধ্যে কেউ তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার বছর পরে তাকে আবার জীবিত করা হয়েছে, এ অনুভূতির লেশমাত্রও তখন তার মধ্যে থাকবে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নামল ২৬ টীকা, বনি ইসরাঈল ৫৬ টীকা, ত্বা–হা ৮০ টীকা এবং ইয়াসীন ৪৮ টীকা)

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ায় জন্মই না হতো অথবা মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যেতাম এবং আবার জীবিত হয়ে ওঠার সুযোগ না হতো।

আন নাযি'আত

৭৯

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ وَالنّٰزِعٰتِ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আম্মা ইয়াতাসা–আলূনা"র পরে এ সূরাটি নাযিল হয়। এটি যে প্রথম দিকের সূরা তা এর বিষয়বস্তু থেকেও প্রকাশ হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের প্রমাণ এবং এ সংগে আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার পরিণাম সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ।

বক্তব্যের সূচনায় মৃত্যুকালে প্রাণ হরণকারী, আল্লাহর বিধানসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নকারী এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সারা বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের কসম খেয়ে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যি হবে এবং মৃত্যুর পরে নিশ্চতভাবে আর একটি নতুন জীবনের সূচনা হবে। কারণ যে ফেরেশতাদের সাহায্যে আজ মানুষের প্রাণবায়ু নির্গত করা হচ্ছে তাদেরই সাহায্যে আবার মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার করা যেতে পারে। যে ফেরেশতারা আজ মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে সংগে সংগেই আল্লাহর হুকুম তামিল করে যাচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছে, আগামীকাল সেই ফেরেশতারাই সেই একই আল্লাহর হুকুমে এ বিশ্ব ব্যবস্থা ওলটপালট করে দিতে এবং আর একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এরপর লোকদের জানানো হয়েছে, এই যে কাজটিকে তোমরা একেবারেই অসম্ভব মনে করো, আল্লাহর জন্য এটি আদতে এমন কোন কঠিন কাজই নয়, যার জন্য বিরাট ধরনের কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হতে পারে। একবার ঝাঁকুনি দিলেই দুনিয়ার এ সমস্ত ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যাবে। তারপর আর একবার ঝাঁকুনি দিলে তোমরা অকস্মাৎ নিজেদেরকে আর একটি নতুন জগতের বুকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবে। তখন যারা এ পরবর্তী জগতের কথা অস্বীকার করতো তারা ভয়ে কাঁপতে থাকবে। যেসব বিষয় তারা অসম্ভব মনে করতো তখন সেগুলো দেখতে থাকবে অবাক বিস্ময়ে।

তারপর সংক্ষেপে হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের কথা বর্ণনা করে লোকদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার, তাঁর হিদায়াত ও পথনির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করার এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে পরাজিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবার পরিণাম ফেরাউন দেখে নিয়েছে। ফেরাউনের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তোমরা যদি নিজেদের কর্মনীতি পরিবর্তন না করো তাহলে তোমাদের পরিণামও অন্য রকম হবে না।

এরপর ২৭ থেকে ৩৩ আয়াত পর্যন্ত মৃত্যুর পরের জীবনের সপক্ষে যুক্তি–প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন কাজ অথবা প্রথমবার মহাশূন্যের অসংখ্য গ্রহ–নক্ষত্র সহ এ বিশাল বিস্তীর্ণ বিশ্ব–জগত সৃষ্টি করা কঠিন কাজ? যে আল্লাহর জন্য এ কাজটি কঠিন ছিল না তাঁর জন্য তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? মাত্র একটি বাক্যে আখেরাতের সম্ভাবনার সপক্ষে এ অকাট্য যুক্তি পেশ করার পর পৃথিবীর প্রতি এবং পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবন ধারণের জন্য যেসব উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে জীবন ধারণের এ উপকরণের প্রতিটি বস্তুই এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতা সহকারে তাকে কোন না কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ইংগিত করার পর মানুষের নিজের চিন্তা–ভাবনা করে মতামত গঠনের জন্য এ প্রশ্নটি তার বুদ্ধিবৃত্তির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্ব–জাহানের এ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থায় মানুষের মতো একটি বুদ্ধিমান জীবকে স্বাধীন ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও দায়িত্ব অর্পণ করে তার কাজের হিসেব নেয়া, অথবা সে পৃথিবীর বুকে সব রকমের কাজ করার পর মরে গিয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে এবং চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তারপর তাকে যে ক্ষমতা–ইখতিয়ারগুলো দেয়া হয়েছিল সেগুলো সে কিভাবে ব্যবহার করেছে এবং যে দায়িত্বসমূহ তার ওপর অর্পণ করা হয়েছিল সেগুলো কিভাবে পালন করেছে, তার হিসেব কখনো নেয়া হবে না— এর মধ্যে কোনটি বেশী যুক্তিসংগত বলে মনে হয়? এ প্রশ্নে এখানে কোন আলোচনা করার পরিবর্তে ৩৪ থেকে ৪১ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের দিন মানুষের স্থায়ী ও চিরন্তন ভবিষ্যতের ফায়সালা করা হবে। দুনিয়ায় নির্ধারিত সীমানা লংঘন করে কে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করেছে, পার্থিব লাভ, স্বার্থ ও স্বাদ আস্বাদনকে উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে এবং কে নিজের রবের সামনে হিসেব–নিকেশের জন্য দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীতি অনুভব করেছে ও নফসের অবৈধ আকাংখা–বাসনা পূর্ণ করতে অস্বীকার করেছে, সেদিন এরি ভিত্তিতে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। একথার মধ্যেই ওপরের প্রশ্নের সঠিক জবাব রয়ে গেছে। জিদ ও হঠকারিতামুক্ত হয়ে ঈমানদারীর সাথে এ সম্পর্কে চিন্তা করলে যে কোন ব্যক্তিই এ জবাব হাসিল করতে পারে। কারণ মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য যেসব ইখতিয়ার ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে কাজ শেষে তার কাজের হিসেব নেয়া এবং তাকে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়াই হচ্ছে এ ইখতিয়ার ও দায়িত্বের স্বাভাবিক, নৈতিক ও যুক্তিসংগত দাবী।

সবশেষে মক্কার কাফেরদের যে একটি প্রশ্ন ছিল 'কিয়ামত কবে আসবে,–তার জবাব দেয়া হয়েছে। এ প্রশ্নটি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বারবার

করতো। জবাবে বলা হয়েছে, কিয়ামত কবে হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। রসূলের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র কেয়ামত যে অবশ্যই হবে এ সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া। এখন যার ইচ্ছা কিয়ামতের ভয়ে নিজের কর্মনীতি সংশোধন করে নিতে পারে আবার যার ইচ্ছা কিয়ামতের ভয়ে ভীত না হয়ে লাগামহীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। তারপর যখন সে সময়টি এসে যাবে তখন এ দুনিয়ার জীবনের জন্য যারা প্রাণ দিতো এবং একেই সবকিছু মনে করতো, তারা অনুভব করতে থাকবে, এ দুনিয়ার বুকে তারা মাত্র সামান্য সময় অবস্থান করেছিল। তখন তারা জানতে পারবে, এ মাত্র কয়েক দিনের জীবনের বিনিময়ে তারা চিরকালের জন্য নিজেদের ভবিষ্যত কিভাবে বরবাদ করে দিয়েছে।

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾
فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا
الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿٨﴾ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾

সেই ফেরেশতাদের কসম যারা ডুব দিয়ে টানে এবং খুব আস্তে আস্তে বের করে নিয়ে যায়। আর (সেই ফেরেশতাদেরও যারা বিশ্বলোকে) দ্রুত গতিতে সাঁতরে চলে, বারবার (হুকুম পালনের ব্যাপারে) সবেগে এগিয়ে যায়, এরপর (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনা করে।[১] যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা ঝাঁকুনি দেবে এবং তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা।[২] কতক হৃদয় সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে।[৩] দৃষ্টি হবে তাদের ভীতি বিহবল।

১. এখানে যে বিষয়টির জন্য পাঁচটি গুণাবলীসম্পন্ন সত্তাসমূহের কসম খাওয়া হয়েছে তার কোন বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী আলোচনায় যেসব বিষয় উত্থাপিত হয়েছে তা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত অবশ্যি হবে এবং সমস্ত মৃত মানুষদের নিশ্চতভাবেই আবার নতুন করে জীবিত করে উঠানো হবে, একথার ওপরই এখানে কসম খাওয়া হয়েছে। এ পাঁচটি গুণাবলী কোন্ কোন্ সত্তার সাথে জড়িত, একথাও এখানে পরিষ্কার করে বলা হয়নি। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈন এবং অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), মাসরূক, সাঈদ ইবনে যুবাইর, আবু সালেহ, আবুদ্ দুহা ও সুদ্দী বলেন ঃ ডুব দিয়ে টানা এবং আস্তে আস্তে বের করে আনা এমন সব ফেরেশতার কাজ যারা মৃত্যুকালে মানুষের শরীরের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার প্রতিটি শিরা উপশিরা থেকে তার প্রাণ বায়ু টেনে বের করে আনে। দ্রুতগতিতে সাঁতরে চলার সাথে হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর ও আবু সালেহ ফেরেশতাদেরকেই সংশ্লিষ্ট করেছেন। এ ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুম তামিল করার জন্য এমন দ্রুত গতিশীল রয়েছে যেন মনে হচ্ছে তারা মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে। "সবেগে এগিয়ে যাওয়ার" ব্যাপারেও এই একই অর্থ গ্রহণ করেছেন হযরত আলী (রা) মুজাহিদ, আতা, আবু সালেহ, মাসরূক ও

يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾

এরা বলে, "সত্যিই কি আমাদের আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে? পচা–গলা হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও?" বলতে থাকে "তাহলে তো এ ফিরে আসা হবে বড়ই লোকসানের!"[৪] অথচ এটা শুধুমাত্র একটা বড় রকমের ধমক এবং হঠাৎ তারা হাযির হবে একটি খোলা ময়দানে।[৫]

হাসান বসরী প্রমুখগণ। আর সবেগে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর হুকুমের ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই তাদের প্রত্যেকেই তা তামিল করার জন্যে দৌড়ে যায়। "সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনাকারী বলতেও ফেরেশতাদের কথাই বুঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রা), মুজাহিদ, আতা, আবু সালেহ, হাসান বসরী, কাতাদাহ থেকে একথাই উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, এরা বিশ্ব ব্যবস্থাপনার এমন সব কর্মচারী যাদের হাতে আল্লাহর হুকুমে দুনিয়ার সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। কোন সহীহ হাদীসে এ আয়াতগুলোর এ অর্থ বর্ণিত না হলেও প্রথম সারির কয়েকজন সাহাবা এবং তাঁদেরই ছাত্রমণ্ডলীর অন্তরভুক্ত কতিপয় তাবেঈ যখন এগুলোর এ অর্থ বর্ণনা করেছেন তখন তাঁদের এই জ্ঞান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অর্জিত হয়ে থাকবে মনে করাটাই স্বাভাবিক।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া ও মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে ফেরেশতাদের কসম খাওয়ার কারণ কি? তারা নিজেরাই তো সে জিনিসের মতো অদৃশ্য ও অননুভূত, যা অনুষ্ঠিত হবার ব্যাপারে তাদেরকে সাক্ষী ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে? এর কারণ অবশ্য আল্লাহ ভালো জানেন। তবে আমার মতে এর কারণ হচ্ছে, আরববাসীরা ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতো না। তারা স্বীকার করতো মৃত্যুকালে ফেরেশতারাই মানুষের প্রাণ বের করে নিয়ে যায়। তারা একথাও বিশ্বাস করতো যে, ফেরেশতারা অতি দ্রুতগতিশীল হয়, এক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায় এবং হুকুম করার সাথে সাথেই যে কোন কাজ মুহূর্তকাল দেরী না করেই করে ফেলে। তারা একথাও মানতো, ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমের অনুগত এবং আল্লাহর হুকুমেই বিশ্ব–জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। ফেরেশতারা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র 'ইচ্ছা ও কর্মপ্রেরণার অধিকারী নয়। মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে তারা অবশ্যি ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলতো। তারা তাদেরকে নিজেদের মাবুদে পরিণত করেছিল। কিন্তু আসল ক্ষমতা–ইখতিয়ার যে ফেরেশতাদের হাতে একথা তারা মনে করতো না। তাই এখানে কিয়ামত হওয়া এবং মৃত্যুর পরের জীবন প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই ফেরেশতাদের উপরোল্লিখিত গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰى ﴿١٥﴾ إِذْ نَادٰىهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ اذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغٰى ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلٰى أَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيَكَ إِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾ فَأَرٰىهُ الْآيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولٰى ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشٰى ﴿٢٦﴾

তোমার[৬] কাছে কি মূসার ঘটনার খবর পৌঁছেছে? যখন তার রব তাকে পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায়[৭] ডেকে বলেছিলেন, "ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তাকে বলো, তোমার কি পবিত্রতা অবলম্বন করার আগ্রহ আছে এবং তোমার রবের দিকে আমি তোমাকে পথ দেখাবো, তাহলে তোমার মধ্যে (তাঁর) ভয় জাগবে?[৮] তারপর মূসা ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে বড় নিদর্শন[৯] দেখালো। কিন্তু সে মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান করলো ও অমান্য করলো, তারপর চালবাজী করার মতলবে পিছন ফিরলো।[১০] এবং লোকদের জমায়েত করে তাদেরকে সম্বোধন করে বললো : "আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব"[১১] অবশেষে আল্লাহ তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন। আসলে এর মধ্যে রয়েছে মস্তবড় শিক্ষা, যে ভয় করে তার জন্যে।[১২]

যে, আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা তোমাদের প্রাণ বের করে নিয়ে যায়, তাঁরই হুকুমে তারা আবার তোমাদের প্রাণ দানও করতে পারে। যে আল্লাহর হুকুমে তারা বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছে তাঁরই হুকুমে, যখনই তিনি এ হুকুম করবেন তখনই তারা এ বিশ্ব–জাহানকে ধ্বংস করে দিতে এবং আর একটি নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করতেও পারে। তাঁর হুকুম তামিল করার ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে সামান্যতম শৈথিল্য বা মুহূর্তকাল দেরীও হতে পারে না।

২. প্রথম ধাক্কা বলতে এমন ধাক্কা বুঝানো হয়েছে, যা পৃথিবী ও তার মধ্যকার সমস্ত জিনিস ধ্বংস করে দেবে। আর দ্বিতীয় ধাক্কা বলতে যে ধাক্কায় সমস্ত মৃতরা জীবিত হয়ে যমীনের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে তাকে বুঝানো হয়েছে। সূরা যুমারে এ অবস্থাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে : "আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন পৃথিবী ও

আকাশসমূহে যা কিছু আছে সব মরে পড়ে যাবে, তবে কেবলমাত্র তারাই জীবিত থাকবে যাদের আল্লাহ (জীবিত রাখতে) চাইবেন। তারপর দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে। তখন তারা সবাই আবার হঠাৎ উঠে দেখতে থাকবে।" (৬৮ আয়াত)

৩. "কতক হৃদয়" বলা হয়েছে। কারণ কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র কাফের, নাফরমান ও মুনাফিকরাই কিয়ামতের দিন ভীত ও আতংকিত হবে। সৎ মু'মিন বান্দাদের ওপর এ ভীতি প্রভাব বিস্তার করবে না। সূরা আম্বিয়ায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "সেই চরম ভীতি ও আতংকের দিনে তারা একটুও পেরেশান হবে না এবং ফেরেশতারা এগিয়ে এসে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। তারা বলতে থাকবে, তোমাদের সাথে এ দিনটিরই ওয়াদা করা হয়েছিল।" (১০৩ আয়াত)

৪. অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হল, হাঁ সেখানে এমনটিই হবে, তারা বিদ্রূপ করে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো ঃ সত্যিই যদি আমাদের আবার জীবিত হয়ে ফিরে আসতে হয় তাহলে তো আমরা মারা পড়বো। এরপর আমাদের আর রক্ষে নেই।

৫. অর্থাৎ তারা এটাকে একটা অসম্ভব কাজ মনে করে একে বিদ্রূপ করছে। অথচ আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়। এ কাজটি করতে তাঁকে কোন বড় রকমের প্রস্তুতি নিতে হবে না। এর জন্য শুধুমাত্র একটি ধমক বা ঝাঁকুনিই যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের শরীরের ধ্বংসাবশেষ মাটি বা ছাই যে কোন আকারেই থাক না কেন সব দিক থেকে উঠে এসে এক জায়গায় জমা হবে এবং অকস্মাৎ তোমরা নিজেদেরকে পৃথিবীর বুকে জীবিত আকারে দেখতে পাবে। এ ফিরে আসাকে যতই ক্ষতিকর মনে করে তোমরা তা থেকে পালিয়ে থাকার চেষ্টা করো না কেন, এ ঘটনা অব্যশই ঘটবে। তোমাদের অস্বীকার, পলায়ন প্রচেষ্টা বা ঠাট্টা-বিদ্রূপে এটা থেমে যাবে না।

৬. মক্কার কাফেরদের কিয়ামত ও আখেরাতকে না মানা এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা আসলে কোন দার্শনিক তত্ত্বের অস্বীকৃতি ছিল না। বরং এভাবে তারা আল্লাহর রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তারা যে কৌশল অবলম্বন করতো তা কোন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ছিল না। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর রসূলকে আঘাত হানা ও ক্ষতিগ্রস্ত করা। তাই আখেরাতের জীবনের ব্যাপারে আরো বেশী যুক্তিপ্রমাণ পেশ করার আগে তাদেরকে হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের ঘটনা শুনানো হচ্ছে। এভাবে তারা রসূলের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া এবং রসূল প্রেরণকারী আল্লাহর মোকাবিলায় মাথা উঁচু করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যেতে পারবে।

৭. পবিত্র তুওয়া উপত্যকার অর্থ বর্ণনা করে সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ বলেছেন ঃ "সেই পবিত্র উপত্যকাটি যার নাম ছিল তুওয়া" কিন্তু এ ছাড়া এর আরো দু'টি অর্থও হয়। এক, "যে উপত্যকাটিকে দু'বার পবিত্র করা হয়েছে।" কারণ মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ)-কে সেখানে সম্বোধন করে প্রথম বার তাকে পবিত্র করেন। আর হযরত মূসা বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে বের করে এনে এ উপত্যকায় অবস্থান করলে আল্লাহ তাকে দ্বিতীয়বার পবিত্রতার মর্যাদায় ভূষিত করেন। দুই, "রাতে পবিত্র উপত্যকায় সম্বোধন

করেন।" আরবী প্রবাদে বলা হয় ঃ جاء بعد طوى অর্থাৎ উমুক ব্যক্তি রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করার পর এসেছিল।

৮. এখানে কয়েকটি কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে ঃ

এক ঃ হযরত মূসাকে নবুওয়াতের দায়িত্বে নিযুক্ত করার সময় তাঁর ও আল্লাহর মধ্যে যেসব কথা হয়েছিল কুরআন মজীদের যথার্থ স্থানে তা কোথাও সংক্ষেপে আবার কোথাও বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে বলার সুযোগ ছিল। তাই এখানে কেবল সেগুলোর সারাংশই বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা ত্বা–হার ৯ থেকে ৪৮, শূ'আরার ১০ থেকে ১৭, নামলের ৭ থেকে ১২ এবং কাসাসের ২৯ থেকে ৩৫ আয়াতে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দুই ঃ এখানে ফেরাউনের যে বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, বন্দেগীর সীমানা অতিক্রম করে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের মোকাবিলায় বিদ্রোহ করা। স্রষ্টার মোকাবিলায় বিদ্রোহ করার বিষয়টির আলোচনা সামনের দিকে এসে যাচ্ছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ ফেরাউন তার প্রজাদের সমবেত করে ঘোষণা করে, "আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।" আর সৃষ্টির মোকাবিলায় তার বিদ্রোহ ও সীমালংঘন ছিল এই যে, সে নিজের শাসনাধীন এলাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। দুর্বল শ্রেণীগুলোর ওপর সে চালাতো কঠোর জুলুম–নির্যাতন এবং নিজের সমগ্র জাতিকে বোকা বানিয়ে তাদেরকে নিজের দাসে পরিণত করে রেখেছিল। একথা সূরা কাসাসের ১৪ আয়াতে এবং সূরা যুখরুফের ৫৪ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিন ঃ হযরত মূসাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ঃ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى "তুমি ও তোমার ভাই হারুন, তোমরা দু'জনে তার সাথে মোলায়েম সুরে কথা বলবে, হয়তো সে নসীহত গ্রহণ করতে ও আল্লাহকে ভয় করতে পারে।" (সূরা ত্বা–হা ৪৪ আয়াত) এ মোলায়েম সুরে কথা বলার একটা নমুনা এ আয়াতগুলোতে পেশ করা হয়েছে। এ থেকে একজন পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে পথ দেখাবার জন্য তার কাছে কিভাবে বিচক্ষণতার সাথে সত্যের দাওয়াত পেশ করতে হবে তার কলাকৌশল জানা যায়। এর দ্বিতীয় নমুনাটি পেশ করা হয়েছে সূরা ত্বা–হা'র ৪৯ থেকে ৫২, আশ্ শূ'আরার ২৩ থেকে ২৮ এবং আল কাসাসের ৩৭ আয়াতে। কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ যেসব আয়াতে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কৌশল শিখিয়েছেন এ আয়াতগুলো তারই অন্তরভুক্ত।

চার ঃ হযরত মূসাকে শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলদের মুক্ত করার জন্য ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়নি, যেমন কোন কোন লোক মনে করে থাকেন। বরং তাঁকে নবুওয়াত দান করে ফেরাউনের কাছে পাঠাবার প্রথম উদ্দেশ্যই ছিল ফেরাউন ও তার কওমকে সত্য সঠিক পথ দেখানো। এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, যদি সে সত্য সঠিক পথ গ্রহণ না করে তাহলে তিনি বনী ইসরাঈলকে (যারা আসলে ছিল একটি মুসলিম কওম) তার দাসত্বমুক্ত করে মিসর থেকে বের করে আনবেন। 'এ আয়াতগুলো থেকেও একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ এগুলোতে বনী ইসরাঈলের রেহাইয়ের কোন উল্লেখই নেই। বরং হযরত মূসাকে

ফেরাউনের সামনে কেবলমাত্র সত্যের দাওয়াত প্রচার করার হুকুম দেয়া হয়েছে। যেসব আয়াতে হযরত মূসা ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন এবং বনী ইসরাঈলদের রেহাই–এর দাবীও করেছেন সেসব আয়াত থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল 'আরাফের ১০৪ থেকে ১০৫, ত্বা–হা'র ৪৭ থেকে ৫২, আশ শূ'আরার ১৬ থেকে ১৭ এবং ২৩ থেকে ২৮ আয়াত। (আরও বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুসের ৭৪ টীকা দেখুন)

পাঁচ ঃ এখানে পবিত্রতা (আত্মিক শুদ্ধতা) অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে আকীদা–বিশ্বাস, চরিত্র ও কর্ম সবক্ষেত্রে পবিত্রতা অবলম্বন করা। অন্য কথায় ইসলাম গ্রহণ করা। ইবনে যায়েদ বলেন, কুরআনে যেখানেই ['তাযাক্কী' (আত্মিক) শুদ্ধতা] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হয় ইসলাম গ্রহণ করা। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি পেশ করেন ঃ وَذٰلِكَ جَزَاۤؤُ مَنْ تَزَكّٰى "আর এটি হচ্ছে তাদের প্রতিদান যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে।" অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে। وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى "আর তোমরা জান, হয়তো তারা পবিত্রতা অবলম্বন করতে পারে।" অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যেতে পারে। وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى "আর কী যদি তারা পবিত্রতা অবলম্বন করতে না পারে তাহলে তোমার কি দায়িত্ব আছে?" অর্থাৎ যদি তারা মুসলমান না হয়। (ইবনে জারীর)।

ছয় ঃ আর "তোমার রবের দিকে আমি তোমাকে পথ দেখাবো, তাহলে তোমার মধ্যে (তাঁর) ভয় জাগবে" –একথার অর্থ হচ্ছে, যখন তুমি নিজের রবকে চিনে নেবে এবং তুমি জানতে পারবে যে, তুমি তার বান্দাহ, স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি নও তখন অনিবার্যভাবে তোমার দিলে তাঁর ভয় সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহর ভয় এমন একটি জিনিস যার ওপর দুনিয়ার মানুষের সঠিক ও নির্ভুল দৃষ্টিভংগী গ্রহণ নির্ভর করে। আল্লাহর জ্ঞান এবং তাঁর ভয় ছাড়া কোন প্রকার পবিত্রতা ও শুদ্ধ আত্মার কথা কল্পনাই করা যেতে পারে না।

৯. বড় নিদর্শন বলতে এখানে লাঠির অজগর হয়ে যাওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্যি একটি নিষ্প্রাণ লাঠির মানুষের চোখের সামনে একটি জলজ্যান্ত অজগর সাপে পরিণত হওয়া, যাদুকরেরা এর মোকাবিলায় লাঠি ও দড়ি দিয়ে যেসব কৃত্রিম অজগর বানিয়ে দেখিয়েছিল সেগুলোকে টপাটপ গিলে ফেলা এবং হযরত মূসা (আ) যখন একে ধরে উঠিয়ে নিলেন তখন আবার এর লাঠি হয়ে যাওয়া, এর চাইতে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে? এসব একথারই সুস্পষ্ট আলামত যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

১০. কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ ফেরাউন সারা মিসর থেকে শ্রেষ্ঠ পারদর্শী যাদুকরদের ডেকে আনে এবং একটি বিশাল সাধারণ সমাবেশে তাদেরকে লাঠি ও দড়ি দিয়ে অজগর সাপ বানাতে বলে, যাতে করে লোক বিশ্বাস করে যে মূসা আলাইহিস সালাম কোন নবী নন বরং একজন যাদুকর এবং লাঠিকে অজগরে পরিণত করার যে তেলেসমাতি তিনি দেখিয়েছেন অন্যান্য যাদুকররাও তা দেখাতে পারে। কিন্তু তার এ প্রতারণাপূর্ণ কৌশল ব্যর্থ হলো এবং যাদুকররা পরাজিত

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا ﴿٣٢﴾ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٣﴾

২ রুকূ'

তোমাদের[১৩] সৃষ্টি করা বেশী কঠিন কাজ, না আকাশের?[১৪] আল্লাহই তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার ছাদ অনেক উঁচু করেছেন। তারপর তার ভারসাম্য কায়েম করেছেন। তার রাতকে ঢেকে দিয়েছেন এবং তার দিনকে প্রকাশ করেছেন।[১৫] এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন।[১৬] তার মধ্য থেকে তার পানি ও উদ্ভিদ বের করেছেন[১৭] এবং তার মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন, জীবন যাপনের সামগ্রী হিসেবে তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুদের জন্য।[১৮]

হয়ে নিজেরাই স্বীকার করে নিল যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যা কিছু দেখিয়েছেন তা যাদু নয় বরং মু'জিযা।

১১. ফেরাউনের এ দাবীটি কুরআনের কয়েকটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার সে হযরত মূসা (আ)–কে বলে, "যদি তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে আল্লাহ বলে মেনে নিয়ে থাকো তাহলে আমি তোমাকে বন্দী করবো।" (আশ শূ'আরার ২৯ আয়াত) আর একবার সে তার দরবারের লোকদের সম্বোধন করে বলে, "হে জাতির প্রধানরা আমি জানি না আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন খোদাও আছে।" (আল কাসাস ৩৮ আয়াত) ফেরাউনের এসব বক্তব্যের এ অর্থ ছিল না এবং এ অর্থ হতেও পারে না যে, সে–ই এই বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা এবং এ পৃথিবীটাও সে সৃষ্টি করেছে। এ সবের এ অর্থও ছিল না যে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং নিজেকেই বিশ্ব–জাহানের রব বলে দাবী করে। আবার এ অর্থও ছিল না যে, সে ধর্মীয় অর্থে একমাত্র নিজেকেই লোকদের মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করে। তার ধর্মের ব্যাপারে কুরআন মজীদই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে নিজেই অন্য উপাস্যদের পূজা করতো। তাই দেখা যায় তার সভাসদরা একবার তাকে সম্বোধন করে বলে, "আপনি কি মূসাকে ও তার কওমকে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করার এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে ত্যাগ করার স্বাধীনতা দিতে থাকবেন? (আল আ'রাফ ১২৭ আয়াত) কুরআনে ফেরাউনের এ বক্তব্যও উদ্ধৃত হয়েছে যে, মূসা যদি আল্লাহর প্রেরিত হতো তাহলে তার কাছে সোনার কাঁকন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন? অথবা তার সাথে ফেরেশতাদেরকে চাপরাশি–আরদালি হিসেবে পাঠানো হয়নি কেন? (আয্ যুখরুফ ৫৩ আয়াত) কাজেই এ থেকে বুঝা যায় যে, আসলে সে ধর্মীয় অর্থে নয়

বরং রাজনৈতিক অর্থে নিজেকে ইলাহ, উপাস্য ও প্রধান রব হিসেবে পেশ করতো। অর্থাৎ এর অর্থ ছিল, আমি হচ্ছি প্রধান কর্তৃত্বের মালিক। আমি ছাড়া আর কেউ আমার রাজ্যে হুকুম চালাবার অধিকার রাখে না। আর আমার ওপর আর কোন উচ্চতর ক্ষমাতাধরও নেই, যার ফরমান এখানে জারী হতে পারে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ ৮৫ টীকা, ত্বা–হা ২১ টীকা, আশ্ শু'আরা ২৪ ও ২৬ টীকা, আল কাসাস ৫২ ও ৫৩ টীকা এবং আয যুখরুফ ৪৯ টীকা)

১২. অর্থাৎ আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার ও তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার পরিণামকে ভয় করো। ফেরাউন এই পরিণামের মুখোমুখি হয়েছিল।

১৩. কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবন যে সম্ভব এবং তা যে সৃষ্টি জগতের পরিবেশ পরিস্থিতির যুক্তিসংগত দাবী একথার যৌক্তিকতা এখানে পেশ করা হয়েছে।

১৪. এখানে সৃষ্টি করা মানে দ্বিতীয়বার মানুষ সৃষ্টি করা। আর আকাশ মানে সমগ্র উর্ধজগত, যেখানে রয়েছে অসংখ্য গ্রহ, তারকা, অগণিত সৌরজগত, নীহারিকা ও ছায়াপথ। একথা বলার অর্থ হচ্ছে ঃ তোমরা মৃত্যুর পর আবার জীবিত করাকে বড়ই অসম্ভব কাজ মনে করছো। বারবার বলছো, আমাদের হাড়গুলো পর্যন্ত যখন পচে গলে যাবে, সে অবস্থায় আমাদের শরীরের বিক্ষিপ্ত অংশগুলো আবার এক জায়গায় জমা করা হবে এবং তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হবে, এটা কেমন করে সম্ভব? তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, এই বিশাল বিশ্ব–জাহানের সৃষ্টি বেশী কঠিন কাজ, না তোমাদের একবার সৃষ্টি করার পর দ্বিতীয়বার সেই একই আকৃতিতে সৃষ্টি করা কঠিন? যে আল্লাহর জন্য প্রথমটি কঠিন ছিল না তার জন্য দ্বিতীয়টি অসম্ভব হবে কেন? মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে এই যুক্তিটিই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা ইয়াসিনে বলা হয়েছে ঃ "আর যিনি আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেছেন, তিনি কি এই ধরনের জিনিসগুলোকে (পুনর্বার) সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়? তিনি তো মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টা। সৃষ্টি করার কাজ তিনি খুব ভালো করেই জানেন।" (৮১ আয়াত) সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ "অবশ্যি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টির চাইতে অনেক বেশী বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৫৭ আয়াত)

১৫. রাত ও দিনকে আকাশের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। কারণ আকাশের সূর্য অস্ত যাওয়ার ফলে রাত হয় এবং সূর্য উঠার ফলে হয় দিন। রাতের জন্য ঢেকে দেয়া শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রাতে অন্ধকার পৃথিবীর ওপর এমনভাবে ছেয়ে যায় যেন ওপর থেকে তার ওপর পরদা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

১৬. "এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন"–এর অর্থ এ নয় যে, আকাশ সৃষ্টি করার পরই আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এটা ঠিক এমনই একটা বর্ণনা পদ্ধতি যেমন আমরা বলে থাকি, "তারপর একথাটা চিন্তা করতে হবে।" এর মানে এ নয় যে, প্রথমে ওই কথাটা বলা হয়েছে তারপর একথাটা বলা হচ্ছে। এভাবে আগের কথার সাথে একথাটার ঘটনামূলক ধারাবাহিক সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং দু'টো কথা একসাথে বলা হলেও এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হয় একটা কথার পরে দ্বিতীয় কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। এই বর্ণনা পদ্ধতির অসংখ্য নজীর কুরআন মজীদেই পাওয়া

যাবে। যেমন সূরা কলমে বলা হয়েছে : عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ "জালেম এবং তারপর বজ্জাত" এর অর্থ এ নয় যে, প্রথমে সে জালেম হয়েছে তারপর হয়েছে বজ্জাত। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সে জালেম এবং তার ওপর অতিরিক্ত হচ্ছে সে বজ্জাতও। এভাবে সূরা বালাদে বলা হয়েছে : فَكُّ رَقَبَةٍ .... ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا "দাসকে মুক্ত করে দেয়া ....তারপর মু'মিনদের অন্তরভুক্ত হওয়া।" এর অর্থও এ নয় যে, প্রথমে সে (দাস মুক্ত করে) সৎকাজ করবে তারপর ঈমান আনবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এসব সৎকাজ করার প্রবণতার সাথে সাথে তার মধ্যে মু'মিন হবার গুণটিও থাকতে হবে। এখানে একথাটিও অনুধাবন করতে হবে যে, কুরআনে কোথাও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ২৯ আয়াতে। আবার কোথাও আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এই আয়াতগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটি আসলে কোন বিপরীতধর্মী বক্তব্য নয়। কুরআনের এসব জায়গায় কোথাও কাকে আগে ও কাকে পরে সৃষ্টি করা হয়েছে, একথা বলা মূল বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। বরং যেখানে পরিবেশ ও পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী আল্লাহর অসীম ক্ষমতা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেখানে আকাশসমূহের আলোচনা প্রথমে করা হয়েছে এবং পৃথিবীর আলোচনা করা হয়েছে পরে। আবার যেখানে ভাষণের ধারা অনুযায়ী পৃথিবীতে মানুষ যেসব নিয়ামত লাভ করছে সেগুলোর কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেখানে পৃথিবীর আলোচনা করা হয়েছে আকাশের আগে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, হা-মীম আস্ সাজদাহ ১৩ থেকে ১৪ টীকা দেখুন)

১৭. উদ্ভিদ বলতে শুধু প্রাণীদের খাদ্য উদ্ভিদের কথা বলা হয়নি বরং মানুষ ও পশু উভয়ের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত যাবতীয় উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে। রা'আ (رَعٰى) ও রতু'আ (رتع) শব্দ দু'টি যদিও সাধারণভাবে আরবী ভাষায় পশুদের চারণভূমির জন্য ব্যবহার করা হয়, তবুও কখনো কখনো মানুষের জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফের (আ) ভাইয়েরা তাদের মহামান্য পিতাকে বলেন : اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ "আপনি আগামীকাল ইউসুফকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। কিছু চরে বেড়াবে এবং খেলাধূলাও করবে" (১৩ আয়াত) এখানে শিশু কিশোরের জন্য চরে বেড়ানো শব্দটি বনের মধ্যে চলাফেরা ও ঘোরাঘুরি করে গাছ থেকে ফল পাড়া ও খাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৮. এই আয়াতগুলোতে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য দুই ধরনের যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এক, যে আল্লাহ অসাধারণ বিস্ময়কর ভারসাম্য সহকারে বিশাল বিস্তৃত বিশ্বজগত এবং জীবন যাপনের নানাবিধ উপকরণ সহকারে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের অনুষ্ঠান মোটেই কঠিন ও অসম্ভব ব্যাপার নয়। দুই, এই মহাবিশ্বে ও এ পৃথিবীতে আল্লাহর পূর্ণ জ্ঞানবত্তার যেসব নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, তা একথাই প্রমাণ করে যে, এখানে কোন কাজই উদ্দেশ্যহীনভাবে হচ্ছে না। মহাশূন্যে অসংখ্য গ্রহ, তারকা, নীহারিকা ও ছায়াপথের মধ্যে যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা একথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, এসব কিছু অকস্মাৎ হয়ে যায়নি। বরং এর পেছনে একটি অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনা কাজ করে যাচ্ছে। একটি

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

তারপর যখন মহাবিপর্যয় ঘটবে।[১৯] যেদিন মানুষ নিজে যা কিছু করেছে তা সব স্মরণ করবে[২০] এবং প্রত্যেক দর্শনকারীর সামনে জাহান্নাম খুলে ধরা হবে, তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছিল এবং দুনিয়ার জীবনকে বেশী ভালো মনে করে বেছে নিয়েছিল, জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল তার ঠিকানা হবে জান্নাত।[২১]

নিয়মের অধীনে এই রাত ও দিনের আসা যাওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে জনবসতি গড়ে তোলার জন্য পূর্ণ বিজ্ঞতা সহকারে এই নিয়ম–শৃংখলা কায়েম করা হয়েছে। এ পৃথিবীতেই এমন এলাকা আছে যেখানে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দিন রাত্রির আবর্তন হয়। আবার এমন এলাকাও আছে যেখানে রাত হয় অতি দীর্ঘ এবং দিনও হয় অতি দীর্ঘ। পৃথিবীর জনবসতির অনেক বড় অংশ প্রথম এলাকায় অবস্থিত। আবার যেখানে রাত ও দিন যত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যেতে থাকে সেখানে জীবন যাপনও হয় তত বেশী কঠিন ও কষ্টকর। ফলে জনবসতিও সেখানে তত বেশী কম হয়ে যেতে থাকে। এমন কি যে এলাকায় ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত হয় সে এলাকা জনবসতির মোটেই উপযোগী নয়। এ পৃথিবীতেই এ দু'টি নমুনা দেখিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ এ সত্যটি প্রমাণ করেছেন যে, রাত ও দিনের যথা নিয়মে যাওয়া আসার ব্যবস্থা কোন ঘটনাক্রমিক ব্যাপার নয় বরং পৃথিবীকে মানুষের উপযোগী করার জন্য বিপুল জ্ঞান ও কলা কুশলতা সহকারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুযায়ীই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে পৃথিবীকে তিনি এমনভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন যার ফলে তা মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তার মধ্যে এমন পানি সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষ ও পশু পান করতে এবং যার সাহায্যে উদ্ভিদ জীবনী শক্তি লাভ করতে পারে তার মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন এবং এমন সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন যা মানুষ ও সব ধরনের প্রাণীর জীবন ধারণের মাধ্যমে পরিণত হতে পারে। এসব কিছুই একথা প্রমাণ করে যে, এগুলো হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয় বা কোন বাজিকর ডুগডুগি বাজিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে এসব করে বসেনি। বরং এর প্রত্যেকটি কাজই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পন্ন করেছেন একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞান সম্পন্ন সত্তা। এখন কিয়ামত ও পরকালের জীবন অনুষ্ঠিত হওয়া বা না হওয়া কোন্‌টা যুক্তিসংগত ও বুদ্ধি–বিবেচনাসম্মত, সুস্থবুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তিই একথা চিন্তা করতে পারে।

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾

এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেই সময়টি (কিয়ামত) কখন আসবে?[২২] সেই সময়টি বলার সাথে তোমার সম্পর্ক কি? এর জ্ঞান তো আল্লাহ পর্যন্তই শেষ। তাঁর ভয়ে ভীত এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করাই শুধুমাত্র তোমার দায়িত্ব।[২৩] যেদিন এরা তা দেখে নেবে সেদিন এরা অনুভব করবে যেন (এরা দুনিয়ায় অথবা মৃত অবস্থায়) একদিন বিকালে বা সকালে অবস্থান করেছে মাত্র।[২৪]

এই সমস্ত জিনিস দেখার পরও যে ব্যক্তি বলে আখেরাত অনুষ্ঠিত হবে না সে যেন বলতে চায়, এখানে অন্য সবকিছুই হিকমত তথা জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচক্ষণতা ও বিশেষ উদ্দেশ্য সহকারে হচ্ছে, তবে শুধুমাত্র পৃথিবীতে মানুষকে যে বুদ্ধি, সচেতনতা ও ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য ও বুদ্ধি-বিচক্ষণতা নেই। কারণ এই পৃথিবীতে মানুষকে বিপুল ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে সব রকমের ভালো মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে কিন্তু কখনো তার কাজের কোন হিসেব নেয়া হবে না,—এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্যহীনতা ও অযৌক্তিক কথা আর কিছুই হতে পারে না।

১৯. এই মহাবিপর্যয় হচ্ছে কিয়ামত। এ জন্য এখানে الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ (আত্‌তাম্মাতুল কুবরা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "তাম্মাহ্" বলতে এমন ধরনের মহাবিপদ বুঝায় যা সবকিছুর ওপর ছেয়ে যায়। এরপর আবার তার সাথে "কুবরা" (মহা) শব্দ ব্যবহার করে একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে সেই বিপদ ও বিপর্যয়ের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা বুঝাবার জন্য শুধুমাত্র "তাম্মাহ্" শব্দ যথেষ্ট নয়।

২০. অর্থাৎ যেদিন মানুষ দেখে নেবে যে, দুনিয়ায় যে হিসেব-নিকেশের খবর তাকে দেয়া হয়েছিল সেদিনটি এসে গেছে। সে সময় আমলনামা হাতে দেবার আগে দুনিয়ায় সে যা কিছু করেছিল এক এক করে সবকিছু তার মনে পড়ে যাবে। কোন কোন লোক দুনিয়াতেও এ অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে যে হঠাৎ তারা কোন ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হয়। মৃত্যুকে তাদের একেবারে অতি নিকটে দেখতে পায়। এ অবস্থায় নিজেদের সারা জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের চিত্র তাদের মানস পটে মুহূর্তের মধ্যে ভেসে ওঠে।

২১. আখেরাতে আসল ফায়সালার ভিত্তি কি, সে কথা এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভংগী হচ্ছে, মানুষ দাসত্বের সীমানা অতিক্রম করে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং স্থির করে নিয়েছে যে, যেভাবেই হোক না কেন দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল ও দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তার লক্ষ।

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় দৃষ্টিভংগীটি হচ্ছে দুনিয়াবী জীবন যাপন করার সময় মানুষকে খেয়াল রাখতে হবে যে, একদিন তাকে নিজের রবের সামনে হাজির হতে হবে এবং প্রবৃত্তির অভিলাশ পূরণ করতে সে এ জন্য বিরত থাকবে যে, যদি এখানে সে নিজের প্রবৃত্তির দাবী মেনে নিয়ে কোন অবৈধ সুযোগ–সুবিধা লাভ করে অথবা কোন অবৈধ ভোগবিলাসে লিপ্ত হয়, তাহলে নিজের রবের কাছে এর কি জবাব দেবে? মানুষ দুনিয়ার জীবনে দু'টি দৃষ্টিভংগীর মধ্য থেকে কোন্‌টি গ্রহণ করবে এরি ওপর আখেরাতের ফায়সালা নির্ভর করবে। যদি প্রথমটি গ্রহণ করে তাহলে তার স্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যদি দ্বিতীয়টি গ্রহণ করে, তাহলে তার স্থায়ী ও চিরন্তন আবাস হবে জান্নাত।

২২. মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার এ প্রশ্ন করতো। তাদের এ প্রশ্নটি করার উদ্দেশ্য ছিল কিয়ামত কবে হবে, তার সময় ও তারিখ জানা নয় বরং এ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা। (আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা মুল্‌ক ৩৫ টীকা দেখুন)

২৩. এর ব্যাখ্যাও সূরা মুল্‌কের ৩৬ টীকায় আলোচিত হয়েছে। তবে এখানে তার ভয়ে ভীত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করে দেয়াই শুধুমাত্র তোমার দায়িত্ব—একথা বলার অর্থ এ নয় যে, যারা ভীত নয় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া তোমার দায়িত্ব নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের সতর্ক করে দেবার ফায়দা তারাই লাভ করতে পারবে যারা সেদিনটির আসার ভয়ে ভীত থাকবে।

২৪. এ বিষয়বস্তুটি এর আগেও কুরআনের আরো কয়েকটি জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোর ব্যাখ্যা আমি সেখানে করে এসেছি। এ জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ৫৩ টীকা, বনী ইসরাঈল ৫৬ টীকা, ত্বা–হা ৮০ টীকা, আল মু'মিনূন ১০১ টীকা, আর রূম ৮১–৮২ টীকা ও ইয়াসীন ৪৮ টীকা দেখুন। এ ছাড়াও সূরা আহকাফের ৩৫ আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করিনি। কারণ এর আগেও কয়েক জায়গায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আবাসা

৮০

নামকরণ

এই সূরার প্রথম শব্দ عَبَسَ কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণ একযোগে এ সূরা নাযিলের নিম্নরূপ কারণ বর্ণনা করেছেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে মক্কা মুয়ায্যমার কয়েক জন বড় বড় সরদার বসেছিলেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগী করার জন্য তিনি তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছিলেন। এমন সময় ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) নামক একজন অন্ধ তাঁর খেদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর কাছে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। তার এই পশ্নে সরদারদের সাথে আলাপে' বাধা সৃষ্টি হওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হলেন। তিনি তার কথায় কান দিলেন না। এই ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সূরাটি নাযিল হয়। এ ঐতিহাসিক ঘটনার কারণে এ সূরা নাযিলের সময়-কাল সহজেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) একেবারেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ও হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন ঃ أَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيمًا (তিনি একেবারেই প্রথম দিকে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন) এবং هُوَ مِمَّنْ أَسْلَمَ قَدِيمًا (তিনি একেবারেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তরভুক্ত)। অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের একেবারেই শুরুতে তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত, যেসব হাদীসে এ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তার কোন কোনটি থেকে জানা যায়, এ ঘটনাটির আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোন কোন হাদীস থেকে প্রকাশ হয়, এ সময় তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সত্যের সন্ধানেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিলেন। হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনা মতে, তিনি এসে বলেছিলেন ঃ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْشِدْنِي "হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সত্য–সরল পথ দেখিয়ে দিন।" (তিরমিয, হাকেম ইবনে হিব্বান, ইবনে জারীর, আবু লাইলা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি এসেই কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ "হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান শিখিয়েছেন আমাকে সেই জ্ঞান শেখান।" (ইবনে জারীর,

ইবনে আবী হাতেম) এসব বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নবী এবং কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মেনে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে ইবনে যায়েদ তৃতীয় আয়াতে উল্লেখিত لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (হয়তো সে পরিশুদ্ধ হবে) এর অর্থ করেছেন لَعَلَّهُ يُسْلِمُ (হয়তো সে ইসলাম গ্রহণ করবে)। (ইবনে জারীর) আবার আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ "তুমি কী জানো, হয়তো সে সংশোধিত হয়ে যাবে অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হবে এবং উপদেশ দেয়া তার জন্য উপকারী হবে?" এ ছাড়া আল্লাহ এও বলেছেন ঃ "যে নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং ভীত হয় তার কথায় তুমি কান দিচ্ছো না।" একথা থেকে ইংগিত পাওয়া যায়, তখন তার মধ্যে সত্য অনুসন্ধানের গভীরতর প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই হেদায়াতের উৎস মনে করে তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই নিজের চাহিদা পূরণ হবে বলে মনে করছিলেন। তাঁর অবস্থা একথা প্রকাশ করছিল যে, তাঁকে সত্য সরল পথের সন্ধান দেয়া হলে তিনি সে পথে চলবেন।

তৃতীয়ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে সে সময় যারা উপস্থিত ছিল বিভিন্ন রেওয়ায়াতে তাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তারা ছিল উতবা, শাইবা, আবু জেহেল, উমাইয়া ইবনে খালাফ, উবাই ইবনে খালফ প্রমুখ ইসলামের ঘোর শত্রুরা। এ থেকে জানা যায়, এ ঘটনাটি তখনই ঘটেছিল যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এই লোকগুলোর মেলামেশা বন্ধ হয়নি। তাদের সাথে বিরোধ ও সংঘাত তখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যে, তাঁর কাছে তাদের আসা যাওয়া এবং তাঁর সাথে তাদের মেলামেশা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে। এসব বিষয় প্রমাণ করে, এ সূরাটি একেবারেই প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আপাতদৃষ্টিতে ভাষণের সূচনায় যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা দেখে মনে হয়, অন্ধের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন ও তার কথায় কান না দিয়ে বড় বড় সরদারদের প্রতি মনোযোগ দেবার কারণে এই সূরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিরস্কার ও তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু পুরো সূরাটির সমস্ত বিষয়বস্তুকে একসাথে সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আসলে এখানে ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে কুরাইশদের কাফের সরদারদের বিরুদ্ধে। কারণ এই সরদাররা তাদের অহংকার, হঠধর্মিতা ও সত্য বিমুখতার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের দাওয়াতকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছিল। এই সংগে এখানে নবীকে তাঁর সত্য দীনের দাওয়াত দেবার সঠিক পদ্ধতি শেখাবার সাথে সাথে নবুওয়াত লাভের প্রথম অবস্থায় নিজের কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে তিনি যে পদ্ধতিগত ভুল করে যাচ্ছিলেন তা তাঁকে বুঝানো হয়েছে। একজন অন্ধের প্রতি তাঁর অমনোযোগিতা ও তার কথায় কান না দিয়ে কুরাইশ সরদারদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কারণ এ ছিল না যে, তিনি বড়লোকদের বেশী সম্মানিত মনে করতেন এবং একজন অন্ধকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন, নাউযুবিল্লাহ তাঁর চরিত্রে এই ধরনের কোন বক্রতা ছিল না যার ফলে আল্লাহ তাঁকে

পাকড়াও করতে পারেন। বরং আসল ব্যাপার এই ছিল, একজন সত্য দীনের দাওয়াত দানকারী যখন তাঁর দাওয়াতের কাজ শুরু করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দৃষ্টি চলে যায় জাতির প্রভাবশালী লোকদের দিকে। তিনি চান, এই প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করুক। এভাবে তাঁর কাজ সহজ হয়ে যাবে। আর অন্যদিকে দুর্বল, অক্ষম ও সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন লোকদের মধ্যে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লেও তাতে সমাজ ব্যবস্থায় কোন বড় রকমের পার্থক্য দেখা দেয় না। প্রথম দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রায় এই একই ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণের পেছনে একান্তভাবে কাজ করেছিল তাঁর আন্তরিকতা ও সত্য দীনের দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার প্রেরণা। বড়লোকদের প্রতি সম্মানবোধ এবং গরীব, দুর্বল ও প্রভাবহীন লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ধারণা এর পেছনে মোটেই সক্রিয় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে বুঝালেন, এটা ইসলামী দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি নয়। বরং এই দাওয়াতের দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, যে সত্যের সন্ধানে ফিরছে, সে যতই দুর্বল, প্রভাবহীন ও অক্ষম হোক না কেন আবার এর দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বহীন, যে নিজেই সত্যবিমুখ, সে সমাজে যত বড় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন। তাই ইসলামের দাওয়াত আপনি জোরেশোরে সবাইকে দিয়ে যান কিন্তু যাদের মধ্যে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করার আগ্রহ পাওয়া যায় তারাই হবে আপনার আগ্রহের আসল কেন্দ্রবিন্দু। আর যেসব আত্মম্ভরী লোক নিজেদের অহংকারে মত্ত হয়ে মনে করে, আপনি ছাড়া তাদের চলবে কিন্তু তারা ছাড়া আপনার চলবে না, তাদের সামনে আপনার এই দাওয়াত পেশ করা এই দাওয়াতের উন্নত মর্যাদার সাথে মোটেই খাপ খায় না।

সূরার প্রথম থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে। তারপর ১৭ আয়াত থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। তারা নিজেদের স্রষ্টা ও রিযিকদাতা আল্লাহর মোকাবিলায় যে দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল প্রথমে সে জন্য তাদের নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের এই কর্মনীতির অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণাম দেখতে পাবে।

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ﴿١﴾ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ﴿٣﴾ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿٤﴾ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿٥﴾ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشٰى ﴿٩﴾ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٢﴾ فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ﴿١٤﴾ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

ভ্রুকুঁচকাল ও মুখ ফিরিয়ে নিল, কারণ সেই অন্ধটি তার কাছে এসেছে।[১] তুমি কী জানো, হয়তো সে শুধরে যেতো অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হতো এবং উপদেশ দেয়া তার জন্য উপকারী হতো? যে ব্যক্তি বেপরোয়া ভাব দেখায় তুমি তার প্রতি মনোযোগী হও, অথচ সে যদি শুধরে না যায় তাহলে তোমার ওপর এর কি দায়িত্ব আছে? আর যে নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং সে ভীত হচ্ছে, তার দিক থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো।[২] কখ্খনো নয়,[৩] এটি তো একটি উপদেশ,[৪] যার ইচ্ছা এটি গ্রহণ করবে। এটি এমন সব বইতে লিখিত আছে, যা সম্মানিত, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র[৫] এটি মর্যাদাবান ও পূত চরিত্র লেখকদের[৬] হাতে থাকে।[৭]

১. এই প্রথম বাক্যটির প্রকাশভংগী বড়ই চমকপ্রদ। পরবর্তী বাক্যগুলোতে সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ থেকে একথা প্রকাশ হয় যে, ভ্রুকুঁচকাবার ও মুখ ফিরিয়ে নেবার কাজটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই করেছিলেন। কিন্তু বাক্যটির সূচনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে মনে হয়েছে, তিনি নন অন্য কেউ এ কাজটি করেছে। এই প্রকাশভংগীর মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে এই অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এটা আপনার করার মতো কাজ ছিল না। আপনার উন্নত চরিত্রের সাথে

পরিচিত কোন ব্যক্তি এ কাজটি দেখলে ভাবতো, আপনি নন বরং অন্য কেউ এ কাজটি করছে।

এখানে যে অন্ধের কথা বলা হয়েছে, ইতিপূর্বে ভূমিকায় আমরা এ সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছি, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)। হাফেয ইবনে আবদুল বার তাঁর 'আল ইসতিআব' এবং হাফেয ইবনে হাজার 'আল ইসাবাহ' গ্রন্থে তাঁকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) ফুফাত ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা লিখেছেন, তাঁর মা উম্মে মাকতূম ছিলেন হযরত খাদীজার (রা) পিতা খুওয়াইলিদের সহোদর বোন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর এই আত্মীয়তার সম্পর্ক জানার পর তিনি যে তাঁকে গরীব বা কম মর্যাদা সম্পন্ন মনে করে তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছিলেন এবং বড়লোকদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ থাকে না। কারণ তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন শ্যালক। বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সমাজের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নন বরং অভিজাত বংশীয় ছিলেন। তাঁর প্রতি তিনি যে আচরণ করেছিলেন তা 'অন্ধ' শব্দটি থেকেই সুস্পষ্ট। রসূলের (সা) অনাগ্রহ ও বিরূপ আচরণের কারণ হিসেবে আল্লাহ নিজেই এ শব্দটি উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ রসূলে করীমের (সা) ধারণা ছিল, আমি বর্তমানে যেসব লোকের পেছনে লেগে আছি এবং যাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করছি তাদের একজনও যদি হেদায়াত লাভ করে তাহলে তার মাধ্যমে ইসলামের শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে। বিপরীত পক্ষে ইবনে উম্মে মাকতূম হচ্ছেন একজন অন্ধ। দৃষ্টিশক্তি না থাকার কারণে এই সরদারদের মধ্য থেকে একজনের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের জন্য যতটা লাভজনক হবে ইবনে মাকতূমের ইসলাম গ্রহণ ততটা লাভজনক হতে পারে না। তাই তিনি মনে করেছিলেন, সরদারদের সাথে আলোচনার মাঝখানে বাধা না দিয়ে অন্য সময় তিনি যা কিছু জানতে চান জেনে নিতে পারবেন।

২. দীন প্রচারের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মূল বিষয়টির প্রতিই অবহেলা প্রদর্শন করেছিলেন। আর এই বিষয়টি বুঝাবার জন্যই মহান আল্লাহ প্রথমে ইবনে উম্মে মাকতূমের সাথে আচরণের ব্যাপারে তাঁকে পাকড়াও করেন। তারপর সত্যের আহবায়কের দৃষ্টিতে কোন্ জিনিসটি সত্যিকারভাবে গুরুত্ব লাভ করবে এবং কোন্ জিনিসটি গুরুত্ব লাভ করবে না তা তাঁকে জানান। একদিকে এক ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, সে সত্যের সন্ধানে ফিরছে, বাতিলের অনুগামী হয়ে আল্লাহর গযবের মুখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে সে ভীত সন্ত্রস্ত। তাই সত্য-সঠিক পথ সম্পর্কে জানার জন্য সে নিজে পায়ে হেঁটে চলে এসেছে। অন্যদিকে আর এক ব্যক্তির আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, সত্য সন্ধানের কোন আগ্রহই তার মনে নেই। বরং সে নিজেকে কারুর সত্য পথ জানিয়ে দেবার মুখাপেক্ষীই মনে করে না। এই দু' ধরনের লোকের মধ্যে কে ঈমান আনলে দীনের বেশী উপকার হতে পারে এবং কার ঈমান আনা দীনের প্রচার এই প্রসারের বেশী সহায়ক নয়, এটা দেখার বিষয় নয়। বরং এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে, কে হেদায়াত গ্রহণ করে নিজেকে সুধরে নিতে প্রস্তুত এবং কে হেদায়াতের এই মূল্যবান সম্পদটির আদতে কোন কদরই করে না। প্রথম ধরনের লোক অন্ধ, কানা খোঁড়া, অংগহীন সহায় সম্বল শক্তি সামর্থহীন হলে এবং বাহ্যত দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন বড় রকমের অবদান রাখার যোগ্যতা

সম্পন্ন না হলেও হকের আহবায়কের কাছে তিনিই হবেন মূল্যবান ব্যক্তি। তার দিকেই তাঁকে নজর দিতে হবে। কারণ এই দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর বান্দাদের জীবন ও কার্যক্রম সংশোধন করা। আর এই ব্যক্তির অবস্থা একথা প্রকাশ করছে যে, তাকে উপদেশ দেয়া হলে সে সংশোধিত হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় ধরনের লোকদের ব্যাপারে বলা যায়, তারা সমাজে যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, সত্যের আহবায়কের তাদের পেছনে লেগে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতিই প্রকাশ্যে একথা জানাচ্ছে যে, তারা সংশোধিত হতে চায় না। কাজেই তাদের সংশোধন করার প্রচেষ্টায় সময় ব্যয় করা নিছক সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা সংশোধিত হতে না চাইলে তাদেরই ক্ষতি, সত্যের আহবায়কের ওপর এর কোন দায়–দায়িত্ব নেই।

৩. অর্থাৎ এমনটি কখনো করো না। যেসব লোক আল্লাহকে ভুলে আছে এবং যারা নিজেদের দুনিয়াবী সহায়–সম্পদ ও প্রভাব–প্রতিপত্তির অহংকারে মত্ত হয়ে আছে, তাদেরকে অযথা গুরুত্ব দিয়ো না। ইসলামের শিক্ষা এমন কোন জিনিস নয় যে, যে ব্যক্তি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তার সামনে নতজানু হয়ে তা পেশ করতে হবে। আবার এই ধরনের অহংকারী লোককে ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য এমন ধরনের কোন প্রচেষ্টা চালানোও তোমার মর্যাদা বিরোধী, যার ফলে সে এ ভুল ধারণা করে বসে যে, তার সাথে তোমার কোন স্বার্থ জড়িত আছে এবং সে মেনে নিলে তোমার দাওয়াত সম্প্রসারিত হবার পথ প্রশস্ত হবে। অন্যথায় তুমি ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে সত্যের যতটা মুখাপেক্ষী নয় সত্যও তার ততটা মুখাপেক্ষী নয়।

৪. অর্থাৎ কুরআন।

৫. অর্থাৎ সব ধরনের মিশ্রণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এর মধ্যে নির্ভেজাল সত্যের শিক্ষা পেশ করা হয়েছে। কোন ধরনের বাতিল, অসৎ ও অন্যায় চিন্তা ও মতবাদের কোন স্থানই সেখানে নেই। দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মগুলো যেসব ময়লা–আবর্জনা ও দুর্গন্ধে ভরে তোলা হয়েছে, তার সামান্য গন্ধটুকুও এখানে নেই। মানুষের চিন্তা–ভাবনা কল্পনা বা শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও দুরভিসন্ধি সবকিছু থেকে তাকে পাক–পবিত্র রাখা হয়েছে।

৬. এখানে একদল ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ অনুসারে কুরআনের বিভিন্ন অংশ লেখা, সেগুলোর হেফাজত করা এবং সেগুলো হুবহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের প্রশংসায় এখানে দু'টি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। একটি হচ্ছে মর্যাদাবান এবং অন্যটি পূত চরিত্র। প্রথম শব্দটির মাধ্যমে একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাঁরা এত বেশী উন্নত মর্যাদার অধিকারী যার ফলে যে আমানত তাঁদের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে তা থেকে সামান্য পরিমাণ খেয়ানত করাও তাঁদের মতো উন্নত মর্যাদার অধিকারী সত্তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় শব্দটি ব্যবহার করে একথা জানানো হয়েছে যে, এই কিতাবের বিভিন্ন অংশ লেখার, সেগুলো সংরক্ষণ করার এবং সেগুলো রসূলের কাছে পৌঁছাবার যে দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হয়েছে পূর্ণ বিশ্বস্ততা সহকারে তাঁরা সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

৭. যে ধারাবাহিক বর্ণনায় এই আয়াতগুলো উদ্ধৃত হয়েছে সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যায়, এখানে নিছক কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার জন্য তার

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿১৭﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿১৮﴾ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ
فَقَدَّرَهُ ﴿১৯﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿২০﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿২১﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿২২﴾
كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿২৩﴾ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿২৪﴾ أَنَّا صَبَبْنَا
الْمَاءَ صَبًّا ﴿২৫﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿২৬﴾ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿২৭﴾ وَعِنَبًا
وَقَضْبًا ﴿২৮﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿২৯﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿৩০﴾ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ﴿৩১﴾
مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿৩২﴾

লানত[৮] মানুষের প্রতি,[৯] সে কত বড় সত্য অস্বীকারকারী![১০] কোন্ জিনিস থেকে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন? এক বিন্দু শুক্র থেকে।[১১] আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার তকদীর নির্দিষ্ট করেছেন,[১২] তারপর তার জন্য জীবনের পথ সহজ করেছেন[১৩] তারপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং কবরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।[১৪] তারপর যখন তিনি চাইবেন তাকে আবার উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন।[১৫] কখ্খনো নয়, আল্লাহ তাকে যে কর্তব্য পালন করার হুকুম দিয়েছিলেন তা সে পালন করেনি।[১৬] মানুষ তার খাদ্যের দিকে একবার নজর দিক।[১৭] আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি।[১৮] তারপর যমীনকে অদ্ভুতভাবে বিদীর্ণ করেছি।[১৯] এরপর তার মধ্যে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙুর, শাক-সব্জি, যয়তুন, খেজুর, ঘন বাগান, নানা জাতের ফল ও ঘাস তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর জীবন ধারণের সামগ্রী হিসেবে।[২০]

এই প্রশংসা করা হয়নি। বরং এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেসব অহংকারী লোক ঘৃণাভরে এর দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তাদেরকে পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দেয়া যে, এই মহান কিতাবটি তোমাদের সামনে পেশ করা হবে এবং তোমরা একে গ্রহণ করে তাকে ধন্য করবে, এই ধরনের কোন কার্যক্রম এর জন্য কোন প্রয়াজন নেই এবং এটি এর অনেক উর্ধে। এ কিতাব তোমাদের মুখাপেক্ষী নয় বরং তোমরাই এর মুখাপেক্ষী। নিজেদের ভালো চাইলে তোমাদের মন-মগজে যে শয়তান বাসা বেঁধে আছে তাকে সেখান থেকে বের করে দাও এবং সোজা এই দাওয়াতের সামনে মাথা নত করে দাও। নয়তো তোমরা এর প্রতি যে পরিমাণ অমুখাপেক্ষিতা দেখাচ্ছো এটি তার চাইতে অনেক বেশী তোমাদের অমুখাপেক্ষী। তোমরা একে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করলে এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে সামান্যতম পার্থক্যও দেখা দেবে না। তবে এর ফলে তোমাদের গর্ব ও অহংকারের গগণচুম্বী ইমারত ভেঙে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়া হবে।

৮. এখান থেকে আল্লাহর সত্য দীনের প্রতি মুখাপেক্ষিতা অস্বীকার করে আসছিল এমন ধরনের কাফেররা ক্রোধের লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছে। এর আগে সূরার শুরু থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে পর্দান্তরালে কাফেরদের প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করা হয়েছে। সেখানে বর্ণনাভংগী ছিল নিম্নরূপ ঃ হে নবী। একজন সত্য সন্ধানীকে বাদ দিয়ে আপনি এ কাদের পেছনে নিজের শক্তি–সামর্থ ব্যয় করছেন? সত্যের দাওয়াতের দৃষ্টিতে এদের তো কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। আপনার মতো একজন মহান মর্যাদা সম্পন্ন নবীর পক্ষে কুরআনের মতো উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব এদের সামনে পেশ করার কোন প্রয়োজন নেই।

৯. কুরআন মজীদের এই ধরনের বিভিন্ন স্থানে মানুষ শব্দটি মানব জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়নি। বরং সেখানে মানুষ বলতে এমন সব লোককে বুঝানো হয়েছে যাদের অপছন্দীয় গুণাবলীর নিন্দা করাই মূল লক্ষ হয়ে থাকে। কোথাও অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ঐসব অপছন্দনীয় গুণাবলী পাওয়া যাওয়ার কারণে "মানুষ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও এর ব্যবহারের কারণ এই দেখা দিয়েছে যে, বিশেষ কিছু লোককে নির্দিষ্ট করে যদি তাদের নিন্দা বা তিরস্কার করা হয় তাহলে তার ফলে তাদের মধ্যে জিদ ও হঠধর্মিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে উপদেশ দেবার জন্য সাধারণভাবে কথা বলার পদ্ধতিই বেশী প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়।

১০. এর আর একটি অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ "কোন্ জিনিসটি তাকে সত্য অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? অন্য কথায় বলা যায়, কিসের জোরে সে কুফরী করে? কুফরী অর্থ এখানে সত্য অস্বীকার হয়, নিজের উপকারীর উপকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করাও হয়, আবার নিজের স্রষ্টা, মালিক, প্রভু ও রিযিকদাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর মতো আচরণ করাও হয়।

১১. অর্থাৎ প্রথমে তো তার নিজের মৌলিক সত্তা সম্পর্কে একটু চিন্তা করা দরকার। কোন্ জিনিস থেকে সে অস্তিত্ব লাভ করেছে? কোথায় সে লালিত হয়েছে? কোন্ পথে সে দুনিয়ায় এসেছে? কোন ধরনের অসহায় অবস্থার মধ্যে দুনিয়ায় তার জীবনের সূচনা হয়েছে? নিজের এই প্রকৃত অবস্থা ভুলে গিয়ে সে কেমন করে "আমার সমতুল্য কেউ নেই" বলে ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে? নিজের স্রষ্টার প্রতি বিদ্রূপ ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা সে কোথায় থেকে পেলো? (এই একই কথা সূরা ইয়াসীনের ৭৭–৭৮ আয়াতে বলা হয়েছে)।

১২. অর্থাৎ সে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় তার তকদীর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সে কোন্ লিংগের হবে? তার গায়ের রং কি হবে? সে কতটুকু উঁচু হবে? তার দেহ কতটুকু কি পরিমাণ মোটা ও পরিপুষ্ট হবে? তার অংগ–প্রত্যংগগুলো কতটুকু নিখুঁত ও অসম্পূর্ণ হবে? তার চেহারা সুরাত ও কন্ঠস্বর কেমন হবে? তার শারীরিক বল কতটুকু হবে? তার বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা কতটুকু হবে? কোন্ দেশে, পরিবারে এবং কোন্ অবস্থায় ও পরিবেশে সে জন্মগ্রহণ করবে, লালিত পালিত হবে এবং শেষ পর্যন্ত কি হয়ে গড়ে উঠবে? তার ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশ ও পরিবারের প্রভাব, পরিবেশের প্রভাব এবং তার নিজের ব্যক্তিসত্তা ও অহমের প্রভাব কি পর্যায়ে ও কতটুকু থাকবে? দুনিয়ার জীবনে সে কী ভূমিকা পালন করবে? পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তাকে কতটুকু সময় দেয়া হবে? এই

তকদীর থেকে এক চুল পরিমাণ সরে আসার ক্ষমতাও তার নেই। এর মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও সে করতে পারবে না। এত সব সত্ত্বেও তার একি দুঃসাহস, যে স্রষ্টার তৈরি করা তকদীরের সামনে সে এতই অসহায়, তার মোকাবেলায় সে কুফরী করে ফিরছে।

১৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় তার জীবন যাপনের সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করেছেন। নয়তো স্রষ্টা যদি তার এই শক্তিগুলো ব্যবহার করার মতো এসব উপায় উপকরণ পৃথিবীতে সরবরাহ না করতেন তাহলে তার দেহ ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি ব্যর্থ প্রমাণিত হতো। এ ছাড়াও স্রষ্টা তাকে এ সুযোগও দিয়েছেন যে, সে নিজের জন্য ভালো বা মন্দ, কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতা আনুগত্য বা অবাধ্যতার মধ্যে যে কোন পথ চায় গ্রহণ করতে পারে। তিনি উভয় পথই তার সামনে খুলে রেখে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি পথই তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। এখন এর মধ্য থেকে যে পথে ইচ্ছা সে চলতে পারে।

১৪. অর্থাৎ কেবল তার সৃষ্টি ও তকদীরের ব্যাপারেই নয়, মৃত্যুর ব্যাপারেও তার স্রষ্টার কাছে সে একেবারেই অসহায়। নিজের ইচ্ছায় সে সৃষ্টি হতে পারে না। নিজের ইচ্ছায় মরতেও পারে না। নিজের মৃত্যুকে এক মুহূর্তকালের জন্য পিছিয়ে দেবার ক্ষমতাও তার নেই। যে সময় যেখানে যে অবস্থায়ই তার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করে দেয়া হয়েছে ঠিক সেই সময় সেই জায়গায় সেই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। আর মৃত্যুর পর তার জন্য যে ধরনের কবর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ঠিক সেই ধরনের কবরেই সে স্থান লাভ করে। তার এই কবর মৃত্তিকা গর্ভে, সীমাহীন সাগরের গভীরতায়, অগ্নিকুণ্ডের বুকে বা কোন হিংস্র পশুর পাকস্থলীতে যে কোন জায়গায় হতে পারে। মানুষের তো কোন কথাই নেই, সারা দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি মিলে চেষ্টা করলেও কোন ব্যক্তির ব্যাপারে স্রষ্টার এই সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে না।

১৫. অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্রষ্টা আবার যখন তাকে জীবিত করে উঠাতে চাইবেন তখন তার পক্ষে উঠতে অস্বীকার করার ক্ষমতাও থাকবে না। প্রথমে সৃষ্টি করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করে সৃষ্টি করা হয়নি। সে সৃষ্টি হতে চায় কিনা, এ ব্যাপারে তার মতামত নেয়া হয়নি। সে সৃষ্টি হতে অস্বীকার করলেও তাকে সৃষ্টি করা হতো। এভাবে এই দ্বিতীয়বার সৃষ্টিও তার মর্জির ওপর নির্ভরশীল নয়। মরার পর সে আবার উঠতে চাইলে উঠবে, আবার উঠতে অস্বীকার করলে উঠবে না, এ ধরনের কোন ব্যাপারই এখানে নেই। এ ব্যাপারেও স্রষ্টার মর্জির সামনে সে পুরোপুরি অসহায়। যখনই তিনি চাইবেন তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন। তাকে উঠতে হবে, সে হাজার বার না চাইলেও।

১৬. হুকুম বলতে এখানে এমন হুকুমও বুঝানো হয়েছে, যা স্বাভাবিক পথনির্দেশনার আকারে মহান আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন। এমন হুকুমও বুঝানো হয়েছে, যেদিকে মানুষের নিজের অস্তিত্ব এবং পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত বিশ্ব–জাহানের প্রতিটি অণু পরমাণু এবং আল্লাহর অপরিসীম শক্তি সমন্বিত প্রতিটি বস্তুই ইংগিত করছে। আবার এমন হুকুমও বুঝানো হয়েছে, যা প্রতি যুগে আল্লাহ নিজের নবী ও কিতাবের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন এবং প্রতি যুগের সৎলোকদের মাধ্যমে যাকে চতুরদিকে পরিব্যাপ্ত করেছেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা দাহার ৫ টীকা) এ প্রসংগে একথাটি যে অর্থে বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ ওপরের আয়াতগুলোতে যেসব মৌলিক সত্যের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে মানুষের উচিত ছিল তার স্রষ্টার

আনুগত্য করা। কিন্তু সে উল্টো তাঁর নাফরমানির পথ অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহর বান্দাহ হবার দাবী পূরণ করেনি।

১৭. অর্থাৎ যে খাদ্যকে সে মামুলি জিনিস মনে করে সে সম্পর্কে তার একবার চিন্তা করা দরকার। কিভাবে এই খাদ্য উৎপন্ন হয়। আল্লাহ যদি এর উপকরণগুলো সরবরাহ না করতেন তাহলে কি জমি থেকে এই খাদ্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা মানুষের ছিল?

১৮. এর অর্থ বৃষ্টি। সূর্য তাপে সমুদ্র পৃষ্ঠের বিপুল বারি রাশিকে বাষ্পের আকারে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। তা থেকে সৃষ্টি হয় ঘন মেঘ। বায়ু প্রবাহ সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। তারপর মহাশূন্যের শীতলতায় সেই বাষ্পগুলো আবার পানিতে পরিণত হয়ে দুনিয়ার প্রত্যেক এলাকায় একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী বর্ষিত হয়। এরপর এই পানি সরাসরি পৃথিবী পৃষ্ঠে বর্ষিত হয়, ভূগর্ভে কূয়া ও ঝর্ণার আকার ধারণ করে, নদীনালায় স্রোতের আকারেও প্রবাহিত হয়। আবার পাহাড়ে জমাট বাঁধা বরফের আকার ধারণ করে গলে যেতেও থাকে। এভাবে বর্ষাকাল ছাড়াও অন্যান্য মওসুমে নদীর বুকে প্রবাহিত হতে থাকে। এসব ব্যবস্থা কি মানুষ নিজেই করেছে? তার স্রষ্টা তার জীবিকার জন্য যদি এসবের ব্যবস্থা না করতেন তাহলে মানুষ কি পৃথিবীর বুকে জীবন ধারণ করতে পারতো?

১৯. যমীনকে বিদীর্ণ করার মানে হচ্ছে, মাটি এমনভাবে ফাটিয়ে ফেলা যার ফলে মানুষ তার মধ্যে যে বীজ, আঁটি বা চারা রোপণ বা বপন করে অথবা যা বাতাস ও পাখির মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে তার মধ্যে পৌঁছে যায় তা অংকুর গজাতে পারে। মানুষ বড় জোর মাটি খনন করতে বা তার মধ্যে লাঙল চালাতে পারে এবং আল্লাহ যে বীজ সৃষ্টি করেছেন তাকে মাটিতে রোপণ করতে পারে। এর বেশী সে কিছুই করতে পারে না। এ ছাড়া সমস্ত কাজ আল্লাহ করেন। তিনি অসংখ্য জাতের উদ্ভিদের বীজ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এসব বীজের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে মাটির বুকে এদের অংকুর বের হয় এবং প্রতিটি বীজ থেকে তার প্রজাতির পৃথক উদ্ভিদ জন্ম নেয়। আবার তিনি মাটির মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফলে তা পানির সাথে মিশে ঐ বীজগুলোর প্রত্যেকটির খোসা আলগা করে তার মুখ খুলে দেয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদের জন্য তার উপযোগী খাদ্য সরবরাহ করে তার উদ্‌গম ও বিকাশ লাভে সাহায্য করে। আল্লাহ যদি এই বীজগুলোর মধ্যে এই বৈশিষ্ট সৃষ্টি না করতেন এবং মাটির এই ওপরি স্তরকে এই যোগ্যতা সম্পন্ন না করতেন তাহলে মানুষ কি এখানে কোন খাদ্য লাভ করতে পারতো?

২০. অর্থাৎ কেবল তোমাদের জন্যই নয়, তোমাদের যেসব পশু থেকে তোমরা গোশত, চর্বি, দুধ, মাখন ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী লাভ করে থাকো এবং যারা তোমাদের আরো অসংখ্য অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ করে থাকে, তাদের জন্যও। এসব কিছুই কি এ জন্য করা হয়েছে যে, তোমরা এসব দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করে লাভবান হবে এবং যে আল্লাহর রিযিক লাভ করে তোমরা বেঁচে আছো তাঁর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করবে?

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾
وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾
تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

অবশেষে যখন সেই কান ফাটানো আওয়াজ আসবে[২১] সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে—নিজের ভাই, মা, বাপ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে।[২২] তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারোর কথা তার মনে থাকবে না।[২৩] সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, হাসিমুখ ও খুশীতে ডগবগ করবে। আবার কতক চেহারা হবে সেদিন ধূলিমলিন, কালিমাখা। তারাই হবে কাফের ও পাপী।

২১. এখানে কিয়ামতের শেষ শিংগাধ্বনির কথা বলা হয়েছে। এই বিকট আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই মরা মানুষেরা বেঁচে উঠবে।

২২. প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে সূরা মা'আরিজের ১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত আয়াতে। পালাবার মানে এও হতে পারে যে, সেদিন মানুষ নিজের ঐসব প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনকে বিপদ সাগরে হাবুডুবু খেতে দেখে তাদের সাহায্যার্থে দৌড়ে যাবার পরিবর্তে উল্টো তাদের থেকে দূরে পালিয়ে যেতে থাকবে, যাতে তারা সাহায্যের জন্য তাকে ডাকতে না থাকে। আবার এর এ মানেও হতে পারে যে, দুনিয়ায় আল্লাহর ভয় না করে এবং আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যেভাবে তারা পরস্পরের জন্য গোনাহ করতে ও পরস্পরকে গোমরাহ করতে থেকেছে, তার কুফল সামনে স্বমূর্তিতে প্রকাশিত দেখে তাদের প্রত্যেকে যাতে অন্যের গোমরাহী ও গোনাহের দায়িত্ব কেউ তার ঘাড়ে না চাপিয়ে দেয় এই ভয়ে অন্যের থেকে পালাতে থাকবে। ভাই ভাইকে, সন্তান মা–বাপকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং মা–বাপ সন্তানকে এই মর্মে ভয় করতে থাকবে যে, নিশ্চয়ই এবার আমার বিরুদ্ধে মামলায় এরা সাক্ষী দেবে।

২৩. হাদীস গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ও সনদ পরম্পরায় বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ একেবারেই উলংগ হয়ে উঠবে।" একথা শুনে তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোন একজন (কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত আয়েশা, কোন বর্ণনা মতে হযরত সওদা আবার কোন বর্ণনা অনুযায়ী অন্য একজন মহিলা) ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের লজ্জাস্থান কি সেদিন সবার সামনে খোলা থাকবে? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি তেলাওয়াত করে বলেন, সেদিন অন্যের দিকে তাকাবার মতো হুঁশ ও চেতনা কারো থাকবে না। (নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, বাইহাকী ও হাকেম)।

আত তাকভীর

৮১

নামকরণ

সূরার প্রথম বাক্যের كُوِّرَتْ শব্দটি থেকে নামকরণ করা হয়েছে। তাকভীর (تكوير) হচ্ছে মূল শব্দ। তা থেকে অতীত কালের কর্তৃবাচ্য অর্থে কূওভিরাত (كورت) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। এই নামকরণের অর্থ হচ্ছে, এটি সেই সূরা যার মধ্যে গুটিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, এটি মক্কা মু'আয্যমার প্রথম যুগের নাযিল হওয়া সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে দু'টি ঃ আখেরাত ও রিসালাত।

প্রথম ছ'টি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যখন সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে। তারকারা স্থানচ্যুত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হবে। পাহাড়গুলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উৎপাটিত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে। মানুষ তাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের কথা ভুলে যাবে। বনের পশুরা আতংকিত ও দিশেহারা হয়ে সব এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে। সমুদ্র স্ফীত হবে ও জ্বলে উঠবে। পরবর্তী সাতটি আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ যখন রূহগুলোকে আবার নতুন করে শরীরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হবে। আমলনামা খুলে দেয়া হবে। অপরাধের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আকাশের সমস্ত পরদা সরে যাবে। এবং জান্নাত–জাহান্নাম ইত্যাদি সব জিনিসই চোখের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আখেরাতের এই ধরনের একটি পুরোপুরি ছবি আঁকার পর একথা বলে মানুষকে চিন্তা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি কি পাথেয় সংগ্রহ করে এনেছে তা সে নিজেই জানতে পারবে।

এরপর রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সামনে যা কিছু পেশ করছেন সেগুলো কোন পাগলের প্রলাপ নয়। কোন শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও বিভ্রান্তিও নয়। বরং সেগুলো আল্লাহর প্রেরিত একজন উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন বুযর্গ ও বিশ্বস্ত বাণীবাহকের বিবৃতি, যাঁকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উন্মুক্ত আকাশের দিগন্তে দিনের উজ্জ্বল আলোয় নিজের চোখে দেখেছেন। এই শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা কোন্ দিকে চলে যাচ্ছো?

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

যখন সূর্য গুটিয়ে নেয়া হবে।[১] যখন তারকারা চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।[২] যখন পাহাড়গুলোকে চলমান করা হবে।[৩] যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দয়া হবে।[৪] যখন বন্য পশুদের চারদিক থেকে এনে একত্র করা হবে।[৫] যখন সমুদ্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।[৬] যখন প্রাণসমূহকে[৭] (দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে।[৮] যখন জীবিত পুঁতে ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?[৯] যখন আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে। যখন আকাশের পরদা সরিয়ে ফেলা হবে।[১০] যখন জাহান্নামের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং জান্নাতকে নিকটে আনা হবে।[১১] সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে কি নিয়ে এসেছে।

১. সূর্যকে আলোহীন করে দেবার জন্য এটা একটা অতুলনীয় উপমা। আরবী ভাষায় তাকভীর মানে হচ্ছে গুটিয়ে নেয়া। মাথায় পাগড়ী বাঁধার জন্য "তাকভীরুল আমামাহ" বলা হয়ে থাকে। কারণ আমামা তথা পাগড়ী লম্বা কাপড়ের হয়ে থাকে এবং মাথার চারদিকে তা জড়িয়ে নিতে হয়। এই সাদৃশ্য ও সম্পর্কের কারণে সূর্য থেকে যে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে তাকে পাগড়ীর সাথে তুলনা করা

হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন এই বিছিয়ে থাকা পাগড়ীটি সূর্যের গায়ে জড়িয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ তার আলোক বিচ্ছুরণ বন্ধ হয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ যে বাঁধনের কারণে তারা নিজেদের কক্ষপথে ও নিজেদের জায়গায় বাঁধা আছে তা খুলে যাবে এবং সমস্ত গ্রহ–তারকা বিশ্ব–জাহানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এ ছাড়াও 'ইনকিদার' শব্দটির মধ্যে 'কুদরাত' এর অর্থও রয়েছে। অর্থাৎ তারা শুধু ছড়িয়েই পড়বে না বরং এই সংগে আলোহীন হয়ে অন্ধকার হয়েও যাবে।

৩. অন্য কথায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই পাহাড়ের ওজন ও ভারত্ব আছে এবং তা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। কাজেই এই শক্তি বিলুপ্ত হবার সাথে সাথেই সমস্ত পাহাড় পর্বত সমূলে উৎপাটিত ও ওজনহীন হয়ে এমনভাবে পৃথিবীর বুকে চলতে থাকবে যেমন মেঘ শূন্যে ভেসে বেড়ায়।

৪. আরবদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বুঝাবার জন্য এটি ছিল একটি চমৎকার বর্ণনা পদ্ধতি। আধুনিক কালের বাস ও ট্রাক চলাচলের আগে আরবদের কাছে গর্ভবতী উটনীর চাইতে বেশী মূল্যবান আর কোন সম্পদই ছিল না, যার প্রসবের সময় অতি নিকটে। এ সময় তার হেফাজত ও দেখাশুনার জন্য সবচেয়ে বেশী যত্ন নেয়া হতো। উটনীটি যাতে হারিয়ে না যায়, কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে না যায় অথবা কোনভাবে তা নষ্ট না হয়ে যায় এ জন্য খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। এই ধরনের উটনীদের থেকে লোকদের গাফেল হয়ে যাওয়ার মানে এই দাঁড়ায় যে, তখন নিশ্চয়ই এমন কোন কঠিন বিপদ লোকদের ওপর এসে পড়বে যার ফলে তাদের নিজেদের এই সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ সংরক্ষণের কথা তাদের খেয়ালই থাকবে না।

৫. দুনিয়ায় কোন সাধারণ বিপদ দেখা দিলে সব ধরনের পশুদের পালিয়ে এক জায়গায় জড়ো হতে দেখা যায়। সে সময় সাপ দংশন করে না এবং বাঘও আক্রমণ করে না।

৬. এখানে سُجِّرَتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে তাসজীর (تسجير) এবং তা থেকে অতীতকালে কর্মবাচ্যে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত চুল্লীতে আগুন জ্বালাবার জন্য 'তাসজীর' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিয়ামতের দিন সমুদ্রে আগুন লেগে যাবে, একথাটা আপাত দৃষ্টে বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু পানির মূল তত্ব ও উপাদান সম্পর্কে ধারণা থাকলে এর মধ্যে কোন কিছুই বিস্ময়কর মনে হবে না। আল্লাহ তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অলৌকিক কার্যক্রমের সাহায্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মতো এমন দু'টি গ্যাসকে একসাথে মিশ্রিত করে রেখেছেন যাদের একটি আগুন জ্বালায় এবং অন্যটি নিজে জ্বলে। এই দু'টি গ্যাসের সংমিশ্রণে পানির মতো এমন একটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন যা আগুন নিভিয়ে দেয়। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার একটি ইংগিতই পানির এই মিশ্রণ পরিবর্তন করে দেবার জন্য যথেষ্ট। তখন তারা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে তাদের মূল প্রকৃতি অনুযায়ী আগুন জ্বালাবার ও জ্বলার কাজে ব্যাপৃত হবে।

৭. এখান থেকে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শুরু হয়েছে।

৮. অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে মানুষ দুনিয়ায় যেমন দেহ ও আত্মার সাথে অবস্থান করছিল আবার ঠিক সেই অবস্থায়ই তাকে নতুন করে জীবিত করা হবে।

৯. এই আয়াতের বর্ণনাভংগীতে মারাত্মক ধরনের ক্রোধের প্রকাশ দেখা যায়। এর চেয়ে বেশী ক্রোধের কল্পনাও করা যেতে পারে না। যে বাপ মা তাদের মেয়েকে জীবিত পুঁতে ফেলেছে আল্লাহর কাছে তারা এত বেশী ঘৃণিত হবে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না, তোমরা এই নিষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করেছিলে কোন্ অপরাধে? বরং তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ছোট্ট নিরপরাধ মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাকে কোন অপরাধে মেরে ফেলা হয়েছিল? জবাবে সে নিজের কাহিনী শুনাতে থাকবে। জালেম বাপ মা তার প্রতি কি অত্যাচার করেছে এবং কিভাবে তাকে জীবিত পুঁতে ফেলেছে সে কথা সে সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকবে। এ ছাড়াও এই ছোট্ট আয়াতটিতে দু'টি বড় বড় বিষয়বস্তু সংযোজিত করা হয়েছে। এ জন্য কোন শব্দের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াই শুধুমাত্র বর্ণনাভংগী থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক, এর মধ্যে আরববাসীদের মনে এই অনুভূতি জাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, জাহেলীয়াত তাদেরকে নৈতিক অবনতির এমন নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যার ফলে তারা নিজেদের সন্তানকে নিজ হাতে জীবিত অবস্থায় মাটির মধ্যে প্রোথিত করার কাজ করছে। এরপরও তারা নিজেদের এই জাহেলী কর্মকাণ্ডকে সঠিক মনে করে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই বিকৃত সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য যে সংস্কার মূলক কর্মসূচী এনেছেন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। দুই, এর মধ্যে আখেরাতের অপরিহার্যতার ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট যুক্তি পেশ করা হয়েছে। যে মেয়েকে জীবিত অবস্থায় মাটির মধ্যে প্রোথিত করা হয়েছে তার প্রতি এ অন্যায়ের বিচার কোথাও হওয়া দরকার এবং যেসব জালেম এই জুলুমের কাজটি করেছে এমন একটি সময় আসা দরকার, যখন তাদের এই নিষ্ঠুরতার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যে মেয়েটিকে মাটির মধ্যে পুতে ফেলা হয়েছে তার ফরিয়াদ শুনার মতো তখন তো দুনিয়ায় কেউ ছিল না। জাহেলী সমাজ ব্যবস্থায় এ কাজটিকে সম্পূর্ণ বৈধ করে রাখা হয়েছিল, বাপ–মা এ জন্য একটুও লজ্জিত হতো না। পরিবারেও কেউ তাদের নিন্দা ও তিরস্কার করতো না। সমগ্র সমাজ পরিবেশে একজনও এ জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতো না। তাহলে আল্লাহর প্রভুত্ব–কর্তৃত্বের অধীনে এই বিরাট জুলুম ও অন্যায়ের কি কোন বিচার হবে না?

প্রাচীনকালে আরবে মেয়েদের জীবিত কবর দেবার এ নিষ্ঠুর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এর বিভিন্ন কারণ ছিল। এক, অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এই দুরবস্থার দরুন লোকেরা চাইতো খাদ্যের গ্রহণকারীর সংখ্যা কম হোক এবং তাদের লালন পালনের বোঝা যেন বহন করতে না হয়। পরবর্তীকালে অর্থ উপার্জনে সহায়তা করবে এই আশায় ছেলেদের লালন পালন করা হতো। কিন্তু মেয়েদের ছোটবেলায় লালন পালন করে বড় হয়ে গেলে বিয়ে দিয়ে অন্যের ঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে, এ কারণে মেরে ফেলে দেয়া হতো। দুই, দেশের আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে সাধারণ নিরাপত্তাহীনতার কারণে এটা মনে করে পুত্রসন্তানের প্রতিপালন করা হতো যে, যার যত বেশী ছেলে হবে তার তত বেশী সাহায্যকারী হবে। অন্যদিকে গোত্রীয় সংঘর্ষ ও যুদ্ধের সময় মেয়েদের সংরক্ষণ করতে হতো এবং তারা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগতো না। তিন, আইন শৃংখলার ক্ষেত্রে সাধারণ দুরবস্থার কারণে শত্রুগোত্ররা পরস্পরের ওপর অতর্কিতে হামলা করার সময় প্রতিপক্ষ শিবিরের যতগুলো মেয়েকে হামলাকারীরা লুটে নিয়ে যেতো, তাদেরকে বাঁদী বানিয়ে

রাখতো অথবা কোথাও বিক্রি করে দিতো। এসব কারণে আরবে কোথাও সন্তান প্রসবকালেই মায়ের সামনেই একটি গর্ত খনন করে রাখা হতো। মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তখনই তাকে গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হতো। আবার কোথাও যদি মা এতে রাজী না হতো বা তার পরিবারের কেউ এতে বাধ সাধতো তাহলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাপ কিছুদিন তাকে লালন পালন করতো। তারপর একদিন মরুভূমি, পাহাড় বা জংগলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কোথাও তাকে জীবিত কবর দিয়ে দিতো। এই ধরনের রেওয়াজ আরবের বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত ছিল। এ ক্ষেত্রে শিশু কন্যাদের সাথে কেমন নির্দয় ব্যবহার করা হতো তার একটি কাহিনী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক সাহাবী একবার তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। সুনানে দারামির প্রথম অধ্যায়ে এ দাহীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার জাহেলী যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমাকে খুব ভালোবাসতো। তার নাম ধরে ডাকলে সে দৌড়ে আমার কাছে আসতো। একদিন আমি তাকে ডাকলাম। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম। পথে একটি কূয়া পেলাম। তার হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিলাম। তার যে শেষ কথাটি আমার কানে ভেসে এসেছিল তা ছিল, হায় আব্বা! হায় আব্বা! একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন বললেন ঃ ওহে, তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোকার্ত করে দিয়েছো। তিনি বললেন ঃ থাক, তোমরা একে বাধা দিয়ো না। যে বিষয়ে তার কঠিন অনুভূতি জেগেছে সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করতে দাও। তারপর তিনি তাকে বললেন ঃ তোমার ঘটনাটি আবার বর্ণনা করো। সেই ব্যক্তি আবার তা শুনালেন। ঘটনাটি আবার শুনে তিনি এত বেশী কাঁদতে থাকলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো। এরপর তিনি বললেন, জাহেলী যুগে যা কিছু করা হয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। এখন নতুন করে জীবন শুরু করো।

একথা মনে করা ভুল হবে যে, আরববাসীরা এই চরম অমানবিক কাজটির কদর্যতার কোন অনুভূতিই রাখতো না। কোন সমাজ যত বেশী বিকৃতই হোক না কেন তা কখনো এই ধরনের জুলুম ও অমানবিক কাজকে একেবারেই অন্যায় মনে করবে না, এমনটি কখনই হতে পারে না। তাই কুরআন মজীদে এই কাজটির কদর্যতা ও দূষণীয় হওয়া সম্পর্কে কোন লম্বা চওড়া ভাষণ দেয়া হয়নি। বরং কতিপয় লোমহর্ষক শব্দের মাধ্যমে কেবল এতটুকু বলেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, এমন এক সময় আসবে যখন জীবিত পুঁতে ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ দোষে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল? আরবের ইতিহাস থেকেও জানা যায়, জাহেলী যুগে অনেক লোকের এই রীতিটির কদর্যতার অনুভূতি ছিল। তাবারানীর বর্ণনা মতে কবি ফারাযদাকের দাদা সা'সা' ইবনে নাজীয়াহ আলমুজাশেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলী যুগে কিছু ভালো কাজও করেছি। এরমধ্যে একটি হচ্ছে, আমি তিনশ ষাটটি মেয়েকে জীবিত কবর দেয়া থেকে রক্ষা করেছি। তাদের প্রত্যেকের প্রাণ বাঁচাবার বদলে দু'টি করে উট বিনিময় মূল্য হিসেবে দিয়েছি। আমি কি এর প্রতিদান পাবো? জবাবে তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য পুরস্কার রয়েছে এবং সে পুরস্কার হচ্ছে, আল্লাহ তোমাকে ইসলামের নিয়ামত দান করেছেন।

আসলে এটি ইসলামের একটি বিরাট অবদান। ইসলাম কেবলমাত্র আরবের এই নিষ্ঠুর ও জঘন্য প্রথাটি নির্মূল করেনি বরং এই সংগে মেয়ের জন্ম যে একটি দুর্ঘটনা এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও একে গ্রহণ করে নিতে হয়—এই ধরনের চিন্তা ও ধারণারও চিরতরে অবসান ঘটিয়েছে। বিপরীত পক্ষে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, মেয়েদের লালন পালন করা, তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দীক্ষা দেয়া এবং ঘর সংসারের কাজে পারদর্শী করে গড়ে তোলা অনেক বড় নেকীর কাজ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে মেয়েদের সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ধারণা যেভাবে পরিবর্তন করে দেন হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে তা আন্দাজ করা যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি নীচে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি ঃ

مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ-

"এই মেয়েদের জন্মের মাধ্যমে যে ব্যক্তিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, তারপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণে পরিণত হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنَا وَهٰكَذَا وَضَمَّ اَصَابِعَهُ-

"যে ব্যক্তি দু'টি মেয়ের লালনপালন করে, এভাবে তারা বালেগ হয়ে যায়, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে ঠিক এভাবে আসবে। একথা বলে তিনি নিজের আঙুলগুলো একসাথে করে দেখান।" (মুসলিম)

مَنْ عَالَ ثَلٰثَ بَنَاتٍ اَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْاَخَوَاتِ فَاَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتّٰى يُغْنِيَهُنَّ اللّٰهُ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوِ اثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ اَوِ اثْنَتَيْنِ حَتّٰى لَوْ قَالُوْا اَوْ وَاحِدَةً ؟ لَقَالَ وَاحِدَةً -

"যে ব্যক্তি তিন কন্যা বা বোনের লালনপালন করে, তাদেরকে ভালো আদব কায়দা শেখায় এবং তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী না থাকে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আর যদি দু'জন হয়। জবাব দেন, দু'জনকে এভাবে লালনপালন করলেও তাই হবে। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি লোকেরা সে সময় একজনের লালনপালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তাহলে তিনি একজনের সম্পর্কেও এই একই জবাব দিতেন।" (শারহুস সুন্নাহ)

مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ -

"যার কন্যা-সন্তান আছে, সে তাকে জীবিত কবর দেয়নি, তাকে দীনহীন ও লাঞ্ছিত করেও রাখেনি এবং পুত্রকে তার ওপর বেশী গুরুত্বও দেয়নি, আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দেবেন।" (আবু দাউদ)

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلٰثُ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهٖ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ -

"যার তিনটি কন্যা আছে, সেজন্য সে যদি সবর করে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী তাদেরকে ভালো কাপড় পরায়, তাহলে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ে পরিণত হবে।" (বুখারীর আদাবুল মুফরাদ ও ইবনে মাজাহ)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا اِلاَّ اَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ

"যে মুসলমানের দু'টি মেয়ে থাকবে, সে যদি তাদেরকে ভালোভাবে রাখে, তাহলে তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" (ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ)

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ اِلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَعْظَمِ الصَّدَقَةِ اَوْ مِنْ اَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِبْنَتُكَ الْمَرْدُوْدَةُ اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ -

"নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাকাহ ইবনে জা'শূমকে বলেন, আমি কি তোমাকে বলবো সবচেয়ে বড় সাদকাহ (অথবা বলেন, বড় সাদকাগুলোর অন্যতম) কি? সুরাকাহ বলেন, অবশ্যই বলুন হে আলাহর রসূল! তিনি বলেন, তোমার সেই মেয়েটি যে (তালাক পেয়ে অথবা বিধবা হয়ে) তোমার দিকে ফিরে আসে এবং তুমি ছাড়া তার আর কোন উপার্জনকারী থাকে না।" (ইবনে মাজাহ ও বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)

এই শিক্ষার ফলে মেয়েদের ব্যাপারে কেবল আরবদেরই নয় দুনিয়ার অন্যান্য যেসব জাতি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সবার দৃষ্টিভংগীই বদলে গেছে।

১০. অর্থাৎ এখন যা কিছু দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে তা সব সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠবে। এখন তো আকাশ কেবল শূন্যই দেখা যায় এবং তার মধ্যে দেখা যায় মেঘ, ধূলিকনা, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ-তারকা। কিন্তু সেদিন আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব তার নিজস্ব ও আসল রূপে আবরণ মুক্ত হয়ে সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১১. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন লোকদের মামলার শুনানী চলতে থাকবে, তখন জাহান্নামের উদ্দীপ্ত আগুনও সবাই দেখতে পাবে। জান্নাতও তার সমস্ত নিয়ামত সহকারে সবার সামনে হাযির থাকবে। এভাবে একদিকে অসৎলোকেরা জানতে পারবে তারা কোন্ ধরনের জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছে এবং সৎলোকেরাও জানতে পারবে তারা কোন্ জিনিসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কোন্ ধরনের নিয়ামত লাভ করতে যাচ্ছে।

فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ
مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ
الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ
رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

কাজেই, না,[১২] আমি কসম খাচ্ছি পেছনে ফিরে আসা ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া তারকারাজির এবং রাত্রির, যখন তা বিদায় নিয়েছে এবং প্রভাতের, যখন তা শ্বাস ফেলেছে।[১৩] এটি প্রকৃতপক্ষে একজন সম্মানিত বাণীবাহকের বাণী,[১৪] যিনি বড়ই শক্তিধর,[১৫] আরশের মালিকের কাছে উন্নত মর্যাদার অধিকারী, সেখানে তার হুকুম মেনে চলা হয়,[১৬] তিনি আস্থাভাজন।[১৭] আর (হে মক্কাবাসীরা!) তোমাদের সাথী[১৮] পাগল নয়। সেই বাণীবাহককে দেখেছে উজ্জ্বল দিগন্তে।[১৯] আর সে গায়েবের (এই জ্ঞান লোকদের কাছে পৌঁছানোর) ব্যাপারে কৃপণ নয়।[২০] এটা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।[২১] কাজেই তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছো? এটা তো সারা জাহানের অধিবাসীদের জন্য একটা উপদেশ। তোমাদের মধ্য থেকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে সত্য সরল পথে চলতে চায়।[২২] আর তোমাদের চাইলেই কিছু হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ রব্বুল আলামীন তা চান।[২৩]

১২. অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয় যে, কুরআনে যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো কোন পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসাহ্‌ ও কুমন্ত্রণা।

১৩. যে বিষয়ের ওপর এই কসম খাওয়া হয়েছে তা সামনের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধরনের কসমের অর্থ হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্ধকারে কোন স্বপ্ন দেখেননি। বরং যখন তারকারা অস্তমিত হয়েছিল, রাত বিদায় নিয়েছিল এবং প্রভাতের উদয় হয়েছিল তখন উন্মুক্ত আকাশে তিনি আল্লাহর ফেরেশতাকে দেখেছিলেন। কাজেই তিনি যা কিছু বর্ণনা করছেন তা সবই তাঁর নিজের চোখে দেখা। সুস্পষ্ট দিনের আলোয় পূর্ণচেতনা সহকারে তিনি এসব দেখেছেন।

১৪. এখানে সম্মানিত বাণীবাহক (রসূলে করীম) বলতে অহী আনার কাজে লিপ্ত ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে। সামনের আয়াতে একথাটি আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

আর কুরআনকে "বাণীবাহকের বাণী" বলার অর্থ এই নয় যে, এটি ঐ সংশ্লিষ্ট ফেরেশতার নিজের কথা। বরং "বাণীবাহকের বাণী" শব্দ দু'টিই একথা প্রকাশ করছে যে, এটি সেই সত্তার বাণী যিনি তাকে বাণীবাহক করে পাঠিয়েছেন। সূরা "আল হাক্কা'র ৪০ আয়াতে এভাবে কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বলা হয়েছে। সেখানেও এর অর্থ এই নয় যে, এটি নবীর (সা) নিজের রচনা। বরং একে "রসূলে করীমের" বাণী বলে একথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি পেশ করছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হিসেবে নয়। উভয় স্থানে বাণীকে ফেরেশতা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বাণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বাণীবহনকারী ফেরেশতার মুখ থেকে এবং লোকদের সামনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আল হাক্কার ২২ টীকা দেখুন)

১৫. সূরা আন নাজমের ৪–৫ আয়াতে এই বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى – عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى –

"এ তো একটি ওহী, যা তার ওপর নাযিল করা হয়। প্রবল শক্তির অধিকারী তাকে তা শিখিয়েছেন।" জিব্রীল আলাইহিস সালামের সেই প্রবল ও মহাপরাক্রমশালী শক্তি কি? এটি আসলে "মুতাশাবিহাত"–এর অন্তরভুক্ত। আল্লাহ ছাড়া এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য কারোর জানা নেই। তবে এ থেকে এতটুকু কথা অবশ্যি জানা যায় যে, নিজের অসাধারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে তিনি ফেরেশতাদের মধ্যেও বৈশিষ্টের অধিকারী। মুসলিম শরীফে কিতাবুল ঈমানে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ আমি দু'বার জিব্রীলকে তার আসল আকৃতিতে দেখেছি। তাঁর বিশাল সত্তা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমগ্র মহাশূন্য জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ছ'শ ডানা সমন্বিত অবস্থায় দেখেছেন। এ থেকে তাঁর অসাধারণ শক্তির বিষয়টি কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

১৬. অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদের কর্মকর্তা। সমস্ত ফেরেশতা তাঁর হুকুমে কাজ করে।

১৭. অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে তিনি কোন কথা আল্লাহর অহীর সাথে মিশিয়ে দেবেন না। বরং তিনি এমন পর্যায়ের আমানতদার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু বলা হয় সেগুলো তিনি হুবহু পৌঁছিয়ে দেন।

১৮. সাথী বলতে এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। তাঁকে মক্কাবাসীদের সাথী অভিহিত করে আসলে তাঁকে এ বিষয়ের অনুভূতি দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাদের জন্য কোন আগন্তুক বা অপরিচিত লোক নন। বরং তিনি তাদেরই জাতি ও গোত্রভুক্ত। তাদের মধ্যেই সারা জীবন তিনি অবস্থান করেছেন। তাদের শহরের প্রতিটি আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁকে চেনে। তিনি কোন্ ধরনের জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সচেতন

ব্যক্তি তা তারা ভালোভাবেই জানে। এই ধরনের এক ব্যক্তিকে জেনেবুঝে পাগল বলতে গিয়ে তাদের অবশ্যি কিছুটা লজ্জা অনুভব করা উচিত। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আন নাজ্‌মের ২ ও ৩ টীকা দেখুন)

১৯. সূরা আন নাজ্‌মের ৭ থেকে ৯ পর্যন্ত টীকায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পর্যবেক্ষণকে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন্‌ নাজ্‌ম ৭–৮ টীকা)

২০. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছ থেকে কোন কথা গোপন রাখেন না। গায়েব থেকে তাঁর কাছে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ফেরেশতা, মৃত্যুর পরের জীবন, কিয়ামত, আখেরাত বা জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে যা কিছু সত্য ও নির্ভুল তথ্য আসে তা সবই তিনি একটুও কমবেশী না করে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন।

২১. অর্থাৎ কোন শয়তান এসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এসব কথা বলে যায়, তোমাদের এ ধারণা ভুল। শয়তান কেন মানুষকে শিরক, মূর্তিপূজা, কুফরী ও আল্লাহদ্রোহিতা থেকে সরিয়ে আল্লাহপরস্তি ও তাওহীদের শিক্ষা দেবে? কেন সে মানুষের মনে লাগামহীন উটের মতো স্বাধীন জীবন যাপন করার পরিবর্তে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন ও তাঁর সামনে জবাবদিহি করার অনুভূতি জাগাবে? জাহেলী রীতিনীতি, জুলুম, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির পথে চলতে বাধা দিয়ে কেন সে মানুষকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপন এবং ন্যায়, ইনসাফ, তাকওয়া ও উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করবে? এই ধরনের কাজ করা শয়তানের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আশ্‌ শু'আরা ২১০–২১২ আয়াত ও ১৩০–১৩২ টীকা এবং ২২১–২২৩ আয়াত ও ১৪০–১৪১ টীকা)

২২. অন্য কথায় বলা যায়, এ বাণীটি তো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য উপদেশ একথা ঠিক কিন্তু এর থেকে ফায়দা একমাত্র সেই ব্যক্তি হাসিল করতে পারে যে নিজে সত্য–সরল পথে চলতে চায়। এ থেকে উপকৃত হবার জন্য মানুষের সত্য–সন্ধানী ও সত্য প্রিয় হওয়া প্রথম শর্ত।

২৩. এ বিষয়বস্তুটি ইতিপূর্বে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ৫৬ আয়াতে এবং সূরা দাহারের ৩০ আয়াতে আলোচিত হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, আল মুদ্দাস্‌সির ৪১ টীকা দেখুন।

আল ইনফিতার

৮২

নামকরণ

প্রথম আয়াতের শব্দ انْفَطَرَتْ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে ইনফিতার انفطار অর্থাৎ ফেটে যাওয়া। এ নামকরণের কারণ হচ্ছে এই যে, এ সূরায় আকাশের ফেটে যাওয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার ও সূরা আত্ তাকভীরের বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে বুঝা যায়, এই সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাত। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনুল মনযার, তাবারানী, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়ায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَاىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَاُ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ، وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ -

"যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনটি নিজের চোখে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক পড়ে নেয়।"

এখানে প্রথমে কিয়ামতের দিনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়ায় যাকিছু করেছে কিয়ামতের দিন তা সবই তার সামনে উপস্থিত হবে। তারপর মানুষের মনে অনুভূতি জাগানো হয়েছে, যে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে অস্তিত্ব দান করলেন এবং যাঁর অনুগ্রহে তুমি আজ সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে সবচেয়ে ভালো শরীর ও অংগ-প্রত্যংগ সহকারে বিচরণ করছো, তিনি কেবল অনুগ্রহকারী ইনসাফকার নন, তাঁর সম্পর্কে তোমার মনে কে এই প্রতারণার জাল বিস্তার করলো? তাঁর অনুগ্রহের অর্থ এ নয় যে, তুমি তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহার ও বিচারের ভয় করবে না। তারপর মানুষকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, তুমি কোন ভুল ধারণা নিয়ে বসে থেকো না। তোমার পুরো আমলনামা তৈরী করা হচ্ছে। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য লেখকরা সবসময় তোমার সমস্ত কথাবার্তা, ওঠাবসা, চলাফেরা ও যাবতীয় কাজকর্ম লিখে চলছেন। সবশেষে পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে বলা হয়েছে, অবশ্যিই একদিন কিয়ামত হবে। সেদিন নেক্কার লোকেরা জান্নাতে সুখের জীবন লাভ করবে এবং পাপীরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। সেদিন কেউ কারোর কোন কাজে লাগবে না। বিচার ও ফায়সালাকারী সেদিন হবেন একমাত্র আল্লাহ।

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ① وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ② وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ④ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ⑤

যখন আকাশ ফেটে যাবে, যখন তারকারা চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, যখন সমুদ্র ফাটিয়ে ফেলা হবে[১] এবং যখন কবরগুলো খুলে ফেলা হবে[২], তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামনের ও পেছনের সবকিছু জেনে যাবে।[৩]

১. সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে, সমুদ্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে এবং এখানে বলা হয়েছে, সমুদ্রগুলোকে ফাটিয়ে ফেলা হবে। এই উভয় আয়াতকে মিলিয়ে দেখলে এবং কুরআনের দৃষ্টিতে কিয়ামতের দিন এমন একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হবে যা কোন একটি বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং একই সময় সারা দুনিয়াকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে দেবে, এ বিষয়টিকেও সামনে রাখলে সমুদ্রগুলোর ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার ও তার মধ্যে আগুন লেগে যাবার প্রকৃত অবস্থাটি আমরা অনুধাবন করতে পারি। আমরা বুঝতে পারি, প্রথমে ঐ মহাভূকম্পনের ফলে সমুদ্রের তলদেশ ফেটে যাবে এবং সমুদ্রের পানি ভূগর্ভের অভ্যন্তরভাগে নেমে যেতে থাকবে যেখানে সর্বক্ষণ প্রচণ্ড গরম লাভা টগবগ করে ফুটছে। এই গরম লাভার সাথে সংযুক্ত হবার পর পানি তার প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ প্রাথমিক দু'টি মৌলিক উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হবে। এর মধ্যে অক্সিজেন আগুন জ্বালানোয় সাহায্য করে এবং হাইড্রোজেন নিজে জ্বলে ওঠে। এভাবে প্রাথমিক মৌলিক উপাদানে পরিণত হওয়া ও আগুন লেগে যাওয়ার একটি ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া (Chain reaction) চলতে থাকবে। এভাবে দুনিয়ার সবগুলো সাগরে আগুন লেগে যাবে। এটা আমাদের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ভিত্তিক অনুমান। তবে এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই।

২. প্রথম তিনটি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আয়াতে দ্বিতীয় পর্বের কথা বলা হয়েছে। কবর খুলে ফেলার মানে হচ্ছে, মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করে উঠানো।

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

হে মানুষ ! কোন্ জিনিষ তোমাকে তোমার মহান রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করে গড়েছেন এবং যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন।[৪] *কখ্খনো না,*[৫] *বরং (আসল কথা হচ্ছে এই যে), তোমরা শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা মনে করছো।*[৬] *অথচ তোমাদের ওপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে, এমন সম্মানিত লেখকবৃন্দ, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানে।*[৭]

৩. আসল শব্দ হচ্ছে مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ এ শব্দগুলোর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবগুলো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। যেমন (১) যে ভালো ও মন্দ কাজ করে মানুষ আগে পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে مَا قَدَّمَتْ এবং যেগুলো করতে সে বিরত থেকেছে তাকে مَا اَخَّرَتْ বলা যায়। এ দিক দিয়ে এ শব্দগুলো ইংরেজি Commission বা Omission-এর মতো একই অর্থবোধক । (২) যা কিছু প্রথমে করেছে তা مَا قَدَّمَتْ এবং যা কিছু পরে করেছে তা مَا اَخَّرَتْ -এর অন্তরভুক্ত। অর্থাৎ সম্পাদনের ধারাবাহিকতা ও তারিখ অনুসারে মানুষের প্রত্যেকটি কাজের হিসেব সম্বলিত আমলনামা তার সামনে এসে যাবে। (৩) যেসব ভালো বা মন্দ কাজ মানুষ তার জীবনে করেছে সেগুলো مَا قَدَّمَتْ -এর অন্তরভুক্ত। এ মানুষের সমাজে এসব কাজের যে প্রভাব ও ফলাফল সে নিজের পেছনে রেখে এসেছে সেগুলো مَا اَخَّرَتْ -এর অন্তরভুক্ত।

৪. অর্থাৎ প্রথমে তো তোমার উচিত ছিল সেই পরম করুণাময় ও অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ লাভ করে তাঁর শোকরগুজারী করা এবং তাঁর সমস্ত হুকুম মেনে চলা। তাঁর নাফরমানী করতে গিয়ে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নিজের যাবতীয় যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাকে তুমি নিজের কৃতিত্ব মনে করার ধোঁকায় পড়ে গেছো। তোমাকে যিনি অস্তিত্বদান করেছেন তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেবার চিন্তা তোমার মনে একবারও উদয় হয় না। দ্বিতীয়ত, দুনিয়ায় তুমি যা ইচ্ছে করে ফেলতে পারো, এটা তোমার রবের অনুগ্রহ। তবে কখনো এমন হয়নি যে, যখনই তুমি কোনো ভুল করেছো অমনি তিনি তোমাকে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত করে বিকল করে দিয়েছেন। অথবা তোমার চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন বা তোমাকে বজ্রপাতে হত্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর এ অনুগ্রহ ও কোমলতাকে তুমি দুর্বলতা ভেবে বসেছো। এবং তোমার আল্লাহর উলুহিয়াতে ইনসাফের নামগন্ধও নেই মনে করে নিজেকে প্রতারিত করেছো।

৫. অর্থাৎ এই ধরনের ধোঁকা খেয়ে যাওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। তোমার অস্তিত্ব নিজেই ঘোষণা করছে যে, তুমি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে যাওনি। তোমার বাপ–মাও তোমাকে সৃষ্টি করেনি। তোমার মধ্যে যেসব উপাদান আছে সেগুলো নিজে নিজে একত্র হয়ে যাওয়ার ফলেও ঘটনাক্রমে তুমি মানুষ হিসেবে তৈরি হয়ে যাওনি। বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ তোমাকে এই পূর্ণাঙ্গ মানবিক আকৃতি দান করেছেন। তোমার সামনে সব রকমের প্রাণী রয়েছে, তাদের মোকাবিলায় তোমার সবচেয়ে সুন্দর শারীরিক কাঠামো এবং শ্রেষ্ঠ ও উন্নত শক্তি একেবারেই সুস্পষ্ট। বুদ্ধির দাবী তো এই ছিল, এসব কিছু দেখে কৃতজ্ঞতায় তোমার মাথা নত হয়ে যাবে এবং সেই মহান রবের মোকাবিলায় তুমি কখনো নাফরমানী করার দুঃসাহস করবে না। তুমি এও জানো যে, তোমার রব কেবলমাত্র রহীম ও করীম করুণাময় ও অনুগ্রহশীলই নন, তিনি জাব্বার ও কাহ্‌হার—মহাপরাক্রমশালী এবং কঠোর শাস্তি দানকারীও। তাঁর পক্ষ থেকে যখন কোন ভূমিকম্প, তুফান বা বন্যা আসে তখন তার প্রতিরোধের জন্য তোমরা যতই ব্যবস্থা অবলম্বন করো না কেন সবকিছুই নিষ্ফল হয়ে যায়। তুমি একথাও জানো, তোমার রব মূর্খ অজ্ঞ নন বরং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ। জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, যাকে বুদ্ধি–জ্ঞান দান করা হবে তাকে তার কাজের জন্য দায়ীও করতে হবে। যাকে ক্ষমতা–ইখতিয়ার দেয়া হবে সেই ক্ষমতা–ইখতিয়ার সে কিভাবে ব্যবহার করেছে তার হিসেবও তার কাছ থেকে নিতে হবে। যাকে নিজ দায়িত্বে সৎ ও অসৎকাজ করার ক্ষমতা দেয়া হবে তাকে তার সৎকাজের জন্য পুরস্কার ও অসৎকাজের জন্য শাস্তিও দিতে হবে। এসব সত্য তোমার কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। তাই তোমার মহান রবের পক্ষ থেকে তুমি যে ধোঁকায় পড়ে গেছো তার পেছনে কোন যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে, একথা তুমি বলতে পারবে না। তুমি নিজে যখন কারোর কর্মকর্তা হবার দায়িত্ব পালন করে থাকো তখন তোমার নিজের অধীন ব্যক্তি যদি তোমার ভদ্রতা ও কোমল ব্যবহারকে দুর্বলতা মনে করে তোমার মাথায় চড়ে বসে, তাহলে তখন তুমি তাকে নীচ প্রকৃতির বলে মনে করে থাকো। কাজেই তোমার প্রকৃতি একথা সাক্ষ দেবার জন্য যথেষ্ট যে, প্রভুর দয়া, করুণা ও মহানুভবতার কারণে তার চাকর ও কর্মচারীর কখনো তার মোকাবিলায় দুঃসাহসী হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার এ ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, সে যা ইচ্ছা তাই করে যাবে এবং এ জন্য কেউ তাকে পাকড়াও করতে ও শাস্তি দিতে পারবে না।

৬. অর্থাৎ যে জিনিসটি তোমাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে তার পেছনে আসলে কোন শক্তিশালী যুক্তি নেই। বরং দুনিয়ার এই কর্মজগতের পরে আর কোন কর্মফল জগত নেই, নিছক তোমার এ নির্বোধ ধারণাই এর পেছনে কাজ করেছে। এ বিভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণাই তোমাকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দিয়েছে। এরি ফলে তুমি আল্লাহর ন্যায় বিচারের ভয়ে ভীত হও না এবং এটিই তোমার নৈতিক আচরণকে দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে।

৭. অর্থাৎ তোমরা চাইলে কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতে পারো, তাকে মিথ্যা বলতে পারো, তার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতে পারো কিন্তু এতে প্রকৃত সত্য বদলে যাবে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তোমাদের রব এই দুনিয়ায় তোমাদেরকে

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝١٣ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝١٤ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝١٥ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝١٦ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝١٧ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝١٨ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ۝١٩

নিসন্দেহে নেক লোকেরা পরমানন্দে থাকবে আর পাপীরা অবশ্যি যাবে জাহান্নামে। কর্মফলের দিন তারা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকে কোনক্রমেই সরে পড়তে পারবে না। আর তোমরা কি জানো, ঐ কর্মফল দিনটি কি? হাঁ, তোমরা কি জানো, ঐ কর্মফল দিনটি কি? এটি সেই দিন যখন কারোর জন্য কোন কিছু করার সাধ্য কারোর থাকবে না।[৮] ফায়সালা সেদিন একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে থাকবে।

লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনি তোমাদের প্রত্যেকের ওপর অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে রেখেছেন। তারা নিরপেক্ষভাবে তোমাদের সমস্ত ভালো ও মন্দ কাজ রেকর্ড করে যাচ্ছে। তোমাদের কোন কাজ তাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকছে না। তোমরা অন্ধকারে, একান্ত নির্জনে, জনমানবহীন গভীর জংগলে অথবা এমন কোন অবস্থায় কোন কাজ করে থাকলে যে সম্পর্কে তোমরা পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকছো যে, তা সকল সৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে, তারপরও তা তাদের কাছ থেকে গোপন থাকছে না। এই তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্য আল্লাহ "কিরামান কাতেবীন" শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ লেখকবৃন্দ যারা করীম (অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান)। তাদের কারোর সাথে ব্যক্তিগত ভালোবাসা বা শত্রুতা নেই। ফলে একজনের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যজনের অযথা বিরোধিতা করে সত্য বিরোধী ঘটনা রেকর্ড করার কোন অবকাশই সেখানে নেই। তারা খেয়ানতকারীও নয়। ডিউটি ফাঁকি দিয়ে নিজেদের তরফ থেকে খাতায় উল্‌টো সিধে লিখে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা ঘুষখোরও নয়। নগদ কিছু নিয়ে কারো পক্ষে বা কারো বিপক্ষে মিথ্যা রিপোর্ট দেবার কোন প্রশ্নই তাদের ব্যাপারে দেখা দেয় না। এসব যাবতীয় নৈতিক দুর্বলতা থেকে তারা মুক্ত। তারা এসবের অনেক উর্ধে। কাজেই সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের মানুষের নিশ্চিত থাকা উচিত যে, তাদের প্রত্যেকের সৎকাজ হুবহু রেকর্ড হবে এবং কারোর ঘাড়ে এমন কোন অসৎকাজ চাপিয়ে দেয়া হবে না, যা সে করেনি। তারপর এই ফেরেশতাদের দ্বিতীয় যে গুণটি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ "তোমরা যা কিছু করো তা তারা জানে।" অর্থাৎ তাদের অবস্থা দুনিয়ার সি, আই, ডি ও তথ্য সরবরাহ এজেন্সিগুলোর মতো নয়। সব রকমের প্রচেষ্টা ও সাধ্য–সাধনার পরও অনেক কথা তাদের কাছ থেকে গোপন থেকে যায়। কিন্তু এ

ফেরেশতারা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। সব জায়গায় সব অবস্থায় সকল ব্যক্তির সাথে তারা এমনভাবে লেগে আছে যে, তারা জানতেই পারছে না যে, কেউ তাদের কাজ পরিদর্শন করছে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ নিয়তে কি কাজ করেছে তাও তারা জানতে পারে। তাই তাদের তৈরি করা রেকর্ড একটি পূর্ণাংগ রেকর্ড। এই রেকর্ডের বাইরে কোন কথা নেই। এ সম্পর্কেই সূরা কাহাফের ৪৯ আয়াতে বলা হয়েছে : কিয়ামতের দিন অপরাধীরা অবাক হয়ে দেখবে তাদের সামনে যে আমলনামা পেশ করা হচ্ছে তার মধ্যে তাদের ছোট বড় কোন একটি কাজও অলিখিত থেকে যায়নি। যা কিছু তারা করেছিল সব হুবহু ঠিক তেমনিভাবেই তাদের সামনে আনা হয়েছে।

৮. অর্থাৎ কাউকে সেখানে তার কর্মফল ভোগ করার হাত থেকে নিষ্কৃতি দান করার ক্ষমতা কারোর থাকবে না। কেউ সেখানে এমন প্রভাবশালী বা আল্লাহর প্রিয়ভাজন হবে না যে, আল্লাহর আদালতে তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে বেঁকে বসে একথা বলতে পারে, উমুক ব্যক্তি আমার আত্মীয়, প্রিয় বা আমার সাথে সম্পর্কিত, কাজেই দুনিয়ায় সে যত খারাপ কাজ করে থাকুক না কেন তাকে তো মাফ করতেই হবে।

প্রত্যেককে কিছু না কিছু কম দিতো। সমাজের আরো অসংখ্য অসৎকাজের মধ্যে এটি এমন একটি অসৎকাজ ছিল যার অসৎ হবার ব্যাপারটি কেউ অস্বীকার করতে পারতো না। এ ধরনের একটি অসৎকাজকে এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করে বলা হয়েছে। এটি আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে থাকার অপরিহার্য ফল। যতদিন লোকদের মনে এ অনুভূতি জাগবে না যে, একদিন তাদের আল্লাহর সামনে পেশ হতে হবে এবং সেখানে এক এক পাইয়ের হিসেব দিতে হবে ততদিন তাদের নিজেদের কাজ–কারবার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে পূর্ণ সততা অবলম্বন সম্ভবই নয়। সততা ও বিশ্বস্ততাকে "উত্তম নীতি" মনে করে কোন ব্যক্তি কিছু ছোট ছোট বিষয়ে সততার নীতি অবলম্বন করলেও করতে পারে কিন্তু যেখানে বেঈমানী একটি "লাভজনক নীতি" প্রমাণিত হয় সেখানে সে কখনই সততার পথে চলতে পারে না। মানুষের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর ভয়ে ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের ফলেই সত্যিকার ও স্থায়ী সত্যতা বিশ্বস্ততা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ এ অবস্থায় সততা একটি "নীতি" নয়, একটি "দায়িত্ব" গণ্য হয় এবং দুনিয়ায় সততার নীতি লাভজনক হোক বা অলাভজনক তার ওপর মানুষের সততার পথ অবলম্বন করা বা না করা নির্ভর করে না।

এভাবে নৈতিকতার সাথে আখেরাত বিশ্বাসের সম্পর্ককে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মনোমুগ্ধকর পদ্ধতিতে বর্ণনা করার পর ৭ থেকে ১৭ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, দুষ্কৃতকারীদের কাজের বিবরণী প্রথমেই অপরাধজীবীদের রেজিষ্টার (Black List) লেখা হচ্ছে এবং আখেরাতে তাদের মারাত্মক ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে। তারপর ১৮ থেকে ২৮ পর্যন্ত আয়াতে সৎলোকদের উত্তম পরিণামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তাদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের রেজিষ্টারে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে। আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতারা এ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

সবশেষে ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং এই সংগে কাফেরদেরকে এই মর্মে সতর্কও করে দেয়া হয়েছে যে, আজ যারা ঈমানদারদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার কাজে ব্যাপৃত আছে কিয়ামতের দিন তারা অপরাধীর পর্যায়ে থাকবে এবং নিজেদের এ কাজের অত্যন্ত খারাপ পরিণাম দেখবে। আর সেদিন এ ঈমানদাররা এ অপরাধীদের খারাপ ও ভয়াবহ পরিণাম দেখে নিজেদের চোখ শীতল করবে।

আল মুতাফ্ফিফীন

৮৩

নামকরণ

প্রথম আয়াত وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এটি মক্কা মু'আয্‌যমায় প্রথম দিকে নাযিল হয়। সে সময় আখেরাত বিশ্বাসকে মক্কাবাসীদের মনে পাকা-পোক্তভাবে বসিয়ে দেবার জন্য একের পর এক সূরা নাযিল হচ্ছিল। সূরাটি ঠিক তখনই নাযিল হয় যখন মক্কার লোকেরা পথে-ঘাটে-বাজারে-মজলিসে-মহফিলে মুসলমানদেরকে টিটকারী দিচ্ছিল এবং তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করছিল। তবে জুলুম, নিপীড়ন ও মারপিট করার যুগ তখনো শুরু হয়নি। কোন কোন মুফাস্‌সির এই সূরাকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনাটিই মূলত এ ভুল ধারণার পেছনে কাজ করছে। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় এলেন তখন এখানকার লোকদের মধ্যে ওজনে ও মাপে কম দেবার রোগ ভীষণভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। তখন আল্লাহ নাযিল করেন وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ সূরাটি। এরপর থেকে লোকেরা ভালোভাবে ওজন ও পরিমাপ করতে থাকে। (নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে জারীর, বাইহাকী ফী শু'আবিল ঈমান) কিন্তু যেমন ইতিপূর্বে সূরা দাহারের ভূমিকায় আমি বলে এসেছি, সাহাবা ও তাবেঈগণ সাধারণত কোন একটি আয়াত যে ব্যাপারটির সাথে খাপ খেতো সে সম্পর্কে বলতেন, এ আয়াতটি এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কাজেই ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়াত থেকে যা কিছু প্রমাণ হয় তা কেবল এতটুকু যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পরে যখন মদীনার লোকদের মধ্যে এ বদঅভ্যাসটির ব্যাপক প্রসার দেখেন তখন আল্লাহর হুকুমে তাদের এ সূরাটি শুনান এবং এর ফলে তারা সংশোধিত হয়ে যায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তুও আখেরাত।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে সাধারণ বেঈমানীটির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল প্রথম ছ'টি আয়াতে সে জন্য তাদের পাকড়াও করা হয়েছে। তারা অন্যের থেকে নেবার সময় ওজন ও মাপ পুরো করে নিতো। কিন্তু যখন অন্যদেরকে দেবার সময় আসতো তখন ওজন ও মাপে

প্রত্যেককে কিছু না কিছু কম দিতো। সমাজের আরো অসংখ্য অসৎকাজের মধ্যে এটি এমন একটি অসৎকাজ ছিল যার অসৎ হবার ব্যাপারটি কেউ অস্বীকার করতে পারতো না। এ ধরনের একটি অসৎকাজকে এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করে বলা হয়েছে। এটি আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে থাকার অপরিহার্য ফল। যতদিন লোকদের মনে এ অনুভূতি জাগবে না যে, একদিন তাদের আল্লাহর সামনে পেশ হতে হবে এবং সেখানে এক এক পাইয়ের হিসেব দিতে হবে ততদিন তাদের নিজেদের কাজ–কারবার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে পূর্ণ সততা অবলম্বন সম্ভবই নয়। সততা ও বিশ্বস্ততাকে "উত্তম নীতি" মনে করে কোন ব্যক্তি কিছু ছোট ছোট বিষয়ে সততার নীতি অবলম্বন করলেও করতে পারে কিন্তু যেখানে বেঈমানী একটি "লাভজনক নীতি" প্রমাণিত হয় সেখানে সে কখনই সততার পথে চলতে পারে না। মানুষের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর ভয়ে ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের ফলেই সত্যিকার ও স্থায়ী সত্যতা বিশ্বস্ততা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ এ অবস্থায় সততা একটি "নীতি" নয়, একটি "দায়িত্ব" গণ্য হয় এবং দুনিয়ায় সততার নীতি লাভজনক হোক বা অলাভজনক তার ওপর মানুষের সততার পথ অবলম্বন করা বা না করা নির্ভর করে না।

এভাবে নৈতিকতার সাথে আখেরাত বিশ্বাসের সম্পর্ককে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মনোমুগ্ধকর পদ্ধতিতে বর্ণনা করার পর ৭ থেকে ১৭ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, দুষ্কৃতকারীদের কাজের বিবরণী প্রথমেই অপরাধজীবীদের রেজিষ্টার (Black List) লেখা হচ্ছে এবং আখেরাতে তাদের মারাত্মক ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে। তারপর ১৮ থেকে ২৮ পর্যন্ত আয়াতে সৎলোকদের উত্তম পরিণামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তাদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের রেজিষ্টারে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে। আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতারা এ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

সবশেষে ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং এই সংগে কাফেরদেরকে এই মর্মে সতর্কও করে দেয়া হয়েছে যে, আজ যারা ঈমানদারদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার কাজে ব্যাপৃত আছে কিয়ামতের দিন তারা অপরাধীর পর্যায়ে থাকবে এবং নিজেদের এ কাজের অত্যন্ত খারাপ পরিণাম দেখবে। আর সেদিন এ ঈমানদাররা এ অপরাধীদের খারাপ ও ভয়াবহ পরিণাম দেখে নিজেদের চোখ শীতল করবে।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝ أَلَا يَظُنُّ أُولٰٓئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়।[১] তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের থেকে নেবার সময় পুরোমাত্রায় নেয় এবং তাদেরকে ওজন করে বা মেপে দেবার সময় কম করে দেয়।[২] এরা কি চিন্তা করে না, একটি মহাদিবসে[৩] এদেরকে উঠিয়ে আনা হবে? যেদিন সমস্ত মানুষ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।

১. মূলে مُطَفِّفِيْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি এসেছে تَطْفِيْف থেকে। আরবী ভাষার তা'ফীফ (طَفِيْف) ছোট্ট, তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসকে বলা হয়ে থাকে। পারিভাষিক অর্থে তাফীফ মানে হচ্ছে মাপে ও ওজনে চুরি করা। কারণ এ কাজ করার সময় এক ব্যক্তি মাপ ও ওজনের মাধ্যমে কোন বড় পরিমাণ জিনিস চুরি করে না। বরং হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতার অংশ থেকে সামান্য সামান্য করে বাচিয়ে নেয়। ফলে বিক্রেতা কি জিনিস কতটুকু চুরি করেছে ক্রেতা তা টেরও পায় না।

২. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ওজনে ও মাপে কম করার কঠোর নিন্দা এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাণ করার জন্য কড়া তাগিদ করা হয়েছে। সূরা আন'আমে বলা হয়েছে ঃ "ইনসাফ সহকারে পুরো ওজন ও পরিমাপ করো। আমি কাউকে তার সামর্থের চাইতে বেশীর জন্য দায়িত্বশীল করি না।" (১৫২ আয়াত) সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে ঃ "মাপার সময় পুরো মাপবে এবং সঠিক পাল্লা দিয়ে ওজন করবে।" (৩৫ আয়াত) সূরা রহমানে তাকীদ করা হয়েছে ঃ "ওজনে বাড়াবাড়ি করো না, ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে ওজন করো এবং পাল্লায় কম করে দিয়ো না। (৮-৯ আয়াত) শো'আইবের সম্প্রদায়ের ওপর এ অপরাধের কারণে আযাব নাযিল হয় যে, তাদের মধ্যে ওজনে ও মাপে কম দেবার রোগ সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং হযরত শো'আইব (আ)-এর বারবার নসীহত করা সত্ত্বেও এ সম্প্রদায়টি এ অপরাধমূলক কাজটি থেকে বিরত থাকেনি।

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿١١﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾

কখ্‌খনো নয়,[৪] নিশ্চিতভাবেই পাপীদের আমলনামা কয়েদখানার দফতরে রয়েছে।[৫] আর তুমি কি জানো সেই কয়েদখানার দফতরটা কি? একটি লিখিত কিতাব। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধ্বংস সুনিশ্চিত, যারা কর্মফল দেবার দিনটিকে মিথ্যা বলেছে। আর সীমালংঘনকারী পাপী ছাড়া কেউ একে মিথ্যা বলে না। তাকে যখন আমার আয়াত শুনানো হয়[৬] সে বলে, এ তো আগের কালের গল্প। কখ্‌খনো নয়, বরং এদের মনে এদের খারাপ কাজের জং ধরেছে।[৭] কখ্‌খনো নয়, নিশ্চিতভাবেই সেদিন তাদের রবের দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।[৮] তারপর তারা গিয়ে পড়বে জাহান্নামের মধ্যে। এরপর তাদেরকে বলা হবে, এটি সেই জিনিস যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

৩. কিয়ামতের দিনটিকে মহাদিবস হিসেবে উপস্থাপিত করে বলা হয়েছে ঃ সেদিন আল্লাহর আদালতে সকল জিন ও মানুষের কাজের হিসেব নেয়া হবে একই সংগে এবং আযাব ও সওয়াব দানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ফায়সালা করা হবে।

৪. অর্থাৎ দুনিয়ায় এ ধরনের অপরাধ করার পর তারা এমনি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে এবং কখনো এদের আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার জন্য হাযির হতে হবে না, তাদের এ ধারণা একেবারে ভুল।

৫. আসলে সিজ্জীন (سِجِّيْن) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি এসেছে সিজন (سجن) থেকে।। সিজন মানে জেলখানা বা কয়েদখানা। সামনের দিকে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, এর অর্থ হচ্ছে এমন ধরনের রেজিষ্টার খাতা যাতে শাস্তিলাভ যোগ্য লোকদের আমলনামা লেখা হচ্ছে।

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

কখ্‌খনো নয়,[৯] অবশ্যি নেক লোকদের আমলনামা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতরে রয়েছে। আর তোমরা কি জানো, এ উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতরটি কি? এটি একটি লিখিত কিতাব। নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা এর দেখাশুনা করে। নিসন্দেহে নেক লোকেরা থাকবে বড়ই আনন্দে। উঁচু আসনে বসে দেখতে থাকবে। তাদের চেহারায় তোমরা সচ্ছলতার দীপ্তি অনুভব করবে। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধতম শরাব পান করানো হবে। তার ওপর মিশ্‌ক–এর মোহর থাকবে।[১০] যারা অন্যদের ওপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এই জিনিসটি হাসিল করার জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার চেষ্টা করে। সে শরাবে তাসনীমের[১১] মিশ্রণ থাকবে। এটি একটি ঝরণা, নৈকট্যলাভকারীরা এর পানির সাথে শরাব পান করবে।

৬. অর্থাৎ যেসব আয়াতে বিচার দিনের খবর দেয়া হয়েছে সেই সব আয়াত।

৭. অর্থাৎ শাস্তি ও পুরস্কারকে গল্প বা উপকথা গণ্য করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। কিন্তু যে কারণে তারা একে গল্প বলছে তা হচ্ছে এই যে, এরা যেসব গোনাহ করতে থেকেছে এদের দিলে পুরোপুরি তার মরীচা ধরেছে। ফলে পুরোপুরি যুক্তিসংগত কথাও এদের কাছে গল্প বলে মন হচ্ছে। এই জং ও মরীচার ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা যখন কোন গোনাহ করে, তার দিলে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। সে তওবা করলে দাগটি উঠে যায়। কিন্তু যদি সে গোনাহ করে যেতেই থাকে তাহলে সমগ্র দিলের ওপর তা ছেয়ে যায়। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে জারীর, হাকেম, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হিব্বান ইত্যাদি)

৮. অর্থাৎ একমাত্র নেক লোকেরাই আল্লাহর সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করবে এবং পাপীরা তার থেকে বঞ্চিত হবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কিয়ামাহ ১৭ টীকা)।

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝٢٩ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝٣٠ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝٣١ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝٣٢ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ۝٣٣ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝٣٤ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ۝٣٥ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝٣٦

অপরাধীরা দুনিয়াতে ঈমানদারদের বিদ্রূপ করতো। তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় চোখ টিপে তাদের দিকে ইশারা করতো। নিজেদের ঘরের দিকে ফেরার সময় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ফিরতো।[১২] আর তাদেরকে দেখলে বলতো, এরা হচ্ছে পথভ্রষ্ট।[১৩] অথচ তাদেরকে এদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।[১৪] আজ ঈমানদাররা কাফেরদের ওপর হাসছে। সুসজ্জিত আসনে বসে তাদের অবস্থা দেখছে। কাফেররা তাদের কৃতকর্মের "সওয়াব" পেয়ে গেলো তো?[১৫]

৯. অর্থাৎ মানুষের ভালো ও মন্দ কাজের কোন পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে না, তাদের এ ধারণা একেবারেই ভুল।

১০. মূলে "খিতামুহু মিস্ক (خِتَامُهُ مِسْكٌ) বলা হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, যেসব পাত্রে এই শরাব রাখা হবে তার ওপর মাটি বা মোমের পরিবর্তে মিশ্কের মোহর লাগানো থাকবে। এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের মানে হয় ঃ এটি হবে উন্নত পর্যায়ের পরিচ্ছন্ন শরাব। ঝরণায় প্রবাহিত শরাবের থেকে এটি বেশী উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন হবে। জান্নাতের খাদেমরা মিশ্কের মোহর লাগানো পাত্রে করে এনে এগুলো জান্নাতবাসীদের পান করাবে। এর দ্বিতীয় মানে হতে পারে ঃ এই শরাব যখন পানকারীদের গলা থেকে নামবে তখন শেষের দিকে তারা মিশ্কের খুশ্বু পাবে। এই অবস্থাটি দুনিয়ার শরাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে শরাবের বোতল খোলার সাথে সাথেই একটি বোট্কা গন্ধ নাকে লাগে। পান করার সময়ও এর দুর্গন্ধ অনুভূত হতে থাকে এবং গলা দিয়ে নামবার সময় মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেও পচা গন্ধ পৌঁছে যায়। এর ফলে শরাবীর চেহারায় বিস্বাদের একটা ভাব জেগে ওঠে।

১১. তাসনীম মানে উন্নত ও উঁচু। কোন ঝরণাকে তাসনীম বলার মানে হচ্ছে এই যে, তা উঁচু থেকে প্রবাহিত হয়ে নীচের দিকে আসে।

১২. অর্থাৎ একথা ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে ফিরতো ঃ আজ তো বড়ই মজা। উমুক মুসলমানকে বিদ্রূপ করে, তাকে চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ করে

বড়ই মজা পাওয়া গেছে এবং সাধারণ মানুষের সামনে তাকে চরমভাবে অপদস্থ করা গেছে।

১৩. অর্থাৎ এরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের চক্করে ফেলে দিয়েছেন। ফলে এরা নিজেরা নিজেদেরকে দুনিয়ার লাভ, স্বার্থ ও ভোগ–বিলাসিতা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং সব রকমের আশংকা ও বিপদ আপদের মুখোমুখি হয়েছে। যা কিছু এদের সামনে উপস্থিত আছে তা কেবল এ অনিশ্চিত আশায় ত্যাগ করছে যে, এদের সাথে মৃত্যুর পরে কি এক জান্নাত দেবার ওয়াদা করা হয়েছে, আর পরবর্তী জগতে নাকি কোন জাহান্নাম হবে, এদেরকে তার আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে এবং তার ফলেই এরা আজ এ দুনিয়ায় সবকিছু কষ্ট বরদাশ্‌ত করে যাচ্ছে।

১৪. এই ছোট বাক্যটিতে বিদ্রূপকারীদের জন্য বড়ই শিক্ষাপ্রদ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে অর্থাৎ ধরে নেয়া যাক মুসলমানরা যা কিছুর প্রতি ঈমান এনেছে সবকিছুই ভুল। কিন্তু তাতে তারা তোমাদের তো কোন ক্ষতি করছে না। যে জিনিসকে তারা সত্য মনে করেছে সেই অনুযায়ী তারা নিজেরাই একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। এখন বলো, আল্লাহ কি তোমাকে কোন সেনানায়ক বানিয়ে পাঠিয়েছেন? যে তোমাকে আক্রমণ করছে না তুমি তাকে আক্রমণ করছো কেন? যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে না তুমি তাকে অযথা কষ্ট দিচ্ছো কেন? আল্লাহ কি তোমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন?

১৫. এই বাক্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ লুকিয়ে আছে যেহেতু কাফেররা সওয়াবের কাজ মনে করে মুসলমানদেরকে বিরক্ত করতো ও কষ্ট দিতো। তাই বলা হয়েছে, আখেরাতে মু'মিনরা জান্নাতে আরামে বসে বসে জাহান্নামে কাফেরদের আগুনে জ্বলতে দেখবে। তাদের এ অবস্থা দেখে মু'মিনরা মনে মনে বলতে থাকবে, ওদের কাজের কেমন চমৎকার সওয়াব ওরা পেয়ে গেলো।

আল ইনশিকাক

৮৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের انْشَقَّتْ শব্দটি থেকে এই নামকরণ করা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে انشقاق শব্দ। ইনশিকাক মানে ফেটে যাওয়া। অর্থাৎ এ নামকরণের মাধ্যমে একথা বলতে চাওয়া হয়েছে যে, এটি এমন একটি সূরা যাতে আকাশের ফেটে যাওয়ার উল্লেখ আছে।

নাযিলের সময়-কাল

এটিও মক্কা মু'আয্যমার প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত। এ সূরার মধ্যে যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ বক্তব্য ও প্রমাণপত্র থেকে একথা জানা যায় যে, যখন এ সূরাটি নাযিল হয় তখন জুলুম-নিপীড়নের ধারাবাহিকতা শুরু হয়নি। তবে কুরআনের দাওয়াতকে তখন মক্কায় প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছিল। একদিন কিয়ামত হবে এবং সমস্ত মানুষকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে একথা মেনে নিতে লোকেরা অস্বীকার করছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। প্রথম পাঁচটি আয়াতে কেবল কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি। বরং এ সংগে কিয়ামত যে সত্যিই অনুষ্ঠিত হবে তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তার অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ সেদিন আকাশ ফেটে যাবে পৃথিবীকে ছড়িয়ে দিয়ে একটি সমতল ময়দানে পরিণত করা হবে। পৃথিবীর পেটে যা কিছু আছে (অর্থাৎ মৃত মানুষের শরীরের অংশসমূহ এবং তাদের কার্যাবলীর বিভিন্ন সাক্ষ প্রমাণ) সব বের করে বাইরে ফেলে দেয়া হবে। এমনকি তার মধ্যে আর কিছুই থাকবে না। এর সপক্ষে যুক্তি পেশ করে বলা হয়েছে, আকাশ ও পৃথিবীর জন্য এটিই হবে তাদের রবের হুকুম। আর যেহেতু এ দু'টি আল্লাহর সৃষ্টি, কাজেই তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে পারবে না। তাদের জন্য তাদের রবের হুকুম তামিল করাটাই সত্য।

এরপর ৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ সচেতন বা অচেতন যে কোনভাবেই হোক না কেন সেই মনযিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে তার নিজেকে তার রবের সামনে পেশ করতে হবে। তখন সমস্ত মানুষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। এক, যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। তাদেরকে কোন প্রকার কঠিন হিসেব-নিকেশের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই সহজে মাফ করে দেয়া হবে। দুই, যাদের আমলনামা পিঠের দিকে

দেয়া হবে। তারা চাইবে, কোনভাবে যদি তাদের মৃত্যু হতো। কিন্তু মৃত্যুর বদলে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হবে। তারা দুনিয়ায় এই বিভ্রান্তিতে ডুবে ছিল যে, তাদেরকে কখনো আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে না। এ কারণে তারা এ পরিণতির সম্মুখীন হবে। অথচ তাদের রব তাদের সমস্ত কার্যক্রম দেখছিলেন। এসব কার্যক্রমের ব্যাপারে জবাবদিহি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার তাদের কোন কারণ ছিল না। দুনিয়ার কর্মজীবন থেকে আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের জীবন পর্যন্ত তাদের পর্যায়ক্রমে পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপারটি ঠিক তেমনই নিশ্চিত যেমন সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে লাল আভা দেখা দেয়া, দিনের পরে রাতের আসা, সে সময় মানুষ ও সকল প্রাণীর নিজ নিজ ডেরায় ফিরে আসা এবং একাদশীর একফালি চাঁদের ধীরে ধীরে চতুরদশীর পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত।

সবশেষে কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির খবর শুনানো হয়েছে। কারণ তারা কুরআনের বাণী শুনে আল্লাহর সামনে নত হওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। এ সংগে যারা ঈমান এনে নেক আমল করে তাদেরকে অগণিত পুরস্কার ও উত্তম প্রতিদানের সুখবর শুনানো হয়েছে।

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾

যখন আকাশ ফেটে যাবে এবং নিজের রবের হুকুম পালন করবে।[১] আর (নিজের রবের হুকুম মেনে চলা,) এটিই তার জন্য সত্য। আর পৃথিবীকে যখন ছড়িয়ে দেয়া হবে।[২] যা কিছু তার মধ্যে আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে সে খালি হয়ে যাবে[৩] এবং নিজের রবের হুকুম পালন করবে। আর (নিজের রবের হুকুম মেনে চলা), এটিই তার জন্য সত্য।[৪] হে মানুষ! তুমি কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তোমার রবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, পরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে।

১. মূলে أَذِنَتْ لِرَبِّهَا শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাব্দিক মানে হয়, "সে নিজের রবের হুকুম শুনবে।" কিন্তু আরবী প্রবাদ অনুযায়ী أَذِنَ لَهُ এর মানে শুধুমাত্র হুকুম শুনা হয় না বরং এর মানে হয়, সে হুকুম শুনে একজন অনুগতের ন্যায় নির্দেশ পালন করেছে এবং একটুও অবাধ্যতা প্রকাশ করেনি।

২. পৃথিবীকে ছড়িয়ে দেবার মানে হচ্ছে, সাগর, নদী ও সমস্ত জলাশয় ভরে দেয়া হবে। পাহাড়গুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হবে। পৃথিবীর সমস্ত উঁচু নীচু জায়গা সমান করে সমগ্র পৃথিবীটাকে একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হবে। সূরা ত্বা–হা'য় এই অবস্থাটিকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ মহান আল্লাহ "তাকে একটা সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন। সেখানে তোমরা কোন উঁচু জায়গা ও ভাঁজ দেখতে পাবে না।" (১০৬–১০৭ আয়াত) হাকেম মুস্তাদ্রাকে নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)–এর বরাত দিয়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে একটি দস্তরখানের মতো খুলে বিছিয়ে দেয়া হবে। তারপর মানুষের জন্য সেখানে কেবলমাত্র পা রাখার জায়গাই থাকবে।" একথাটি ভালোভাবে বুঝে নেয়ার জন্য এ বিষয়টিও সামনে রাখতে হবে যে, সেদিন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের জন্য

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ﴿৭﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿৮﴾ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿৯﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ﴿১০﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ﴿১১﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿১২﴾ إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿১৩﴾ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿১৪﴾ بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ﴿১৫﴾

তারপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে হাল্‌কা হিসেব নেয়া হবে[৬] এবং সে হাসিমুখে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে যাবে।[৭] আর যার আমলনামা তার পিছন দিক থেকে দেয়া হবে,[৮] সে মৃত্যুকে ডাকবে এবং জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়বে। সে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে ডুবে ছিল।[৯] সে মনে করেছিল, তাকে কখনো ফিরতে হবে না। না ফিরে সে পারতো কেমন করে? তার রব তার কার্যকলাপ দেখছিলেন।[১০]

হয়েছে ও হবে সবাইকে একই সংগে জীবিত করে আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে। এ বিরাট জনগোষ্ঠীকে এক জায়গায় দাঁড় করাবার জন্য সমস্ত সাগর, নদী, জলাশয়, পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, মালভূমি, তথা উঁচু–নীচু সব জায়গা ভেঙেচুরে ভরাট করে সারা দুনিয়াটাকে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পরিণত করা হবে।

৩. এর অর্থ হচ্ছে, যত মৃত মানুষ তার মধ্যে রয়েছে সবাইকে ঠেলে বাইরে বের করে দেবে। আর এভাবে তাদের কৃতকর্মের যেসব প্রমাণপত্র তার মধ্যে রয়ে গেছে সেগুলোও পুরোপুরি বেরিয়ে আসবে। কোন একটি জিনিসও তার মধ্যে লুকিয়ে বা গোপন থাকবে না।

৪. যখন এসব ঘটনাবলী ঘটবে তখন কি হবে, একথা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। কারণ এ পরবর্তী বক্তব্যগুলো নিজে নিজেই তা প্রকাশ করে দিচ্ছে। এ বক্তব্যগুলোতে বলা হচ্ছে ঃ হে মানুষ! তুমি তোমার রবের দিকে এগিয়ে চলছো। শীঘ্র তাঁর সামনে হাযির হয়ে যাবে। তখন তোমার আমলনামা তোমার হাতে দেয়া হবে। আর তোমার আমলনামা অনুযায়ী তোমাকে পুরস্কার দেয়া হবে।

৫. অর্থাৎ দুনিয়ায় তুমি যা কিছু কষ্ট–সাধনা প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছ, সে সম্পর্কে তুমি মনে করতে পারো যে তা কেবল দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এবং দুনিয়াবী স্বার্থ লাভ করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু আসলে তুমি সচেতন বা অচেতনভাবে নিজের রবের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছো এবং অবশেষে তোমাকে তাঁর কাছেই পৌঁছতে হবে।

৬. অর্থাৎ তার হিসেব নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না, উমুক উমুক কাজ তুমি কেন করেছিলে? ঐসব কাজ করার ব্যাপারে তোমার কাছে কি কি ওজর আছে? নেকীর সাথে সাথে গোনাহও তার আমলনামায় অবশ্যি লেখা থাকবে। কিন্তু গোনাহের তুলনায় নেকীর পরিমাণ বেশী হবার কারণে তার অপরাধগুলো উপেক্ষা করা হবে এবং সেগুলো মাফ করে দেয়া হবে। কুরআন মজিদে অসৎকর্মশীল লোকদের কঠিন হিসেব-নিকেশের জন্য "সু-উল হিসেব" (খারাপভাবে হিসেব নেয়া) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (আর্ রা'আদ ১৮ আয়াত) সৎলোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "এরা এমন লোক যাদের সৎকাজগুলো আমি গ্রহণ করে নেবো এবং অসৎকাজগুলো মাফ করে দেবো।" (আল আহকাফ ১৬ আয়াত) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তাকে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে জারীর, আব্দ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মারদুইয়া বিভিন্ন শব্দাবলীর সাহায্যে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এক বর্ণনা মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যার থেকেই হিসেব নেয়া হয়েছে, সে মারা পড়েছে।"

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কি একথা বলেননি, "যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে তার থেকে হাল্কা হিসেব নেয়া হবে?" রসূলুল্লাহ (সা) জবাব দেন ঃ "সেটি তো হলো কেবল আমলের উপস্থাপনা। কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে সে মারা পড়েছে।" আর একটি রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি একবার নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তে শুনি ঃ "হে আল্লাহ! আমার থেকে হাল্কা হিসেব নাও" তিনি সালাম ফেরার পর আমি তাঁকে এর অর্থ জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন ঃ "হাল্কা হিসেব মানে বান্দার আমলনামা দেখা হবে এবং উপেক্ষা করা হবে। হে আয়েশা! সেদিন যার কাছ থেকে হিসেব নেয়া হয়েছে সে মারা পড়েছে।"

৭. নিজের লোকজন বলতে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সাথী-সহযোগীদের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেও একইভাবে মাফ করে দেয়া হয়ে থাকবে।

৮. সূরা আল হাক্কায় বলা হয়েছে, যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে। আর এখানে বলা হয়েছে, তার পেছন দিক থেকে দেয়া হবে। সম্ভবত এটা এভাবে হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ডান হাতে আমলনামা পাবার ব্যাপারে প্রথম থেকে নিরাশ হয়ে থাকবে। কারণ নিজের কার্যক্রম তার ভালোভাবেই জানা থাকবে। ফলে সে নিশ্চিতভাবে মনে করবে যে, তাকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তবে সমস্ত মানুষের সামনে আমলনামা বাম হাতে নিতে সে লজ্জা অনুভব করবে। তাই সে নিজের হাত পেছনের দিকে রাখবে। কিন্তু এই চালাকি করে সে নিজের কৃতকর্মের ফল নিজের হাতে তুলে নেবার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। সে হাত সামনের দিকে রাখুক বা পেছনের দিকে অবশ্যি তার আমলনামা তার হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে।

৯. অর্থাৎ তার অবস্থা ছিল আল্লাহর সৎবান্দাদের থেকে আলাদা। আল্লাহর এই সৎ-বান্দাদের সম্পর্কে সূরা ত্বা-হা'র ২৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তারা নিজেদের পরিবারের লোকদের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকদের জীবন যাপন করতো। অর্থাৎ সবসময় তারা

فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ
عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾ اِلَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

কাজেই না, আমি কসম খাচ্ছি, আকাশের লাল আভার ও রাতের এবং তাতে যা কিছুর সমাবেশ ঘটে তার, আর চাঁদের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে। তোমাদের অবশ্যি স্তরে স্তরে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে হবে।[১১] তাহলে এদের কি হয়েছে, এরা ঈমান আনে না এবং এদের সামনে কুরআন পড়া হলে এরা সিজদা করে না?[১২] বরং এ অস্বীকারকারীরা উলটো মিথ্যা আরোপ করে। অথচ এরা নিজেদের আমলনামায় যা কিছু জমা করছে আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন।[১৩] কাজেই এদের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

ভয় করতো নিজেদের সন্তান ও পরিবারের লোকদের প্রতি ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেদের পরকাল বরবাদ না করে ফেলে। বিপরীত পক্ষে সেই ব্যক্তির অবস্থা ছিল এই যে, সে নিজের ঘরে আরামে সুখের জীবন যাপন করছিল। সন্তান-সন্তুতি ও পরিবারের লোকজনদের বিলাসী জীবন যাপনের জন্য যতই হারাম পদ্ধতি অবলম্বন এবং অন্যের অধিকার হরণ করার প্রয়োজন হোক না কেন তা তারা করে চলছিল। এই বিলাসী জীবন-যাপন করতে গিয়ে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখাগুলোকে সে চোখ বন্ধ করে ধ্বংস করে চলছিল।

১০. অর্থাৎ সে যেসব কাজ কারবার করে যাচ্ছিল আল্লাহ সেগুলো উপেক্ষা করতেন এবং নিজের সামনে ডেকে তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না এমনটি ছিল আল্লাহর ইনসাফ ও হিকমতের পরিপন্থী।

১১. অর্থাৎ তোমরা একই অবস্থার ওপর অপরিবর্তিত থাকবে না। বরং যৌবন থেকে বার্ধক্য, বার্ধক্য থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে বরযখ (মৃত্যু ও কিয়ামতের মাঝখানের জীবন), বরযখ থেকে পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন থেকে হাশরের ময়দান তারপর হিসেব-নিকেশ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অসংখ্য মনযিল তোমাদের অবশ্যি অতিক্রম করতে হবে। এ

বিষয়ে তিনটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে। সূর্য অস্ত যাবার পর পশ্চিম আকাশের লালিমার, দিনের পর রাত্রির আঁধার ও তার মধ্যে দিনের বেলা যেসব মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী পৃথিবীর চারদিকে বিচরণ করে তাদের একত্র হওয়ার এবং চাঁদের সরুকাস্তের মতো অবস্থা থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হওয়ার। অন্য কথায় বলা যায়, এ জিনিসগুলো প্রকাশ্যে সাক্ষ প্রদান করছে যে, মানুষ যে বিশ্ব–জাহানে বসবাস করে সেখানে কোন স্থিতিশীলতা নেই। সেখানে সর্বত্র একটি নিরন্তর পরিবর্তন ও ধারাবাহিক অবস্থান্তর প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে। কাজেই শেষ নিশ্বাসটা বের হয়ে যাবার সাথে সাথে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, মুশরিকদের এ ধারণা ঠিক নয়।

১২. অর্থাৎ এদের মনে আল্লাহর ভয় জাগে না। এরা তাঁর সামনে মাথা নত করে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্যক্রম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পড়ার সময় সিজদা করেছেন। ইমাম মালেক, মুসলিম ও নাসাঈ হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি নামাযে এ সূরাটি পড়ে এ জায়গায় সিজদা করেন এবং বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জায়গায় সিজদা করেছেন। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ আবু রাফের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, হযরত আবু হুরাইরা (রা) এশার নামাযে এ সূরাটি পড়েন এবং সিজদা করেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায পড়ি এবং তিনি এখানে সিজদা করেন তাই আমি আমৃত্যু এখানে সিজদা করে যেতে থাকবো। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং আরো অনেকে অন্য একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এই সূরায় এবং 'ইক্‌রা বিস্‌মি রব্বিকাল্লাজী খালাক' সূরায় সিজদা করেছি।

১৩. এর আর একটি অর্থ এও হতে পারে যে, এরা নিজেদের মনে কুফরী, হিংসা, সত্যের সাথে শত্রুতা এবং অন্যান্য খারাপ ইচ্ছা ও দুষ্ট সংকল্পের যে নোংরা আবর্জনা ভরে রেখেছে আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন।

আল বুরূজ
৮৫

নামকরণ

প্রথম আয়াতে ٱلْبُرُوجِ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর বিষয়বস্তু থেকেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ সূরাটি মক্কা মুয়াযযমায় এমন এক সময় নাযিল হয় যখন মুশরিকদের জুলুম নিপীড়ন তুংগে উঠেছিল এবং তারা কঠিনতম শাস্তি দিয়ে মুসলমানদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, ঈমানদারদের ওপর কাফেররা যে জুলুম করছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং ঈমানদারদেরকে এই মর্মে সান্ত্বনা দেয়া যে, যদি তারা এসব জুলুম–নিপীড়নের মোকাবিলায় অবিচল থাকে তাহলে তারা এর জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার পাবে এবং আল্লাহ নিজেই জালেমদের থেকে বদ্‌লা নেবেন।

এ প্রসংগে সর্বপ্রথম আসহাবুল উখদূদের (গর্ত ওয়ালাদের) কাহিনী শুনানো হয়েছে। তারা ঈমানদারদেরকে আগুনে ভরা গর্তে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল। এ কাহিনীর মাধ্যমে মু'মিন ও কাফেরদেরকে কয়েকটি কথা বুঝানো হয়েছে। এক, গর্তওয়ালারা যেমন আল্লাহর অভিশাপ ও তাঁর শাস্তির অধিকারী হয়েছে তেমনি মক্কার মুশরিক সরদাররাও তার অধিকারী হচ্ছিল। দুই, ঈমানদাররা যেমন তখন ঈমান ত্যাগ করার পরিবর্তে আগুনে ভরা গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে জীবন দেয়াকে বেছে নিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে এখনও ঈমানদারদের ঈমানের পথ থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত না হয়ে সব রকমের কঠিনতম শাস্তি ভোগ করা উচিত। তিন, যে আল্লাহকে মেনে নেবার কারণে কাফেররা বিরোধী হয়ে গেছে এবং ঈমানদাররা তাদের মেনে নেবার ওপর অবিচল রয়েছে, তিনি সবার ওপর ক্ষমতাশালী ও বিজয়ী, তিনি পৃথিবী ও আকাশের কর্তৃত্বের অধিকারী, নিজের সত্তায় তিনি নিজেই প্রশংসার অধিকারী এবং তিনি উভয় দলের অবস্থা দেখছেন। কাজেই নিশ্চিতভাবেই কাফেররা তাদের কুফরীর কারণে কেবল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে না বরং এই সংগে নিজেদের জুলুম–নিপীড়নের শাস্তিও তারা ভোগ করবে আগুনে দগ্ধীভূত হয়ে। অনুরূপভাবে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করেছে তারা নিশ্চিতভাবে জান্নাতে যাবে এবং এটিই বৃহত্তম সাফল্য। তারপর কাফেরদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত শক্ত ও কঠোরভাবে পাকড়াও করে থাকেন। যদি তোমরা

নিজেদের বিরাট দলীয় শক্তির ওপর ভরসা করে থাকো তাহলে তোমাদের চাইতে বড় দলীয় শক্তির অধিকারী ছিল ফেরাউন ও সামূদরা। তাদের সেনাবাহিনীর পরিণাম থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহর অসীম শক্তি তোমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে। এই ঘেরাও কেটে বের হবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আর যে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য তোমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো, তার প্রত্যেকটি শব্দ অপরিবর্তনীয়। এই কুরআনের প্রতিটি শব্দ লওহে মাহফুযের গায়ে এমনভাবে খোদিত আছে যে হাজার চেষ্টা করেও কেউ তা বদলাতে পারবে না।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٣ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٦ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝٩

কসম মজবুত দুর্গ বিশিষ্ট আকাশের[১] এবং সেই দিনের যার ওয়াদা করা হয়েছে[২] আর যে দেখে তার এবং সেই জিনিসের যা দেখা যায়।[৩] মারা পড়েছে গর্তওয়ালারা যে গর্তে দাউ দাউ করে জ্বলা জ্বালানীর আগুন ছিল, যখন তারা সেই গর্তের কিনারে বসেছিল এবং ঈমানদারদের সাথে তারা সবকিছু করছিল তা দেখছিল।[৪] ওই ঈমানদারদের সাথে তাদের শত্রুতার এ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না যে, তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল যিনি মহাপরাক্রমশালী এবং নিজের সত্তায় নিজেই প্রশংসিত, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী। আর সে আল্লাহ সবকিছু দেখছেন।[৫]

১. মূলে ذَاتِ الْبُرُوْجِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ বুর্জ বিশিষ্ট আকাশ। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী মুফাস্‌সিরগণের কেউ কেউ এ থেকে আকাশের বারটি বুর্জ অর্থ করেছেন। অন্যদিকে ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদাহ, হাসান বসরী, যাহ্‌হাক ও সুদ্দীর মতে এর অর্থ হচ্ছে, আকাশের বিশাল গ্রহ ও তারকাসমূহ।

২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

৩. যে দেখে এবং যা দেখা যায়—এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মতে বক্তব্যের ধারাবাহিকতার সাথে যে কথাটি সম্পর্ক রাখে সেটি হচ্ছে, যে দেখে বলতে এখানে কিয়ামতের দিন উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে এবং যা দেখা

যায় বলতে কিয়ামতকেই বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক ঘটনাবলী সেদিন যারা দেখে তারা প্রত্যেকেই দেখবে। এটি মুজাহিদ, ইকরামা, যাহ্হাক, ইবনে নুজাইহ্ এবং অন্যান্য কতিপয় মুফাস্সিরের বক্তব্য।

৪. যারা বড় বড় গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং তাদের জ্বলে পুড়ে মরার বীভৎস দৃশ্য নিজেদের চোখে দেখেছিল তাদেরকে এখানে গর্তওয়ালা বলা হয়েছে। মারা পড়েছে অর্থ তাদের ওপর আল্লাহর লানত পড়েছে এবং তারা আল্লাহর আযাবের অধিকারী হয়েছে। এ বিষয়টির জন্য তিনটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে। প্রথম বুর্জ বিশিষ্ট আকাশের দ্বিতীয় কিয়ামতের দিনের, যার ওয়াদা করা হয়েছে। তৃতীয় কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলীর এবং সেই সমস্ত সৃষ্টির যারা এ দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করবে। প্রথম জিনিসটি সাক্ষ দিচ্ছে, যে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মহাশক্তিধর সত্ত্বা বিশ্ব–জাহানের বিশাল তারকা ও গ্রহরাজির ওপর কর্তৃত্ব করছেন তাঁর পাকড়াও থেকে এ তুচ্ছ নগণ্য মানুষ কেমন করে বাঁচতে পারে? দ্বিতীয় জিনিসটির কসম এ জন্য খাওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় তারা ইচ্ছামতো জুলুম করেছে কিন্তু এমন একটি দিন অবশ্যি আসবে যেদিনটি সম্পর্কে সমস্ত মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে সেদিন প্রত্যক মজলুমের বদ্‌লা দেয়া হবে এবং প্রত্যেক জালেমকে পাকাড়াও করা হবে। তৃতীয় জিনিসটির কসম খাওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ জালেমরা যেভাবে ওই ঈমানদারদের জ্বলে পুড়ে মরার দৃশ্য দেখেছে ঠিক তেমনি কিয়ামতের দিন এদের শাস্তি দেয়ার দৃশ্য সমগ্র সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করবে।

গর্তে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরক তার মধ্যে নিক্ষেপ করার একাধিক ঘটনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, এ ধরনের জুলুম ও নিপীড়নমূলক ঘটনা দুনিয়ায় কয়েকবার ঘটেছে।

হযরত সুহাইব রুমী (রা) এ ধরনের একটি ঘটনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। ঘটনাটি হচ্ছে ঃ এক বাদশার কাছে একজন যাদুকর ছিল। বৃদ্ধ বয়সে সে বাদশাহকে বললো, একটি ছেলেকে আমার কাছে নিযুক্ত করো, সে আমার কাছ থেকে এ যাদু শিখে নেবে। বাদশাহ যাদু শেখার জন্য যাদুকরের কাছে একটি ছেলেকে নিযুক্ত করলো। কিন্তু সেই ছেলেটি যাদুকরের কাছে আসা যাওয়ার পথে একজন রাহেবের (যিনি সম্ভবত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী একজন সাধক ছিলেন) সাক্ষাত করতে লাগলো। তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়ে সে ঈমান আনলো। এমন কি তাঁর শিক্ষার গুণে সে অলৌকিক শক্তির অধিকারীও হয়ে গেলো। সে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে এবং কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতে লাগলো। ছেলেটি তাওহীদের প্রতি ঈমান এনেছে, একথা জানতে পেরে বাদশাহ প্রথমে রাহেবকে হত্যা করলো তারপর ছেলেটিকে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু কোন অস্ত্র দিয়েই এবং কোনভাবেই তাকে হত্যা করতে পারলো না।–শেষে ছেলেটি বললো, যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও তাহলে প্রকাশ্য জনসমাবেশে "বিস্‌মি রব্বিল গুলাম" (অর্থাৎ এই ছেলেটির রবের নামে) বাক্য উচ্চারণ করে আমাকে তীর মারো, তাতেই আমি মারা যাবো। বাদশাহ তাই করলো। ফলে ছেলেটি মারা গেলো। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে লোকেরা চীৎকার করে উঠলো, আমরা এই ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। বাদশাহর সভাসদরা তাকে বললো, এখন তো

তাই হয়ে গেলো যা থেকে আপনি বাঁচতে চাচ্ছিলেন। লোকেরা আপনার ধর্ম ত্যাগ করে এ ছেলেটির ধর্মগ্রহণ করেছে। এ অবস্থা দেখে বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। সে রাস্তার পাশে গর্ত খনন করালো। তাতে আগুন জ্বালালো। যারা ঈমান ত্যাগ করতে রাজী হলো না তাদের সবাইকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করলো। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবী শাইবা, তাবারানী, আব্দ ইবনে হুমাইদ)

দ্বিতীয় ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, ইরানের এক বাদশাহ শরাব পান করে নিজের বোনের সাথে ব্যভিচার করে এবং উভয়ের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। কথাটি প্রকাশ হয়ে গেলে বাদশাহ জনসমক্ষে ঘোষণা করে দেয় যে, আল্লাহ বোনের সাথে বিয়ে হালাল করে দিয়েছেন। লোকেরা তার একথা মানতে প্রস্তুত হয় না। ফলে সে নানান ধরনের শাস্তি দিয়ে লোকদের একথা মানতে বাধ্য করতে থাকে। এমনকি সে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে যে ব্যক্তি তার একথা মানতে প্রস্তুত হয়নি তাকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। হযরত আলী (রা) বলেন, সে সময় থেকেই অগ্নি উপাসকদের মধ্যে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়কে বিয়ে করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। (ইবনে জারীর)

তৃতীয় ঘটনাটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সম্ভবত ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ বেবিলনের অধিবাসীরা বনী ইসরাঈলকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দীন থেকে বিচ্যুত করতে বাধ্য করেছিল। এমন কি যারা তাদের কথা মানতে অস্বীকার করতো তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে ভরা গর্তে নিক্ষেপ করতো। (ইবনে জারীর, আব্দ ইবনে হুমাইদ)

নাজরানের ঘটনাটিই সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইবনে হিশাম, তাবারী, ইবনে খালদূন, মু'জামুল বুলদান গ্রন্থ প্রণেতা ইত্যাদি মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ হিম্‌য়ারের (ইয়ামন) বাদশাহ তুবান আস্‌য়াদ আবু কারিবা একবার ইয়াস্‌রিবে যায়। সেখানে ইহুদিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে এবং বনি কুরাইযার দু'জন ইহুদি আলেমকে সংগে করে ইয়ামনে নিয়ে যায়। সেখানে সে ব্যাপকভাবে ইহুদি ধর্মের প্রচার চালায়। তারপর তার ছেলে যু–নুওয়াস তার উত্তরাধিকারী হয়। সে দক্ষিণ আরবে ঈসায়ীদের কেন্দ্রস্থল নাজরান আক্রমণ করে। সেখান থেকে ঈসায়ী ধর্মকে উৎখাত করা এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে জোরপূর্বক ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল তার লক্ষ। (ইবনে হিশাম বলেন, নাজরানবাসীরা হযরত ঈসার আসল দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল)। নাজরান পৌঁছে সে লোকদেরকে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করার আহবান জানায়। লোকেরা অস্বীকার করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে বিপুল সংখ্যক লোককে দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের কুয়ায় নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেয় এবং অনেককে হত্যা করে। এভাবে মোট বিশ হাজার লোক নিহত হয়। নাজরানবাসীদের মধ্য থেকে দাউস যু–সা'লাবান নামক এক ব্যক্তি কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করে পালিয়ে যায়। এক বর্ণনা মতে, সে রোমের কায়সারের দরবারে চলে যায় এবং অন্য একটি বর্ণনা মতে সে চলে যায় হাবশার (ইথিওপিয়া) বাদশাহ নাজ্জাসীর দরবারে। সেখানে সে এই জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী রোমের কায়সার হাবশার বাদশাকে লেখেন এবং

দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী নাজ্জাশী কায়সারের কাছে নৌবাহিনীর জাহাজ সরবরাহের আবেদন জানান। যাহোক সবশেষে হাবশার সত্তর হাজার সৈন্য আরইয়াত নামক একজন সেনাপতির পরিচালনাধীনে ইয়ামন আক্রমণ করে। যু-নুওয়াস নিহত হয়। ইহুদি রাষ্ট্রের পতন ঘটে। ইয়ামন হাবশার ঈসায়ী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হয়।

অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদি থেকে মুসলিম ঐতিহাসিকদের এ বর্ণনার কেবল সত্যতাই প্রমাণিত হয় না বরং এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত তথ্যাদিও জানা যায়। সর্বপ্রথম ৩৪০ খৃষ্টাব্দে ইয়ামন হাবশার ঈসায়ীদের দখলে আসে। ৩৭৮ খৃঃ পর্যন্ত সেখানে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ সময় ঈসায়ী মিশনারীরা ইয়ামনে প্রবেশ করতে শুরু করে। এরি নিকটবর্তী সময়ে ফেমিউন (Faymiyun) নামক একজন সংসার ত্যাগী সাধক পুরুষ, কাশ্‌ফ ও কারামতের অধিকারী ঈসায়ী পর্যটক নাজরানে আসেন। তিনি স্থানীয় লোকদেরকে মূর্তি পূজার গলদ বুঝাতে থাকেন। তার প্রচার গুণে নাজরানবাসীরা ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত হয়। সে সময় তিনজন সরদার তাদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। তাদের একজনকে বলা হতো সাইয়েদ। তিনি উপজাতীয় সরদারদের মতো একজন বড় সরদার ছিলেন। বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়াবলী, সন্ধি-চুক্তি এবং সেনাবাহিনী পরিচালনা তার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় জনকে বলা হতো আকেব। তিনি অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলী দেখাশুনা করতেন। তৃতীয় জনকে বলা হতো উস্‌কুফ (বিশপ)। তিনি ছিলেন ধর্মীয় নেতা। দক্ষিণ আরবে নাজরান ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এটি ছিল একটি বৃহত্তম বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্র। এখানে তসর, চামড়া ও অস্ত্র নির্মাণ শিল্প উন্নতি লাভ করেছিল। প্রসিদ্ধ ইয়ামনী বর্মও এখানেই নির্মিত হতো। এ কারণে নিছক ধর্মীয় কারণেই নয় বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেও যু-নুওয়াস এ গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি আক্রমণ করে। নাজরানের সাইয়েদ হারেশাকে, সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ যাকে Arethas বলেছেন, হত্যা করে। তার স্ত্রী রুমার সামনে তার দুই কন্যাকে হত্যা করে এবং তাদের রক্ত পান করতে তাকে বাধ্য করে। তারপর তাকেও হত্যা করে। উস্‌কুফ্‌ বিশপ পলের (Paul) শুকনো হাড় কবর থেকে বের করে এনে জ্বালিয়ে দেয়। আগুন ভরা গর্তসমূহে নারী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, পাদরী, রাহেব সবাইকে নিক্ষেপ করে। সামগ্রিকভাবে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক নিহত হয়েছিল বলা হয়। ৫২৩ খৃষ্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে। অবশেষে ৫২৫ খৃষ্টাব্দে হাবশীরা ইয়ামন আক্রমণ করে যু-নুওয়াস ও তার হিমইয়ারী রাজত্বের পতন ঘটায়। প্রত্নতাত্বিক গবেষকগণ ইয়ামন হিস্‌নে গুরাবের যে শিলালিপি উদ্ধার করেছেন তা থেকেও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ঈসায়ী লেখকদের বিভিন্ন লেখায় গর্তওয়ালাদের এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে মূল ঘটনার সময় এবং এ ঘটনা যারা প্রত্যক্ষ করেছিল তাদের বিবরণ সহকারে লিখিত বেশ কিছু গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনটি গ্রন্থের রচয়িতারা এই ঘটনার সমসাময়িক। তাদের একজন হচ্ছেন ঃ প্রকোপিউস দ্বিতীয় জন কসমস ইনডিকোপ্লিউসটিস (Cosmos Indicopleustis) তিনি নাজ্জাশী এলিস বুয়ানের (Elesboan) নির্দেশে সে সময় বাত্‌লিমুসের গ্রীক ভাষায় লিখিত বইগুলোর অনুবাদ করছিলেন। এ সময় তিনি হাবশার সমুদ্রোপকূলবর্তী এডোলিশ (Adolis) শহরে

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾

যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছে, তারপর তা থেকে তাওবা করেনি, নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং জ্বালা-পোড়ার শাস্তি।[৬] *যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের বাগান যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে ঝরণাধারা। এটিই বড় সাফল্য।*

অবস্থান করছিলেন। তৃতীয়জন হচ্ছেন জোহান্নাস মালালা (Johnnes Malala)। পরবর্তী বহু ঐতিহাসিক তাঁর রচনা থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। এদের পর এফেসুসের জোহান্নাসের (Johannes of Ephesus) নাম করা যায়। তিনি ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর গীর্জার ইতিহাস গ্রন্থে নাজরানের ঈসায়ী সম্প্রদায়ের ওপর এই নিপীড়নের কাহিনী এ ঘটনার সমসাময়িক বর্ণনাকারী বিশপ শিমউনের (SIMEON) একটি পত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ পত্রটি লিখিত হয় জাবৃলা ধর্ম মন্দিরের প্রধানের (Abbot Von Gabula) নামে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিভিন্ন ইয়ামনবাসীর বর্ণনার মাধ্যমে শিমউন তাঁর এই পত্রটি তৈরি করেন। এ পত্রটি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রোম থেকে এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ঈসায়ী শহীদানের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে প্রকাশিত হয়। ইয়াকূবী পত্রিয়ার্ক ডিউনিসিউস (Patriarch Dionysius) ও জাকারিয়া সিদলিনি (Zacharia of Mitylene) তাদের সুরিয়ানী ইতিহাসেও এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন। নাজরানের ঈসায়ী সমাজ সম্পর্কিত ইয়াকূব সুরুজীর গ্রন্থেও এর উল্লেখ রয়েছে। আর রাহা (Edessa) এর বিশপ পোলাস (PULUS) নাজরানের নিহতদের উদ্দেশ্যে শোকগীতি লিখেছেন। এটি এখনো পাওয়া যায়। সুরিয়ানী ভাষার বই "আল হিময়ারীন" এর ইংরেজী অনুবাদ (Book of the Himyarites) ১৯২৪ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করে। বৃটিশ মিউজিয়ামে সেই আমলের এবং তার নিকটবর্তী আমলের কিছু ইথিয়োপীয় শিলালিপি সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলো থেকেও এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়। কিলবি তাঁর Arabian Highlands নামক সফরনামায় লিখেছেন : গর্তওয়ালাদের ঘটনা যেখানে সংঘটিত হয়েছিল সে জায়গাটি আজো নাজরানবাসীদের কাছে সুস্পষ্ট। 'উম্মু খারাক'-এর কাছে এক জায়গায় পাথরের গায়ে খোদিত কিছু চিত্রও পাওয়া যায়। আর নাজরানের কাবা যেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল বর্তমান নাজরানবাসীরা সে জায়গাটিও জানে।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

আসলে তোমার রবের পাকড়াও বড় শক্ত। তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন আবার তিনিই দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবেন। তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের মালিক, শ্রেষ্ঠ–সম্মানিত এবং তিনি যা চান তাই করেন।[৭] তোমার কাছে কি পৌঁছেছে সেনাদলের খবর? ফেরাউন ও সামূদের সেনাদলের?[৮] কিন্তু যারা কুফরী করেছে, তারা মিথ্যা আরোপ করার কাজে লেগে রয়েছে। অথচ আল্লাহ তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন। (তাদের মিথ্যা আরোপ করায় এ কুরআনের কিছু আসে যায় না) বরং এ কুরআন উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।[৯]

হাবশার ঈসায়ীরা নাজরান অধিকার করার পর সেখানে কাবার আকৃতিতে একটি ইমারত তৈরি করে। মক্কার কাবার মোকাবিলায় এই ঘরটিকে তারা কেন্দ্রীয় মর্যাদা দিতে চাচ্ছিল। এখানকার বিশপরা মাথায় পাগড়ী বাঁধতেন। এই ঘরকে তারা হারাম শরীফ গণ্য করেন। রোমান সম্রাটের পক্ষ থেকেও এই কাবাঘরের জন্য আর্থিক সাহায্য পাঠনো হতো। এই নাজরানের কাবার পাদরী তাঁর সাইয়েদ, আকেব ও উসকুফের নেতৃত্বে 'মুনাযিরা' (বিতর্ক) করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়েছিলেন। সেখানে যে বিখ্যাত 'মুবাহিলা'র ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় সূরা আলে ইমরানের ৬১ আয়াতে তা উল্লেখিত হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ২৯ ও ৫৫ টীকা)

৫. এ আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহর এমন সব গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে তাঁর প্রতি ঈমান আনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে এগুলোর প্রতি ঈমান আনার কারণে যারা অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হয় তারা জালেম।

৬. জাহান্নামের আযাব থেকে আবার আলাদাভাবে জ্বালা–পোড়ার শাস্তির উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা মজলুমদেরকে আগুনে ভরা গর্তে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়েছিল। সম্ভবত এটা জাহান্নামের সাধারণ আগুন থেকে ভিন্ন ধরনের এবং তার চেয়ে বেশী তীব্র কোন আগুন হবে এ বিশেষ আগুনে তাদেরকে জ্বালানো হবে।

৭. "তিনি ক্ষমাশীল" বলে এই মর্মে আশান্বিত করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি গোনাহ করা থেকে বিরত হয়ে যদি তাওবা করে তাহলে সে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। "প্রেমময়" বলে একথা বলা হয়েছে যে, তিনি নিজের সৃষ্টির প্রতি কোন শত্রুতা পোষণ করেন না। অযথা তাদেরকে শাস্তি দেয়া তাঁর কাজ নয়। বরং নিজের সৃষ্টিকে তিনি ভালোবাসেন। তাকে তিনি কেবল তখনই শাস্তি দেন যখন সে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করা থেকে বিরত হয় না। "আরশের মালিক" বলে মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি জাগানো হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের রাজত্বের তিনিই একমাত্র অধিপতি। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কেউ তাঁর হাত থেকে নিস্তার পেতে পারে না। "শ্রেষ্ঠ সম্মানিত" বলে এ ধরনের বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন সত্তার প্রতি অশোভন আচরণ করার হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। তাঁর শেষ গুণটি বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "তিনি যা চান তাই করেন।" অর্থাৎ আল্লাহ যে কাজটি করতে চান তাতে বাধা দেবার ক্ষমতা এ সমগ্র বিশ্ব–জাহানে কারোর নেই।

৮. যারা নিজেদের দল ও জনশক্তির জোরে আল্লাহর এ যমীনে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা বুলন্দ করছে এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমাদের কি জানা আছে, ইতিপূর্বে যারা নিজেদের দলীয় শক্তির জোরে এ ধরনের বিদ্রোহ করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল?

৯. এর অর্থ হচ্ছে, এ কুরআনের লেখা অপরিবর্তনীয়। এর বিলুপ্তি হবে না। আল্লাহর এমন সংরক্ষিত ফলকে এর লেখাগুলো খোদিত রয়েছে যেখানে এর মধ্যে কোন রদবদল করার ক্ষমতা কারোর নেই। এর মধ্যে যে কথা লেখা হয়েছে তা অবশ্যি পূর্ণ হবে। সারা দুনিয়া একজোট হয়ে তাকে বাতিল করতে চাইলেও তাতে সফল হবে না।

আত তারিক

৮৬

নামকরণ

প্রথম আয়াতে اَلطَّارِقِ শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনা পদ্ধতির দিক দিয়ে মক্কা মুআ'য্‌যমার প্রাথমিক সূরাগুলোর সাথে এর মিল দেখা যায়। কিন্তু মক্কার কাফেররা যখন কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়।

সর্বপ্রথম আকাশের তারকাগুলোকে এ মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এ বিশ্ব–জাহানে কোন একটি জিনিসও নেই যা কোন এক সত্তার রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ও অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। তারপর মানুষের দৃষ্টি তার নিজের সত্তার প্রতি আকৃষ্ট করে বলা হয়েছে, দেখো কিভাবে এক বিন্দু শুক্র থেকে অস্তিত্ব দান করে তাকে একটি জ্বলজ্যান্ত গতিশীল মানুষে পরিণত করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, যে আল্লাহ এভাবে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি নিশ্চিতভাবেই তাকে দ্বিতীয়বার পয়দা করার ক্ষমতা রাখেন। দুনিয়ায় মানুষের যেসব গোপন কাজ পর্দার আড়ালে থেকে গিয়েছিল সেগুলোর পর্যালোচনা ও হিসেব–নিকেশই হবে এই দ্বিতীয়বার পয়দা করার উদ্দেশ্য। সে সময় নিজের কাজের পরিণাম ভোগ করার হাত থেকে বাঁচার কোন ক্ষমতাই মানুষের থাকবে না এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসতেও পারবে না।

সবশেষে বলা হয়েছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং মাটি থেকে গাছপালা ও ফসল উৎপাদন যেমন কোন খেলা তামাসার ব্যাপার নয় বরং একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ, ঠিক তেমনি কুরআনে যেসব প্রকৃত সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোও কোন হাসি তামাসার ব্যাপার নয়। বরং সেগুলো একেবারে পাকাপোক্ত ও অপরিবর্তনীয় কথা। কাফেররা এ ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছে যে, তাদের চালবাজী ও কৌশল কুরআনের এই দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তারা জানে না, আল্লাহও একটি কৌশল অবলম্বন করছেন এবং তাঁর কৌশলের মোকাবিলায় কাফেরদের যাবতীয় চালবাজী ও কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারপর একটি বাক্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা এবং পর্দান্তরালে কাফেরদের ধমক দিয়ে কথা এভাবে শেষ করা হয়েছে ঃ তুমি একটু সবর করো এবং কিছুদিন কাফেরদেরকে ইচ্ছেমতো চলার সুযোগ দাও। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা টের পেয়ে যাবে, তাদের চালবাজী ও প্রতারণা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। বরং যেখানে তারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে কুরআন বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ۝٦ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝٧ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝٨

কসম আকাশের এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর। তুমি কি জানো ঐ রাতে আত্মপ্রকাশকারী কি? উজ্জ্বল তারকা। এমন কোন প্রাণ নেই যার ওপর কোন হেফাজতকারী নেই।[১] কাজেই মানুষ একবার এটাই দেখে নিক কী জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে![২] তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবলবেগে নিঃসৃত পানি থেকে, যা পিঠ ও বুকের হাড়ের মাঝখান দিয়ে বের হয়।[৩] নিশ্চিতভাবেই তিনি (স্রষ্টা) তাকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।[৪]

১. হেফাজতকারী বলতে এখানে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর ছোট বড় সকল সৃষ্টির দেখাশুনা, তত্ত্বাবধান ও হেফাজত করছেন। তিনিই সব জিনিসকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনিই সবকিছুকে টিকিয়ে রেখেছেন। তিনি সব জিনিসকে ধারণ করেছেন বলেই প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি সব জিনিসকে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বিপদমুক্ত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ বিষয়টির জন্য আকাশের ও রাতের অন্ধকারে আত্মপ্রকাশকারী প্রত্যেকটি গ্রহ ও তারকার কসম খাওয়া হয়েছে। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ শব্দ একবচন হলেও এখানে এর মানে কিন্তু একটি তারকা নয় বরং তারকা মণ্ডলী। ফলে এখানে এ কসমের অর্থ এ দাঁড়ায় ঃ রাতের আকাশে এই যে অসংখ্য গ্রহ তারকা ঝলমল করতে দেখা যায় এদের প্রত্যেকটির অস্তিত্ব এ মর্মে সাক্ষ প্রদান করছে যে অবশ্যি কেউ একজন আছেন যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, এগুলোকে আলোকিত করেছেন, এগুলোকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং এমনভাবে এদেরকে হেফাজত করছেন যার ফলে এরা নিজেদের স্থান থেকে ছিটকে পড়ে না এবং অসংখ্য তারকা একসাথে আবর্তন করার সময় একটি তারকা অন্য তারার সাথে ধাক্কা খায় না বা অন্য কোন তারা তাকে ধাক্কা দেয় না।

২. উর্ধজগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর এবার মানুষকে তার নিজের সত্তা সম্পর্কে একটু চিন্তা করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। তাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? কে পিতার দেহ থেকে নির্গত কোটি কোটি শুক্রকীটের মধ্য থেকে একটি শুক্রকীট এবং মায়ের গর্ভ থেকে নির্গত অসংখ্য ডিম্বের মধ্য থেকে একটি ডিম্ব বাছাই করে দেয় এবং কোন এক সময় তাদের সম্মিলন ঘটায় এবং তারপর এক বিশেষ মানবীর গর্ভ ধারণ সংগঠিত হয়? গর্ভ সঞ্চারের পর কে মায়ের উদরে তার ক্রমবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করে? তারপর কে তাকে একটি জীবিত শিশুর আকারে জন্মলাভ করার পর্যায়ে পৌছিয়ে দেয়? কে মায়ের গর্ভাধারের মধ্যই তার শারীরিক কাঠামো এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাসমূহের অনুপাত নির্ধারণ করে দেয়? কে জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনবরত তার তত্ত্বাবধান করে? তাকে রোগ মুক্ত করে। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে। নানা প্রকার আপদ-বিপদ থেকে বাঁচায়। তার জন্য বহুতর সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে। তার নিজের এসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতাই নেই। এমনকি এগুলো সম্পর্কে কোন চেতনাই তার নেই। এসবকিছুই কি এক মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান ছাড়াই চলছে?

৩. এখানে মূল আয়াতে সুলব (صلب) ও তারায়েব (ترائب) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'সুলব' মেরুদণ্ডকে ও 'তারায়েব' বুকের পাঁজরকে বলা হয়। যেহেতু যে উপাদান থেকে পুরুষ ও নারীর জন্ম হয় তা মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্যস্থিত ধড় থেকে বের হয়, তাই বলা হয়েছে পিঠ ও বুকের মধ্যস্থল থেকে নির্গত পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের হাত-পা কর্তিত অবস্থায়ও এ উপাদান জন্ম নেয়। তাই একথা বলা ঠিক নয় যে, সারা শরীর থেকে এ উপাদান বের হয়। আসলে শরীরের প্রধান অঙ্গগুলোই হচ্ছে এর উৎস। আর এ প্রধান অঙ্গগুলো সব ধড়ের সাথে সংযোজিত। মস্তিষ্কের কথা আলাদা করে না বলার কারণ হচ্ছে এই যে, মেরুদণ্ড মস্তিষ্কের এমন একটি অংশ যার মাধ্যমে শরীরের সাথে মস্তিষ্কের সম্পর্ক বজায় রয়েছে।*

* মাসিক তরজুমানুল কুরআনে এই ব্যাখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর জনৈক ডাক্তার সাহেব মাওলানা মওদূদীকে (র) লেখেন : "আপনার ব্যাখ্যাটি আমি মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়লাম। কিন্তু আমি বিষয়টি বুঝতে পারলাম না। কারণ বাস্তব পর্যবেক্ষণে আমরা দেখি, অণ্ডকোষে (Testicles) বীর্যের জন্ম হয়। তারপর সরু সরু নালীর মাধ্যমে বড় বড় নালীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তা পেটের দেয়ালের অভ্যন্তরে কোমরের হাড়ের ঠিক বরাবর একটি নালী (Inguinal Canal) অতিক্রম করে নিকটবর্তী একটি গ্রন্থিতে প্রবেশ করে। এই গ্রন্থিটির নাম Prostate. এরপর সেখান থেকে তরল পদার্থ নিয়ে এর নির্গমন হয়। মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মধ্যে এর অগ্রসর হবার ব্যাপারটি আমার বোধগম্য হলো না। অবশ্য এর নিয়ন্ত্রণ এমন একটি নার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে হয় যা মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মাঝখানে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। তাও একটি বিশেষ সীমিত পর্যায়ে। এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আবার মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত আর একটি গ্রন্থির তরল পদার্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখানে নির্গমনের (যা একটি নালীর মাধ্যমেই হতে পারে) আমার আবেদন, এর ব্যাখ্যা কি, এটা আপনি বিস্তারিতভাবে লেখেন। আমি আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস করলাম এ জন্য যে, আপনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চর্চায় বিশ্বাস করেন।"

এর জবাবে মাওলানা ১৯৭১ সালের নভেম্বরের তরজুমানুল কুরআন সংখ্যায় পরবর্তী প্যারাটি লেখেন :

৪. অর্থাৎ যেভাবে তিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান করেন এবং গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার দেখাশুনা করেন তা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে যে, তিনি মৃত্যুর পর আবার তাকে অস্তিত্বশীল করতে পারেন। যদি তিনি প্রথমটির ক্ষমতা রেখে থাকেন এবং তারি বদৌলতে মানুষ দুনিয়ায় জীবন ধারণ করছে, তাহলে তিনি দ্বিতীয়টির ক্ষমতা রাখেন না, এ ধারণা পোষণ করার পেছনে এমন কি শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা

যদিও শরীরের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী (Functions) আলাদা তবুও কোন অংশ নিজে একাকী কোন কাজ করে না। বরং প্রত্যেকে অন্যের কার্যাবলীর সহায়তায় (Co-oridination) নিজের কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। নিসন্দেহে বীর্যের জন্ম হয় পুরুষাঙ্গে এবং সেখান থেকে তা বের হয়েও আসে একটা বিশেষ পথ দিয়ে। কিন্তু পাকস্থলী, কলিজা, ফুসফুস, কিডনী, লিভার ও মস্তিষ্ক প্রত্যেকে স্বস্থানে নিজের কাজটি না করলে বীর্য জন্মাবার ও নির্গত হবার এ ব্যবস্থাটি কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের কাজ করতে সক্ষম? অনুরূপভাবে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, কিডনীতে পেশাব তৈরি হয় এবং একটি নালীর সাহায্যে মূত্রাশয়ে পৌছে পেশাব নির্গত হবার পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কিভাবে কোন্ কার্যক্রমের ফলে? রক্ত প্রস্তুতকারী ও তাকে সমগ্র দেহে আবর্তিত করে কিডনী পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবার দায়িত্বে যেসব অঙ্গ নিয়োজিত তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে কি কিডনী একাই রক্ত থেকে পেশাবের উপাদানগুলো আলাদা করে সেগুলোকে এক সাথে পেশাবের নালী দিয়ে বাইরে বের করে দিতে সক্ষম হবে? তাই কুরআন মজীদে বলা হয়নি যে, এ উপাদানগুলো মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড় থেকে নির্গত হয় বরং বলা হয়েছে, "ঐ দু'টোর মধ্যখানে শরীরের যে অংশটি রয়েছে সেখান থেকে এ উপাদানগুলো নির্গত হয়।" এতে একথা অস্বীকার করা হয়নি যে বীর্য তৈরি হবার ও তার নির্গমনের একটি বিশেষ কর্মপ্রণালী (Mechanism) রয়েছে, শরীরের বিশেষ কিছু অংশ এ কাজে নিয়োজিত থাকে। বরং এ থেকে একথা প্রকাশ হয় যে, এ কর্মপ্রণালী স্বতঃপ্রবৃত্ত নয়। মহান আল্লাহ মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে যেসব অঙ্গ সংস্থাপন করেছেন তাদের সমগ্র কর্মের সহায়তায় এ কাজটি সম্পাদিত হয়। এ জন্য আমি আগেই বলেছি যে, সমগ্র শরীর এ কাজে অংশ নেয়নি। কেননা হাতপা কর্তিত অবস্থায়ও এ ব্যবস্থাকে কর্মরত দেখা যায়। তবে মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে যেসব বড় বড় অঙ্গ রয়েছে তাদের কোন একটিও যদি না থাকে তাহলে এ কর্মপ্রণালী অচল বলা যেতে পারে।

"ভ্রূণতত্বের (Embryology) দৃষ্টিতে এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, ভ্রূণের (Foetus) মধ্যে যে অণ্ডকোশে (Testicle) বীর্যের জন্ম হয় তা মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মধ্যস্থলে কিডনীর নিকটেই অবস্থান করে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে পুরুষাঙ্গে নেমে আসে। এ কার্যধারা সংঘটিত হয় জন্মের পূর্বে আবার অনেক ক্ষেত্রে তার কিছু পরে। কিন্তু তবুও তার স্নায়ু ও শিরাগুলোর উৎস সবসময় সেখানেই (মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে) থাকে। বরং পিঠের নিকটবর্তী মহাধমনী (Artery) থেকে শিরাগুলো (Aorta) বের হয় এবং পেটের সমগ্র অঞ্চল সফর করে সেখানে রক্ত সরবরাহ করে। এভাবে দেখা যায় অণ্ডকোষ আসলে পিঠের একটি অংশ। কিন্তু শরীরের অতিরিক্ত উষ্ণতা সহ্য করার ক্ষমতা না থাকার কারণে তাকে পুরুষাঙ্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উপরন্তু যদিও অণ্ডকোষ বীর্য উৎপাদন করে এবং তা মৌলিক কোষে (Seminal Vesicles) জমা থাকে তবুও মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলই হয় তাকে বের করার কেন্দ্রীয় সঞ্চালন শক্তি। মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুবিক প্রবাহ এ কেন্দ্রে পৌছার পর কেন্দ্রের সঞ্চালনে (Triger Action) মৌলিক কোষ সংকুচিত হয়। এর ফলে তরল শুক্র পিচকারীর ন্যায় প্রবল বেগে বের হয়। এ জন্য কুরআনের বক্তব্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বাধুনিক পরীক্ষা– নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান লব্ধ জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল।"

মওলানার এই জবাবটি প্রকাশিত হবার পর দু'জন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ দু'টি বিভিন্ন স্থান থেকে মাওলানার বক্তব্য সমর্থন করে যে তথ্য সরবরাহ করেন তা সর্বশেষ প্যারায় সন্নিবেশিত হয়েছে। –অনুবাদক

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَّأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

যেদিন গোপন রহস্যের যাচাই বাছাই হবে,[৫] সেদিন মানুষের নিজের কোন শক্তি থাকবে না এবং কেউ তার সাহায্যকারীও হবে না। কসম বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের[৬] এবং (উদ্ভিদ জন্মাবার সময়) ফেটে যাওয়া যমীনের, এটি মাপাজোকা মীমাংসাকারী কথা, হাসি–ঠাট্টা নয়।[৭] এরা কিছু চক্রান্ত করছে[৮] এবং আমিও একটি কৌশল করছি।[৯] কাজেই ছেড়ে দাও, হে নবী! এ কাফেরদেরকে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য এদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও।[১০]

যেতে পারে? আল্লাহর এই শক্তিকে অস্বীকার করতে হলে আল্লাহ যে তাকে অস্তিত্বদান করেছেন সরাসরি একথাটিই অস্বীকার করতে হবে। আর যে ব্যক্তি একথা অস্বীকার করবে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি একদিন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যার ফলে সে দাবী করে বসবে, এ দুনিয়ায় সমস্ত বইপত্র একদিন ঘটনাক্রমে ছাপা হয়ে গেছে, দুনিয়ার সমস্ত শহর একদিন হঠাৎ ঘটনাক্রমে তৈরি হয়ে গেছে এবং এই দুনিয়ায় হঠাৎ একদিন এমন এক ঘটনা ঘটে গেছে যার ফলে সমস্ত কলকারখানা আপনা আপনি নির্মিত হয়ে তাতে উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। আসলে মানুষ দুনিয়ায় যেসব কাজ করেছে ও করছে তার তুলনায় তার সৃষ্টি ও তার শারীরিক গঠনাকৃতি এবং তার মধ্যে কর্মরত শক্তি যোগ্যতাসমূহের সৃষ্টি এবং একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে তার টিকে থাকা অনেক বেশী জটিল কাজ। এত বড় জটিল কাজ যদি এ ধরনের জ্ঞানবত্তা, উন্নত কলাকৌশল, আনুপাতিক ও পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক শৃংখলা সহকারে হঠাৎ ঘটনাক্রমে ঘটে যেতে পারে, তাহলে দুনিয়ার আর কোন্ কাজটি আছে যাকে মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি হঠাৎ ঘটে যাওয়া কাজ বলবে না?

৫. গোপন রহস্য বলতে এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির এমনসব কাজ বুঝানো হয়েছে যেগুলো রহস্যাবৃত্ত রয়ে গেছে আবার এমন সব কাজও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো বাহ্যিক আকৃতিতে জন সমক্ষে এসে গেছে কিন্তু সেগুলোর পেছনে সক্রিয় নিয়ত, উদ্দেশ্য, স্বার্থ ও আশা–আকাঙ্খা এবং সেগুলোর গোপন কার্যকারণ লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। কিয়ামতের দিন এসব কিছু উন্মুক্ত হয়ে সামনে এসে যাবে। সেদিন কেবলমাত্র কে কি করেছে এর তদন্ত ও হিসেব–নিকেশ হবে না বরং কি কারণে, কি উদ্দেশ্যে, কি নিয়তে ও কোন্ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছিল তারও হিসেব হবে। অনুরূপভাবে এক

ব্যক্তি যে কাজটি করেছে দুনিয়ায় তার কি প্রভাব পড়েছে, কোথায় কোথায় তার প্রভাব পৌঁছেছে এবং কতদিন পর্যন্ত এ প্রভাব অব্যাহত থেকেছে—তাও সারা দুনিয়ার চোখ থেকে গোপন থেকেছে, এমনকি যে ব্যক্তি এ কাজটি করেছে তার চোখ থেকেও। আর একটি রহস্যও শুধুমাত্র কিয়ামতের দিনেই উন্মুক্ত হবে এবং সেদিন এর পুরোপুরি তদন্ত ও হিসেব-নিকেশ হবে। সেটি হচ্ছে, এক ব্যক্তি দুনিয়ায় যে বীজ বপন করে গিয়েছিল তার ফসল কতখানি পর্যন্ত কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে সে এবং তার সাথে আর কে কে কাটতে থেকেছে?

৬. আকাশের জন্য ذَاتِ الرَّجْعِ (বৃষ্টি বর্ষণকারী) বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'রজুআ' (رجع) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ফিরে আসা। তবে পরোক্ষভাবে আরবী ভাষায় এ শব্দটি বৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ বৃষ্টি মাত্র একবার বর্ষিত হয়েই খতম হয়ে যায় না বরং একই মওসুমে বারবার এবং কখনো মওসুম ছাড়াই একাধিকবার ফিরে আসে এবং যখন তখন বর্ষিত হয়। বৃষ্টিকে প্রত্যাবর্তনকারী বলার আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর সমুদ্রগুলো থেকে পানি বাষ্পের আকারে উঠে যায়। আবার এই বাষ্পই পানির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়।

৭. অর্থাৎ যেমন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং তার ফলে মাটি চিরে উদ্ভিদের অংকুর গজিয়ে ওঠা কোন হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয় বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নিরেট সত্য, ঠিক তেমনি কুরআন মানুষকে আবার তার আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এই মর্মে যে বিষয়টির খবর দিচ্ছে, সেটিও কোন হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়। বরং সেটি একটি চূড়ান্ত ও মীমাংসাকারী কথা, একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় নিরেট সত্য। সেটি পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েই ক্ষান্ত হবে।

৮. অর্থাৎ কাফেররা কুরআনের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য নানা ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। তারা ফুঁক দিয়ে এ প্রদীপটি নিভিয়ে দিতে চাচ্ছে। মানুষের মনে সব রকমের সন্দেহের জাল বুনে দিচ্ছে। একের পর এক মিথ্যা দোষারোপ করে যাচ্ছে কুরআনের দাওয়াত পেশকারী নবীর বিরুদ্ধে। এভাবে দুনিয়ায় যাতে তাঁর কথা বিস্তার লাভ করতে না পারে এবং তিনি যে কুফরী ও জাহেলিয়াতের আঁধার দূর করতে চান তা যাতে চারদিক আচ্ছন্ন করে রাখে সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৯. অর্থাৎ এদের কোন অপকৌশল লাভে কামিয়াব না হয় এবং অবশেষে এরা ব্যর্থ হয়ে যায় আর এই সংগে যে আলোর শিখাটিকে নিভিয়ে দেবার জন্য এরা সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেটি যাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সে জন্য আমি ব্যবস্থা অবলম্বন করছি।

১০. অর্থাৎ এদেরকে ছেড়ে দাও কিছুক্ষণের জন্য। এরা যাকিছু করতে চায় তা করে দেখুক। বেশী সময় যাবে না, এর ফলাফল এদের সামনে এসে যাবে। তখন আমি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলাম তার মোকাবিলায় এদের অপকৌশল কতটুকু সাফল্যের মুখ দেখেছে তা এরা বুঝতে পারবে।

আল আ'লা

৮৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতে উপস্থাপিত আ'লা শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর আলোচ্য বিষয় থেকে জানা যায়, এটি একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। ষষ্ঠ আয়াতে "আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না" এ বাক্যটিও একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোভাবে অহী আয়ত্ব করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেননি। এবং অহী নাযিলের সময় তার কোন শব্দ ভুলে যাবেন বলে তিনি আশংকা করতেন। এই আয়াতের সাথে যদি সূরা ত্বা-হা'র ১১৪ আয়াত ও সূরা কিয়ামাহ'র ১৬-১৯ আয়াতগুলোকে মিলিয়ে পড়া হয় এবং তিনটি সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর বর্ণনাভংগী ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এখানে উল্লেখিত ঘটনাবলীকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যায় ঃ সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, তুমি চিন্তা করো না, আমি এ বাণী তোমাকে পড়িয়ে দেবো এবং তুমি আর ভুলে যাবে না। তারপর বেশ কিছুকাল পরে যখন সূরা কিয়ামহ নাযিল হতে থাকে তখন তিনি অবচেতনভাবে অহীর শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। তখন বলা হয় "হে নবী! এই অহী দ্রুত মুখস্ত করার জন্য নিজের জিহবা সঞ্চালন করো না। এগুলো মুখস্থ করানো ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। কাজেই যখন আমরা এগুলো পড়ি তখন তুমি এর পড়া মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকো, তারপর এর মানে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার।" শেষবার সূরা ত্বা-হা নাযিলের সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার এই পরপর নাযিল হওয়া ১১৩টি আয়াতের কোন অংশ স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে যাবার আশংকা করেন, ফলে তিনি সেগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে তাঁকে বলা হয় ঃ "আর কুরআন পড়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে এর অহী সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে না যায়।" এরপর আর কখনো এমনটি ঘটেনি। নবী (সা) আর কখনো এ ধরনের আশংকা করেননি। কারণ এ তিনটি জায়গা ছাড়া কুরআনের আর কোথাও এ ব্যাপারে কোন ইংগিত নেই।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই ছোট্ট সূরাটিতে তিনটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। এক, তাওহীদ। দুই, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দান। তিন, আখেরাত।

তাওহীদের শিক্ষাকে প্রথম আয়াতের একটি বাক্যের মধ্যই সীমিত করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহর নামে তাসবীহ পাঠ করো। অর্থাৎ তাঁকে এমন কোন নামে স্মরণ করা যাবে না যার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি, অভাব, দোষ, দুর্বলতা বা সৃষ্টির সাথে কোন দিক দিয়ে কোন প্রকার মিল রয়ে গেছে। কারণ দুনিয়ায় যতগুলো ভ্রান্ত আকীদার জন্ম হয়েছে তার সবগুলোর মূলে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কিত কোন না কোন ভুল ধারণা। আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য কোন ভুল ও বিভ্রান্তিকর নাম অবলম্বন করার মাধ্যমে এ ভুল ধারণাগুলো বিকশিত হয়েছে। কাজেই আকীদা সংশোধনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, মহান আল্লাহকে কেবলমাত্র তাঁর উপযোগী পূর্ণ গুণান্বিত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর নামে স্মরণ করতে হবে।

এরপর তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের এমন এক রবের তাসবীহ পাঠ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যিনি বিশ্ব–জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে সমতা কায়েম করেছেন। তার ভাগ্য তথা তার ক্ষমতাগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন এবং যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার পথ তাকে বাত্লে দিয়েছেন। তোমরা নিজের চোখে তাঁর ক্ষমতার বিস্ময়কর ও বিচিত্র প্রকাশ দেখে চলছো। তিনি মাটির বুকে উদ্ভিদ ও গাছপালা উৎপন্ন করেন আবার সেগুলোকে প্রাণহীন আবর্জনায় পরিণত করেন। তিনি ছাড়া আর কেউ বসন্তের সজীবতা আনার ক্ষমতা রাখেন না আবার পাতাঝরা শীতের আগমন রোধ করার ক্ষমতাও কারো নেই।

তারপর দু'টি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ এই যে কুরআন তোমার প্রতি নাযিল হচ্ছে এর প্রতিটি শব্দ কিভাবে তোমার মুখস্থ থাকবে, এ ব্যাপারে তুমি কোন চিন্তা করো না। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত করে দেয়া আমার কাজ। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখার পেছনে তোমার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নেই। বরং এটা আমার মেহেরবানীর ফল। নয়তো আমি চাইলে তোমার স্মৃতি থেকে একে মুছে ফেলতে পারি।

এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। বরং তোমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সত্যের প্রচার। আর এই প্রচারের সরল পদ্ধতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি উপদেশ শুনতে ও তা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে তাকে উপদেশ দাও। আর যে ব্যক্তি তাতে প্রস্তুত নয় তার পেছনে লেগে থাকার প্রয়োজন নেই। যার মনে ভুল পথে চলার অশুভ পরিণামের ভয় থাকবে সে সত্য কথা শুনে তা মেনে নেবে এবং যে দুর্ভাগা তা শুনতে ও মেনে নিতে চাইবে না সে নিজের চোখেই নিজের অশুভ পরিণাম দেখে নেবে।

সবশেষে বক্তব্যের সমাপ্তি টেনে বলা হয়েছে ঃ সাফল্য কেবল তাদের জন্য যারা আকীদা–বিশ্বাস, কর্ম ও চরিত্রে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়বে। কিন্তু লোকেরা শুধুমাত্র এ দুনিয়ার আরাম–আয়েশ এবং এর স্বার্থ ও আশা–আনন্দের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। অথচ তাদের আসলে আখেরাতের চিন্তা করা উচিত। কারণ এ দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে আখেরাত চিরস্থায়ী। আর দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নিয়ামত অনেক বেশী ও অনেক উন্নত পর্যায়ের। এ সত্যটি কেবল কুরআনেই বর্ণনা করা হয়নি, হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসার (আ) সহীফাসমূহেও মানুষকে এই একই সত্যের সন্ধান দেয়া হয়েছিল।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ① الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ② وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ③ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ④ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ⑤

(হে নবী!) তোমার সুমহান রবের নামের তাসবীহ পাঠ করো।[১] যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সমতা কায়েম করেছেন।[২] যিনি তাকদীর গড়েছেন[৩] তারপর পথ দেখিয়েছেন।[৪] যিনি উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন।[৫] তারপর তাদেরকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।[৬]

১. এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "তোমার সুমহান রবের নামকে পবিত্র ও মহিমাময় করো।" এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবকটিই এখানে প্রযোজ্য। এক, আল্লাহকে এমন নামে স্মরণ করতে হবে যা তাঁর উপযোগী। তাঁর মহান সত্তার সাথে এমন নাম সংযুক্ত না করা উচিত যা অর্থের দিক দিয়ে তাঁর অনুপযোগী এবং তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। অথবা যে নামে তাঁর জন্য কোন ত্রুটি, অমর্যাদা বা শিরকের চিহ্ন পাওয়া যায়। অথবা যাতে তাঁর সত্তা, গুণাবলী বা কার্যাবলী সম্পর্কে কোন ভুল বিশ্বাস পাওয়া যায়। এ জন্য কুরআন মজীদে আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য ভাষায় এই নামগুলোর সঠিক অনুবাদ যে শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করাই হবে সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত পদ্ধতি। দুই, সৃষ্টির জন্য যেসব নাম নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা অথবা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামগুলো সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি এমন কিছু গুণবাচক নাম থাকে যেগুলো শুধু আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে বরং বান্দার জন্যও সেগুলোর ব্যবহার বৈধ হয় যেমন রউফ (পরম স্নেহশীল), রহীম (পরম করুণাময়) করীম (মেহেরবান), সামী (সবকিছু শ্রবণকারী), বসীর (সর্বদ্রষ্টা) ইত্যাদি, তাহলে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য এ শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয় বান্দার জন্য ঠিক সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না। তিন, পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মর্যাদাসহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। এমন কোন পদ্ধতিতে বা এমন কোন অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না, যা তাঁর প্রতি মর্যাদাবোধের পরিপন্থী। যেমন হাসি–ঠাট্টা করতে করতে, মলমূত্র ত্যাগকালে অথবা কোন গোনাহ করার সময় তাঁর নাম উচ্চারণ করা। অথবা এমন লোকদের সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করা যারা তা শুনে বেআদবী করতে থাকবে। এমন মজলিসেও তাঁর নাম বলা যাবে না। যেখানে লোকেরা অশালীন কাজে লিপ্ত

থাকে এবং তাঁর নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথে তারা বিদ্রূপ করতে থাকবে। আবার এমন অবস্থায়ও তাঁর পবিত্র নাম মুখে আনা যাবে না যখন আশংকা করা হবে যে, শ্রোতা তাঁর নাম শুনে বিরক্তি প্রকাশ করবে। ইমাম মালেকের (র) জীবনেতিহাসে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, কোন প্রার্থী তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি যদি তাকে তা দিতে না পারতেন তাহলে সাধারণ লোকদের মতো "আল্লাহ তোমাকে দেবেন" একথা না বলে অন্য কোনভাবে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রার্থীকে কিছু না দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলে আসলে তার মনে বিরক্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ অবস্থায় আল্লাহর নাম নেয়া আমি সংগত মনে করি না। কারণ সে বিরক্তি ও ক্ষোভের সাথে আল্লাহর নাম শুনবে।

হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত উকবাহ ইবনে আমের জুহানী (রা) থেকে রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের ভিত্তিতেই সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। আর রুকূ'তে তিনি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ভিত্তি ছিল সূরা ওয়াকিয়ার শেষ আয়াতটি فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ইবনুল মুনযির)

২. অর্থাৎ পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আর যে জিনিসটিই সৃষ্টি করেছেন তাকে সঠিক ও সুঠাম দেহসৌষ্ঠব দান করেছেন তার মধ্যে ভারসাম্য ও শক্তির অনুপাত সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাকে এমন আকৃতি দান করেছেন যে, তার জন্য এর চেয়ে ভালো আকৃতির কল্পনাই করা যেতে পারে না। একথাটিকে সূরা আস সাজদায় নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ الَّذِىْ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ "তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে চমৎকার তৈরি করেছেন।" এভাবে দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের যথোপযোগী ও যথা অনুপাতে সৃষ্টি হওয়াটাই একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কোন এক মহাবিজ্ঞ স্রষ্টা এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কোন আকস্মিক ঘটনাক্রমে অথবা বহু স্রষ্টার কর্মতৎপরতায় বিশ্ব-জাহানের এই অসংখ্য অংশের সৃষ্টিতে এ ধরনের সুষ্ঠু রুচিশীলতা এবং সামগ্রিকভাবে এদের সবার অংশের সম্মিলনে বিশ্ব-জাহানে এ ধরনের শোভা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর নয়।

৩. অর্থাৎ প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করার আগে দুনিয়ায় তাকে কি কাজ করতে হবে, এই কাজ করার জন্য তাকে কতটুকু সময় দেয়া হবে, তার আকার-আকৃতি কেমন হবে, তার মধ্যে কি কি গুণাবলী থাকবে, তার স্থান কোথায় হবে, তার জন্য প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব এবং কাজের জন্য কি কি সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হবে, কখন সে অস্তিত্ব লাভ করবে, নিজের অংশের কাজটুকু সে কতদিনে সম্পন্ন করবে এবং কবে কিভাবে সে খতম হয়ে যাবে, এসব কিছুই ঠিক করে দিয়েছেন। এই সমগ্র পরিকল্পনাটির সামগ্রিক নাম হচ্ছে "তাকদীর"। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের জন্য মহান আল্লাহ এই তাকদীর গড়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এমনি হঠাৎ উদ্দেশ্যহীনভাবে এই সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হয়নি। বরং স্রষ্টার সামনে এ জন্য একটি পূর্ণ পরিকল্পনা ছিল। সবকিছুই সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হচ্ছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন,

আল হিজর, ১৩-১৪ টীকা, আল ফুরকান ৮ টীকা, আল ক্বামার ২৫ টীকা এবং আবাসা ১২ টীকা দেখুন।)

৪. অর্থাৎ কোন জিনিসকে কেবলমাত্র সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি বরং যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে সেই কাজ করার পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। অন্য কথায় তিনি শুধুমাত্র স্রষ্টাই নন, পথপ্রদর্শকও। যে জিনিসটিকে তিনি যে মর্যাদার অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন তাকে তার উপযোগী পথনির্দেশনা দেবার এবং তার জন্য শোভনীয় উপায়ে পথ দেখাবার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারকাকে তিনি এক ধরনের পথ দেখিয়েছেন। সে পথে তারা চলছে এবং তাদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা সম্পাদন করে যাচ্ছে। আর এক ধরনের পথনির্দেশনা দিয়েছেন পানি, বায়ু, আলো, জড়পদার্থ ও খনিজপদার্থকে। সেই অনুযায়ী যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিক সেই কাজই তারা করে যাচ্ছে। উদ্ভিদকে অন্য এক ধরনের পথনির্দেশনা দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী তারা মাটির অভ্যন্তরে নিজেদের শিকড় বিস্তার করছে ও মাটির বুক চিরে অংকুরিত হচ্ছে। যেখানে যেখানে আল্লাহ তাদের জন্য খাদ্য সৃষ্টি করে রেখেছেন সেখান থেকে তা আহরণ করছে। কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে, পাতা ও ফুলে ফলে সুশোভিত হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য যে কাজ নির্ধারিত করা হয়েছে তা করে যাচ্ছে। এক ধরনের পথনির্দেশনা দিয়েছেন স্থলভাগ, জলভাগ ও শূন্যে উড্ডয়নশীল অসংখ্য প্রজাতির এবং তাদের প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্য। প্রাণীদের জীবন যাপন এবং তাদের কার্যকলাপে এর বিস্ময়কর ও সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। এমনকি একজন নাস্তিকও অবশেষে একথা মানতে বাধ্য হয় যে, বিভিন্ন ধরনের প্রাণীরা এমন কিছু নৈসর্গিক জ্ঞানের অধিকারী হয় যা মানুষ তার ইন্দ্রিয় তো দূরের কথা নিজের যন্ত্রপাতির সাহায্যেও অর্জন করতে পারে না। তারপর মানুষের জন্য রয়েছে আবার দু'টি আলাদা ধরনের পথনির্দেশনা। তার মধ্যে যে দুই ধরনের অবস্থা বিরাজ করছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এক ধরনের পথনির্দেশনার সম্পর্ক রয়েছে মানুষের জৈবিক জীবনের সাথে। এরি বদৌলতে প্রতিটি মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই দুধ পান করা শিখে নেয়। এরি মাধ্যমে মানুষের চোখ, নাক, কান, হৃদয়, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, হৃদপিণ্ড, কলিজা, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত্র, স্নায়ু, শিরা-উপশিরা সবকিছু যার যার কাজ করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে মানুষ সচেতন থাক বা নাই থাক তাতে কিছু আসে যায় না। তারি ইচ্ছা-অনিচ্ছার সাথে এই অংগ-প্রত্যংগগুলোর কাজের কোন সম্পর্ক নেই। এ পথনির্দেশনার আওতাধীনেই মানুষের মধ্যে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যাবস্থায় এমন সব শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসতে থাকে যা কোথাও এবং কোন ক্ষেত্রেই তার ইচ্ছা, সংকল্প, আশা-আকাংক্ষা এমন কি তার চেতনা শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। দ্বিতীয় পথনির্দেশনাটির সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের বুদ্ধি ও চেতনাগত জগতের সাথে। চেতনাহীন জগতের পথনির্দেশনা থেকে এর ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ জীবনের এ বিভাগে মানুষকে এক ধরনের স্বাধীন কর্মক্ষমতা দান করা হয়েছে। যার ফলে যে ধরনের পথনির্দেশনা স্বাধীন কর্মক্ষমতাবিহীন জীবনের উপযোগী তা এ বিভাগের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের পথনির্দেশনাটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য মানুষ যতই চেষ্টা করুক এবং যতই যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নিক না কেন, যে স্রষ্টা এই সমগ্র বিশ্ব-জাহানে প্রতিটি জিনিসকে তার আকৃতি, প্রকৃতি ও অবস্থা

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰٓ ۞ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَىٰ ۞ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۞ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۞

আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না।[৭] তবে আল্লাহ যা চান তা ছাড়া।[৮] তিনি জানেন প্রকাশ্য এবং যা কিছু গোপন আছে তাও।[৯]

আর আমি তোমাকে সহজ পথের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। কাজেই তুমি উপদেশ দাও, যদি উপদেশ উপকারী হয়[১০] যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করে নেবে।[১১] আর তার প্রতি অবহেলা করবে নিতান্ত দুর্ভাগাই, যে বৃহৎ আগুনে প্রবেশ করবে, তারপর সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না।[১২]

অনুযায়ী পথনির্দেশনা দেবার ব্যবস্থা করেছেন তিনি মানুষকে এই দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে সব জিনিস ভোগ–ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু এই ক্ষমতা ব্যবহারের সঠিক ও ভ্রান্ত পদ্ধতি কি হতে পারে তা তাকে জানিয়ে দেননি, একথা অবশ্যি মেনে নেবার কোন কারণ নেই। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল ৯, ১০, ১৪ ও ৫৬ টীকা, ত্বা–হা ২৩ টীকা, আর রহমান ২ ও ৩ টীকা এবং আদ দাহ্‌র ৫ টীকা)।

৫. মূলে মারআ (مَرْعَىٰ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তৃণভূক প্রাণীদের খাদ্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু আয়াতের পরবর্তী আলোচনা থেকে বুঝা যায়, এখানে কেবল উদ্ভিদজাত খাদ্যের কথা বলা হয়নি বরং মাটিতে উৎপন্ন সব ধরনের উদ্ভিদের কথাই বলা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ তিনি কেবল বসন্তকালের আগমন ঘটান না, শীতেরও আগমন ঘটান। তোমাদের চোখ তাঁর উভয় প্রকার ক্ষমতার প্রকাশই দেখছে। একদিকে তিনি সবুজ শ্যামল বৃক্ষলতায় ভরে দেন। তাদের তরুতাজা শ্যামল শোভা দেখে মন আনন্দে ভরে ওঠে। আবার অন্যদিকে এ বৃক্ষলতাকে তিনি শুষ্ক শ্রীহীন করে কালো জঞ্জালে পরিণত করেন। এগুলো বাতাসে উড়ে বেড়ায় এবং বন্যার স্রোতে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। তাই এই দুনিয়ায় কোন ব্যক্তির এই ভুল ধারণা করা উচিত নয় যে, সে এখানে কেবল বসন্তকালই দেখবে, শীতের সাথে তার সাক্ষাতই হবে না। এই একই বক্তব্য কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন দেখুন সূরা ইউনুস ২৪ আয়াত, সূরা কাহাফ ৪৫ আয়াত এবং সূরা হাদীদ ২০ আয়াত।

৭. হাকেম হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে এবং ইবনে মারদুইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুলে যাবার ভয়ে কুরআনের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে থাকতেন। মুজাহিদ ও কালবী বলেন, জিব্রীল অহী শুনিয়ে শেষ করার আগেই ভুলে যাবার আশংকায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোড়ার দিক থেকে আবার পড়তে শুরু করতেন। এ কারণে আল্লাহ তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, অহী নাযিলের সময় তুমি নিরবে শুনতে থাকো। আমি তোমাকে তা এমনভাবে পড়িয়ে দেবো যার ফলে চিরকালের জন্য তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে। এর কোন একটি শব্দ তুমি ভুলে যাবে, এ ভয় করো না। এ নিয়ে তৃতীয়বার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অহী আয়ত্ব করার পদ্ধতি শেখানো হয়। এর আগে আরো দু'বার সূরা 'ত্বা-হা'র ১১৪ আয়াতে এবং সূরা 'কিয়ামাহ'র ১৬-১৯ আয়াতে এর আলোচনা এসেছে। এই আয়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয়, কুরআন যেমন মু'জিযা হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হয়েছিল ঠিক তেমনি মুজিযা হিসেবেই তার প্রতিটি শব্দ তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছিল। এর কোন একটি শব্দ তিনি ভুলে যাবেন অথবা একটি শব্দের জায়গায় তার সমার্থক অন্য একটি শব্দ তাঁর মুবারক কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে, এ ধরনের সকল সম্ভাবনার পথই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

৮. এই বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সমগ্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ তোমার স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পেছনে তোমার নিজের শক্তির কোন কৃতিত্ব নেই; বরং এটি আল্লাহর মেহেরবানী এবং তাঁর তাওফীকের ফল। নয়তো আল্লাহ চাইলে এগুলো তোমার স্মৃতি থেকে উধাও করে দিতে পারেন। এ বক্তব্যটি কুরআনের অন্যত্র নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ "আমি চাইলে অহীর মাধ্যমে তোমাকে যা কিছু দিয়েছি সব ছিনিয়ে নিতে পারি।" (বনি ইসরাঈল ৮৬) দুই, কখনো সাময়িকভাবে তোমার ভুলে যাওয়া এবং কোন আয়াত বা শব্দ তোমার কোন সময় ভুলে যাওয়া এই ওয়াদার ব্যতিক্রম। যে ব্যাপারে ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তুমি স্থায়ীভাবে কুরআনের কোন শব্দ ভুলে যাবে না। সহী বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীসটিকে এ অর্থের সমর্থনে পেশ করা যেতে পারে ঃ একবার ফজরের নামাযে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা পড়ার সময় মাঝখানে একটি আয়াত বাদ দিয়ে যান। নামাযের পর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) এ আয়াতটি মানসূখ (রহিত) হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেন। জবাবে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

৯. এমনিতে এ শব্দগুলো সাধারণভাবে ব্যবহৃত এবং তার অর্থ এই যে, আল্লাহ গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। কিন্তু যে বক্তব্য প্রসঙ্গে একথাগুলো এখানে বলা হয়েছে তা সামনে রাখলে এর যা অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে ঃ তুমি জীব্রীলের (আ) সাথে সাথে যে কুরআন পড়ে চলেছো। তা আল্লাহ জানেন এবং ভুলে যাবার ভয়ে যে এমনটি করছো তাও আল্লাহ জানেন। তাই তাঁকে নিশ্চয়তা দান করে বলা হচ্ছে, তোমার ভুলে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

১০. সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ এ দু'টি বাক্যকে পৃথক পৃথক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা প্রথম বাক্যের অর্থ করেছেন, আমি তোমাদেরকে একটি সহজ শরীয়াত দিচ্ছি। এ শরীয়াত অনুযায়ী কাজ করা সহজ। আর দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ করেছেন, উপদেশ দাও, যদি তা কাজে লাগে। কিন্তু আমার মতে "ফাযাক্কির" (فَذَكِّرْ) শব্দটি উভয় বাক্যকে

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

সে সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে[১৩] এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করেছে[১৪] তারপর নামায পড়েছে।[১৫] কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো।[১৬] অথচ আখেরাত উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।[১৭] পূর্বে অবতীর্ণ সহীফাগুলোয় একথাই বলা হয়েছিল, ইবরাহীম ও মূসার সহীফায়।[১৮]

পরস্পর সংযুক্ত করে দিয়েছে এবং শেষের বাক্যটির বিষয়বস্তু প্রথম বাক্যটির বিষয়বস্তুর ওপরই সংস্থাপিত হয়েছে। তাই আল্লাহর এই বাণীটির অর্থ আমি যা বুঝেছি তা হচ্ছে ঃ হে নবী! দীন প্রচারের ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন সংকটের মুখোমুখি করতে চাই না। যার শ্রবণশক্তি নেই তাকে শুনাতে হবে এবং যার দৃষ্টিশক্তি নেই তাকে দেখাতে হবে, এ ধরনের সংকটে তোমাকে ফেলতে চাই না। বরং তোমার জন্য একটি সহজ পথ তৈরি করে দিচ্ছি। সে পথটি হচ্ছে, যেখানে তুমি অনুভব করো কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে প্রস্তুত সেখানে উপদেশ দিতে থাকো। এখন কে উপদেশ থেকে উপকৃত হতে এবং কে উপকৃত না হতে চায়, তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে সাধারণ প্রচারের মাধ্যমেই। কাজেই সাধারণ প্রচার জারী রাখতে হবে। কিন্তু সেখানে তোমাদের উদ্দেশ্য হবে এমনসব লোকদের খুঁজে বের করা যারা এর সাহায্যে উপকৃত হয়ে সত্য-সরল পথ অবলম্বন করবে। এসব লোকেই তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অধিকার রাখে এবং এদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এদেরকে বাদ দিয়ে এমনসব লোকের পেছনে পড়ার তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। যাদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তোমরা জানতে পেরেছো যে, তারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তুই সূরা আবাসায় অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি বেপরোয়া ভাব দেখায় তার প্রতি তুমি দৃষ্টি দিচ্ছো। অথচ সে সংশোধিত না হলে তোমার ওপর তার কী দায়িত্ব বর্তায়? আর যে ব্যক্তি নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং সে দৌড়রত রয়েছে, তার প্রতি তুমি অনাগ্রহ দেখাচ্ছো। এতো একটি উপদেশ, যে চায় এটা গ্রহণ করতে পারে।" (৫-১২ আয়াত)।

১১. অর্থাৎ যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর ভয় এবং খারাপ পরিণতির আশংকা থাকবে সেই ভাবতে থাকবে যে, সে ভুল পথে যাচ্ছে কি-না এবং সেই ব্যক্তিই হেদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য এবং সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথের সন্ধান দানকারীর উপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনবে।

১২. অর্থাৎ তার মৃত্যু হবে না। যার ফলে আযাব থেকে রেহাই পাবে না। আবার বাঁচার মতো বাঁচবেও না। যার ফলে জীবনের কোন স্বাদ-আহলাদও পাবে না। যারা আল্লাহ ও

তাঁর রসূলের উপদেশ আদৌ গ্রহণ করেনি এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কুফরী, শিরক বা নাস্তিকতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তারাই এ শাস্তি লাভ করবে। আর যারা মনের অভ্যন্তরে ঈমানকে পোষণ করে কিন্তু নিজেদের খারাপ কাজের দরুন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তাদের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তারা নিজেদের শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ তাদের মৃত্যু দান করবেন। তারপর তাদের পক্ষে শাফা'আত কবুল করা হবে। তাদের অগ্নিদগ্ধ লাশ এনে জান্নাতের ঝরণার কিনারে ফেলে দেয়া হবে। জান্নাতবাসীদের বলা হবে, ওদের ওপর পানি ঢালো। বৃষ্টির পানি পেয়ে যেমন মৃত উদ্ভিদ জীবন্ত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি জান্নাতের পানি পেয়ে তারাও জেগে উঠবে। এ সম্পর্কিত হাদীস মুসলিমে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এবং বায্যারে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

১৩. পবিত্রতা অর্থ কুফর ও শিরক ত্যাগ করে ঈমান আনা, অসৎআচার–আচরণ ত্যাগ করে সদাচার অবলম্বন করা এবং অসৎকাজ ত্যাগ করে সৎকাজ করা। সফলতা বলতে পার্থিব সমৃদ্ধি বুঝানো হয়নি বরং আসল ও সত্যিকার সফলতার কথা বুঝানো হয়েছে। এর সাথে পার্থিব সমৃদ্ধি অর্জিত হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ২৩ টীকা, আল মু'মিনুন ১, ১১, ৫০ টীকা এবং সূরা লুকমান ৪ টীকা।)

১৪. 'স্মরণ করা' বলতে আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ করা এবং মুখে তা উচ্চারণ করাও বুঝানো হয়েছে। এই উভয়টিই যিকরুল্লাহ বা আল্লাহকে স্মরণ করার অন্তরভুক্ত হবে।

১৫. অর্থাৎ কেবল স্মরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং নিয়মিত নামাযও পড়ে সে প্রমাণ করেছে যে, যে আল্লাহকে সে নিজের ইলাহ বলে মেনে নিয়েছে কার্যত তাঁর আনুগত্য করতেও সে প্রস্তুত এবং তাঁকে সর্বক্ষণ স্মরণ করার জন্য সে ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। এই আয়াতে পর্যায়ক্রমে দু'টি কথা বলা হয়েছে। প্রথমে আল্লাহকে স্মরণ করা তারপর নামায পড়া। এ অনুযায়ী 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের যে পদ্ধতির প্রচলন করেছেন তার সকল অংশই যে কুরআনের ইশারা–ইংগিত থেকে গৃহীত, এটি তার অসংখ্য প্রমাণের অন্যতম। কিন্তু আল্লাহর রসূল ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে এই ইংগিতগুলো জমা করে নামাযকে এ আকারে সাজানো কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না।

১৬. অর্থাৎ দুনিয়া ও তার আরাম–আয়েশ এবং তার স্বার্থ ও আনন্দ স্বাদ লাভ করার জন্যই তোমাদের সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা উৎসর্গিত। তোমরা মনে করে থাকো, এখানে যা কিছু পাওয়া যায়, তাই নীট লাভ এবং এখানে যা থেকে বঞ্চিত হও তাই তোমাদের জন্য আসল ক্ষতি।

১৭. অর্থাৎ আখেরাত দু'দিক দিয়ে দুনিয়ার মোকাবিলায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। প্রথমত তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ, আরাম–আয়েশ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের চাইতে অনেক বেশী ও অনেক উচ্চ পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং আখেরাত চিরস্থায়ী।

১৮. এই দ্বিতীয়বারের মতো কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসা (আ)–এর সহীফা শিক্ষার বরাত দেয়া হয়েছে। এর আগে সূরা আন নাজ্‌মের তৃতীয় রুকূ'তে আর একবার এ ধরনের বরাত দেয়া হয়েছে।

আল গাশিয়াহ

৮৮

নামকরণ

প্রথম আয়াতের الْغَاشِيَةُ শব্দকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির সমগ্র বিষয়বস্তু একথা প্রমাণ করে যে এটিও প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন এবং মক্কার লোকেরা তাঁর দাওয়াত শুনে তাঁর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে থাকে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য একথাটি অবশ্যি সামনে রাখতে হবে যে, ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রধানত দু'টি কথা লোকদেরকে বুঝাবার মধ্যেই তাঁর দাওয়াত সীমাবদ্ধ রাখেন। একটি তাওহীদ ও দ্বিতীয়টি আখেরাত। আর মক্কাবাসীরা এই দু'টি কথা মেনে নিতে অস্বীকার করতে থাকে। এই পটভূমিটুকু অনুধাবন করার পর এবার এই সূরাটির বিষয়বস্তু ও বর্ণনা পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন।

এখানে সবার আগে গাফলতির জীবনে আকণ্ঠ ডুবে থাকা লোকদেরকে চমকে দেবার জন্য হঠাৎ তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে ঃ তোমরা কি সে সময়ের কোন খবর রাখো যখন সারা দুনিয়ার ওপর ছেয়ে যাবার মতো একটি বিপদ অবতীর্ণ হবে? এরপর সাথে সাথেই এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, সে সময় সমস্ত মানুষ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দু'টি ভিন্ন পরিণামের সম্মুখীন হবে। একদল জাহান্নামে যাবে। তাদের উমুক উমুক ধরনের ভয়াবহ ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। দ্বিতীয় দলটি উন্নত ও উচ্চ মর্যাদার জান্নাতে যাবে। তাদেরকে উমুক উমুক ধরনের নিয়ামত দান করা হবে।

এভাবে লোকদেরকে চমকে দেবার পর হঠাৎ বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রশ্ন করা হয়, যারা কুরআনের তাওহীদী শিক্ষা ও আখেরাতের খবর শুনে নাক সিটকায় তারা কি নিজেদের চোখের সামনে প্রতি মুহূর্তে যেসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সেগুলো দেখে না? আরবের দিগন্ত বিস্তৃত সাহারায় যেসব উটের ওপর তাদের সমগ্র জীবন যাপন প্রণালী নির্ভরশীল তারা কিভাবে ঠিক মরু জীবনের উপযোগী বৈশিষ্ট ও গুণাবলী সম্পন্ন পশু হিসেবে গড়ে

উঠেছে, একথা কি তারা একটুও চিন্তা করে না? পথে সফর করার সময় তারা আকাশ, পাহাড় বা বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী দেখে। এই তিনটি জিনিস সম্পর্কেই তারা চিন্তা করে না কেন? মাথার ওপরে এই আকাশটি কেমন করে ছেয়ে গেলো? সামনে ওই পাহাড় খাড়া হলো কেমন করে? পায়ের নীচে এই যমীন কিভাবে বিছানো হলো? এসব কিছুই কি একজন মহাবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান কারিগরের কারিগরী তৎপরতা ছাড়াই হয়ে গেছে? যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, একজন সৃষ্টিকর্তা বিপুল শক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে এই জিনিসগুলো তৈরি করেছেন এবং দ্বিতীয় আর কেউ তাঁর এই সৃষ্টি কর্মে শরীক নেই তাহলে তাঁকেই একক রব হিসেবে মেনে নিতে তাদের আপত্তি কেন? আর যদি তারা একথা মেনে নিয়ে থাকে যে সেই আল্লাহর এসব কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল, তাহলে সেই আল্লাহ কিয়ামত সংঘটিত করার ক্ষমতাও রাখেন, মানুষদের পুনর্বার সৃষ্টি করার ক্ষমতাও রাখেন এবং জান্নাত ও জাহান্নাম বানাবার ক্ষমতাও রাখেন—এসব কথা কোন্ যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে মানতে ইতস্তত করছে?

এ সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি–প্রমাণের ভিত্তিতে বক্তব্য বুঝানো হয়েছে। এরপর কাফেরদের দিক থেকে ফিরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, এরা না মানতে চাইলে না মানুক, তোমাকে তো এদের ওপর বল প্রয়োগকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়নি। তুমি জোর করে এদের থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে পারো না। তোমার কাজ উপদেশ দেয়া। কাজেই তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকো। সবশেষে তাদের অবশ্যি আমার কাছেই আসতে হবে। সে সময় আমি তাদের কাছ থেকে পুরো হিসেব নিয়ে নেব। যারা মানেনি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবো।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ ① وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَٰشِعَةٌ ② عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ③ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ④ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ⑤ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ⑥ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ⑦ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ⑧ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑨ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑩ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةً ⑪ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑫ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ⑬ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ⑭ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ⑮ وَزَرَابِىُّ مَبْثُوثَةٌ ⑯

তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী বিপদের খবর এসে পৌঁছেছে কি?[১] কিছু চেহারা[২] সেদিন হবে ভীতি কাতর, কঠোর পরিশ্রম রত, ক্লান্ত–পরিশ্রান্ত। জ্বলন্ত আগুনে ঝলসে যেতে থাকবে। ফুটন্ত ঝরণার পানি তাদেরকে দেয়া হবে পান করার জন্য। তাদের জন্য কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না।[৩] তা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও মেটাবে না। কিছু চেহারা সেদিন আলোকোজ্জ্বল হবে। নিজেদের কর্ম সাফল্যে আনন্দিত হবে।[৪] উচ্চ মর্যাদার জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে কোন বাজে কথা শুনবে না।[৫] সেখানে থাকবে বহমান ঝরণাধারা। সেখানে উঁচু আসন থাকবে, পানপাত্রসমূহ থাকবে।[৬] সারি সারি বালিশ সাজানো থাকবে এবং উৎকৃষ্ট বিছানা পাতা থাকবে।

১. এর অর্থ হচ্ছে কিয়ামত। অর্থাৎ যে বিপদটা সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এ প্রসংগে একটি কথা অবশ্যি সামনে রাখতে হবে। এখানে সামগ্রিকভাবে আখেরাতের কথা বলা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়ার সূচনা থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষের আবার জীবিত হয়ে ওঠা এবং আল্লাহর দরবারে শাস্তি ও পুরস্কার লাভ করা পর্যন্ত সমগ্র পর্যায়টি এর অন্তরভুক্ত হবে।

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٧ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝١٨ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝١٩ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝٢٠ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۝٢١ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۝٢٣ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝٢٤ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝٢٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ۝٢٦

(এরা মানছে না) তাহলে কি এরা উটগুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ দেখছে না, কিভাবে তাকে উঠানো হয়েছে? পাহাড়গুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে শক্তভাবে বসানো হয়েছে? আর যমীনকে দেখছে না, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে?[৭]

বেশ (হে নবী!) তাহলে তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকো। তুমি তো শুধুমাত্র একজন উপদেশক, এদের ওপর বল প্রয়োগকারী নও।[৮] তবে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাকে মহাশাস্তি দান করবেন। অবশ্যি এদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তারপর এদের হিসেব নেয়া হবে আমারই দায়িত্ব।

২. চেহারা শব্দটি এখানে ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের শরীরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সবচেয়ে সুস্পষ্ট অংশ হচ্ছে তার চেহারা। এর মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের পরিচিতি ফুটে ওঠে। মানুষ ভালো–মন্দ যে অবস্থারই সম্মুখীন হয়, তার প্রকাশ ঘটে তার চেহারায়। তাই "কিছু লোক" না বলে "কিছু চেহারা" বলা হয়েছে।

৩. কুরআন মজীদে কোথাও বলা হয়েছে, জাহান্নামের অধিবাসীদের খাবার জন্য "যাক্‌কুম" দেয়া হবে। কোথাও বলা হয়েছে, "গিসলীন" (ক্ষতস্থান থেকে ঝরে পড়া তরল পদার্থ) ছাড়া তাদের আর কোন খাবার থাকবে না। আর এখানে বলা হচ্ছে, তারা খাবার জন্য কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে মূলত কোন বৈপরীত্য নেই। এর অর্থ এও হতে পারে যে, জাহান্নামের অনেকগুলো পর্যায় থাকবে। বিভিন্ন অপরাধীকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী সেই সব পর্যায়ে রাখা হবে। তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আযাব দেয়া হবে। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা "যাক্‌কুম" খেতে না চাইলে "গিসলীন" পাবে এবং তা খেতে অস্বীকার করলে কাঁটাওয়ালা ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। মোটকথা, তারা কোন মনের মতো খাবার পাবে না।

৪. অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা যেসব প্রচেষ্টা চালিয়ে ও কাজ করে এসেছে আখেরাতে তার চমৎকার ফল দেখে তারা আনন্দিত হবে। তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে যে, দুনিয়ায় ঈমান, সততা ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও কামনা–বাসনার যে কুরবানী দিয়েছে, দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে যে কষ্ট স্বীকার করেছে, আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে গিয়ে যেসব জুলুম নিপীড়নের শিকার হয়েছে, গোনাহ থেকে বাঁচতে গিয়ে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং যেসব স্বার্থ ও স্বাদ আস্বাদন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছে তা সবই আসলে বড়ই লাভজনক কারবার ছিল।

৫. এটিকেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে জান্নাতের নিয়ামতের মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মারয়াম ৩৮ টীকা, আত্‌তুর ১৮ টীকা, আল ওয়াক্বিয়াহ ১৩ টীকা এবং আন নিসা ২১ টীকা)

৬. তাদের সামনে সবসময় পানপাত্র ভরা থাকবে। চেয়ে বা ডাক দিয়ে আনিয়ে নেবার প্রয়োজন হবে না।

৭. অর্থাৎ আখেরাতের কথা শুনে এরা যদি বলে, এসব কিছু কেমন করে হতে পারে, তাহলে নিজেদের চারপাশের জগতের প্রতি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে এরা কি কখনো চিন্তা করেনি, এই উট কেমন করে সৃষ্টি হলো? আকাশ কেমন করে বুলন্দ হলো? পাহাড় কেমন করে প্রতিষ্ঠিত হলো? এই পৃথিবী কেমন করে বিস্তৃত হলো? এসব জিনিস যদি তৈরি হতে পারে এবং তৈরি হয়ে এদের সামনে বর্তমান থাকতে পারে, তাহলে কিয়ামত কেন আসতে পারবে না? আখেরাতে আর একটা নতুন জগত তৈরি হতে পারবে না কেন? জান্নাত ও জাহান্নাম হতে পারবে না কেন? দুনিয়ায় চোখ মেলেই যেসব জিনিস দেখা যায় সেগুলো সম্পর্কে যে ব্যক্তি মনে করে যে, সেগুলোর অস্তিত্ব লাভ তো সম্ভবপর। কারণ সেগুলো অস্তিত্ব লাভ করেছে কিন্তু যেসব জিনিস এখনো তার দৃষ্টিতে পড়েনি এবং সেগুলো সম্পর্কে এখনো সে কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি, সেগুলো সম্পর্কে যদি সে এক কথায় বলে দেয় যে, সেগুলোর অস্তিত্ব লাভ সম্ভব নয়, তাহলে তাকে বুদ্ধি–বিবেকহীন ও চিন্তাশক্তি বিবর্জিত ব্যক্তিই মনে করা হবে। তার মস্তিষ্কে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে তাহলে তার অবশ্যি চিন্তা করা উচিত যে, যা কিছু বর্তমান আছে এবং অস্তিত্ব লাভ করেছে সেগুলোইবা কেমন করে অস্তিত্ব লাভ করলো? আরবের মরু এলাকার অধিবাসীদের জন্য যে ধরনের বৈশিষ্ট ও গুণাবলীসম্পন্ন প্রাণীর প্রয়োজন এই উটগুলো কেমন করে সেসব বৈশিষ্ট ও গুণাবলী সম্পন্ন হলো? এই আকাশ কেমন করে তৈরি হলো, যার শূন্য পেট শ্বাস নেবার জন্য বাতাসে ভরা? যার মেঘমালা বৃষ্টিবহন করে আনে? যার সূর্য দিনে আলো ও তাপ দেয়? যার চাঁদ ও তারা রাতের আকাশে আলো ছড়ায়? পৃথিবীর এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, যেখানে মানুষ বসবাস করে, যেখানে উৎপাদিত শস্য ও ফলমূল তার খাদ্য প্রয়োজন পূর্ণ করে, যার নদী ও কূপের পানির ওপর তার জীবন নির্ভরশীল তাকে কিভাবে বিছানার মতো ছড়িয়ে দেয়া হলো? রং বে–রঙের মাটি ও পাথর এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ নিয়ে এ পাহাড়গুলো পৃথিবীর বুকে কিভাবে গজিয়ে উঠেছে? এসব কিছুই কি একজন মহাশক্তিশালী ও বিজ্ঞ স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল ছাড়া এমনিই তৈরি হয়ে গেছে? কোন চিন্তাশীল বিবেকবান ব্যক্তি এই প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দিতে পারেন না। তিনি যদি জেদী ও হঠধর্মী না হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে অবশ্যি

মানতে হবে, কোন মহাশক্তিধর ও মহাবিজ্ঞ সত্তা এগুলোকে সম্ভবপর না করলে এগুলোর প্রত্যেকটি অসম্ভব ছিল। আর একজন সর্বশক্তিমানের শক্তির জোরে যদি দুনিয়ার এসব জিনিস তৈরি হওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে যে জিনিসগুলোর অস্তিত্ব লাভের খবর দেয়া হচ্ছে সেগুলোকে অসম্ভব মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

৮. অর্থাৎ ন্যায়সংগত যুক্তি মানতে যদি কোন ব্যক্তি প্রস্তুত না হয়, তাহলে মানা না মানা তার ইচ্ছা। তবে তোমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়নি যে, যে ব্যক্তি মানতে প্রস্তুত নয় তাকে জবরদস্তি মানাতে হবে। তোমার কাজও কেবল এতটুকু ঃ লোকদেরকে ভুল ও সঠিক এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য জানিয়ে দাও। তাদেরকে ভুল পথে চলার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করো। কাজেই এ দায়িত্ব তুমি পালন করে যেতে থাকো।

আল ফজর্

৮৯

নামকরণ

প্রথম শব্দ وَالْفَجْرِ কে এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এই সূরার বিষয়বস্তু থেকে জানা যায়, এটি এমন এক যুগে নাযিল হয় যখন মক্কা মুয়ায্‌যমায় ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর ব্যাপকভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চলছিল। তাই মক্কাবাসীদেরকে আদ, সামূদ ও ফেরাউনের পরিণাম দেখিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের সত্যতা প্রমাণ করা। কারণ মক্কাবাসীরা একথা অস্বীকার করে আসছিল। এ উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক পর্যায়ে যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে সে ধারাবাহিকতা সহকারে এ বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে।

প্রথমে ফজর, দশটি রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের কসম খেয়ে শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যে বিষয়টি তোমরা অস্বীকার করছো তার সত্যতার সাক্ষ দেবার জন্য কি এই জিনিসগুলো যথেষ্ট নয়? সামনের দিকে টীকায় আমি এ চারটি জিনিসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা থেকে জানা যাবে যে, দিনরাত্রির ব্যবস্থায় যে নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায় এগুলো তারই নির্দশন। এগুলোর কসম খেয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করার পরও যে আল্লাহ এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি আখেরাত কায়েম করার ক্ষমতা রাখেন এবং মানুষের কাছ থেকে তার কার্যাবলীর হিসেব নেয়া তাঁর এ বিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য দাবী, একথার সাক্ষ প্রমাণ পেশ করার জন্য কি আর কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকে?

এরপর মানব জাতির ইতিহাস থেকে প্রমাণ পেশ করে উদাহরণ স্বরূপ আদ ও সামূদ জাতি এবং ফেরাউনের পরিণাম পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন তারা সীমা পেরিয়ে গেছে এবং পৃথিবীতে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তখন আল্লাহর আযাব তাদেরকে গ্রাস করেছে। একথা প্রমাণ করে যে, কোন অন্ধ–বধির শক্তি এই বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছে না এবং এ দুনিয়াটা কোন অথর্ব রাজার মগের মুল্লুকও নয়। বরং একজন মহাবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী শাসক এ বিশ্ব–জাহানের ওপর কর্তৃত্ব করছেন। তিনি বুদ্ধি–জ্ঞান ও নৈতিক অনুভূতি দান করে যেসব সৃষ্টিকে এ দুনিয়ায় স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়েছেন তাদের কাজের হিসেব–নিকেশ করা এবং তাদেরকে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া তাঁর জ্ঞানবত্তা ও ন্যায়পরায়ণতার অনিবার্য দাবী। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা এর অবিচ্ছিন্ন প্রকাশ দেখি।

তারপর মানব সমাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আরব জাহেলিয়াতের অবস্থা সে সময় সবার সামনে বাস্তবে সুস্পষ্ট ছিল। বিশেষ করে তার দু'টি দিকের সমালোচনা করা হয়েছে। এক, সাধারণ মানুষের বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগী। যার ফলে তারা নৈতিক ভালো-মন্দের দিকটাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র পার্থিব ধন-দওলাত, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জন বা এর অভাবকে সম্মান লাভ ও সম্মানহানির মানদণ্ড গণ্য করেছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল, সম্পদশালিতা কোন পুরস্কার নয় এবং আর্থিক অভাব অনটন কোন শাস্তি নয় বরং এ দুই অবস্থাতেই মহান আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নিচ্ছেন। সম্পদ লাভ করে মানুষ কি দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করে এবং আর্থিক অনটন ক্লিষ্ট হয়ে সে কোন পথে চলে—এটা দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য। দুই, লোকদের সাধারণ কর্মনীতি। পিতার মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের সমাজে এতিম ছেলেমেয়েরা চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। গরীবদের খবর নেবার এবং তাদের পক্ষে কথা বলার একটি লোকও পাওয়া যায় না। যার ক্ষমতা থাকে সে মৃতের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে বসে। দুর্বল হকদারদের খেদিয়ে দেয়া হয়। অর্থ ও সম্পদের লোভ একটি দুর্নিবার ক্ষুধার মতো মানুষকে তাড়া করে ফেরে। যত বেশী পায় তবুও তার পেট ভরে না। দুনিয়ার জীবনে যেসব লোক এ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করে তাদের কাজের হিসেব নেয়া যে ন্যায়সংগত, লোকদের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করাই হচ্ছে এ সমালোচনার উদ্দেশ্য।

সবশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, সমালোচনা ও হিসেব-নিকেশ অবশ্যি হবে। আর সেদিন এই হিসেব-নিকেশ হবে যেদিন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে। শাস্তি ও পুরস্কার অস্বীকারকারীদেরকে হাজার বুঝালেও আজ তারা যে কথা মেনে নিতে পারছে না। সেদিন তা তাদের বোধগম্য হবে। কিন্তু তখন বুঝতে পারায় কোন লাভ হবে না। অস্বীকারকারী সেদিন আফসোস করে বলবে ঃ হায়, আজকের দিনের জন্য যদি আমি দুনিয়ায় কিছু সরঞ্জাম তৈরি করতাম। কিন্তু এই লজ্জা ও দুঃখ তাকে আল্লাহর আযাবের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে যেসব লোক আসমানী কিতাব ও আল্লাহর নবীগণের পেশকৃত সত্য পূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততা সহকারে মেনে নিয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তারাও আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিদান পেয়ে সন্তুষ্ট হবে। তাদেরকে আহবান জানানো হবে, তোমরা নিজেদের রবের প্রিয় বান্দাদের অন্তরভুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।

وَالْفَجْرِ ① وَلَيَالٍ عَشْرٍ ① وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ① وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ① هَلْ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ①

ফজরের কসম, দশটি রাতের, জোড় ও বেজোড়ের এবং রাতের কসম যখন তা বিদায় নিতে থাকে। এর মধ্যে কোন বুদ্ধিমানের জন্য কি কোন কসম আছে?[১]

১. এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। এমন কি জোড় ও বেজোড় সম্পর্কে ছত্রিশটি বক্তব্য পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় এগুলোর ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও সম্পর্কিত করা হয়েছে। কিন্তু আসলে রসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোন ব্যাখ্যা প্রমাণিত নেই। নয়তো তাঁর ব্যাখ্যার পর সাহাবা, তাবেঈ ও পরবর্তী তাফসীরকারদের মধ্য থেকে কোন একজনও এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা নির্ধারণ করার সাহস করতেন না।

বর্ণনাভংগি সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, প্রথম থেকে কোন আলোচনা চলছিল। সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কথা পেশ করছিলেন এবং অস্বীকারকারীরা তা অস্বীকার করছিল। এ প্রসংগে রসূলের কথার সত্যতা প্রমাণ করে বলা হয়েছে, ওমুক ওমুক জিনিসের কসম। এর অর্থ ছিল, এই জিনিসগুলোর কসম, যা কিছু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন সব সত্য। তারপর এ প্রশ্নের ভিত্তিতে এ বক্তব্য পেশ করা হয়েছে যে, কোন বুদ্ধিমান লোকের জন্য কি এর মধ্যে কোন কসম আছে? অর্থাৎ এই সত্য কথাটির পক্ষে সাক্ষ দেবার জন্য এরপর কি আর কোন কসমের প্রয়োজন আছে? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথা বলছেন তা জেনে নেবার জন্য কি একজন বুদ্ধি-বিবেকমান ব্যক্তির জন্য এই কসমই যথেষ্ট নয়?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে প্রসংগে এই চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা কি ছিল? এ জন্য আমাদের পরবর্তী আয়াতগুলোতে "তুমি কি দেখনি তোমার রব তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছিলেন" থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত সমগ্র আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এ থেকে জানা যায়, আলোচনা চলছিল শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে। মক্কাবাসীরা একথা অস্বীকার করছিল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে এর স্বীকৃতি আদায় করার জন্য অনবরত তাদেরকে দাওয়াত ও উপদেশ দিয়ে চলছিলেন। এ জন্য ফজর, দশটি রাত, জোড়-বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের কসম

খেয়ে বলা হয়েছে, এই বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য এই চারটি জিনিস যথেষ্ট নয় কি? এ জন্য কোন বুদ্ধি–বিবেকবান ব্যক্তির সামনে কি আর কোন জিনিস পেশ করার প্রয়োজন আছে?

এই কসমগুলোর এই পরিবেশ–পরিস্থিতি নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী আলোচনা এগুলোর যে অর্থ নির্দেশ করে আমাদের অপরিহার্যভাবে সেই অর্থই গ্রহণ করতে হবে। প্রথমে বলা হয়েছে "ফজরের কসম"। ফজর বলা হয় প্রভাত হয়ে যাওয়াকে। অর্থাৎ যখন রাতের অন্ধকার ভেদ করে দিনের প্রথম আলোক রশ্মি পূর্বদিগন্তে একটি সাদা রেখার মতো আত্মপ্রকাশ করে। তারপর বলা হয়েছে "দশটি রাতের কসম।" ধারাবাহিক বর্ণনাগুলো সামনে রাখলে জানা যায়, এর অর্থ হচ্ছে মাসের তিরিশটি রাতের প্রত্যেক দশটি রাত। প্রথম দশটি রাতের চাঁদ সরু কাস্তের আকারে শুরু হয়ে প্রতি রাতে বাড়তে থাকে। এভাবে তার অর্ধেকেরও বেশী এলাকা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দশটি রাতে চাঁদের আলোয় রাতের বৃহত্তম অংশ আলোকিত থাকে। শেষ দশটি রাতে চাঁদ আস্তে আস্তে একেবারে ছোট হয়ে যেতে থাকে এবং রাতের বেশীর ভাগ অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। এমনকি মাসের শেষ রাতটি হয় পুরোপুরি অন্ধকার। এরপর বলা হয়েছে, "জোড় ও বেজোড়ের কসম।" জোড় বলা হয় এমন সংখ্যাকে যাকে দু'টি সমান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ২, ৪, ৬, ৮, ১০। অন্যদিকে বেজোড় বলা হয় এমন সংখ্যাকে যাকে সমান দু'ভাগে ভাগ করা যায় না। যেমন ১, ৩, ৫, ৭, ৯। সাধারণভাবে দেখলে এর অর্থ হতে পারে বিশ্ব–জাহানের সমস্ত জিনিস। কারণ প্রতিটি জিনিস হয় জোড়, নয় বেজোড়। কিন্তু যেহেতু এখানে দিন ও রাতের কথা আলোচনা হচ্ছে তাই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এখানে জোড় ও বেজোড় মানে হচ্ছে, দিন–রাত্রির পরিবর্তন। অর্থাৎ মাসের তারিখ এক থেকে দুই এবং দুই থেকে তিন হয়ে যায়। আর প্রত্যেকটি পরিবর্তন একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে। সবশেষে বলা হয়েছে, "রাতের কসম যখন তা বিদায় নিতে থাকে।" অর্থাৎ সূর্য ডোবার পর থেকে পৃথিবীর বুকে যে অন্ধকার ছেয়ে ছিল তার অবসান ঘটেছে এবং আলোকময় উষার উদয় হতে যাচ্ছে।

এখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাস্তি ও পুরস্কারের যে খবর দিচ্ছিলেন তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যে চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তাদের ওপর একবার সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করুন। এসব জিনিস এই সত্যটি প্রমাণ করছে যে, একজন মহাশক্তিশালী স্রষ্টা এই বিশ্ব–জাহানের ওপর রাজত্ব করছেন। তিনি যে কাজটিই করছেন, তা উদ্দেশ্যহীন, লক্ষহীন, অর্থহীন নয় এবং তার পেছনে কোন বিজ্ঞতাপূর্ণ পরিকল্পনা নেই একথা বলা যাবে না। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা সক্রিয় রয়েছে। তাঁর পৃথিবীতে কখনো এমন দেখা যাবে না যে, এখনই রাত আবার এখনই হঠাৎ সূর্য একেবারে মাথার ওপর উঠেছে। অথবা একদিন চাঁদ উঠলো কাস্তের মতো সরু হয়ে এবং তারপর দিন একেবারে গোল থালার মতো পূর্ণচন্দ্র আকাশে শোভা পেতে লাগলো। অথবা রাত এলো কিন্তু তা আর শেষই হচ্ছে না, স্থায়ীভাবে ঠায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। অথবা আদতে দিন রাত্রির পরিবর্তনের কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই নেই। যার ফলে তারিখের হিসাব রাখা যায় না। আজ কোন্ মাসের কয় তারিখ, কোন তারিখে কোন্ কাজটি শুরু করা হয়েছিল এবং কবে খতম হবে,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

তুমি[২] কি দেখনি তোমার রব সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী আদে-ইরামের[৩] সাথে কি আচরণ করেছেন, যাদের মতো কোন জাতি দুনিয়ার কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি?[৪] আর সামূদের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল?[৫] আর কীলকধারী ফেরাউনের[৬] সাথে? এরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বড়ই সীমালংঘন করেছিল এবং সেখানে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। অবশেষে তোমার রব তাদের ওপর আযাবের কশাঘাত করলেন। আসলে তোমার রব ওঁৎ পেতে আছেন।[৭]

গ্রীষ্মকাল কবে থেকে শুরু হচ্ছে এবং বর্ষাকাল ও শীতকাল কবে আসবে—এসব জানা সম্ভব হয় না। বিশ্ব-জাহানের অন্যান্য অসংখ্য জিনিস বাদ দিয়ে মানুষ যদি শুধুমাত্র দিন রাত্রির এই যথা নিয়মে যাওয়া আসার বিষয়টি মনোযোগ সহকারে দেখে এবং এ ব্যাপারটি নিয়ে একটু মাথা ঘামায়, তাহলে এক সর্বশক্তিমান সত্তা যে এই বিরাট নিয়ম-শৃংখলা ও আইনের রাজত্ব কায়েম করেছেন এবং এই নিয়ম-শৃংখলার সাথে এখানে সৃষ্টজীবের অসংখ্য স্বার্থ ও কর্মপ্রবাহ জড়িত তার সাক্ষ-প্রমাণ সে এর মধ্যেই পেয়ে যাবে। এখন এই ধরনের জ্ঞানবান ও বিজ্ঞানময় এবং মহাশক্তিধর স্রষ্টার আখেরাতে শাস্তি ও পুরস্কার দেবার বিষয়টি যদি দুনিয়ার কোন মানুষ অস্বীকার করে তাহলে সে দু'টি নির্বুদ্ধিতার মধ্য থেকে কোন একটিতে অবশ্যি লিপ্ত। হয় সে তাঁর ক্ষমতা অস্বীকার করে এবং মনে করে তিনি এই অকল্পনীয় নিয়ম-শৃংখলা সহকারে এই বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করে তাকে শাস্তি ও পুরস্কার দান করার ক্ষমতা তাঁর নেই অথবা সে তাঁর জ্ঞানবত্তা ও বিজ্ঞানময়তা অস্বীকার করে এবং তাঁর সম্পর্কে একথা মনে করে নিয়েছে যে, তিনি মানুষকে দুনিয়ায় বুদ্ধি-বিবেক ও ক্ষমতা-ইখতিয়ার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি কখনো তার কাছ থেকে এই বুদ্ধি-বিবেক ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে সে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে তার হিসেব নেবেন না। আর তিনি ভালো কাজের পুরস্কার দেবেন না এবং খারাপ কাজের শাস্তিও দেবেন না। এই দু'টি কথার কোন একটিকেও যে ব্যক্তি মেনে নেবে সে একজন প্রথম শ্রেণীর নির্বোধ।

২. দিন-রাত্রির আবর্তন ব্যবস্থা থেকে শাস্তি ও পুরস্কার বিধানের প্রমাণ পেশ করার পর এখন তার নিশ্চিত সত্য হবার ব্যাপারে মানুষের ইতিহাস থেকে প্রমাণ পেশ করা

হচ্ছে। ইতিহাসের কয়েকটি পরিচিত জাতির কর্মপদ্ধতি ও তাদের পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে একথা বলার উদ্দেশ্যে যে, এই বিশ্ব-জাহান কোন অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে না। বরং এক বিজ্ঞানময় আল্লাহ এই সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। আর এই আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যে তোমরা যাকে প্রাকৃতিক আইন মনে করো কেবলমাত্র সেই আইনটিই সক্রিয় নেই বরং এই সাথে একটি নৈতিক আইনও এখানে সক্রিয় রয়েছে, যার অনিবার্য দাবী হচ্ছে, কাজের প্রতিফল এবং শাস্তি ও পুরস্কার দান। এই আইন যে সক্রিয় রয়েছে তার চিহ্ন এই দুনিয়াতেই বার বার প্রকাশ হতে থেকেছে এবং তা থেকে বুদ্ধি-বিবেকবান মানুষ বিশ্ব-জাহানের শাসন কর্তৃত্বের প্রকৃতি ও স্বভাব সুস্পষ্টভাবে জানতে পেরেছে। এখানে যেসব জাতি আখেরাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এবং আল্লাহর শাস্তি ও পুরস্কারের ভয় না করেই নিজেদের জীবনের ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে তারা পরিণামে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী রূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে। আর যে জাতিই এ পথে চলেছে বিশ্ব-জাহানের রব তার ওপর শেষ পর্যন্ত আযাবের চাবুক বর্ষণ করেছেন। মানুষের ইতিহাসের এই ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা দু'টি কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে ঃ এক, আখেরাত অস্বীকার করার কারণে প্রত্যেক জাতি বিপথে পরিচালিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা তাকে ধ্বংসের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। কাজেই আখেরাত একটি যথার্থ সত্য। প্রত্যেক সত্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার যে ভয়াবহ পরিণতি হয় এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ফলও তাই হয়। দুই, কর্মফল কোন এক সময় পূর্ণ মাত্রায়ও দেয়া হবে। কারণ বিপর্যয় ও বিকৃতির শেষ পর্যায়ে এসে আযাবের চাবুক যাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে তাদের পূর্বে শত শত বছর পর্যন্ত বহু লোক এই বিপর্যয়ের বীজ বপন করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল এবং তাদের ওপর কোন আযাব আসেনি। আল্লাহর ইনসাফের দাবী এই যে, কোন এক সময় তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক এবং তারা কৃতকর্মের ফল ভোগ করুক। (কুরআন মজীদে আখেরাতের ব্যাপারে এই ঐতিহাসিক ও নৈতিক যুক্তির বিশ্লেষণ বিভিন্ন জায়গায় করা হয়েছে এবং সবজায়গায় আমি এর ব্যাখ্যা করেছি। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত জায়গাগুলো দেখুন ঃ তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফ ৫-৬ টীকা, ইউনুস ১২, হূদ ৫৭, ১০৫, ১১৫ টীকা, ইবরাহীম ৯ টীকা, আন নহল ৬৬ ও ৮৬ টীকা, আররূম ৮ টীকা, সাবা ২৫ টীকা, সাদ ২৯ ও ৩০ টীকা, আল মু'মিন ৮০ টীকা, আদ দুখান ৩৩ ও ৩৪ টীকা; আল জাসিয়াহ-২৭ ও ২৮ টীকা, কাফ ১৭ টীকা এবং আয যারিয়াত ২১ টীকা।)

৩. 'আদে ইরাম' বলতে আদ জাতির সেই প্রাচীন ধারাটির কথা বুঝানো হয়েছে যাকে কুরআন মজীদ ও আরবের ইতিহাসে 'আদে উলা' (প্রথম) বলা হয়েছে। সূরা আন নাজ্‌মে বলা হয়েছে ঃ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ "আর তিনি প্রাচীন আদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন।" (৫০ আয়াত) অর্থাৎ সেই আদ জাতিকে যাদের কাছে হযরত হূদ আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছিল এবং যাদের ওপর আযাব নাযিল হয়েছিল। অন্যদিকে এই জাতির যেসব লোক আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার পর নিজেদের জাতি সত্তার সমৃদ্ধি সাধন করেছিল, আরবের ইতিহাসে তাদেরকে 'আদে উখ্‌রা' (দ্বিতীয় আদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাচীন আদ জাতিকে 'আদে ইরাম' বলার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা সিরিয় বংশজাত আদদের সেই বংশধারার সাথে সম্পর্কিত যাদের উদ্ভব হয়েছিল নূহ আলাইহিস সালামের নাতি ও সামের ছেলে ইরাম থেকে। ইতিহাসে আদদের এই শাখার আরো

কয়েকটি উপশাখা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। সামূদ এদের অন্যতম। কুরআনে এই জাতিটির উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আরামিয়ান (Arameana) জাতি। এরা প্রথমে সিরিয়ার উত্তর এলাকায় বসবাস করতো। এদের ভাষা আরামী (Aramic)। সিরিয়ার ভাষাগুলোর মধ্যে এই ভাষাটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

আদের জন্য 'যাতুল ইমাদ' (সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তারা বড় বড় উঁচু উঁচু ইমারত তৈরি করতো। দুনিয়ায় তারাই সর্বপ্রথম উঁচু উঁচু স্তম্ভের ওপর ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় তাদের এই বৈশিষ্টকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ হযরত হূদ (আ) তাদেরকে বলেন,

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۝ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۝

"তোমাদের এ কেমন অবস্থা, প্রত্যেক উঁচু জায়গায় অনর্থক একটি স্মৃতিগৃহ তৈরি করছো এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন তোমরা চিরকাল এখানে থাকবে।" (আশ শু'আরা, ১২৮-১২৯)

৪. অর্থাৎ তারা সমকালীন জাতিদের মধ্যে ছিল একটি তুলনাবিহীন জাতি। শক্তি শৌর্য-বীর্য, গৌরব ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে সে যুগে সারা দুনিয়ায় কোন জাতি তাদের সমকক্ষ ছিল না। কুরআনের অন্যান্য স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً। "দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তোমাদের অবয়বকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছেন। (আল আরাফ, ৬৯)

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً -

"আর তাদের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, তারা কোন অধিকার ছাড়াই পৃথিবীর বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করেছে। তারা বলেছে ঃ কে আছে আমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী?" (হা-মীম আস্ সাজদাহ, ১৫)

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ "আর তোমরা যখন কারোর ওপর হাত উঠিয়েছো প্রবল পরাক্রান্ত হয়েই উঠিয়েছো।" (আশ শু'আরা, ১৩০)

৫. উপত্যকা বলতে 'আলকুরা' উপত্যকা বুঝানো হয়েছে। সামূদ জাতির লোকেরা সেখানে পাথর কেটে কেটে তার মধ্যে গৃহ নির্মাণ করেছিল। সম্ভবত ইতিহাসে তারাই প্রথম জাতি হিসেবে চিহ্নিত যারা পাহাড়ের মধ্যে এভাবে ইমারত নির্মাণের রীতি প্রচলন করেছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আরাফ ৫৭-৫৯ টীকা, আল হিজর ৪৫ টীকা এবং আশ্ শু'আরা ৯৫-৯৯ টীকা)

৬. ফেরাউনের জন্য 'যুল আউতাদ' (কীলকধারী) শব্দ এর আগে সূরা সাদের ১২ আয়াতেও ব্যবহার করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তার সেনাবাহিনীকে কীলকের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সেই অর্থে কীলকধারী মানে সেনাবাহিনীর

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

কিন্তু[৮] মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নিয়ামত দান করেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তার রিযিক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন।[৯]

অধিকারী। কারণ তাদেরই বদৌলতে তার রাজত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন কীলকের সাহায্যে তাঁবু মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর অর্থ সেনা দলের সংখ্যাধিক্যও হতে পারে। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, তার সেনাদল যেখানে গিয়ে তাঁবু গাঁড়তো সেখানেই চারদিকে শুধু তাঁবুর কীলকই পোঁতা দেখা যেতো। আবার এর অর্থ সেই কীলকও হতে পারে যা মানুষের শরীরে গেঁড়ে দিয়ে সে তাদেরকে শাস্তি দিতো। এও হতে পারে, মিসরের পিরামিডগুলোকে কীলকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ সেগুলো ফেরাউনদের পরাক্রম ও শান–শওকতের নিদর্শন হিসেবে হাজার হাজার বছর থেকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

৭. জালেম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখার জন্য ওঁৎ পেতে থাকা প্রবাদটির ব্যবহার করা হয়েছে রূপক হিসেবে। কোন ব্যক্তির কারো অপেক্ষায় কোন গোপন স্থানে এই উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসে থাকা যে, তার আয়ত্বের মধ্যে আসার সাথে সাথেই সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, একে বলা হয় ওঁৎপেতে থাকা। যার জন্য লুকিয়ে বসে থাকা হয় সে জানতে পারে না যে, তার ওপর আক্রমণ করার জন্য কেউ কোথাও লুকিয়ে বসে আছে। সে নিশ্চিন্তে চারদিক সম্পর্কে অসতর্ক হয়ে ঐ স্থান অতিক্রম করতে থাকে তখন অকস্মাৎ সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দুনিয়ায় যেসব জালেম বিপর্যয়ের তুফান সৃষ্টি করে থাকে আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের অবস্থাও অনুরূপ হবে। আল্লাহ যে একজন আছেন এবং তিনি তার সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ রাখছেন, এ অনুভূতিই তার থাকে না। সে একেবারে নির্ভয়ে দিনের পর দিন বেশী বেশী শয়তানী কাজ করে যেতে থাকে। তারপর একদিন যখন সে এক সীমান্তে পৌঁছে যায় যেখান থেকে আল্লাহ তাকে আর এগিয়ে যেতে দিতে চান না, তখন তার ওপর হঠাৎ আল্লাহর আযাবের চাবুক বর্ষিত হয়।

৮. এখন লোকদের সাধারণ নৈতিক অবস্থার সমালোচনা করে বলা হচ্ছে, যেসব লোক দুনিয়ার জীবনে এই দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলীর হিসেব কখনো না নেয়ার কি কারণ থাকতে পারে? দুনিয়ায় এসব কাজ–কারবার করে যখন মানুষ বিদায় নেবে তখন তার কাজের জন্য সে কোন শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে না একে বুদ্ধি ও নৈতিক বৃত্তির দাবী বলে কেমন করে মেনে নেয়া যেতে পারে।

৯. অর্থাৎ এটি হচ্ছে মানুষের বস্তুবাদী জীবন দর্শন। এই দুনিয়ার ধন–সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্বকেই সে সবকিছু মনে করে। এগুলো পেলে সে আনন্দে উল্লসিত হয় এবং বলে

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحُضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾
وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّا
اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ
الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ
عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾

কখনই নয়,[১০] বরং তোমরা এতিমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না[১১] এবং মিসকীনকে খাওয়াবার জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।[১২] তোমরা মীরাসের সব ধন-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলো[১৩] এবং ধন-সম্পদের প্রেমে তোমরা মারাত্মকভাবে বাঁধা পড়েছ।[১৪] কখনই নয়,[১৫] পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করে বালুকাময় করে দেয়া হবে এবং তোমার রব এমন অবস্থায় দেখা দেবেন।[১৬] যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেদিন জাহান্নামকে সামনে আনা হবে। সেদিন মানুষ বুঝবে কিন্তু তার বুঝতে পারায় কী লাভ?[১৭] সে বলবে, হায়, যদি আমি নিজের জীবনের জন্য কিছু আগাম ব্যবস্থা করতাম! সেদিন আল্লাহ যে শাস্তি দেবেন তেমন শাস্তি কেউ দিতে পারবে না। এবং আল্লাহ যেমন বাঁধবেন আর কেউ তেমন বাঁধতে পারবে না।

আল্লাহ্ আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। আবার না পেলে বলে, আল্লাহ আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব পাওয়া-নাপাওয়াই হচ্ছে তার কাছে মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটিই সে বোঝে না। আল্লাহ দুনিয়ায় যাকেই যা কিছুই দিয়েছেন পরীক্ষার জন্যই দিয়েছেন। ধন ও শক্তি দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। এগুলো পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অকৃতজ্ঞ হয়, তা তিনি দেখতে চান। দারিদ্র ও অভাব দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। ধৈর্য ও পরিতুষ্টি সহকারে মানুষ আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকে এবং বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে নিজের সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করে, না সততা, বিশ্বস্ততা ও নৈতিকতার সব বাঁধন ছিন্ন করে আল্লাহকেই গালমন্দ দিতে থাকে, তা আল্লাহ অবশ্যই দেখতে চান।

১০. অর্থাৎ এটি কখনই মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড নয়। তোমরা মস্তবড় ভুল করছো। একে সৎ চারিত্রিক মনোবৃত্তি ও অসৎ চারিত্রিক মনোবৃত্তির পরিবর্তে তোমরা মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছো।

১১. অর্থাৎ তার বাপ জীবিত থাকাকালে তার সাথে তোমরা এক ধরনের ব্যবহার করো। আর তার বাপ মারা যাবার সাথে সাথেই প্রতিবেশী ও দূরের আত্মীয়দের তো কথাই নেই, চাচা, মামা এমনকি বড় ভাই পর্যন্ত তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১২. অর্থাৎ তোমাদের সমাজে গরীবদের আহার করাবার কোন রেওয়াজই নেই। কোন ব্যক্তি নিজে অগ্রসর হয়ে কোন অভুক্তকে আহার করাবার উদ্যোগ নেয় না। অথবা ক্ষুধার্তদের ক্ষুধা নিবারণ করার কোন চিন্তাই তোমাদের মনে আসে না এবং এর ব্যবস্থা করার জন্য তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিতও করো না।

১৩. আরবে মেয়েদের ও শিশুদের এমনিতেই মীরাস থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। এ ব্যাপারে লোকেরা যে মত পোষণ করতো তা ছিল এই যে, মীরাস লাভ করার অধিকার একমাত্র এমন সব পুরুষের আছে যারা লড়াই করার ও পরিবারের লোকদের হেফাজত করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে। এছাড়াও মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হতো সে নিশ্চিন্তে সমস্ত মীরাস নিজের একার দখলে নিয়ে নিতো এবং যারা নিজেদের অংশ হাসিল করার ক্ষমতা রাখতো না তাদের সবারটা গ্রাস করে ফেলতো। অধিকার ও কর্তব্যের কোন গুরুত্বই তাদের কাছে ছিল না। অধিকারী নিজের অধিকার হাসিল করতে পারুক বা না পারুক ঈমানদারীর সাথে নিজের কর্তব্য মনে করে তাকে তার অধিকার প্রদান করার কথা তারা চিন্তাই করতো না।

১৪. অর্থাৎ বৈধ-অবৈধ ও হালাল-হারামের কোন পার্থক্যই তোমাদের কাছে নেই। যে কোন পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করতে তোমরা মোটেই ইতস্তত করো না। যত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদই তোমরা লাভ করো না কেন তোমাদের লোভের ক্ষুধা মেটে না।

১৫. অর্থাৎ তোমাদের চিন্তা ভুল। তোমরা দুনিয়ায় যত দিন জীবন যাপন করবে, এসব কিছুই করতে থাকবে এবং এজন্য তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না, একথা ঠিক নয়। যে শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি অস্বীকার করে তোমরা এই জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করেছো সেটি কোন অসম্ভব ও কাল্পনিক ব্যাপার নয়। বরং সে বিষয়টি অবশ্যি সংঘটিত হবে। সামনের দিকে সেটি কখন সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬. মূলে বলা হয়েছে جَآءَ رَبُّكَ এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে, "তোমার রব আসবেন।" তবে আল্লাহর জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই একে রূপক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। এর উদ্দেশ্য এমনি ধরনের একটি ধারণা দেয়া যে, সে সময় আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব, শাসন ও প্রতাপের নিদর্শনসমূহ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। দুনিয়ায় কোন বাদশাহর সমগ্র সেনাদল এবং তার মন্ত্রণাপরিষদ ও সভাসদদের আগমনে ঠিক ততটা প্রভাব ও প্রতাপ সৃষ্টি হয় না যতটা বাদশাহর নিজের দরবারে আগমনে সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টিই এখানে বুঝানো হয়েছে।

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِىٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ﴿٣٠﴾

(অন্যদিকে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা![১৮] চলো তোমার রবের দিকে,[১৯] এমন অবস্থায় যে তুমি (নিজের শুভ পরিণতিতে) সন্তুষ্ট (এবং তোমার রবের) প্রিয়পাত্র। শামিল হয়ে যাও আমার (নেক) বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।

১৭. মূলে বলা হয়েছে يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সেদিন মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তা স্মরণ করবে এবং সেজন্য লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন স্মরণ করায় এবং লজ্জিত হওয়ায় কোন লাভ হবে না। দুই, সেদিন মানুষ সচেতন হবে। সে উপদেশ গ্রহণ করবে। সে বুঝতে পারবে, নবীগণ তাকে যা কিছু বলেছিলেন তাই ছিল সঠিক এবং তাদের কথা না মেনে সে বোকামি করেছে। কিন্তু সে সময় সচেতন হওয়ায়, উপদেশ গ্রহণ করায় এবং নিজের ভুল বুঝতে পারায় কী লাভ?

১৮. 'প্রশান্ত আত্মা' বলে এমন মানুষকে বুঝানো হয়েছে যে, কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়াই পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে ঠাণ্ডা মাথায় এক ও লা–শরীক আল্লাহকে নিজের রব এবং নবীগণ যে সত্য দীন এনেছিলেন তাকে নিজের দীন ও জীবন বিধান হিসেবে গণ্য করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছ থেকে যে বিশ্বাস ও বিধানই পাওয়া গেছে তাকে সে পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আল্লাহর দীন যে জিনিসটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাকে সে অনিচ্ছা সত্ত্বে নয় বরং এই বিশ্বাস সহকারে বর্জন করেছে যে, সত্যিই তা খারাপ। সত্য–প্রীতির পথে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে নির্দ্বিধায় তা করেছে। এই পথে যেসব সংকট, সমস্যা, কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে হাসি মুখে সেগুলো বরদাশ্‌ত করেছে। অন্যায় পথে চলে লোকদের দুনিয়ায় নানান ধরনের স্বার্থ, ঐশ্বর্য ও সুখ–সম্ভার লাভ করার যেসব দৃশ্য সে দেখছে তা থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য তার নিজের মধ্যে কোন ক্ষোভ বা আক্ষেপ জাগেনি। বরং সত্য দীন অনুসরণ করার ফলে সে যে এই সমস্ত আবর্জনা থেকে মুক্ত থেকেছে, এজন্য সে নিজের মধ্যে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছে। কুরআনের অন্যত্র এই অবস্থাটিকে 'শারহে সদর' বা হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয়া অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। (আল আন'আম, ১২৫)

১৯. একথা তাকে মৃত্যুকালেও বলা হবে, যখন কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যেতে থাকবে সে সময়ও বলা হবে এবং আল্লাহর আদালতে পেশ করার সময়ও তাকে একথা বলা হবে। প্রতিটি পর্যায়ে তাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দান করা হবে যে, সে আল্লাহর রহমতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আল বালাদ

৯০

নামকরণ

প্রথম আয়াত لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ এর আল বালাদ শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী মক্কা মু'আযযমার প্রথম যুগের সূরাগুলোর মতোই। তবে এর মধ্যে একটি ইংগিত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায়, এই সূরাটি ঠিক এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিল এবং তাঁর ওপর সব রকমের জুলুম নিপীড়ন চালানো নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

একটি অনেক বড় বিষয়বস্তুকে এই সূরায় মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি পূর্ণ জীবন দর্শন, যা বর্ণনার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থের কলেবরও যথেষ্ট বিবেচিত হতো না তাকে এই ছোট্ট সূরাটিতে মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি কুরআনের অলৌকিক বর্ণনা ও প্রকাশ পদ্ধতির পূর্ণতার প্রমান। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা বুঝিয়ে দেয়া। মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উভয় পথই খুলে রেখেছেন, সেগুলো দেখার ও সেগুলোর ওপর দিয়ে চলার যাবতীয় উপকরণও তাদেরকে সরবরাহ করেছেন। এখন মানুষ সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে অথবা দুর্ভাগ্যের পথে চলে অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হবে, এটি তার নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে।

প্রথমে মক্কা শহরকে, এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব বিপদের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোকে এবং সমগ্র মানব জাতির অবস্থাকে এই সত্যটির সপক্ষে এই মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এই দুনিয়াটা মানুষের জন্য কোন আরাম আয়েশের জায়গা নয়। এখানে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আনন্দ উল্লাস করার জন্য তাকে পয়দা করা হয়নি। বরং এখানে কষ্টের মধ্যেই তার জন্ম হয়েছে। এই বিষয়বস্তুটিকে সূরা আন নাজমের لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (মানুষ যতটুকু প্রচেষ্টা চালাবে ততটুকুর ফলেরই সে অধিকারী হবে) আয়াতটির সাথে মিলিয়ে দেখলে একথা একেবারে

সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার এই কর্মচাঞ্চল্যে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার কর্মতৎপরতা, প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার ওপর।

এরপর মানুষই যে এখানে সবকিছু এবং তার ওপর এমন কোন উচ্চতর ক্ষমতা নেই যে তার কাজের তত্বাবধান করবে এবং তার কাজের যথাযথ হিসেব নেবে, তার এই ভুল ধারণা দূর করে দেয়া হয়েছে।

তারপর মানুষের বহুতর জাহেলী নৈতিক চিন্তাধারার মধ্য থেকে একটিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করে দুনিয়ায় সে অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের যেসব ভুল মানদণ্ডের প্রচলন করে রেখেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের বড়াই করার জন্য বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ব্যয় করে সে নিজেও নিজের এই বিপুল ব্যয় বহরের জন্য গর্ব করে এবং লোকেরা তাকে বাহবা দেয়। অথচ যে সর্বশক্তিমান সত্তা তার কাজের তত্বাবধান করছেন তিনি দেখতে চান, সে এই ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে এবং কোন্ মনোভাব সহকারে এসব ব্যয় করছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলছেন, আমি মানুষকে জ্ঞানের বিভিন্ন উপকরণ এবং চিন্তা ও উপলব্ধির যোগ্যতা দিয়ে তার সামনে ভালো ও মন্দ দু'টো পথই উন্মুক্ত করে দিয়েছি। একটি পথ মানুষকে নৈতিক অধপাতে নিয়ে যায়। এ পথে চলার জন্য কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। বরং তার প্রবৃত্তি সাধ মিটিয়ে দুনিয়ার সম্পদ উপভোগ করতে থাকে। দ্বিতীয় পথটি মানুষকে নৈতিক উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি দুর্গম গিরিপথের মতো। এ পথে চলতে গেলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তির ওপর জোর খাটাতে হয়। কিন্তু নিজের দুর্বলতার কারণে মানুষ এই গিরিপথে ওঠার পরিবর্তে গভীর খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়াই বেশী পছন্দ করে।

তারপর যে গিরিপথ অতিক্রম করে মানুষ ওপরের দিকে যেতে পারে সেটি কি তা আল্লাহ বলেছেন। তা হচ্ছে ঃ গর্ব ও অহংকার মূলক এবং লোক দেখানো ও প্রদর্শনী মূলক ব্যয়ের পথ পরিত্যাগ করে নিজের ধন-সম্পদ এতিম ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর প্রতি ও তাঁর দীনের প্রতি ঈমান আনতে হবে আর ঈমানদারদের দলের অন্তরভুক্ত হয়ে এমন একটি সমাজ গঠনে অংশ গ্রহণ করতে হবে, যা ধৈর্য সহকারে সত্যপ্রীতির দাবী পূরণ এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে। এই পথে যারা চলে তারা পরিণামে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়। বিপরীত পক্ষে অন্যপথ অবলম্বনকারীরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। সেখান থেকে তাদের বের হবার সমস্ত পথই থাকবে বন্ধ।

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝

না,[১] আমি কসম খাচ্ছি এই নগরের।[২] আর অবস্থা হচ্ছে এই যে (হে নবী!) তোমাকে এই নগরে হালাল করে নেয়া হয়েছে।[৩] কসম খাচ্ছি বাপের এবং তার ঔরসে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার।[৪] আসলে আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।[৫] সে কি মনে করে রেখেছে, তার ওপর কেউ জোর খাটাতে পারবে না?[৬]

১. ইতিপূর্বে সূরা কিয়ামাহর ১ টীকায় "না" বলে বক্তব্য শুরু করে তারপর কসম খেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছি। সেখানে আমি বলেছি, এভাবে বক্তব্য শুরু করার মানে হয়, লোকেরা কোন ভুল কথা বলছিল, তার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, আসল কথা তা নয় যা তোমরা মনে করছো বরং আমি অমুক অমুক জিনিসের কসম খেয়ে বলছি আসল ব্যাপার হচ্ছে এই। এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, যে কথার প্রতিবাদে এই ভাষণটি নাযিল হয়েছে সেটি কি ছিল? এর জবাবে বলা যায়, পরবর্তী আলোচ্য বিষয়টি একথা প্রকাশ করছে। মক্কার কাফেররা বলছিল, আমরা যে ধরনের জীবনধারা অবলম্বন করেছি তাতে কোন দোষ নেই, কোন গলদ নেই। খাও-দাও ফূর্তি করো, তারপর একদিন সময় এলে টুপ করে মরে যাও, ব্যাস্, এই তো দুনিয়ার জীবন! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খামখা আমাদের এই জীবনধারাকে ত্রুটিপূর্ণ গণ্য করছেন এবং আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন, এসব ব্যাপারে আবার নাকি আমাদের একদিন জবাবদিহি করতে হবে এবং নিজেদের কাজের জন্য আমাদের শাস্তি ও পুরস্কার লাভ করতে হবে।

২. অর্থাৎ মক্কা নগরের। এখানে এই নগরের কসম কেন খাওয়া হচ্ছে সে কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। মক্কাবাসীরা নিজেরাই তাদের নগরের পটভূমি জানতো। তারা জানতো, কিভাবে পানি ও বৃক্ষলতাহীন একটি ধূসর উপত্যকায় নির্জন পাহাড়ের

মাঝখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজের এক স্ত্রী ও একটি দুধের বাচ্চাকে এখানে এনে নিঃসংগভাবে ছেড়ে গিয়েছিলেন। কিভাবে এখানে একটি ঘর তৈরি করে হজ্জের ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ বহু দূর–দূরান্তে এই ঘোষণা শোনারও কেউ ছিল না। তারপর কিভাবে একদিন এই নগরটি সমগ্র আরবের কেন্দ্রে পরিণত হলো এবং এমন একটি 'হারম'–সম্মানিত স্থান হিসেবে গণ্য হলো, যা শত শত বছর পর্যন্ত আরবের সরজমিনে, যেখানে আইন শৃংখলার কোন অস্তিত্বই ছিল না সেখানে এই নগরটি ছাড়া আর কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো না।

৩. মূলে বলা হয়েছে اَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ । মুফাস্সিরগণ এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক, তুমি এই শহরে 'মুকীম' অর্থাৎ মুসাফির নও। তোমার 'মুকীম' হবার কারণে এই শহরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে গেছে। দুই, যদিও এই শহরটি 'হারম' তবুও এমন এক সময় আসবে যখন কিছুক্ষণের জন্য এখানে যুদ্ধ করা তোমার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তিন, এই শহরের বনের পশুদের পর্যন্ত মেরে ফেলা এবং গাছপালা পর্যন্ত কেটে ফেলা আরববাসীদের নিকট হারাম এবং সবাই এখানে নিরাপত্তা লাভ করে। কিন্তু অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে হে নবী, তোমার জন্য এখানে কোন নিরাপত্তা নেই। তোমাকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়া এবং তোমাকে হত্যা করার উপায় উদ্ভাবন করা হালাল করে নেয়া হয়েছে। যদিও এখানে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে তিনটি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে তবুও পরবর্তী বিষয়বস্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, প্রথম অর্থ দু'টি এর সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না এবং তৃতীয় অর্থটির সাথে এর মিল দেখা যায়।

৪. যেহেতু বাপ ও তার ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানদের ব্যাপারে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সামনের দিকে মানুষের কথা বলা হয়েছে, তাই বাপ মানে আদম আলাইহিস সালামই হতে পারেন। আর তাঁর ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তান বলতে দুনিয়ায় বর্তমানে যত মানুষ পাওয়া যায়, যত মানুষ অতীতে পাওয়া গেছে এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

৫. ওপরে যে কথাটির জন্য কসম খাওয়া হয়েছে এটিই সেই কথা। মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করার মানে হচ্ছে এই যে, এই দুনিয়ায় আনন্দ উপভোগ করার ও আরামে শুয়ে শুয়ে সুখের বাঁশী বাজাবার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তার জন্য এ দুনিয়া পরিশ্রম, মেহনত ও কষ্ট করার এবং কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার জায়গা। এই অবস্থা অতিক্রম না করে কোন মানুষ সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। এই মক্কা শহর সাক্ষী, আল্লাহর কোন এক বান্দা এক সময় কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন বলেই আজ এই শহরটি আবাদ হয়েছে এবং আরবের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই শহরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সাক্ষ দিচ্ছে, একটি আদর্শের খাতিরে তিনি নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন।

বন্য পশুদের পর্যন্ত এখানে নিরাপত্তা আছে কিন্তু তাঁর প্রাণের কোন নিরাপত্তা নেই। আর মায়ের গর্ভে এক বিন্দু শুক্র হিসেবে অবস্থান লাভের পর থেকে নিয়ে মৃত্যুকালে শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করা পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জীবন এই মর্মে সাক্ষ দিচ্ছে যে, তাকে প্রতি পদে পদে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনত, বিপদ ও কঠিন অবস্থার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়। যাকে তোমরা দুনিয়ায় সবচেয়ে লোভনীয় অবস্থায় দেখছো সেও যখন

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝٦ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ ۝٧ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ ۝٨ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝٩ وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ۝١٠ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ۝١١ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۝١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝١٣ أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ۝١٤ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝١٦

সে বলে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি।[৭] সে কি মনে করে কেউ তাকে দেখেনি?[৮] আমি কি তাকে দু'টি চোখ, একটি জিহবা ও দু'টি ঠোঁট দেইনি?[৯] আমি কি তাকে দু'টি সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি?[১০] কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি।[১১] তুমি কী জানো সেই দুর্গম গিরিপথটি কি? কোন গলাকে দাসত্বমুক্ত করা অথবা অনাহারের দিন কোন নিকটবর্তী এতিম বা ধূলি মলিন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।[১২]

মায়ের পেটে অবস্থান করছিল তখন সর্বক্ষণ তার মরে যাওয়ার ভয় ছিল। সে মায়ের পেটেই মরে যেতে পারতো। অথবা গর্ভপাত হয়ে তার দফারফা হয়ে যেতে পারতো। প্রসবকালে তার মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে মাত্র এক চুলের বেশী দূরত্ব ছিল না। জন্মলাভ করার পর সে এত বেশী অসহায় ছিল যে, দেখাশুনা করার কেউ না থাকলে সে একাকী পড়ে মরে যেতো। একটু হাঁটা চলার ক্ষমতা লাভ করার পর প্রতি পদে পদে আছাড় খেয়ে পড়তো। শৈশব থেকে যৌবন এবং তারপর বার্ধক্য পর্যন্ত তাকে এমন সব শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে যে, এর মধ্য থেকে কোন একটি পরিবর্তনও যদি ভুল পথে হতো তাহলে তার জীবন বিপন্ন হতো। সে যদি বাদশাহ বা একনায়ক হয় তাহলে কোন্ সময় কোথাও তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র না হয় এই ভয়ে সে এক মুহূর্ত নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারে না। সে বিশ্ববিজয়ী হলেও তার সেনাপতিদের মধ্য থেকে কেউ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে বসে এই ভয়ে সে সর্বক্ষণ তটস্থ থাকে। সে নিজের যুগে কারুনের মতো ধনী হলেও কিভাবে নিজের ধন-সম্পদ আরো বাড়াবে এবং কিভাবে তা রক্ষা করবে, এই চিন্তায় সবসময় পেরেশান থাকে। মোটকথা কোন ব্যক্তিও নির্বিবাদে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার নিয়ামত লাভ করেনি। কারণ মানুষের জন্মই হয়েছে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনত ও কঠিন অবস্থার মধ্যে।

৬. অর্থাৎ এসব অবস্থার মধ্যে যে মানুষ ঘেরাও হয়ে আছে সে কি এই অহংকারে মত্ত হয়েছে যে, দুনিয়ায় সে যা ইচ্ছা করে যাবে, তাকে পাকড়াও করার ও তার মাথা নীচু করাবার মতো কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নেই? অথচ আখেরাত আসার আগে এই

দুনিয়াতেই সে প্রতি মুহূর্তে দেখছে, তার তকদীরের ওপর অন্য একজনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তের সামনে তার নিজের সমস্ত জারিজুরি, কলা–কৌশল পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ভূমিকম্পের একটি ধাক্কা, ঘূর্ণিঝড়ের একটি আঘাত এবং নদী ও সাগরের একটি জলোচ্ছ্বাস তাকে একথা বলে দেবার জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহর শক্তির তুলনায় সে কতটুকু ক্ষমতা রাখে। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা একজন সুস্থ সবল সক্ষম মানুষকে পংগু করে দিয়ে যায়। ভাগ্যের একটি পরিবর্তন একটি প্রবল পরাক্রান্ত বিপুল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে আকাশ থেকে পাতালে নিক্ষেপ করে। উন্নতির উচ্চতম শিখরে অবস্থানকারী জাতিদের ভাগ্য যখন পরিবর্তিত হয় তখন এই দুনিয়ায় যেখানে তাদের চোখে চোখ মেলাবার হিম্মত কারোর ছিল না সেখানে তারা লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়। এহেন মানুষের মাথায় কেমন করে একথা স্থান পেলো যে, তার ওপর কারোর জোর খাটবে না?

৭. اَنْفَقْتُ مَالًا لُّبَدًا "আমি প্রচুর ধন–সম্পদ খরচ করেছি বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا "আমি প্রচুর ধন–সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি। এই শব্দগুলোই প্রকাশ করে, বক্তা তার ধন–সম্পদের প্রাচুর্যে কী পরিমাণ গর্বিত। যে বিপুল পরিমাণ ধন সে খরচ করেছে নিজের সামগ্রিক সম্পদের তুলনায় তার কাছে তার পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, তা উড়িয়ে বা ফুঁকিয়ে দেবার কোন পরোয়াই সে করেনি। আর এই সম্পদ সে কোন্ কাজে উড়িয়েছে? কোন প্রকৃত নেকীর কাজে নয়, যেমন সামনের আয়াতগুলো থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বরং এই সম্পদ সে উড়িয়েছে নিজের ধনাঢ্যতার প্রদর্শনী এবং নিজের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য। তোশামোদকারী কবিদেরকে সে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেছে। বিবাহ ও শোকের মজলিসে হাজার হাজার লোককে দাওয়াত দিয়ে আহার করিয়েছে। জুয়া খেলায় গো–হারা হেরে বিপুল পরিমাণ অর্থ খুইয়েছে। জুয়ায় জিতে শত শত উট জবাই করে ইয়ার বন্ধুদের ভূরি ভোজন করিয়াছে। মেলায় ধূমধাম করে গিয়েছে এবং অন্যান্য সরদারদের চাইতে অনেক বেশী জাঁকজমক ও আড়ম্বর দেখিয়েছে। উৎসবে অঢেল খাবার তৈরি করেছে এবং যে চায় সে এসে খেয়ে যেতে পারে বলে সব মানুষকে খাবার জন্য সাধারণ আহবান জানিয়েছে অথবা নিজের বাড়িতে প্রকাশ্য লংঘরখানা খুলে দিয়েছে, যাতে দূর–দূরান্তে একথা ছড়িয়ে পড়ে যে, অমুক ধনীর দানশীলতার তুলনা নেই। এসব এবং এই ধরনের আরো অনেক প্রদর্শনীমূলক ব্যয় বহর ছিল যেগুলোকে জাহেলী যুগে মানুষের দানশীলতা ও ঔদার্যের নিদর্শন এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের নিশানী মনে করা হতো। এসবের জন্য তাদের প্রশংসার ডংকা বাজতো, তাদের প্রশংসায় কবিতা রচিত ও পঠিত হতো এবং তারা নিজেরাও এজন্য অন্যের মোকাবেলায় নিজেদের গৌরব করে বেড়াতো।

৮. অর্থাৎ এই গৌরবকারী কি দেখে না, ওপরে আল্লাহও একজন আছেন? তিনি দেখছেন সবকিছু। কোন্ পথে সে এ ধন–সম্পদ উপার্জন করেছে, কোন্ কাজে ব্যয় করেছে এবং কি উদ্দেশ্যে, কোন্ নিয়তে ও স্বার্থে সে এসব কাজ করেছে তা তিনি দেখছেন। সে কি মনে করে, আল্লাহর ওখানে এই অমিতব্যয়িতা, খ্যাতিলাভের আকাংখা ও অহংকারের কোন দাম হবে? সে কি মনে করে, দুনিয়ায় মানুষ যেমন তার কাজেকর্মে প্রতারিত হয়েছে তেমনি আল্লাহও প্রতারিত হবেন?

৯. এর অর্থ হচ্ছে, আমি কি তাকে জ্ঞান ও বুদ্ধির উপকরণগুলো দেইনি? দু'টি চোখ মানে গরু ছাগলের চোখ নয়, মানুষের চোখ। যে চোখ মেলে তাকালে চারদিকে এমনসব নিশানী নজরে পড়বে, যা মানুষকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেবে এবং তাকে ভুল ও নির্ভুল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে। জিহবা ও ঠোঁট মানে নিছক কথা বলার যন্ত্র নয় বরং যে ব্যক্তি কথা বলে এবং ঐ যন্ত্রগুলোর পেছনে বসে যে ব্যক্তি চিন্তা যোগায় তারপর মনের কথা প্রকাশ করার জন্যে তার সাহায্য গ্রহণ করে।

১০. অর্থাৎ শুধুমাত্র বুদ্ধি ও চিন্তার শক্তি দান করে তাকে নিজের পথ নিজে খুঁজে নেবার জন্য ছেড়ে দেইনি। বরং তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। তার সামনে ভালো ও মন্দ এবং নেকী ও গোনাহের দু'টি পথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার মধ্য থেকে নিজ দায়িত্বে যে পথটি ইচ্ছা সে গ্রহণ করতে পারে। সূরা দাহ্‌রেও এই একই কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "আমি মানুষকে একটি মিশ্রিত বীর্য থেকে পয়দা করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নেয়া যায় এবং এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে সে শোকরকারী হতে পারে বা কুফরকারী।" (২-৩ আয়াত) আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আদ্‌দাহর ৩-৫ টীকা।

১১. মূল বাক্যটি হচ্ছে, فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ এখানে ইকতিহাম (اقتحام) মানে হচ্ছে, নিজেকে কোন কঠিন ও পরিশ্রম সাধ্য কাজে নিযুক্ত করা। আর পর্বতশৃংগে যাবার জন্য পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যে দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয় তাকে বলা হয় আকাবাহ (عقبه)। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে, দু'টি পথ আমি তাকে দেখিয়েছি। একটি গেছে ওপরের দিকে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। সে পথটি বড়ই দুর্গম। সে পথে যেতে হলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আকাংখা এবং শয়তানের প্ররোচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বিতীয় পথটি বড়ই সহজ। এটি খাদের মধ্যে নেমে গেছে। এই পথ দিয়ে নীচের দিকে নেমে যাবার জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। বরং এ জন্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বাঁধনটা একটু আলগা করে দেয়াই যথেষ্ট। তারপর মানুষ আপনা আপনি গড়িয়ে যেতে থাকে। এখন এই যে ব্যক্তিকে আমি দু'টি পথই দেখিয়ে দিয়েছিলাম সে ঐ দু'টি পথের মধ্য থেকে নীচের দিকে নেমে যাবার পথটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ওপরের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটি পরিত্যাগ করেছে।

১২. ওপরে তার অমিতব্যয়িতার কথা বলা হয়েছে। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শনী ও অহংকার প্রকাশ করার জন্য সে অর্থের অপচয় করতো। তাই এখানে তার মোকাবেলায় এমন ব্যয় ও ব্যয়ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে যা মানুষের নৈতিক অধপতন রোধ করে তাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এতে প্রবৃত্তির কোন সুখানুভব নেই। বরং এ জন্য মানুষকে প্রবৃত্তির ওপর জোর খাটিয়ে ত্যাগের মহড়া দিতে হয়। নিজেই কোন দাসকে দাসত্বমুক্ত করে সেই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। অথবা তাকে আর্থিক সাহায্য করা যেতে পারে। তার ফলে সে নিজের মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত হতে পারে। অথবা অর্থ সাহায্য করে কোন গরীবের গলাকে ঋণমুক্ত করা যেতে পারে। অথবা কোন অসচ্ছল ব্যক্তি যদি কোন অর্থদণ্ডের বোঝার তলায় চাপা পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে তা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কোন নিকটবর্তী (অর্থাৎ আত্মীয় বা

প্রতিবেশী) এতিম এবং এমন কোন ধরনের অসহায় অভাবীকে আহার করিয়ে এই অর্থ ব্যয় করা যায় যাকে দারিদ্র ও উৎকট অর্থহীনতা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে এবং যাকে হাত ধরে তোলার কেউ নেই। এই ধরনের লোকদের সাহায্য করলে মানুষের খ্যাতির ডংকা বাজে না। এদেরকে খাওয়ালে কারো ধনাঢ্যতা ও বদান্যতার তেমন কোন চর্চা হয় না। বরং হাজার হাজার সচ্ছল ব্যক্তি ও ধনীদের জন্য শানদার জিয়াফতের ব্যবস্থা করে তার তুলনায় অনেক বেশী শোহরতের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু নৈতিক উন্নতির পথটি এই দুর্গম গিরিপথটি অতিক্রম করেই এগিয়ে গেছে।

এই আয়াতগুলোতে যেসব সৎকাজের উল্লেখ করা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে সেগুলোর বিপুল মর্যাদা ও সওয়াবের কথা ঘোষণা করেছেন। فَكُّ رَقَبَةٍ (গলাকে দাসত্বমুক্ত করা) সম্পর্কিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হুরাইরা (রা)। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি একজন মু'মিন গোলামকে আযাদ করে আল্লাহ ঐ গোলামের প্রতিটি অংগের বদলে আযাদকারীর প্রতিটি অংগকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন। হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা এবং লজ্জাস্থানের বদলে লজ্জাস্থান। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।) হযরত আলী ইবনে হুসাইন (ইমাম যইনুল আবেদীন) এই হাদীসের বর্ণনাকারী সা'দ ইবনে মারজানাহকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি নিজে আবু হুরাইরার (রা) কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনেছো? তিনি জবাব দেন, হাঁ। কথা শুনে ইমাম যইনুল আবেদীন নিজের সবচেয়ে মূল্যবান গোলামটিকে ডাকেন এবং সেই মুহূর্তেই তাকে আযাদ করে দেন। মুসলিম শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, এই গোলামটির জন্য লোকেরা তাঁকে দশ হাজার দিরহাম দিতে চেয়েছিল। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম শা'বী (র) এই আয়াতের ভিত্তিতে বলেন, গোলাম আযাদ করা সাদকার চাইতে ভালো। কারণ আল্লাহ সাদকার কথা বলার আগে তার কথা বলেছেন।

মিসকিনদের সাহায্য করার ফজিলত সম্পর্কেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও অসংখ্য হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। এর মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

الساعى على الارملة والمسكين كالساعى فى سبيل الله واحسبه قال كالقائم لايفتروكا لصائم لا يفطر -

"বিধবা ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে যে ব্যক্তি প্রচেষ্টা চালায় সে আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত ব্যক্তির সমতুল্য। (আর হযরত আবু হুরাইরা বলেন ঃ) আমার মনে হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সা) একথাও বলেন যে, সে ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে নামাযে রত আছে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে নামায পড়ে যাচ্ছে, আরাম করছে না এবং সেই রোযাদারের মতো যে অনবরত রোযা রেখে যাচ্ছে, কখনো রোযা ভাঙে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

এতিমদের সম্পর্কেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য বাণী রয়েছে। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

তারপর (এই সংগে) তাদের মধ্যে শামিল হওয়া যারা ঈমান এনেছে[১৩] এবং যারা পরস্পরকে সবর ও (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি) রহম করার উপদেশ দেয়।[১৪] এরাই ডানপন্থী। আর যারা আমার আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে তারা বামপন্থী।[১৫] এদের ওপর আগুন ছেয়ে থাকবে।[১৬]

বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন আত্মীয় বা অনাত্মীয় এতিমের ভরণ পোষণ করে সে ও আমি জান্নাতে ঠিক এভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দু'টি পাশাপাশি রেখে দেখান এবং দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখেন।" (বুখারী) হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন, "মুসলমানদের বাড়িগুলোর মধ্যে যে বাড়িতে কোন এতিমের সাথে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে সেটিই সর্বোত্তম বাড়ি এবং যে বাড়িতে কোন এতিমের সাথে অসদ্ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি সবচেয়ে খারাপ বাড়ি।" (ইবনে মাজাহ, বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)। হযরত আবু উমামাহ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন এতিমের মাথার হাত বুলায় এবং নিছক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হাত বুলায়, সে ঐ এতিমের মাথায় যতগুলো চুলের ওপর হাত বুলিয়েছে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য নেকী লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি কোন এতিম ছেলে বা মেয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে সে ও আমি জান্নাতে এভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি নিজের দু'টি আঙ্গুল মিলিয়ে দেখান। (মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজের পানাহারে কোন এতিমকে শামিল করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তবে সে ব্যক্তি যদি ক্ষমার অযোগ্য কোন গোনাহ করে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা (শারহুস সুন্নাহ) হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন, "আমার মন বড় কঠিন।" রসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন, "এতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকিনকে আহার করাও।" (মুসনাদে আহমাদ)।

১৩. অর্থাৎ ওপরে উল্লেখিত গুণাবলী অর্জনের সাথে সাথে তার জন্য মু'মিন হওয়াও জরুরী। কারণ ঈমান ছাড়া কোন কাজ সৎকাজ হিসেবে চিহ্নিত হতে এবং আল্লাহর কাছেও গৃহীত হতে পারে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঈমান সহকারে যে সৎকাজ করা হয় একমাত্র সেটিই নেকী ও মুক্তির উপায় হিসেবে গৃহীত হয়। যেমন সূরা নিসায় বলা হয়েছে ঃ "পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করে সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (১২৪

আয়াত) সূরা নাহলে বলা হয়েছে ঃ "পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয় তাহলে আমি তাকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং এই ধরনের লোকদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেবো।" (৯৭ আয়াত) সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ "পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাকে দেয়া হবে বেহিসেব রিযিক।" (৪০ আয়াত) যে কোন ব্যক্তিই কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন এ কিতাবের যেখানেই সৎকাজ ও তার উত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই অবশ্যই তার সাথে ঈমানের শর্ত লাগানো হয়েছে। ঈমান বিহীন আমল আল্লাহর কাছে কোথাও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কোথাও এ ধরনের কাজের বিনিময়ে কোন প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়নি। এ প্রসংগে এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, আয়াতে একথা বলা হয়নি, "তারপর সে ঈমান এনেছে।" বরং বলা হয়েছে, "তারপর সে তাদের মধ্যে শামিল হয়েছে যারা ঈমান এনেছে।" এর অর্থ হয়, নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে তার নিজের ঈমান আনাই কেবলমাত্র এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে মূল লক্ষ হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে সে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে তার সাথে শামিল হয়ে যাবে। এর ফলে ঈমানদারদের একটি জামায়াত তৈরি হয়ে যাবে। মু'মিনদের একটি সমাজ গড়ে উঠবে। সামগ্রিক ও সমাজবদ্ধভাবে নেকী, সততা ও সৎবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ঈমানের দাবী। অন্যদিকে অসৎবৃত্তি ও পাপ নির্মূল হয়ে যাবে, যেগুলো খতম করাই ছিল ঈমানের মৌলিক চাহিদার অন্তরভুক্ত।

১৪. এখানে মুসলিম সমাজের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টকে দু'টি ছোট ছোট বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট হচ্ছে, এই সমাজের সদস্যরা পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দেবে এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা পরস্পরকে রহম ও পরস্পরের প্রতি স্নেহার্দ্র ব্যবহারের উপদেশ দান করবে।

সবরের ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমি বারবার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি, কুরআন মজীদ যে ব্যাপক অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার করেছে সে দৃষ্টিতে বিচার করলে মু'মিনের সমগ্র জীবনকেই সবরের জীবন বলা যায়। ঈমানের পথে পা রাখার সাথে সাথেই মানুষের সবরের পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ যেসব ইবাদাত ফরয করেছেন, সেগুলো সম্পাদন করতে গেলে সবরের প্রয়োজন। আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার ও সঠিকভাবে মেনে চলার জন্যও সবরের দরকার। আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সবরের সাহায্য ছাড়া সেগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়াও কঠিন। নৈতিক অসৎবৃত্তি পরিহার করা ও সৎবৃত্তি অবলম্বন করার জন্য সবরের প্রয়োজন। প্রতি পদে পদে গোনাহ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। তার মোকাবেলা করা সবর ছাড়া সম্ভব নয়। জীবনের এমন বহু সময় আসে যখন আল্লাহর আইনের আনুগত্য করলে বিপদ-আপদ, কষ্ট, ক্ষতি ও বঞ্চণার সম্মুখীন হতে হয়। আবার এর বিপরীত পক্ষে নাফরমানির পথ অবলম্বন করলে লাভ, ফায়দা, আনন্দ ও ভোগের পেয়ালা উপচে পড়তে দেখা যায়। সবর ছাড়া কোন মু'মিন এ পর্যায়গুলো নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পারে না। তারপর ঈমানের পথ অবলম্বন করতেই মানুষ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। নিজের সন্তান-সন্তুতির, পরিবারের, সমাজের, দেশের, জাতির ও সারা দুনিয়ার মানুষ ও জ্বিন শয়তানদের। এমনকি তাকে আল্লাহর পথে হিজরত এবং জিহাদও করতে হয়। এসব

অবস্থায় একমাত্র সবরের গুণই মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল রাখতে পারে। একথা সুস্পষ্ট যে, এক একজন মু'মিন একা একা যদি এই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তাহলে তার সবসময় পরাজিত হবার ভয় থাকে। অতি কষ্টে হয়তো সে কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে। বিপরীত পক্ষে যদি মু'মিনদের এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে, যার প্রত্যেকটি সদস্য সবরকারী হয় এবং এই সমাজের সদস্যরা সবরের এই ব্যাপকতর পরীক্ষায় পরস্পরকে সাহায্য সহায়তা দান করতে থাকে তাহলে সাফল্যের ডালি এই সমাজের পদতলে লুটিয়ে পড়বে। সেখানে পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সীমাহীন শক্তির প্রবাহ সৃষ্টি হবে। এভাবে মানুষের সমাজকে ন্যায়, সততা ও নেকীর পথে আনার জন্য একটি জবরদস্ত শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরি হয়ে যাবে।

আর রহমের ব্যাপারে বলা যায়, ঈমানদারদের সমাজের বৈশিষ্টই হচ্ছে এই যে, এটা কোন জালেম, নির্দয়, বেরহম, পাষাণ হৃদয় ও হৃদয়হীনদের সমাজ হয় না। বরং সমগ্র মানবতার জন্য এটি হয় একটি স্নেহশীল, করুণাপ্রবণ এবং নিজেদের পরস্পরের জন্য সহানুভূতিশীল ও পরস্পরের দুঃখে–শোকে বেদনা অনুভবকারী একটি সংবেদনশীল সমাজ। ব্যক্তি হিসেবেও একজন মু'মিন হয় আল্লাহর করুণার মূর্ত প্রকাশ এবং দলগতভাবেও মু'মিনদের দল আল্লাহর এমন এক নবীর প্রতিনিধি যার প্রশংসায় বলা হয়েছে– وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও করুণা হিসেবেই তোমাকে পাঠিয়েছি। আম্বিয়া ঃ ১০৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মাতের মধ্যে এই রহম ও করুণাবৃত্তিটির মতো উন্নত নৈতিক বৃত্তিটিকেই সবচেয়ে বেশী প্রসারিত ও বিকশিত করতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর নিম্নোক্ত বাণীগুলো দেখুন। এগুলো থেকে তাঁর দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব কি ছিল তা জানা যাবে। হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়াত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّايَرْحَمُ النَّاسَ

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি রহম করে না, আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না।"

(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ – اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ –

"রহমকারীদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। পৃথিবীবাসীদের প্রতি রহম করো। আকাশবাসী তোমার প্রতি রহম করবেন।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন ঃ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ "যে ব্যক্তি রহম করে না তার প্রতি রহম করা হয় না।" (বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি রহম করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযী)

ইমাম আবু দাউদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বরাত দিয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি রহম করে না এবং আমাদের বড়দের হক চেনে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি আবুল কাসেম (নবী করীম) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ "হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় থেকেই রহম তুলে নেয়া হয়।" (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

হযরত 'ঈয়ায ইবনে হিমার (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন ধরনের লোক জান্নাতী। তার মধ্যে একজন হচ্ছে ঃ

رَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ -

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক আত্মীয় ও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দয়ার্দ্র হৃদয় ও কোমল প্রাণ" (মুসলিম)

হযরত নু'মান ইবনে বশীর বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تُدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى -

"তোমরা মু'মিনদেরকে পরস্পরের মধ্যে রহম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির ব্যাপারে একটি দেহের মতো পাবে। যদি একটি অংগে কোন কষ্ট অনুভূত হয় তাহলে সারা দেহ তাতে নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا "মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য এমন দেয়ালের মতো যার প্রতিটি অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِى حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

"মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না এবং তাকে সাহায্য করতেও বিরত হয় না। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কোন প্রয়োজন পূরণ করার কাজে লেগে থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করার কাজে লেগে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করবে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদগুলোর মধ্য থেকে একটি বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

সৎকর্মকারীদেরকে ঈমান আনার পর ঈমানদারদের দলে শামিল হবার যে নির্দেশ কুরআন মজীদের এই আয়াতে দেয়া হয়েছে তার ফলে কোন্ ধরনের সমাজ গঠন করতে চাওয়া হয়েছে, তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তিগুলো থেকে জানা যায়।

১৫. ডানপন্থী ও বামপন্থীর ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে সূরা ওয়াকি'আর তাফসীরে করে এসেছি। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল ওয়াকি'আ ৫–৬ টীকা।

১৬. অর্থাৎ আগুন তাদেরকে চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে থাকবে যে তা থেকে বের হবার কোন পথ থাকবে না।

আশ্ শামস

৯১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আশ শাম্সকে (الشَّمْسِ) এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে জানা যায়, এ সূরাটিও মক্কা মু'আয্যমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা তুংগে উঠেছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, সৎ ও অসৎ নেকী ও গোনাহর পার্থক্য বুঝানো এবং যারা এই পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে আর গোনাহর পথে চলার ওপরই জোর দেয় তাদেরকে খারাপ পরিণতির ভয় দেখানো।

মূল বক্তব্যের দিক দিয়ে সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে এবং ১০ আয়াতে গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগটি ১১ আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে। এক, সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত, পৃথিবী ও আকাশ যেমন পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি সৎ ও অসৎ এবং নেকী ও গোনাহও পরস্পর ভিন্ন এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়েও তারা পরস্পর বিরোধী। এদের উভয়ের আকৃতি এক নয় এবং ফলাফলও এক হতে পারে না। দুই, মহান আল্লাহ মানবাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি শক্তি দিয়ে দুনিয়ায় একেবারে চেতনাহীনভাবে ছেড়ে দেননি বরং একটি প্রাকৃতিক চেতনার মাধ্যমে তার অবচেতন মনে নেকী ও গোনাহর পার্থক্য, ভালো ও মন্দের প্রভেদ এবং ভালোর ভালো হওয়া ও মন্দের মন্দ হওয়ার বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিন, মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ, সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে শক্তিসমূহ আল্লাহ রেখে দিয়েছেন, সেগুলো ব্যবহার করে সে নিজের প্রবৃত্তির ভালো ও মন্দ প্রবণতাগুলোর মধ্য থেকে কাউকে উদ্দীপিত করে আবার কাউকে দাবিয়ে দেয়। এরি ওপর তার ভবিষ্যত নির্ভর করে। যদি সে সৎপ্রবণতাগুলোকে উদ্দীপিত করে এবং অসৎ-প্রবণতাসমূহ থেকে নিজের নফ্সকে পবিত্র করে তাহলে সে সাফল্য লাভ করবে। বিপরীত পক্ষে যদি সে নফ্সের সৎপ্রবণতাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে এবং অসৎ-প্রবণতাকে উদ্দীপিত করতে থাকে তাহলে সে ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয় অংশে সামূদ জাতির ঐতিহাসিক নজীর পেশ করে রিসালাতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ভালো ও মন্দের যে চেতনালব্ধজ্ঞান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন তা মানুষের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাকে পুরোপুরি না বুঝার কারণে মানুষ ভালো ও মন্দের বিভ্রান্তিকর দর্শন ও মানদণ্ড নির্ণয় করে পথভ্রষ্ট হতে থেকেছে। তাই মহান আল্লাহ এই প্রকৃতিগত চেতনাকে সাহায্য করার জন্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের ওপর সুস্পষ্ট এ দ্ব্যর্থহীন অহী নাযিল করেছেন। এর ফলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে লোকদেরকে নেকী ও গোনাহ কি তা জানাতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ দুনিয়ায় নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। এই ধরনেরই একজন নবী ছিলেন হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম। তাঁকে সামূদ জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সামূদরা তাদের প্রবৃত্তির অসৎপ্রবণতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বড় বেশী হকুম অমান্য করার ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। যার ফলে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের মু'জিযা দেখাবার দাবী অনুযায়ী তিনি তাদের সামনে একটি উটনী পেশ করলেন। তাঁর সাবধান বাণী সত্ত্বেও এই জাতীর সবচেয়ে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিটি সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও দাবী অনুযায়ী উটনীটিকে হত্যা করলো। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেলো।

সামূদ জাতির এ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সমগ্র সূরার কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হে কুরাইশ সম্প্রদায়। যদি তোমরা সামূদদের মতো তোমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তোমরাও সামূদের মতো একই পরিণামের সম্মুখীন হবে। সালেহ আলাইহিস সালামের মোকাবেলায় সামূদ জাতির দুশ্চরিত্র লোকেরা যে অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল মক্কায় সে সময় সেই একই অবস্থা বিরাজ করছিল। তাই এ অবস্থায় এই কাহিনী শুনিয়ে দেয়াটা আসলে সামূদদের এই ঐতিহাসিক নজীর কিভাবে মক্কাবাসীদের সাথে খাপ খেয়ে যাচ্ছে, তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝١٠

সূর্যের ও তার রোদের কসম।[১] চাঁদের কসম যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে। দিনের কসম যখন তা (সূর্যকে) প্রকাশ করে। রাতের কসম যখন তা (সূর্যকে) ঢেকে নেয়।[২] আকাশের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৩] পৃথিবীর ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে বিছিয়েছেন। মানুষের নফসের ও সেই সত্তার কসম যিনি তাকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন।[৪] তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন।[৫] নিসন্দেহে সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি নফস্‌কে পরিশুদ্ধ করেছে এবং যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে সে ব্যর্থ হয়েছে।[৬]

১. মূলে দুহা (ضُحٰى) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দুহা মানে সূর্যের আলো ও তাপ দু'টোই। আরবী ভাষায় এর পরিচিত মানে হচ্ছে চাশ্‌তের সময়, যখন সূর্য উদয়ের পরে যথেষ্ট উপরে উঠে যায় কিন্তু উপরে ওঠার পরে কোন আলোই বেড়ে যায় না, তাপও বিকীরণ করতে থাকে। তাই 'দুহা' শব্দটি যখন সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন তার আলো বা তার বদৌলতে যে দিনের উদয় হয় তা থেকে তার পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ হয় না। বরং এর তুলনায় রোদ শব্দটি তার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

২. রাতের আগমনে সূর্য লুকিয়ে যায়। সারা রাত তার আলো দেখা যায় না। এই অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ রাত সূর্যকে ঢেকে নেয়। কারণ সূর্যের দিগন্ত রেখার নীচে নেমে যাওয়াকেই রাত বলে। এর ফলে পৃথিবীর যে অংশে রাত নামে সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না।

৩. ছাদের মতো পৃথিবীর বুকে তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই আয়াতে এবং এর পরের দু'টি আয়াতে 'মা' (مَا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মা–বানাহা (مَابَنٰهَا) মা–তাহাহা (ماطحاها) ও মা–সাওওয়াহা (ماسواها)। মুফাস্সিরগণের একটি দল এই 'মা' শব্দটিকে ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করেছেন। তারা এই আয়াতগুলোর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আকাশ ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কসম, পৃথিবী ও তাকে বিছিয়ে দেবার কসম এবং মানুষের নফ্সের ও তাকে ঠিকভাবে গঠন করার কসম। কিন্তু এ অর্থ ঠিক নয়। কারণ এই তিনটি বাক্যের পরে নিম্নোক্ত বাক্যটি আনা হয়েছে ঃ "তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন।" আর এই বাক্যটি আগের বাক্য তিনটির সাথে খাপ খায় না। অন্য মুফাস্সিরগণ এখানে 'মা' (ما) কে মান (مَن) বা 'আল্লাযী' (الذين) এর অর্থে ব্যবহার করেছেন। ফলে তারা এই বাক্যগুলোর অর্থ করেছেন ঃ যিনি আকাশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি পৃথিবীকে বিছিয়েছেন এবং যিনি মানুষের নফ্সকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন। আমার মতে এই দ্বিতীয় অর্থটিই সঠিক। এর বিরুদ্ধে এ আপত্তি ওঠানো ঠিক হতে পারে না যে, আরবী ভাষায় 'মা' শব্দ প্রাণহীন বস্তু ও বুদ্ধিহীন জীবের জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ খোদ কুরআনেই 'মা' কে 'মান' অর্থে বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ (আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করি)। فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ (কাজেই মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পসন্দ করো বিয়ে করে নাও)। وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ (আর যেসব মেয়েকে তোমাদের বাপেরা বিয়ে করেছে তাদেরকে বিয়ে করো না)।

৪. 'ঠিকভাবে গঠন করেছেন' মানে হচ্ছে, তাকে এমন একটি দেহ দান করেছেন, যা তার সুডৌল গঠনাকৃতি, হাত–পা ও মস্তিষ্ক সংযোজনের দিক থেকে মানবিক জীবন যাপন করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী ছিল। তাকে দেখার, শুনার, স্পর্শ করার, স্বাদ গ্রহণ করার ও ঘ্রাণ নেবার জন্য এমন ইন্দ্রিয় দান করেছেন যা তার বৈশিষ্ট ও আনুপাতিক কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে তার জন্য জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে ভালো উপায় হতে পারতো। তাকে চিন্তা ও বুদ্ধি–বিবেচনার শক্তি, যুক্তি উপস্থাপন ও প্রমাণ পেশ করার শক্তি, কল্পনা শক্তি, স্মৃতি শক্তি, পার্থক্য করার শক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি, সংকল্প শক্তি এবং এমন অনেক মানসিক শক্তি দান করেছেন যার ফলে সে এই দুনিয়ায় মানুষের মতো কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এছাড়া "ঠিকভাবে গঠন করার" মধ্যে এ অর্থও রয়েছে যে, তাকে জন্মগত পাপী ও প্রকৃতিগত বদমায়েশ হিসেবে তৈরি না করে বরং সহজ সরল প্রকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তার ঘঠনাকৃতিতে এমন ধরনের কোন বক্রতা রেখে দেননি যা তাকে সোজাপথ অবলম্বন করতে চাইলেও করতে দিতো না। এ কথাটিকেই সূরা রূমে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا "সেই প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও যার ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।" (৩০ আয়াত) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এ কথাটিকেই একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "এমন কোন শিশু নেই যে প্রকৃতি ছাড়া অন্যকিছুর ওপর পয়দা হয়। তারপর মা–বাপ তাকে ইহুদি, খৃষ্টান বা অগ্নি উপাসক বানায়। এটা তেমনি যেমন পশুর পেট থেকে সুস্থ, সবল ও পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট বাচ্চা পয়দা হয়। তোমরা কি তাদের কাউকে কানকাটা পেয়েছো? (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ পরবর্তী কালে মুশরিকরা তাদের জাহেলী

কুসংস্কারের কারণে পশুদের কান কেটে দেয়। নয়তো আল্লাহ কোন পশুকে তার মায়ের পেট থেকে কানকাটা অবস্থায় পয়দা করেননি। অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমার রব বলেন, আমার সকল বান্দাকে আমি হানীফ (সঠিক প্রকৃতির ওপর) সৃষ্টি করেছিলাম। তারপর শয়তানরা এসে তাদেরকে তাদের দীন (অর্থাৎ তাদের প্রাকৃতিক দীন) থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের ওপর এমন সব জিনিস হারাম করে দিয়েছে যা আমি তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছিলাম। শয়তানরা আমার সাথে তাদেরকে শরীক করার জন্য তাদেরকে হুকুম দিয়েছে, অথচ আমার সাথে তাদের শরীক হবার ব্যাপারে আমি কোন প্রমাণ নাযিল করিনি।" (মুসনাদে আহমাদ, ইমাম মুসলিমও প্রায় একই রকম শব্দ সহকারে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন)

৫. ইলহাম শব্দটির উৎপত্তি লহ্‌ম (لَهْم) থেকে। এর মানে গিলে ফেলা। যেমন বলা হয়, لَهِمَ الشَّيْءَ اَلْتَهَمَهُ উমুক ব্যক্তি জিনিসটিকে গিলে ফেলেছে। আর اَلْهَمْتُهُ الشَّيْءَ মানে হয়, আমি উমুক জিনিসটি তাকে গিলিয়ে দিয়েছি বা তার গলার নীচে নামিয়ে দিয়েছি। এই মৌলিক অর্থের দিক দিয়ে ইলহাম শব্দ পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কল্পনা বা চিন্তাকে অবচেতনভাবে বান্দার মন ও মস্তিষ্কের গোপন প্রদেশে নামিয়ে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। মানুষের প্রতি তার পাপ এবং তার নেকী ও তাকওয়া ইলহাম করে দেয়ার দু'টি অর্থ হয়। এক, স্রষ্টা তার মধ্যে নেকী ও গোনাহ উভয়ের ঝোঁক প্রবণতা রেখে দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই এটি অনুভব করে। দুই, প্রত্যেক ব্যক্তির অবচেতন মনে আল্লাহ এ চিন্তাটি রেখে দিয়েছেন যে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোন্ জিনিস ভালো ও কোন্ জিনিস মন্দ এবং সৎ নৈতিক বৃত্তি ও সৎকাজ এবং অসৎ নৈতিক বৃত্তি ও অসৎকাজ সমান নয়। ফুজুর (দুষ্কৃতি ও পাপ) একটি খারাপ জিনিস এবং তাকওয়া (খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা) একটি ভালো জিনিস, এ চিন্তাধারা মানুষের জন্য নতুন নয়। বরং তার প্রকৃতি এগুলোর সাথে পরিচিত। স্রষ্টা তার মধ্যে জন্মগতভাবে ভালো ও মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। একথাটিই সূরা আল বালাদে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ "আর আমি ভালো ও মন্দ উভয় পথ তার জন্য সুস্পষ্ট করে রেখে দিয়েছি।" (১০ আয়াত) সূরা আদ্দাহ্‌রে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا "আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে আবার চাইলে হতে পারে অস্বীকারকারী।" (৩ আয়াত) একথাটিই সূরা আল কিয়ামাহে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেঃ মানুষের মধ্যে একটি নফ্‌সে লাওয়ামাহ (বিবেক) আছে। সে অসৎকাজ করলে তাকে তিরস্কার করে। (২ আয়াত) আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে যতই ওজর পেশ করুক না কেন সে কি তা সে খুব ভালো করেই জানে। (১৪-১৫ আয়াত)

এখানে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, মহান আল্লাহ স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত ইলহাম করেছেন প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি তার মর্যাদা, ভূমিকা ও স্বরূপ অনুযায়ী। যেমন সূরা ত্বা-হা'য় বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى "যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন, তারপর তাকে পথ দেখিয়েছেন।" (৫০ আয়াত) যেমন প্রাণীদের প্রত্যেক প্রজাতিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। যার ফলে মাছ নিজে নিজেই সাঁতার কাটে। পাখি উড়ে বেড়ায়। মৌমাছি

মৌচাক তৈরি করে। চাতক বাসা বানায়। মানুষকেও তার বিভিন্ন পর্যায় ও ভূমিকার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। মানুষ এক দিক দিয়ে প্রাণী গোষ্ঠীভুক্ত। এই দিক দিয়ে তাকে যে ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে তার একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, মানব শিশু জন্মের সাথে সাথেই মায়ের স্তন চুষতে থাকে। আল্লাহ যদি প্রকৃতিগতভাবে তাকে এ শিক্ষাটি না দিতেন তাহলে তাকে এ কৌশলটি শিক্ষা দেবার সাধ্য কারো ছিল না। অন্যদিক দিয়ে মানুষ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী। এদিক দিয়ে তার সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ তাকে অনবরত ইলহামী পথনির্দেশনা দিয়ে চলছেন। এর ফলে সে একের পর এক উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার বিকাশ সাধন করছে। এই সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ইতিহাস অধ্যয়নকারী যে কোন ব্যক্তিই একথা অনুভব করবেন যে, সম্ভবত মানুষের চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল হিসেবে দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকটি আবিষ্কার আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছে। হঠাৎ এক ব্যক্তির মাথায় একটি চিন্তার উদয় হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে সে কোন জিনিস আবিষ্কার করেছে। এই দু'টি মর্যাদা ছাড়াও মানুষের আর একটি মর্যাদা ও ভূমিকা আছে। সে একটি নৈতিক জীবও। এই পর্যায়ে আল্লাহ তাকে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি এবং ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ জানার অনুভূতি ইলহাম করেছেন। এই শক্তি, বোধ ও অনুভূতি একটি বিশ্বজনীন সত্য। এর ফলে আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এমন কোন সমাজ সভ্যতা গড়ে ওঠেনি যেখানে ভালো ও মন্দের ধারণা ও চিন্তা কার্যকর ছিল না। আর এমন কোন সমাজ ইতিহাসে কোন দিন পাওয়া যায়নি এবং আজো পাওয়া যায় না যেখানকার ব্যবস্থায় ভালো ও মন্দের এবং সৎ ও অসৎকর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির কোন না কোন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি। প্রতিযুগে, প্রত্যেক জায়গায় এবং সভ্যতা–সংস্কৃতির প্রত্যেক পর্যায়ে এই জিনিসটির অস্তিত্বই এর স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এছাড়াও একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ স্রষ্টা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটি গচ্ছিত রেখেছেন, একথাও এ থেকে প্রমাণিত হয়। কারণ যেসব উপাদানে মানুষ তৈরি এবং যেসব আইন ও নিয়মের মাধ্যমে জড় জগত চলছে তার কোথাও নৈতিকতার কোন একটি বিষয়ও চিহ্নিত করা যাবে না।

৬. একথাটির ওপরই ওপরের আয়াতগুলোতে বিভিন্ন জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে। ওই জিনিসগুলো থেকে একথাটি কিভাবে প্রমাণ হয় তা এখন চিন্তা করে দেখুন। যেসব গভীর তত্ত্ব আল্লাহ মানুষকে বুঝাতে চান সেগুলো সম্পর্কে তিনি কুরআনে যে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করেছেন তা হচ্ছে এই যে, সেগুলো প্রমাণ করার জন্য তিনি হাতের কাছের এমন কিছু সুস্পষ্ট ও সর্বজন পরিচিত জিনিস পেশ করেন, যা প্রত্যেক ব্যক্তি তার আশেপাশে অথবা নিজের অস্তিত্বের মধ্যে প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে দেখে। এই নিয়ম অনুযায়ী এখানে এক এক জোড়া জিনিস নিয়ে তাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে পেশ করা হয়েছে। তারা পরস্পরের বিপরীতধর্মী কাজেই তাদের প্রভাব ও ফলাফলও সমান নয়। বরং অনিবার্যভাবে তারা পরস্পর বিভিন্ন। একদিকে সূর্য, অন্যদিকে চাঁদ। সূর্যের আলো অত্যন্ত প্রখর। এর মধ্যে রয়েছে তাপ। এর তুলনায় চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের উপস্থিতিতে সে আকাশে থাকলেও আলোহীন থাকে। সূর্য ডুবে যাবার পর সে উজ্জ্বল হয়। সে সময়ও তার আলোর মধ্যে রাতকে দিন বানিয়ে দেবার ঔজ্জ্বল্য থাকে না। সূর্য তার আলোর প্রখরতা দিয়ে দুনিয়ায় যে কাজ করে চাঁদের আলোর মধ্যে সে প্রখরতা থাকে না। তবে তার নিজস্ব কিছু প্রভাব রয়েছে। এগুলো সূর্যের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

এভাবে একদিকে আছে দিন এবং অন্যদিকে রাত। এরা পরস্পরের বিপরীতধর্মী। উভয়ের প্রভাব ও ফলাফল এত বেশী বিভিন্ন যে, এদেরকে কেউ একসাথে জমা করতে পারে না। এমন কি সবচেয়ে নিবোর্ধ ব্যক্তিটির পক্ষেও একথা বলা সম্ভব হয় না যে, রাত হলেই বা কি আর দিন হলেই বা কি, এতে কোন পার্থক্য হয় না। ঠিক তেমনি একদিকে রয়েছে আকাশ। স্রষ্টা তাকে উঁচুতে স্থাপন করেছেন। অন্যদিকে রয়েছে পৃথিবী। এর স্রষ্টা একে আকাশের তলায় বিছানার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছেন। এরা উভয়েই একই বিশ্ব জাহানের ও তার ব্যবস্থার সেবা করছে এবং তার প্রয়োজন পূর্ণ করছে। কিন্তু উভয়ের কাজ এবং প্রভাব ও ফলাফলের মধ্যে আসমান–যমীন ফারাক। উর্ধজগতের এই সাক্ষ প্রমাণগুলো পেশ করার পর মানুষের নিজের শরীর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার অংগ–প্রত্যংগ এবং ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের শক্তিগুলোকে আনুপাতিক ও সমতাপূর্ণ মিশ্রণের মাধ্যমে সুগঠিত করে স্রষ্টা তার মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয় প্রবনতা ও কার্যকারণসমূহ রেখে দিয়েছেন। এগুলো পরস্পরের বিপরীত ধর্মী। ইলহামী তথা অবচেতনভাবে তাকে এদের উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এদের একটি হচ্ছে ফুজুর–দুষ্কৃতি, তা খারাপ এবং অন্যটি হচ্ছে, তাকওয়া–আল্লাহভীতি, তা ভালো। এখন যদি সূর্য ও চন্দ্র, রাত ও দিন এবং আকাশ ও পৃথিবী এক না হয়ে থাকে বরং তাদের প্রভাব ও ফলাফল অনিবার্যভাবে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে থাকে তাহলে, মানুষের নফ্সের দুস্কৃতি ও তাকওয়া পরস্পরের বিপরীতধর্মী হওয়া সত্ত্বেও এক হতে পারে কেমন করে? মানুষ নিজেই এই দুনিয়ায় নেকী ও পাপকে এই মনে করে না। নিজের মনগড়া দর্শনের দৃষ্টিতে সে যদি ভালো ও মন্দের কিছু মানদণ্ড তৈরি করে নিয়েই থাকে তাহলেও যে জিনিসটিকে সে নেকী মনে করে, সে সম্পর্কে তার অভিমত হচ্ছে এই যে, তা প্রশংসনীয় এবং প্রতিফল ও পুরস্কার লাভের যোগ্য। অন্যদিকে যাকে সে অসৎ ও গোনাহ মনে করে, সে সম্পর্কে তার নিজের নিরপেক্ষ অভিমত হচ্ছে এই যে, তা নিন্দনীয় ও শাস্তির যোগ্য। কিন্তু আসল ফায়সালা মানুষের হাতে নেই। বরং যে স্রষ্টা মানুষের প্রতি তার গোনাহ ও তাকওয়া ইলহাম করেছেন তার হাতেই রয়েছে এর ফায়সালা। স্রষ্টার দৃষ্টিতে যা গোনাহ ও দুষ্কৃতি আসলে তাই হচ্ছে গোনাহ ও দুষ্কৃতি এবং তাঁর দৃষ্টিতে যা তাকওয়া আসলে তাই হচ্ছে তাকওয়া। স্রষ্টার কাছে এ দু'টির রয়েছে পৃথক পরিণাম। একটির পরিণাম হচ্ছে, যে নিজের নফ্সের পরিশুদ্ধি করবে সে সাফল্য লাভ করবে এবং অন্যটির পরিণাম হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজের নফ্সকে দাবিয়ে দেবে সে ব্যর্থ হবে।

তাযাক্কা (تـزكـى) পরিশুদ্ধ করা মানে পাক–পবিত্র করা, বিকশিত করা এবং উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করা। পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি নিজের নফস্ ও প্রবৃত্তিকে দুষ্কৃতি থেকে পাক–পবিত্র করে, তাকে উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করে তাকওয়ার উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং তার মধ্যে সৎপ্রবণতাকে বিকশিত করে, সে সাফল্য লাভ করবে। এর মোকাবেলায় দাস্সাহা (دَسّٰهَا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শব্দমূল হচ্ছে তাদ্সীয়া (تـدسـيـه) তাদ্সীয়া মানে হচ্ছে দাবিয়ে দেয়া, লুকিয়ে ফেলা, ছিনিয়ে নেয়া, আত্মসাৎ করা ও পথভ্রষ্ট করা। পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর অর্থও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ব্যর্থ হবে, যে নিজের নফ্সের মধ্যে নেকী ও সৎকর্মের যে প্রবণতা পাওয়া যাচ্ছিল তাকে উদ্দীপিত ও বিকশিত করার পরিবর্তে দাবিয়ে দেয়, তাকে

বিভ্রান্ত করে অসৎপ্রবণতার দিকে নিয়ে যায় এবং দুষ্কৃতিকে তার ওপর এত বেশী প্রবল করে দেয় যার ফলে তাকওয়া তার নীচে এমনভাবে মুখ ঢাকে যেমন কোন লাশকে কবরের মধ্যে রেখে তার ওপর মাটি চাপা দিলে তা ঢেকে যায়। কোন কোন তাফসীরকার এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّى اللّٰهُ نَفْسَهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّى اللّٰهُ نَفْسَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তির নফ্সকে আল্লাহ পাক–পবিত্র করে দিয়েছেন সে সাফল্য লাভ করেছে এবং যার নফ্সকে আল্লাহ দাবিয়ে দিয়েছেন সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি প্রথমত ভাষার দিক দিয়ে কুরআনের বর্ণনাভংগীর পরিপন্থী। কারণ আল্লাহর যদি একথা বলাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তিনি এভাবে বলতেন : قَدْ اَفْلَحَتْ مَنْ زَكَّهَا اللّٰهُ وَقَدْ خَابَتْ مَنْ دَسَّهَا اللّٰهُ (যে নফ্সকে আল্লাহ পাক–পবিত্র করে দিয়েছেন সে সফল হয়ে গেছে এবং ব্যর্থ হয়ে গেছে সেই নফ্স যাকে আল্লাহ দাবিয়ে দিয়েছেন।) দ্বিতীয়, এই ব্যাখ্যাটি এই বিষয়বস্তু সম্বলিত, কুরআনের অন্যান্য বর্ণনার সাথে সংঘর্ষশীল। সূরা আ'লায় মহান আল্লাহ বলেছেন : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى (সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে—৪ আয়াত) সূরা 'আবাসায় মহান আল্লাহ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন : وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى "তোমাদের ওপর কি দায়িত্ব আছে যদি তারা পবিত্রতা অবলম্বন না করে?" এই দু'টি আয়াতে পবিত্রতা অবলম্বন করাকে বান্দার কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন সূরা দাহ্‌র–এ বলা হয়েছে : "আমি মানুষকে একটি মিশ্রিত শুক্র থেকে পয়দা করেছি, যাতে তাকে পরীক্ষা করতে পারি, তাই তাকে আমি শোনার ও দেখার ক্ষমতা দিয়েছি।" (২ আয়াত) সূরা মূল্‌কে বলা হয়েছে : "তিনি মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা যায় যে, তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।" (২ আয়াত) যখন একথা সুস্পষ্ট, পরীক্ষা গ্রহণকারী যদি আগেভাগেই একজন পরীক্ষার্থীকে সামনে বাড়িয়ে দেয় এবং অন্যজনকে দাবিয়ে দেয় তাহলে আদতে পরীক্ষাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাজেই কাতাদাহ, ইকরামা, মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে জুবাইর যা বলেছেন সেটিই হচ্ছে এর আসল তাফ্সীর। তারা বলেছেন : যাক্কাহা ও দাস্সাহা'র কর্তা হচ্ছে বান্দা, আল্লাহ নন। আর ইবনে আবী হাতেম জুওয়াইর ইবনে সাঈদ থেকে এবং তিনি যাহ্হাক থেকে এবং যাহ্হাক ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন : اَفْلَحَتْ نَفْسٌ زَكَّهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যাকে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ পবিত্র করে দিয়েছেন)। এ হাদীসটি সম্পর্কে বলা যায়, এখানে রসূলুল্লাহ (সা)–এর যে উক্তি পেশ করা হয়েছে তা আসলে তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়। কারণ এই সনদের রাবী জুওয়াইর একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। অন্যদিকে ইবনে আব্বাসের সাথে যাহ্হাকের সাক্ষাত হয়নি। তবে ইমাম আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে আবী শাইবা হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে যে রেওয়ায়াতটি করেছেন সেটি অবশ্যি একটি সহীহ হাদীস। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন :

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿١١﴾ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾

সামূদ জাতি[৭] নিজের বিদ্রোহের কারণে মিথ্যা আরোপ করলো।[৮] যখন সেই জাতির সবচেয়ে বড় হতভাগ্য লোকটি ক্ষেপে গেলো, আল্লাহর রসূল তাদেরকে বললো ঃ সাবধান! আল্লাহর উটনীকে স্পর্শ করো না এবং তাকে পানি পান করতে (বাধা দিয়ো না)[৯] কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করলো এবং উটনীটিকে মেরে ফেললো।[১০] অবশেষে তাদের গোনাহের কারণে তাদের রব তাদের ওপর বিপদের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। আর তিনি (তাঁর এই কাজের) খারাপ পরিণতির কোন ভয়ই করেন না।[১১]

"হে আল্লাহ! আমার নফ্সকে তার তাকওয়া দান করো এবং তাকে পবিত্র করো। তাকে পবিত্র করার জন্যে তুমিই সর্বোত্তম সত্তা। তুমিই তার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক।"

রসূলের প্রায় এই একই ধরনের দোয়া তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনুল মুনযির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এবং ইমাম আহমাদ হযরত আয়েশা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। মূলত এর অর্থ হচ্ছে, বান্দা কেবল তাকওয়া ও তাযকীয়া তথা পবিত্রতা অবলম্বন করার ইচ্ছাই প্রকাশ করতে পারে। তবে তা তার ভাগ্যে জুটে যাওয়া আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফীকের ওপর নির্ভর করে। তাদসীয়া তথা নফসকে দাবিয়ে দেবার ব্যাপারেও এই একই অবস্থা অর্থাৎ আল্লাহ জোর করে কোন নফ্সকে দাবিয়ে দেন না। কিন্তু বান্দা যখন এ ব্যাপারে একেবারে আদা–পানি খেয়ে লাগে তখন তাকে তাক্ওয়া ও তায্কীয়ার তাওফীক থেকে বঞ্চিত করেন এবং সে তার নফ্সকে যে ধরনের ময়লা আবর্জনার মধ্যে দাবিয়ে দিতে চায় তার মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেন।

৭. ওপরের আয়াতগুলোতে নীতিগতভাবে যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে এখন একটি ঐতিহাসিক নজীরের সাহায্যে তাকে সুস্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে। এটি কিসের নজীর এবং ওপরের বর্ণনার সাথে এর কি সম্পর্ক তা জানার জন্যে কুরআন মজীদের অন্যান্য বর্ণনার আলোকে ৭ থেকে ১০ আয়াতে বর্ণিত দু'টি মৌলিক সত্য সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা গবেষণা করা উচিত।

এক ঃ সেখানে বলা হয়েছে, মানুষের নফ্সকে একটি সুগঠিত ও সুসামঞ্জস্য প্রতিকৃতির ওপর সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ তার দুষ্কৃতি ও তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন। কুরআন এ সত্যটি বর্ণনা করার পর একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, দুষ্কৃতি ও তাকওয়ার এই ইলহামী (চেতনালব্ধ) জ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্বভাবে বিস্তারিত পথ

নির্দেশনা লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। বরং এই উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে নবীগণকে বিস্তারিত পথনির্দেশনা দান করেছেন। তাতে দুষ্কৃতির আওতায় কি কি জিনিস পড়ে, যা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তাকওয়া কাকে বলে, তা কিভাবে হাসিল করা যায়—এসব কথা পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে। যদি অহীর মাধ্যমে প্রেরিত এই বিস্তারিত পথনির্দেশনা মানুষ গ্রহণ না করে, তাহলে সে দুষ্কৃতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না এবং তাকওয়া অবলম্বনের পথও পাবে না।

দুই ঃ এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, দুষ্কৃতি ও তাকওয়া দু'টোর মধ্যে থেকে যে কোনটি অবলম্বন করার অনিবার্য ফল হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তি। নফ্সকে দুষ্কৃতি মুক্ত ও তাকওয়ার সাহায্যে উন্নত করার ফলে সাফল্য অর্জিত হয়। আর তার সৎপ্রবণতাগুলোকে দাবিয়ে দিয়ে তাকে দুষ্কৃতির মধ্যে ডুবিয়ে দেবার ফল হচ্ছে ব্যর্থতা ও ধ্বংস।

একথাটি বুঝাবার জন্যে একটি ঐতিহাসিক নজীর পেশ করা হচ্ছে। এ জন্যে নমুনা হিসেবে সামূদ জাতিকে পেশ করা হয়েছে। কারণ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের মধ্যে এই জাতিটির এলাকা ছিল মক্কাবাসীদের সবচেয়ে কাছে। উত্তর হিজাযে এর ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ ছিল। মক্কাবাসীদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া যাবার পথে প্রায়ই এই স্থানটি অতিক্রম করতো। জাহেলী যুগের কবিতায় এই জাতির উল্লেখ যেমন ব্যাপকভাবে করা হয়েছে তাতে বুঝা যায়, আরববাসীদের মধ্যে তাদের ধ্বংসের চর্চা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল।

৮. অর্থাৎ তারা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের নবুওয়াতকে মিথ্যা গণ্য করলো। তাদেরকে হেদায়াত করার জন্যে হযরত সালেহকে পাঠানো হয়েছিল। যে দুষ্কৃতিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল। তা ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না এবং হযরত সালেহ (আ) যে তাকওয়ার দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা গ্রহণ করতে তারা চাইছিল না। নিজেদের এই বিদ্রোহী মনোভাব ও কার্যক্রমের কারণে তাই তারা তার নবুওয়াতকে মিথ্যা বলছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফ ৭৩–৭৬ আয়াত, হুদ ৬১–৬২ আয়াত, আশ শু'আরা ১৪১–১৫৩ আয়াত, আন নাম্ল ৪৫–৪৯ আয়াত, আল ক্বামার ২৩–২৫ আয়াত।

৯. কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সামূদ জাতির লোকেরা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে এই বলে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিশানী (মুজিযা) পেশ করো। একথায় হযরত সালেহ (আ) মুজিযা হিসেবে একটি উটনী তাদের সামনে হাযির করেন, তিনি বলেন ঃ এটি আল্লাহর উটনী। যমীনের যেখানে ইচ্ছা সে চরে বেড়াবে। একদিন সে একা সমস্ত পানি পান করবে এবং অন্যদিন তোমরা সবাই ও তোমাদের পশুরা পানি পান করবে। যদি তোমরা তার গায়ে হাত লাগাও তাহলে মনে রেখো তোমাদের ওপর কঠিন আযাব বর্ষিত হবে। একথায় তারা কিছুদিন পর্যন্ত ভয় করতে থাকলো। তারপর তারা তাদের সবচেয়ে বড় শয়তান ও বিদ্রোহী সরদারকে ডেকে বললো, এই উটনীটিকে শেষ করে দাও। সে এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলো। (আল আরাফ ৭৩ আয়াত, আশ্ শু'আরা ১৫৪–১৫৬ আয়াত এবং আল ক্বামার ২৯ আয়াত)

১০. সূরা আরাফে বলা হয়েছে ঃ উটনীকে হত্যা করার পর সামূদের লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বললো, তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাতে এখন সেই আযাব আনো। (৭৭ আয়াত) সূরা হূদে বলা হয়েছে, হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন, তিনদিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে আরো আয়েশ করে নাও, তারপর আযাব এসে যাবে এবং এটি এমন একটি সতর্কবাণী যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে না। (৬৫ আয়াত)

১১. অর্থাৎ দুনিয়ার বাদশাহ ও শাসকদের মতো নন। তিনি কোন জাতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এর পরিণাম কি হবে, একথা ভাবতে বাধ্য হন না। তিনি সবার ওপর কর্তৃত্বশালী। সামূদ জাতির সাহায্যকারী এমন কোন শক্তি আছে যে তার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবে, এ ভয় তাঁর নেই।

আল লাইল

৯২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াল লাইল (وَالَّيْلِ) –কে এই সূরার নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

পূর্ববর্তী সূরা আশ্ শামসের সাথে এই সূরাটির বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এদিক দিয়ে এদের একটিকে অপরটির ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। একই কথাকে সূরা আশ্ শামসে একভাবে বলা হয়েছে আবার সেটিকে এই সূরায় অন্যভাবে বলা হয়েছে। এথেকে আন্দাজ করা যায়, এ দু'টি সূরা প্রায় একই যুগে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পার্থক্য এবং তাদের পরিণাম ও ফলাফলের প্রভেদ বর্ণনা করাই হচ্ছে এর মূল বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু থেকে ১১ আয়াত পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগটি ১২ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম অংশে বলা হয়েছে, মানুষ ব্যক্তিগত, জাতিগত ও দলগতভাবে দুনিয়ায় যা কিছু প্রচেষ্টা ও কর্ম তৎপরতা চালায় তা অনিবার্যভাবে নৈতিক দিক দিয়ে ঠিক তেমনি বিভিন্ন যেমন দিন ও রাত এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। তারপর কুরআনের ছোট ছোট সূরাগুলোর বর্ণনাভংগী অনুযায়ী প্রচেষ্টা ও কর্মের সমগ্র যোগফল থেকে এক ধরনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট এবং অন্য ধরনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট নিয়ে নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্টগুলোর বর্ণনা শুনে এদের মধ্যকার পার্থক্য সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কারণ এক ধরনের মৌলিক বৈশিষ্ট যে ধরনের জীবন পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে অন্য ধরনের মৌলিক বৈশিষ্টে ঠিক তার বিপরীতধর্মী জীবন পদ্ধতির চিহ্ন ফুটে ওঠে। এই উভয় প্রকার নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে ছোট ছোট, আকর্ষণীয়, সুন্দর ও সুগঠিত বাক্যের সাহায্যে। শোনার সাথে সাথে এগুলোর মর্মবাণী মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে যায় এবং সে সহজে সেগুলো আওড়াতে থাকে। প্রথম ধরনের বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে ঃ অর্থ–সম্পদ দান করা, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া অবলম্বন করা এবং সৎবৃত্তিকে সৎবৃত্তি বলে মেনে নেয়া। দ্বিতীয় ধরনের বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে ঃ কৃপণতা করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পরোয়া না করা এবং ভালো কথাকে মিথ্যা গণ্য করা। তারপর বলা হয়েছে, এই উভয় ধরনের সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী কর্মপদ্ধতি নিজের পরিণাম ও ফলাফলের দিক

থেকে মোটেই এক নয়। বরং যেমন এরা পরস্পর বিপরীতধর্মী, ঠিক তেমনি এদের ফলাফলও বিপরীতধর্মী। যে ব্যক্তি বা দল প্রথম কর্মপদ্ধতিটি গ্রহণ করবে তার জন্য মহান আল্লাহ জীবনের সত্য সরল পথটি সহজ লভ্য করে দেবেন। এ অবস্থায় তার জন্য সৎকাজ করা সহজ ও অসৎকাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। আর যারা দ্বিতীয় কর্মপদ্ধতিটি অবলম্বন করবে আল্লাহ জীবনের নোংরা, অপরিচ্ছন্ন ও কঠিন পথ তাদের জন্য সহজ করে দেবেন। এ অবস্থায় তাদের জন্য অসৎকাজ করা সহজ এবং সৎকাজ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এ বর্ণনা এমন একটি বাক্যের দ্বারা শেষ করা হয়েছে যা তীরবেগে হৃদয়ে প্রবেশ করে মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সে বাক্যটি হচ্ছে ঃ দুনিয়ার এই ধন–সম্পদ যার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়ে দেয়, এসব তো কবরে তার সাথে যাবে না, তাহলে মরণের পরে এগুলো তার কি কাজে লাগবে?

দ্বিতীয় অংশেও এই একই রকম সংক্ষিপ্তভাবে তিনটি মৌলিক তত্ব পেশ করা হয়েছে। এক, দুনিয়ার এই পরীক্ষাগারে আল্লাহ মানুষকে অগ্রিম কিছু না জানিয়ে একেবারে অজ্ঞ করে পাঠিয়ে দেননি। বরং জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে সোজা পথ কোন্‌টি এটি তাকে জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি নিজের জিম্মায় নিয়েছেন। এই সংগে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না যে, নিজের রসূল ও নিজের কিতাব পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। কারণ সবাইকে পথ দেখাবার জন্য রসূল ও কুরআন সবার সামনে উপস্থিত ছিল। দুই, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর কাছে দুনিয়া চাইলে তাও পাওয়া যাবে আবার আখেরাত চাইলে তাও তিনি দেবেন। এখন মানুষ এর মধ্য থেকে কোনটি চাইবে—সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মানুষের নিজের দায়িত্ব। তিন, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে ন্যায় ও কল্যাণ পেশ করা হচ্ছে, যে হতভাগ্য ব্যক্তি তাকে মিথ্যা গণ্য করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জ্বলন্ত আগুন। আর যে আল্লাহভীরু ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে নিছক নিজের রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের ধন–মাল সৎপথে ব্যয় করবে তার রব তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তাকে এত বেশী দান করবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে।

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهٗ إِذَا تَرَدّٰى ﴿١١﴾

রাতের কসম যখন তা ঢেকে যায়। দিনের কসম যখন তা উজ্জ্বল হয়। আর সেই সত্তার কসম যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। আসলে তোমাদের প্রচেষ্টা নানা ধরনের।[১] কাজেই যে (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ দান করেছে, (আল্লাহর নাফরমানি থেকে) দূরে থেকেছে এবং সৎবৃত্তিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে,[২] তাকে আমি সহজ পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো।[৩] আর যে কৃপণতা করেছে, আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং সৎবৃত্তিকে মিথ্যা গণ্য করেছে,[৪] তাকে আমি কঠিন পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো।[৫] আর তার ধন-সম্পদ তার কোন্ কাজে লাগবে যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে?[৬]

১. এ কথার জন্যই রাত ও দিন এবং নারী ও পুরুষের জন্মের কসম খাওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যেভাবে রাত ও দিন এবং পুরুষ ও নারী পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং তাদের প্রত্যেক জোড়ার প্রভাব ও ফলাফল পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি তোমরা যেসব পথে ও যেসব উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছো সেগুলোও বিভিন্ন ধরনের এবং সেগুলোর পরিণাম বিভিন্ন বিপরীতধর্মী ফলাফলেরও উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ এসব বিভিন্ন প্রচেষ্টা দু'টি বড় বড় ভাগে বিভক্ত।

২. এটি এক ধরনের মানবিক প্রচেষ্টা। তিনটি জিনিসকে এর অংগীভূত করা হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এগুলোর মধ্যে সব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। এর

মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষ যেন অর্থ লিপ্সায় ডুবে না যায়। বরং নিজের অর্থ–সম্পদ, যে পরিমাণ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, তা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায়ে, সৎ–কাজে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে সাহায্য করার কাজে ব্যয় করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তার মনে যেন আল্লাহর ভয় জাগরুক থাকে। সে যেন নিজের যাবতীয় কর্ম, আচার–আচরণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে এমন প্রত্যেকটি কাজ থেকে দূরে থাকে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে, সে যেন সৎবৃত্তি ও সৎকাজের সত্যতার স্বীকৃতি দেয়। সৎবৃত্তি ও সৎকাজ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্ম তিনটি সৎবৃত্তির অন্তরভুক্ত। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সৎবৃত্তির স্বীকৃতি হচ্ছে, শিরক, কুফরী ও নাস্তিক্যবাদ পরিত্যাগ করে মানুষ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে সত্য বলে মেনে নেবে। আর কর্ম ও নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে সৎবৃত্তির স্বীকৃতি হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও পদ্ধতি ছাড়াই নিছক নিজের অজ্ঞাতসারে কোন সৎকাজ সম্পাদিত হওয়া নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ ও সৎবৃত্তির যে ব্যবস্থা দান করা হয়েছে মানুষ তার সত্যতার স্বীকৃতি দেবে। আল্লাহ শরীয়াত নামক যে ব্যাপকতর ব্যবস্থাটি দান করেছেন এবং যার মধ্যে সব ধরনের ও সকল প্রকার সৎবৃত্তি ও সৎকাজকে সুশৃংখলভাবে একটি ব্যবস্থার আওতাধীন করেছেন, মানুষ তাকে স্বীকার করে নিয়ে সেই অনুযায়ী সৎকাজ করবে।

৩. এটি হচ্ছে এই ধরনের প্রচেষ্টার ফল। সহজ পথ মানে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে মিল রয়েছে এমন পথ। যে স্রষ্টা মানুষ ও এই সমগ্র বিশ্ব–জাহান সৃষ্টি করেছেন তিনি যেমন চান তেমন পথ। যে পথে নিজের বিবেকের সাথে লড়াই করে মানুষকে চলতে হয় না। যে পথে মানুষকে নিজের দেহ, প্রাণ,বুদ্ধি ও মনের শক্তিগুলোর ওপর জোর খাটিয়ে যে কাজের জন্যে তাদেরকে এ শক্তি দান করা হয়নি জবরদস্তি তাদের থেকে সেই কাজ আদায় করে নিতে হয় না। বরং তাদের থেকে এমন কাজ নেয় যে জন্য তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে এই শক্তিগুলো দান করা হয়েছে। পাপপূর্ণ জীবনে চতুরদিকে যেমন প্রতি পদে পদে সংঘাত, সংঘর্ষ ও বাধা–বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, এ পথে মানুষকে তেমনি ধরনের কোন বাধা ও সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয় না। বরং মানুষের সমাজে প্রতি পদে পদে সে সহানুভূতি, সহযোগিতা, প্রেম, ভালোবাসা, মর্যাদা ও সম্মান লাভ করতে থাকে। একথা সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি নিজের ধন–সম্পদ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে, নিজের জীবনকে অশ্লীল কার্যকলাপ ও দুষ্কৃতিমুক্ত রাখে, নিজের লেন–দেনের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন ও ন্যায়–নিষ্ঠ থাকে, কারো সাথে বেঈমানী, শপথ ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে না, যার পক্ষ থেকে কারোর প্রতি জুলুম, নির্যাতন ও অন্যায় আচরণের আশংকা থাকে না। যে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং যার চরিত্র ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার সুযোগ কারোর থাকে না, সে যতই নষ্ট ও ভ্রষ্ট সমাজে বাস করুক না কেন সেখানে অবশ্যি সে মর্যাদার আসনে সমাসীন থাকে। মানুষের মন তার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। মানুষের হৃদয়ে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তার নিজের মন ও বিবেকও নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। সমাজে তার এমন মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কোন অসৎব্যক্তি ও দুষ্কৃতকারী কোন দিন লাভ করতে পারে না। একথাটিকেই সূরা আন্ নাহলে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মু'মিন হলে আমি অবশ্যি তাকে ভালো জীবন যাপন করাবো।" (৯৭ আয়াত)

আবার একথাটি সূরা মারয়ামে নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا –

"নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে রহমান তাদের জন্য হৃদয়গুলোতে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।"(৯৬ আয়াত)

তাছাড়া এটিই মানুষের জন্য দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত পূর্ণ আনন্দের একমাত্র পথ। একমাত্র এ পথেই আছে আরাম ও প্রশান্তি। এর ফলাফল সাময়িক ও ক্ষণকালীন নয় বরং এটা হচ্ছে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ফল, এর কোন ক্ষয় নেই।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলছেন, আমি তাকে এ পথে চলার সহজ সুযোগ দেবো। এর মানে হচ্ছে, যখন সে সৎবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, এটিই তার উপযোগী পথ এবং দুষ্কৃতির পথ তার উপযোগী নয়, আর যখন সে কার্যত আর্থিক ত্যাগ ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে একথা প্রমাণ করবে যে, তার এই স্বীকৃতি সত্য, তখন আল্লাহ এ পথে চলা তার জন্য সহজ করে দেবেন। এ অবস্থায় তার জন্য আবার গোনাহ করা কঠিন এবং নেকী করা সহজ হয়ে যাবে। হারাম অর্থ–সম্পদ তার সামনে এলে সে তাকে লাভের সওদা মনে করবে না। বরং সে অনুভব করবে, এটা জ্বলন্ত অংগার, একে সে হাতের তালুতে উঠিয়ে নিতে পারে না। ব্যভিচারের সুযোগ সে পাবে। কিন্তু তাকে সে ইন্দ্রিয় লিপ্সা চরিতার্থ করার সুযোগ মনে করে সেদিকে পা বাড়াবে না। বরং জাহান্নামের দরজা মনে করে তা থেকে দূরে পালিয়ে যাবে। নামায তার কাছে কঠিন মনে হবে না বরং নামাযের সময় হয়ে গেলে নামায না পড়া পর্যন্ত তার মনে শান্তি আসবে না। যাকাত দিতে তার মনে কষ্ট হবে না। বরং যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত নিজের ধন–সম্পদ তার কাছে নাপাক মনে হবে। মোটকথা, প্রতি পদে পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পথে চলার সুযোগ ও সুবিধা সে লাভ করতে থাকবে। অবস্থাকে তার উপযোগী বানিয়ে দেয়া হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, ইতিপূর্বে সূরা আল বালাদে এ পথটিকে দুর্গম পার্বত্য পথ বলা হয়েছিল আর এখানে একে বলা হচ্ছে, সহজ পথ। এই দু'টি কথাকে কিভাবে এক করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে, এই পথ অবলম্বন করার আগে এটা মানুষের কাছে দুর্গম পার্বত্য পথই মনে হতে থাকে। এ উঁচু দুর্গম পার্বত্য পথে চলার জন্য তাকে নিজের প্রবৃত্তির লালসা নিজের বৈষয়িক সার্থের অনুরাগী পরিবার পরিজন, নিজের আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব ও কাজ–কারবারের লোকজন এবং সবচেয়ে বেশী শয়তানের সাথে লড়াই করতে হয়। কারণ এদের প্রত্যেকেই তাকে এ পথে চলতে বাধা দেয় এবং একে ভীতিপ্রদ বানিয়ে তার সামনে হাযির করে। কিন্তু যখন মানুষ সৎবৃত্তির স্বীকৃতি দিয়ে সে পথে চলার সংকল্প করে, নিজের ধন–সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে কার্যত এই সংকল্পকে পাকাপোক্ত করে নেয়, তখন এই দুর্গম পথ

পাড়ি দেয়া তার জন্য সহজ এবং নৈতিক অবনতির গভীর খাদে গড়িয়ে পড়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. এটি দ্বিতীয় ধরনের মানসিক প্রচেষ্টা। প্রথম ধরনের প্রচেষ্টাটির সাথে প্রতি পদে পদে রয়েছে এর অমিল। কৃপণতা মানে শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থে যাকে কৃপণতা বলা হয় তা নয়। অর্থাৎ এক একটি পয়সা গুণে গুণে রাখা, খরচ না করা, না নিজের জন্য না নিজের ছেলেমেয়ের জন্য। বরং এখানে কৃপণতা বলতে আল্লাহর পথে এবং নেকী ও কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় না করা বুঝাচ্ছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে এমন ব্যক্তিকেও কৃপণ বলা যায়, যে নিজের জন্য, নিজের আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যাসনের স্বার্থে এবং নিজের ইচ্ছামতো খুশী ও আনন্দ বিহারে দু'হাতে টাকা উড়ায় কিন্তু কোন ভালো কাজে তার পকেট থেকে একটি পয়সাও বের হয় না। অথবা কখনো বের হলেও তার পেছনে থাকে এর বিনিময়ে দুনিয়ার খ্যাতি, যশ, শাসকদের নৈকট্য লাভ বা অন্য কোন রকমের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার। বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার অর্থ দুনিয়ার বৈষয়িক লাভ ও স্বার্থকে নিজের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের লক্ষে পরিণত করা এবং আল্লাহর ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাওয়া। কোন্ কাজে আল্লাহ খুশী হন এবং কোন্ কাজে নাখোশ হন তার কোন তোয়াক্কা না করা। আর সৎবৃত্তিকে মিথ্যা গণ্য করার মানে হচ্ছে, সৎকাজকে তার সকল বিস্তারিত আকারে সত্য বলে মেনে না নেয়া এখানে এর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ইতিপূর্বে সৎবৃত্তিকে সত্য বলে মেনে নেয়ার বিষয়টি আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

৫. এ পথকে কঠিন বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ পথে যে পাড়ি জমাতে চায় সে যদিও বৈষয়িক লাভ, পার্থিব ভোগ-বিলাস ও বাহ্যিক সাফল্যের লোভে এ দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু এখানে সর্বক্ষণ তাকে নিজের প্রকৃতি, বিবেক, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার তৈরি করা আইন এবং তার চারপাশের সমাজ পরিবেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। সততা, ন্যায় পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা ও নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘন করে যখন সে সর্বপ্রকারে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও লোভ-লালসা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চালায়, যখন তার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হতে থাকে এবং সে অন্যের অধিকার ও মর্যাদার ওপর হস্তক্ষেপ করতে থাকে তখন নিজের চোখেই সে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবে পরিণত হয় এবং যে সমাজে সে বাস করে সেখানেও তাকে প্রতি পদে পদে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। সে দুর্বল হলে এসব কার্যকলাপের জন্য তাকে নানা ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হয়। আর সে ধনী, শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হলে সারা দুনিয়া তার শক্তির সামনে মাথা নত করলেও কারো মনে তার জন্য সামান্যতমও শুভাকাংক্ষা, সম্মানবোধ ও ভালোবাসার প্রবণতা জাগে না। এমন কি তার কাজের সাথী-সহযোগীরাও তাকে একজন বজ্জাত-দুর্বৃত্ত হিসেবেই গণ্য করতে থাকে। আর এ ব্যাপারটি কেবলমাত্র ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী জাতিরাও যখন নৈতিকতার সীমানালংঘন করে নিজেদের শক্তি ও অর্থের বিভ্রমে পড়ে অসৎকাজে লিপ্ত হয় তখন একদিকে বাইরের জগত তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যদিকে তাদের নিজেদের সমাজ অপরাধমূলক কার্যকলাপ, আত্মহত্যা, নেশাখোরী, দুরারোগ্য ব্যাধি, পারিবারিক জীবনের ধ্বংস, যুব সমাজের অসৎপথ অবলম্বন, শ্রেণী সংঘাত এবং জুলুম নিপীড়নের

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

নিসন্দেহে পথনির্দেশ দেয়া তো আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।[৭] আর আসলে আমি তো আখেরাত ও দুনিয়া উভয়েরই মালিক।[৮] তাই আমি তোমাদের সাবধান করে দিয়েছি জ্বলন্ত আগুন থেকে। যে চরম হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ তাতে ঝলসে যাবে না। আর যে পরম মুত্তাকী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধন-সম্পদ দান করে তাকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।[৯] তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। সেতো কেবলমাত্র নিজের রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্য এ কাজ করে।[১০] আর তিনি অবশ্যি (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।[১১]

বিপুলাকার রোগে আক্রান্ত হয়। এমন কি উন্নতির উচ্চতম শিখর থেকে একবার পতন ঘটার পর ইতিহাসের পাতায় তাদের জন্য কলংক, লানত ও অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই থাকেনি।

আর এই ধরনের লোককে আমি কঠিন পথে চলার সুবিধা দেবো, একথা বলার মানে হচ্ছে, তার থেকে সৎপথে চলার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া হবে। অসৎপথের দরজা তার জন্য খুলে দেয় হবে। অসৎকাজ করার যাবতীয় উপকরণ ও কার্যকারণ তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হবে। খারাপ কাজ করা তার জন্য সহজ হবে এবং ভালো কাজ করার চিন্তা মনে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই সে মনে করবে এই বুঝি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই অবস্থাটিকেই কুরআনে অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ যাকে পথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য খুলে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেবার এরাদা করেন তার বক্ষদেশকে সংকীর্ণ করে দেন এবং তাকে এমনভাবে সংকুচিত করেন যার ফলে (ইসলামের কথা মনে হলেই) সে অনুভব করতে থাকে যেন তার প্রাণবায়ু উড়ে যাচ্ছে। (আনআম ১২৫ আয়াত) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ নিসন্দেহে নামায একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ, কিন্তু আল্লাহ অনুগত বান্দার জন্য নয়।" (আল বাকারাহ ৪৬ আয়াত) আর মোনাফেকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "তারা নামাযের দিকে এলেও গড়িমসি করে আসে এবং আল্লাহর পথে খরচ করলেও যেন মন চায় না তবুও খরচ

করে।” (আত তাওবাহ ৫৪ আয়াত) আরো বলা হয়েছে ঃ “তাদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের ওপর জবরদস্তি আরোপিত জরিমানা মনে করে।” (আত তাওবাহ ৯৮ আয়াত)

৬. অন্য কথায় বলা যায়, একদিন তাকে অবশ্যি মরতে হবে। তখন এখানে আয়েশ আরামের জন্য সে যা কিছু সংগ্রহ করেছিল সব এই দুনিয়াতেই রেখে যেতে হবে। যদি নিজের আখেরাতের জন্য এখান থেকে কিছু কামাই করে না নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ার এ ধন–সম্পদ তার কোন্ কাজে লাগবে? সে তো কোন দালান কোঠা, মোটরগাড়ি, সম্পত্তি বা জমানো অর্থ সংগে করে কবরে যাবে না।

৭. অর্থাৎ মানুষের স্রষ্টা হবার কারণে মহান আল্লাহ নিজের জ্ঞানপূর্ণ কর্মনীতি, ন্যায়নিষ্ঠা ও রহমতের ভিত্তিতে নিজেই মানুষকে এ দুনিয়ায় এমনভাবে ছেড়ে দেননি যে, সে কিছুই জানে না। বরং সঠিক পথ কোন্‌টি ও ভুল পথ কোন্‌টি, নেকী, গোনাহ, হালাল ও হারাম কি, কোন্ কর্মনীতি তাকে নাফরমান বান্দার ভূমিকায় এনে বসাবে—এসব কথা জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন।

একথাটিকেই সূরা আন নাহ্‌লে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ “আর সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহরই ওপর বার্তায় যখন বাঁকা পথও রয়েছে।” (৯ আয়াত) ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নাহ্‌ল, ৯ টীকা।

৮. এ বক্তব্যটির কয়েকটি অর্থ হয়। সবগুলো অর্থই সঠিক। এক, দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত কোথাও তোমরা আমার নিয়ন্ত্রণ ও পাকড়াও এর বাইরে অবস্থান করছো না। কারণ আমিই উভয় জাহানের মালিক । দুই, তোমরা আমার দেখানো পথে চলো বা না চলো আসলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের ওপর আমার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। তোমরা ভুল পথে চললে তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না, তোমাদের ক্ষতি হবে। আর তোমরা সঠিক পথে চললে আমার কোন লাভ হবে না, তোমরাই লাভবান হবে। তোমাদের নাফরমানির কারণে আমার মালিকানায় কোন কমতি দেখা দেবে না এবং তোমাদের আনুগত্য তার মধ্যে কোন বৃদ্ধিও ঘটাতে পারবে না। তিন, আমিই উভয় জাহানের মালিক। দুনিয়া তথা বৈষয়িক স্বার্থ চাইলে তা আমার কাছ থেকেই তোমরা পাবে। আবার আখেরাতের কল্যাণ চাইলে তাও দেবার ক্ষমতা একমাত্র আমারই আছে। একথাটিই সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا

“যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সওয়াব হাসিলের সংকল্পে কাজ করবে আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো আর যে ব্যক্তি আখেরাতের সওয়াব হাসিলের সংকল্পে কাজ করবে আমি তাকে আখেরাত থেকে দেবো।”

সূরা শুরা ২০ আয়াতে একথাটি নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ –

"যে ব্যক্তি আখেরাতের কৃষি চায় তার কৃষিকে আমি বাড়িয়ে দেই আর যে দুনিয়ার কৃষি চায় তাকে দুনিয়া থেকেই দান করি, কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।"

আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ১০৫ টীকা এবং আশ শূরা ৩৫ টীকা।

৯. এর অর্থ এই নয় যে, চরম হতভাগ্য ছাড়া আর কেউ জাহান্নামে যাবে না এবং পরম মুত্তাকী ছাড়া আর কেউ তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। বরং দু'টি চরম পরস্পর বিরোধী চরিত্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে পেশ করে তাদের পরস্পর বিরোধী চরম পরিণাম বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। এক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শিক্ষাকে মিথ্যা বলে এবং আনুগত্যের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেবল ঈমান এনেই ক্ষান্ত হয় না বরং পরম আন্তরিকতা সহকারে কোন প্রকার লোক দেখানো প্রবণতা, নাম যশ ও খ্যাতির মোহ ছাড়াই শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে পাক-পবিত্র মানুষ হিসেবে গণ্য হবার আকাংখায় আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। এই দু' ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোক সে সময় মক্কার সমাজে সবার সমানে বর্তমান ছিল। তাই কারো নাম না নিয়ে লোকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, জাহান্নামের আগুনে দ্বিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোক নয় বরং প্রথম ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকই পুড়বে। আর এই আগুন থেকে প্রথম ধরনের লোক নয় বরং দ্বিতীয় ধরনের লোককেই দূরে রাখা হবে।

১০. এখানে সেই মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু ব্যক্তির আন্তরিকতার আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সে নিজের অর্থ যাদের জন্য ব্যয় করে, আগে থেকেই তার কোন অনুগ্রহ তার ওপর ছিল না, যার বদ্‌লা সে এখন চুকাচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে তাদের থেকে আরো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদেরকে উপহার উপঢৌকন ইত্যাদি দিচ্ছে এবং তাদেরকে দাওয়াত খাওয়াচ্ছে। বরং সে নিজের মহান ও সর্বশক্তিমান রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্য এমনসব লোককে সাহায্য করছে, যারা ইতিপূর্বে তার কোন উপকার করেনি এবং ভবিষ্যতেও তাদের উপকার করার কোন আশা নেই। এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম ও বাঁদীদের আযাদ করার কাজটি। মক্কা মু'আয্‌যমার যে অসহায় গোলাম ও বাঁদীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই অপরাধে তাদের মালিকরা তাদের ওপর চরম অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল হযরত আবু বকর (রা) তাদেরকে মালিকদের জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্য কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছিলেন। ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের এই রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ হযরত আবু বকরকে এভাবে গরীব গোলাম ও বাঁদীদেরকে গোলামী মুক্ত করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে দেখে তাঁর পিতা তাকে বলেন, হে পুত্র! আমি দেখছি তুমি দুর্বল লোকদের মুক্ত করে দিচ্ছো, যদি এ টাকাটা তুমি শক্তিশালী জোয়ানদের মুক্ত করার জন্য খরচ করতে তাহলে তারা তোমার হাতকে শক্তিশালী করতো। একথায় হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে বলেনঃ اى ابا ه انما اريد ما عندالله 'আব্বাজান! আমি তো আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান চাই।"

১১. এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। দু'টি অর্থই সঠিক। একটি অর্থ হচ্ছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, শীঘ্রই আল্লাহ এ ব্যক্তিকে এতসব কিছু দেবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে।

আদ দুহা

৯৩

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াদ্‌দুহা (وَالضُّحٰى) –কে এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার বক্তব্য বিষয় থেকে একথা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এটি মক্কা মু'আয্‌যমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়। হাদীস থেকেও জানা যায়, কিছুদিন অহীর অবতরণ বন্ধ ছিল। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। বারবার তাঁর মনে এই আশংকার উদয় হচ্ছিল, হয়তো তাঁর এমন কোন ত্রুটি হয়ে গেছে যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। এ জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, কোন প্রকার অসন্তুষ্টির কারণে অহীর সিলসিলা বন্ধ করা হয়নি। বরং এর পেছনে সেই একই কারণ সক্রিয় ছিল যা আলোকোজ্জ্বল দিনের পরে রাতের নিস্তব্ধতা এ প্রশান্তি ছেয়ে যাবার মধ্যে সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ অহীর প্রখর কিরণ যদি একনাগাড়ে তাঁর প্রতি বর্ষিত হতো তাহলে তাঁর স্নায়ু তা বরদাশত করতে পারতো না। তাই মাঝখানে বিরতি দেয়া হয়েছে। তাঁকে আরাম ও প্রশান্তি দান করাই এর উদ্দেশ্য। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থার মুখোমুখি হন। সে সময় অহী নাযিলের কষ্ট বরদাশত করার অভ্যাস তাঁর গড়ে ওঠেনি। তাই মাঝে মাঝে ফাঁক দেবার প্রয়োজন ছিল। সূরা মুদ্‌দাস্‌সিরের ভূমিকায় আমি একথা সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছি। আর অহী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নায়ুর ওপর এর কী গভীর প্রভাব পড়তো তা আমি সূরা মুয্‌যাম্মিলের ৫ টীকায় বলেছি। পরে তাঁর মধ্যে এই মহাভার বরদাশ্‌ত করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে গেলে আর দীর্ঘ ফাঁক দেবার প্রয়োজন থাকেনি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া। আর এই সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্য ছিল অহী নাযিলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাঁর মধ্যে যে পেরেশানী দেখা দিয়েছিল তা দূর করা। প্রথমে আলো ঝলমল দিনের এবং রাতের নীরবতা ও প্রশান্তির কসম খেয়ে তাঁকে এই মর্মে নিশ্চিন্ততা দান করা হয়েছে যে, তার রব তাঁকে মোটেই পরিত্যাগ করেননি এবং তিনি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। এরপর তাঁকে

সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে যেসব কঠিন সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এগুলো মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। তাঁর জন্য পরবর্তী প্রত্যেকটি পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে উন্নততর হয়ে যেতেই থাকবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এমনভাবে তাঁর দান বর্ষণ করতে থাকবেন যার ফলে তিনি খুশী হয়ে যাবেন। কুরআনের যেসব সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় এটি তার অন্যতম। অথচ যে সময় এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন যেসব অসহায় সাহায্য–সম্বলহীন ব্যক্তি মক্কায় সমগ্র জাতির জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিল তারা যে কোনদিন এত বড় বিস্ময়কর সাফল্যের মুখ দেখবে এর কোন দূরবর্তী আলামতও কোথাও দেখা যায়নি।

তারপর মহান আল্লাহ তাঁর বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করেছি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছি—এ ধরনের পেরেশানীতে তুমি ভুগছো কেন? আমি তো তোমার জন্মের দিন থেকেই তোমার প্রতি অবিরাম মেহেরবানী করে আসছি। তুমি এতিম অবস্থায় জন্মলাভ করেছিলে। আমি তোমার প্রতিপালন ও রক্ষাণাবেক্ষণের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা করেছি। তুমি অনভিজ্ঞ ছিলে। আমি তোমাকে পথের সন্ধান দিয়েছি। তুমি অর্থ–সম্পদহীন ছিলে। আমি তোমাকে বিত্তশালী করেছি। এসব কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তুমি শুরু থেকেই আমার প্রিয়পাত্র আছো এবং আমার মেহেরবানী, অনুগ্রহ দান স্থায়ীভাবে তোমার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সূরা ত্বা–হা'র ৩৭ থেকে ৪২ পর্যন্ত আয়াতগুলোও সামনে রাখতে হবে। এই আয়াতগুলোতে হযরত মূসাকে ফেরাউনের মতো শক্তিশালী জালেমের বিরুদ্ধে পাঠাবার সময় আল্লাহ তাঁর পেরেশানী দূর করার জন্য তাঁর জন্মের পর থেকে কিভাবে আল্লাহর মেহেরবানী তাঁকে ঘিরে রেখেছিল সে কথা তাঁকে বলেন। এই সংগে তাঁকে একথাও বলেন যে, এ অবস্থায় তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এই ভয়াবহ অভিযানে তুমি একাকী থাকবে না বরং আমার মেহেরবানীও তোমার সাথে থাকবে।

সবশেষে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন তার জবাবে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তাঁর কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করতে হবে একথা তাঁকে জানিয়ে দেন।

وَالضُّحٰى ① وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ② مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ③
وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ④ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ⑤

উজ্জ্বল দিনের কসম[১] এবং রাতের কসম যখন তা নিঝুম হয়ে যায়।[২] (হে নবী!) তোমার রব তোমাকে কখনো পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।[৩] নিসন্দেহে তোমার জন্য পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো।[৪] আর শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে।[৫]

১. এখানে 'দুহা' শব্দটি রাতের মোকাবেলায় ব্যবহার করা হয়েছে তাই এর অর্থ উজ্জ্বল দিবা। সূরা আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াতটিকে এর নজীর হিসেবে পেশ করা যায় :

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ -

'জনপদবাসীরা কি এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে পড়েছে যে, তাদের ওপর রাতে আমার আযাব আসবে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে? আর জনপদের লোকেরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে তাদের ওপর দিন-দুপুরে আমার আযাব আসবে যখন তারা খেলতে থাকবে?" (৯৭-৯৮ আয়াত) এই আয়াতগুলোতেও "দুহা" (ضُحًى) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে রাতের মোকাবেলায়। আর এর অর্থ চাশ্‌ত এর সময় নয়, বরং দিন।

২. মূলে রাতের সাথে سَجٰى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে শুধুমাত্র অন্ধকার ছেয়ে যাবারই নয় বরং নিঝুম ও শান্ত হয়ে যাবার অর্থও পাওয়া যায়। সামনের দিকে যে বর্ণনা আসছে তার সাথে রাতের এই গুণাবলীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

৩. হাদীস থেকে জানা যায়, কিছুদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল বন্ধ ছিল। এ সময়টা কতদিনের ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। ইবনে জুরাইজ ১২ দিন, কালবী ১৫ দিন, ইবনে আব্বাস ২৫ দিন, সুদ্দী ও মুকাতিল এর মেয়াদ ৪৫ দিন বলে বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, সময়টা এত দীর্ঘ ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সা) নিজে এ জন্য ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন এবং বিরোধীরাও তাঁকে বিদ্রূপ করতে শুরু করেছিল। কারণ তাঁর ওপর নতুন নতুন সূরা নাযিল হলে তিনি তা

লোকদের শুনাতেন। তাই দীর্ঘদিন যখন তিনি লোকদেরকে কোন অহী শুনালেন না তখন বিরোধীরা মনে করলো এ কালাম যেখান থেকে আসতো সে উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। জন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী (রা) রেওয়ায়াত করেন, যখন জিব্রীল আলাইহিস সালামের আসার সিলসিলা থেমে গেলো, মুশরিকরা বলতে শুরু করলো ঃ মুহাম্মাদকে (সা) তাঁর রব পরিত্যাগ করেছেন। (ইবনে জারীর, তাবারানী, আব্দ ইবনে হুমাইদ, সাঈদ ইবনে মনসূর ও ইবনে মারদুইয়া) অন্যান্য বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রসূল (সা)–এর চাচী আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলের ঘর ছিল তাঁর ঘরের সাথে লাগোয়া। সে তাঁকে ডেকে বললো ঃ "মনে হচ্ছে তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে।" আউফী ও ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ কয়েকদিন পর্যন্ত জিব্রীলের আসা বন্ধ থাকার কারণে রসূলুল্লাহ (সা) পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। অন্যদিকে মুশরিকরা বলতে শুরু করলো, তার রব তার প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তিনি তাকে পরিত্যাগ করেছেন। কাতাদাহ ও যাহ্হাক বর্ণিত মুরসাল* হাদীসেও প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এ অবস্থায় বিভিন্ন হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) গভীর দুঃখ ও মর্মব্যথার কথাও বর্ণিত হয়েছে। আর এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। কারণ প্রেমাস্পদের দিক থেকে বাহ্যত অমনোযোগিতা ও উপেক্ষা, কুফর ও ঈমানের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যাবার পর এই প্রাণান্তকর সংঘাত সংগ্রামের মাঝ দরিয়ায় যে শক্তিটি ছিল তাঁর একমাত্র সহায় তার সাহায্য থেকে বাহ্যত বঞ্চিত হওয়া এবং এর ওপর বাড়তি বিপদ হিসেবে শত্রুদের বিদ্রূপ–ভর্ৎসনা ইত্যাদি এসব কিছু মিলে অবশ্যি তাঁর জন্য মারাত্মক ধরনের পেরেশানী সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ অবস্থায় তাঁর মনে বারবার এ সন্দেহ জেগে থাকবে যে, তিনি এমন কোন ভুল তো করেননি যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তিনি হক ও বাতিলের এই লড়াইয়ে তাঁকে একাকী ছেড়ে দিয়েছেন।

এই অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সূরাটি নাযিল হয়। এতে দিনের আলোর ও রাতের নিরবতার কসম খেয়ে রসূলুল্লাহকে (সা) বলা হয়েছে ঃ তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি নারাজও হননি। একথার জন্য যে সম্বন্ধের ভিত্তিতে এই দু'টি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, দিনের আলোকমালায় উদ্ভাসিত হওয়া এবং রাতের নিঝুমতা ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়া যেমন আল্লাহর দিনে মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট এবং রাতে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকার জন্য নয় বরং একটি বিরাট বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্যের আওতাধীনে এই দু'টি অবস্থার উদ্ভব হয় ঠিক তেমনি তোমার কাছে কখনো অহী পাঠানো এবং তা পাঠানো বন্ধ করাও একটি বিরাট বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্যের আওতাধীনেই হয়ে থাকে। মহান

* মুরসাল এমন এক ধরনের হাদীসকে বলা হয় যেখানে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী হিসেবে সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয়নি অর্থাৎ তাবেয়ী সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়াই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমামদের মধ্যে আবু হানিফা (র) ও মালিক (র)–ই একমাত্র এ ধরনের হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এক বর্ণনামতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) মুরসাল হাদীসের ভিত্তিতে ফতওয়া দিয়েছেন এবং এর বিপরীত রায়কে রদ করেছেন। (আ'লামুল মুকিইন, ইবনে কাইয়েম) –অনুবাদক

আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে অহী পাঠান এবং যখন অহী পাঠান না তখন মনে করতে হবে, তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তোমাকে ত্যাগ করেছেন—এ ধরনের কোন কথা বা বক্তব্যের কোন সম্পর্ক এখানে নেই। এ ছাড়া এই বিষয়বস্তুর সাথে এই কসমের আরো সম্পর্ক রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, দিনে সূর্যের কিরণ যদি অনবরত মানুষের ওপর পড়তে থাকে তাহলে তা তাকে ক্লান্ত ও অবশ করে দেবে। তাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত দিনের আলো বিরাজ করে। এরপরে রাতের আসা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে মানুষ ক্লান্তি দূর করতে ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অনুরূপভাবে অহীর কিরণ যদি অনবরত তোমার ওপর পড়তে থাকে তাহলে তা তোমার স্নায়ুর সহ্যের অতীত হয়ে পড়বে। তাই মাঝে মধ্যে ফাতরাতুল অহীর (অহী নাযিলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যাওয়া) একটি সময়ও আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন। এভাবে অহী নাযিল হওয়ার কারণে তোমার ওপর যে চাপ পড়ে তার প্রভাব খতম হয়ে যাবে এবং তুমি মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারবে। অর্থাৎ অহী সূর্যের উদয় যেন ঠিক উজ্জ্বল দিনের সমতুল্য এবং ফাতরাতুল অহীর সময়টি রাতের প্রশান্তির পর্যায়ভুক্ত।

৪. মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সুখবরটি এমন এক সময় দেন যখন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ছিল তাঁর সহযোগী এবং অন্যদিকে সমগ্র জাতি ছিল তাঁর বিরোধী। বাহ্যত সাফল্যের কোন দূরবর্তী চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। ইসলামের প্রদীপ মক্কাতে টিম টিম করে জ্বলছিল। চতুরদিকে ঝড় উঠেছিল তাকে নিভিয়ে দেবার জন্য। সে সময় আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন ঃ প্রাথমিক যুগের সংকটে তুমি মোটেই পেরেশান হয়ো না। তোমার জন্য পরবর্তী প্রত্যেকটি যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো প্রমাণিত হবে। তোমার শক্তি, সম্মান, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা দিনের পর দিন বাড়তে থাকবে। তোমার প্রভাব ও অনুপ্রবেশের সীমানা বিস্তৃত হতেই থাকবে। আবার এই ওয়াদা কেবল দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে এ ওয়াদাও আছে যে, আখেরাতে তুমি যে মর্যাদা লাভ করবে তা দুনিয়ায় তোমার অর্জিত মর্যাদা থেকে অনেক গুণ বেশী হবে। তাবারানী তাঁর আওসাত গন্থে এবং বাইহাকী তাঁর দালায়েল গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমার পরে আমার উম্মাত যেসব দেশ জয় করবে তা আমার সামনে পেশ করা হয়। তাতে আমি খুব খুশী হই। তখন মহান আল্লাহ একথা নাযিল করেন যে, আখেরাত তোমার জন্য দুনিয়া থেকেও ভালো।"

৫. অর্থাৎ দিতে কিছুটা দেরী হলে সেসময় দূরে নয়, যখন তোমার ওপর তোমার রবের দান ও মেহেরবানী এমনভাবে বর্ষিত হবে যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে। এই ওয়াদাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেই পূর্ণ হয়েছে। সমগ্র আরব ভূখণ্ড, দক্ষিণের সমুদ্র উপকূল থেকে উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের সিরীয় সীমান্ত ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাকী সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে নিয়ে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত এলাকা তাঁর শাসনাধীনে চলে আসে। আরবের ইতিহাসে এই প্রথমবার এই সমগ্র ভূখণ্ডটি একটি আইন ও শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন হয়। যে শক্তিই এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর কালেমায় সমগ্র দেশ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। যে দেশে মুশরিক ও আহ্‌লি কিতাবরা নিজেদের মিথ্যা মতবাদ ও

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

তিনি কি তোমাকে এতিম হিসেবে পাননি? তারপর তোমাকে আশ্রয় দেননি?[৬] তিনি তোমাকে পথ না পাওয়া অবস্থায় পান, তারপর তিনিই পথ দেখান।[৭] তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পান, তারপর তোমাকে ধনী করেন।[৮] কাজেই এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না।[৯] প্রার্থীকে তিরস্কার করো না।[১০] আর নিজের রবের নিয়ামত প্রকাশ করো।[১১]

আদর্শকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল সেখানে মানুষ কেবল আনুগত্যের শিরই নত করেনি বরং তাদের মনও বিজিত হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাসে, নৈতিক চরিত্রে ও কর্মকাণ্ডে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। জাহেলিয়াতের গভীর পংকে নিমজ্জিত একটি জাতি মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে এমনভাবে বদলে যায় যে, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই। এরপর নবী (সা) যে আন্দোলনের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তা বিপুল শক্তিমত্তা সহকারে জেগে ওঠে এবং এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা তিন মহাদেশের বিরাট অংশে ছেয়ে যায় এবং দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এসব মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে দিয়েছেন দুনিয়ায়। আর আখেরাতে তাঁকে যা কিছু দেবেন তার বিপুলতা ও মহত্বের কল্পনাই করা যাবে না। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা–হা ১১২ টীকা)

৬. অর্থাৎ তোমাকে ত্যাগ করার ও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। যখন তুমি এতিম অবস্থায় জন্মলাভ করেছিলে তখন থেকেই তো আমি তোমার প্রতি মেহেরবানী করে আসছি। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন ছয় মাসের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা ইন্তিকাল করেন। কাজেই এতিম হিসেবেই তিনি পৃথিবীতে আসেন। কিন্তু এ অবস্থায় মহান আল্লাহ একদিনও তাঁকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেননি। ছ'বছর বয়স পর্যন্ত মা তাঁকে লালন–পালন করতে থাকেন। তাঁর স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হবার পর থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর দাদা তাঁকে প্রতিপালন করেন। দাদা কেবল তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেনই তাই না বরং তাঁর জন্য গর্বও করতেন। তিনি লোকদের বলতেন, আমার এই ছেলে একদিন দুনিয়ায় বিপুল খ্যাতির অধিকারী হবে। তার ইন্তিকালের পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন–পালনের দায়িত্ব নেন। চাচা তাঁর সাথে এমন প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেন যে, কোন পিতার পক্ষেও এর চেয়ে বেশী প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এমনকি নবুওয়াত লাভের পর সমগ্র জাতি যখন তাঁর শত্রু হয়ে গিয়েছিল তখন দশ বছর পর্যন্ত তিনিই তার সাহায্যার্থে চীনের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

৭. মূলে "দাল্লান" (ضَالاًّ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি এসেছে "দালালাত" (ضَلاَلَت) থেকে। এর কয়েকটি অর্থ হয়। এর একটি অর্থ গোমরাহী। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এক ব্যক্তি পথ জানে না, এক জায়গায় গিয়ে সে সামনে বিভিন্ন পথ দেখে কোন্ পথে যাবে তা ঠিক করতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া বা হারানো জিনিস। আরবী প্রবাদে বলা হয়, ضَلَّ الْمَاءُ فِى اللَّبَنِ অর্থাৎ পানি দুধের মধ্যে হারিয়ে গেছে। মরুভূমির মধ্যে যে গাছটি একাকি দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার আশেপাশে কোন গাছ থাকে না তাকেও আরবীতে "দাল্লাহ" বলা হয়। নষ্ট হয়ে যাওয়া অর্থেও "দালাল" (ضَلاَل) বলা হয়। যেমন, অনুপযোগী ও বিরোধী পরিবেশে কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানেও "দালাল" শব্দ ব্যবহার করা হয়। আবার গাফলতির জন্যও "দালাল" ব্যবহার করা হয়। যেমন কুরআন মজীদে এর দৃষ্টান্ত" দেখা যায় ঃ لاَ يَضِلُّ رَبِّى وَلاَ يَنْسَى অর্থাৎ "আমার রব না গাফেল হন আর না তিনি ভুলে যান।" (ত্বা–হা ৫২) এই বিভিন্ন অর্থের মধ্য থেকে প্রথম অর্থটি এখানে খাপ খায় না। কারণ ইতিহাসে রসূলের শৈশব থেকে নিয়ে নবুওয়াত লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সময়–কালের যেসব অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে তাতে কোথাও তিনি কখনো মূর্তিপূজা, শিরক বা নাস্তিক্যবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন অথবা তাঁর জাতির মধ্যে যেসব জাহেলী কার্যকলাপ, রীতিনীতি ও আচার আচরণের প্রচলন ছিল তার সাথেও তিনি কোনক্রমে জড়িত হয়েছিলেন বলে সামান্যতম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই وَوَجَدَكَ ضَالاًّ বাক্যে কোনক্রমেই এ অর্থ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাঁকে বিশ্বাস ও কর্মের দিক থেকে গোমরাহ হিসেবে পেয়েছিলেন। তবে অন্যান্য অর্থগুলো কোন না কোনভাবে এখানে খাপ খেতে পারে। বরং বিভিন্ন দিক থেকে হয়তো প্রত্যেকটি অর্থই এখানে কার্যকর হতে পারে। নবুওয়াত লাভের পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম আল্লাহর অস্তিত্বে ও তাঁর একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, এতে সন্দেহ নেই। সে সময় তাঁর জীবন গোনাহ মুক্ত এবং নৈতিক গুণাবলী সমন্বিত ছিল। কিন্তু সত্যদীন এবং তার মূলনীতি ও বিধান সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلاَ الْاِيْمَانُ অর্থাৎ "তুমি জানতে না কিতাব কি এবং ঈমানই বা কি।" (আশ্‌শূরা ৫২ আয়াত) এ আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, নবী (সা) একটি জাহেলী সমাজের বুকে হারিয়ে গিয়েছিলেন এবং নবুওয়াত লাভের আগে একজন পথপ্রদর্শক ও পথের দিশা দানকারী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে সামনে আসেনি। এর এ অর্থও হতে পারে যে, জাহেলিয়াতের মরুভূমিতে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন একটি নিসংগ বৃক্ষের মতো। এই বৃক্ষের ফল উৎপাদনের ও চারাগাছ বৃদ্ধি করে আর একটি বাগান তৈরি করার যোগ্যতা ছিল। কিন্তু নবুওয়াতের পূর্বে এ যোগ্যতা কোন কাজে লাগেনি। এ অর্থও হতে পারে যে, মহান আল্লাহ আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন। জাহেলিয়াতের অনুপযোগী ও বিরোধী পরিবেশে তা নষ্ট হতে বসেছিল। "দালাল"কে গাফলতির অর্থেও ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ নবুওয়াত লাভের পরে আল্লাহ তাঁকে যেসব জ্ঞান ও সত্যের সাথে পরিচিত করিয়েছেন ইতিপূর্বে তিনি সেগুলো থেকে গাফেল ছিলেন। কুরআনেও এক জায়গায় বলা হয়েছে। وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ "আর যদিও তুমি ইতিপূর্বে এসব বিষয়ে গাফেল ছিলে।" (ইউসুফ ৩) এ ছাড়াও দেখুন সূরা আল বাকারাহ ২৮৩ আয়াত এবং আশ্ শু'আরা ২০ আয়াত)

৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৈতৃক সূত্রে উত্তরাধিকার হিসেবে শুধুমাত্র একটি উটনী ও একটি বাঁদী লাভ করেছিলেন। এভাবে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের সূচনা হয়। তারপর এমন এক সময় আসে যখন মক্কার সবচেয়ে ধনী মহিলা হযরত খাদীজা (রা) প্রথমে ব্যবসায়ে তাঁকে নিজের সাথে শরীক করে নেন। তারপর তিনি তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হন। এভাবে তাঁর সমস্ত ব্যবসায়ের দায়িত্বও তিনি নিজের হাতে তুলে নেন। এই সুবাদে তিনি কেবল ধনীই হননি এবং তাঁর ধনাঢ্যতা নিছক স্ত্রীর ধনের ওপর নির্ভরশীল ছিল না বরং তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতি বিধানে তাঁর নিজের যোগ্যতা ও শ্রম বিরাট ভূমিকা পালন করে।

৯. অর্থাৎ যেহেতু তুমি নিজে এতিম ছিলে, আল্লাহ তোমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন এবং এতিম অবস্থায় সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তোমাকে সাহায্য–সহায়তা দান করেছেন, তাই আল্লাহর এই সাহায্যের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তুমি কখনো কোন এতিমের প্রতি জুলুম করবে না।

১০. এর দু'টি অর্থ হয়। যদি প্রার্থীকে সাহায্য প্রার্থনাকারী অভাবী হিসেবে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, তাকে সাহায্য করতে পারলে করো আর না করতে পারলে কোমল স্বরে তাকে নিজের অক্ষমতা বুঝিয়ে দাও। কিন্তু কোনক্রমে তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করো না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই নির্দেশটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে—"তুমি অভাবী ছিলে তারপর আল্লাহ তোমাকে ধনী করে দিয়েছেন। আর যদি প্রার্থীকে জিজ্ঞেসকারী অর্থাৎ দীনের কোন বিষয় বা বিধান জিজ্ঞেসকারী অর্থে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, এই ধরনের লোক যতই মূর্খ ও অজ্ঞ হোক না কেন এবং যতই অযৌক্তিক পদ্ধতিতে সে প্রশ্ন করুক বা নিজের মানসিক সংকট উপস্থাপন করুক না কেন, সকল অবস্থায়ই স্নেহশীলতা ও কোমলতা সহকারে তাকে জবাব দাও এবং জ্ঞানের অহংকারে বদমেজাজ লোকদের মতো ধমক দিয়ে বা কড়া কথা বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ো না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই বাণীটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে—"তুমি পথের খোঁজ জানতে না তারপর তিনিই তোমাকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন।" হযরত আবু দারদা (রা) হাসান বসরী (র), সুফিয়ান সওরী (র) এবং অন্যান্য কয়েকজন মনীষী এই দ্বিতীয় অর্থটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ তাদের মতে বক্তব্য বিন্যাসের দিক দিয়ে বিচার করলে এ বক্তব্যটি وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى এর জবাবেই দেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১. নিয়ামত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ এমনসব নিয়ামত হয়, যা এই সূরাটি নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর রসূলকে দান করেছিলেন। আবার এমন সব নিয়ামতও হয়, যা এই সূরায় প্রদত্ত নিজের ওয়াদা এবং পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা দান প্রসংগে তিনি রসূলকে প্রদান করেছিলেন। এর ওপর আবার হুকুম দেয়া হয়েছে, হে নবী! আল্লাহ তোমাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার প্রত্যেকটির কথা স্মরণ কর। এ নিয়ামত প্রকাশ করার পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারে এবং নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি নিয়ামত বিশেষ আকারে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামত প্রকাশের পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ মুখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং

একথার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমি যেসব নিয়ামত লাভ করেছি সবই আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহের ফল। নয়তো এর মধ্যে কোন একটিও আমার নিজের ব্যক্তিগত উপার্জনের ফসল নয়। দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে নবুওয়াতের নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। লোকদের মধ্যে বেশী বেশী করে কুরআন প্রচার করে এবং তার শিক্ষাবলীর সাহায্যে মানুষের হৃদয়দেশ আলোকিত করে কুরআনের নিয়ামত প্রকাশ করা যেত পারে। পথহারা মানুষদের সরল সত্য পথ দেখিয়ে দিয়ে এবং সবরের সাহায্যে এই কাজের যাবতীয় তিক্ততা ও কষ্টের মোকাবেলা করে হেদায়াত লাভের নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। এতিম অবস্থায় সাহায্য–সহায়তা দান করে আল্লাহ যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন এতিমদের সাথে ঠিক তেমনি অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করে এই নিয়ামতটি প্রকাশ করা যেতে পারে। দারিদ্র্য ও অভাব থেকে সচ্ছলতা ও ধনাঢ্যতা দান করার জন্য যে অনুগ্রহ আল্লাহ করেছেন অভাবী মানুষদের সাহায্য করেই সেই নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। মোটকথা, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করার পর একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে তাঁর রসূলকে এই গভীর ও ব্যাপক অর্থপূর্ণ হেদায়াত দান করেন।

আলাম নাশরাহ

৯৪

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ দু'টিকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরা আদ্ দুহার সাথে এর বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় এ সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে একই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মক্কা মু'আয্যমায় আদ্ দুহার পরেই এই সূরাটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির উদ্দেশ্যও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দান করা। নবুওয়াত লাভ করার পর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই তাঁকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, নবুওয়াত লাভের আগে তাঁকে কখনো তেমনি অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়নি। তাঁর নিজের জীবনে এটি ছিল একটি মহাবিপ্লব। নবুওয়াত পূর্ব জীবনে এ ধরনের কোন বিপ্লবের ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই দেখতে দেখতে সমগ্র সমাজ তাঁর দুশমন হয়ে যায়। অথচ পূর্বে এই সমাজে তাঁকে বড়ই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। যেসব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গোত্রীয় লোকজন ও মহল্লাবাসী ইতিপূর্বে তাঁকে মাথায় তুলে রাখতো তারাই এখন তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকে। মক্কায় এখন আর কেউ তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল না। পথে তাঁকে দেখলে লোকেরা শিস দিতো, যা তা মন্তব্য করতো। প্রতি পদে পদে তিনি সংকটের সম্মুখীন হতে থাকেন। যদিও ধীরে ধীরে এসব অবস্থার মোকাবেলা করতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তবুও এই প্রথম দিকের দিনগুলো তাঁর জন্য ছিল বড়ই কঠিন এবং এগুলো তাঁর মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এ জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে প্রথমে সূরা আদ্ দুহা এবং পরে এই সূরাটি নাযিল হয়।

এই সূরায় মহান আল্লাহ প্রথমেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন; আমি তোমাকে তিনটি বিরাট বিরাট নিয়ামত দান করেছি। এগুলোর উপস্থিতিতে তোমার মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই। তার মধ্যে একটি হচ্ছে হৃদয়দেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার নিয়ামত। দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে যে ভারী বোঝা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল তা কি আমি তোমার ওপর থেকে নামিয়ে দেইনি? তৃতীয়টি হচ্ছে, সুনাম ও

সুখ্যাতিকে উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করার নিয়ামত। এই নিয়ামতটি তাঁর চেয়ে বেশী আর কাউকে দেয়া তো দূরের কথা তাঁর সমানও কাউকে কখনো দেয়া হয়নি। সামনের দিকের ব্যাখ্যায় আমি এ তিনটি নিয়ামত বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং এগুলো কত বড় নিয়ামত ছিল তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

এরপর বিশ্ব–জাহানের প্রভু তাঁর বান্দা ও রসূলকে এই মর্মে নিশ্চন্ততা দান করেছেন যে, সমস্যা ও সংকটের যে যুগের মধ্য দিয়ে তুমি এগিয়ে চলছো এটা কোন সুদীর্ঘ যুগ নয়। বরং এখানে সমস্যা, সংকট ও সংকীর্ণতার সাথে সাথে প্রশস্ততার যুগও চলে আসছে। এই এক কথাই সূরা আদ্ দুহায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ তোমার জন্য প্রত্যেকটি পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো হবে এবং শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমন সবকিছু দেবেন যাতে তোমার মন খুশীতে ভরে যাবে।

সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের এসব কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে একটি মাত্র জিনিসের সাহায্যে। সেটি হচ্ছে ঃ নিজের কাজ–কর্ম থেকে ফুরসত পাবার সাথে সাথেই তুমি পরিশ্রম পূর্ণ ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হয়ে যাও। আর সমস্ত জিনিসের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো এটি সেই একই উপদেশের পুনরাবৃত্তি যা সূরা মুয্যাম্মিলের ৯ আয়াতে আরো বেশী বিস্তারিতভাবে তাঁকে দান করা হয়েছে।

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ① وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ② الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ③ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ④ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑤ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ⑦ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ⑧

হে নবী! আমি কি তোমার বক্ষদেশ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি ?[১] আমি তোমার ওপর থেকে ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।[২] আর তোমার জন্য তোমার খ্যাতির কথা বুলন্দ করে দিয়েছি।[৩] আসলে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে।[৪] অবশ্যই সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে। কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদাতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও এবং নিজের রবেরই প্রতি মনোযোগ দাও।[৫]

১. এ প্রশ্নটি সহকারে বক্তব্য শুরু করায় এবং এর পরবর্তী বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা থেকে প্রকাশ হয় ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার পর প্রথম যুগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কঠিন বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো তাঁকে ভীষণভাবে পেরেশান করে রেখেছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে সম্বোধন করে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, হে নবী ! আমি কি তোমার প্রতি অমুক অমুক মেহেরবানী করিনি ? তাহলে এই প্রাথমিক সংকটগুলোর মুখোমুখি হয়ে তুমি পেরেশান হচ্ছো কেন ?

কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে সেগুলোর দু'টি অর্থ জানা যায়। এক, সূরা আন'আমের ১২৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ "কাজেই যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায়াত দান করার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" আর সূরা যুমারের ২২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ –

"তাহলে কি যার বক্ষদেশ আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তারপর যে তার রবের পক্ষ থেকে একটি আলোর দিকে চলেছে.......................?"

এই উভয় স্থানে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করার অর্থই হচ্ছে, সব রকমের মানসিক অশান্তি ও সংশয় মুক্ত হয়ে একথার ওপর নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া যে, ইসলামের পথই একমাত্র সত্য এবং ইসলাম মানুষকে যে আকীদা–বিশ্বাস, সভ্যতা–সংস্কৃতি ও নৈতিকতার যে মূলনীতি এবং যে হেদায়াত ও বিধিবিধান দান করেছে তা সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল। দুই, সূরা শু'আরার ১২–১৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ যখন হযরত মূসাকে নবুওয়াতের মহান দায়িত্বে নিযুক্ত করে ফেরাউন ও তার বিশাল সাম্রাজ্যের সাথে সংঘাত–সংঘর্ষের হুকুম দিচ্ছিলেন তখন হযরত মূসা (আ) আরয করেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ

"হে আমার রব! আমার ভয় হচ্ছে তারা আমাকে মিথ্যা বলবে এবং আমার বক্ষদেশ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।"

আর সূরা ত্বা–হা'র ২৫–২৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْٓ اَمْرِىْ

"হে আমার রব! আমার বক্ষদেশ আমার জন্য খুলে দাও এবং আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও।"

এখানে সংকীর্ণতার মানে হচ্ছে, নবুওয়াতের মতো একটি মহান দায়িত্ব সম্পাদন করার এবং একটি অতি পরাক্রমশালী কুফরী শক্তির সাথে একাকী সংঘর্ষ মুখর হবার হিম্মত মানুষের হয় না। আর বক্ষদেশের প্রশস্ততার মানে হচ্ছে, হিম্মত বুলন্দ হওয়া, কোন বৃহত্তর অভিযানে অগ্রসর হওয়া ও কোন কঠিনতর কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে ইতস্তত না করা এবং নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব পালন করার হিম্মত সৃষ্টি হওয়া।

একটু চিন্তা করলে এ বিষয়টি অনুভব করা যায় যে, এই আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার এ দু'টি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে এর মানে হয়, নবুওয়াত লাভের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের মুশরিক, খৃষ্টান, ইহুদী, অগ্নি উপাসক সবার ধর্মকে মিথ্যা মনে করতেন আবার আরবের কোন কোন তাওহীদের দাবীদারের মধ্যে যে 'হানীফী' ধর্মের প্রচলন ছিল তার প্রতিও তিনি আস্থাশীল ছিলেন না। কারণ এটি ছিল একটি অস্পষ্ট আকীদা। এখানে সঠিক পথের কোন বিস্তারিত চেহারা দেখা যেতো না। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আস সাজ্‌দার ৫ টীকায় আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।) কিন্তু তিনি নিজে যেহেতু সঠিক পথ জানতেন না তাই মারাত্মক ধরনের মানসিক সংশয়ে ভুগছিলেন। নবুওয়াত দান করে আল্লাহ তাঁর এই সংশয় দূর করেন। তাঁর সামনে সঠিক পথ উন্মুক্ত করে মেলে ধরেন। এর ফলে তিনি পূর্ণ মানসিক নিশ্চন্ততা ও প্রশান্তি লাভ করেন। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর মানে হয়, নবুওয়াত দান করার সাথে সাথে এই মহান দায়িত্বের বোঝা উঠাবার জন্য যে ধরনের মনোবল, সাহস, সংকল্পের দৃঢ়তা এবং মানসিক উদারতা ও প্রশস্ততার প্রয়োজন তা আল্লাহ তাঁকে দান করেন। তিনি এমন বিপুল ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হন, যা তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষের মধ্যে স্থিতি লাভ করতে পারতো না। তিনি এমন বাস্তব বুদ্ধি ও কলাকৌশলের অধিকারী হন, যা বৃহত্তম বিকৃতি দূর ও সংশোধন করার যোগ্যতা

রাখতো। তিনি জাহেলিয়াতের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকা এবং নিরেট মূর্খ ও অজ্ঞ সমাজে কোন প্রকার সহায় সম্বল ও বাহ্যত কোন পৃষ্ঠপোষকতাহীন শক্তির সহায়তা ছাড়াই ইসলামের পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবার, বিরোধিতা ও শত্রুতার বড় বড় তুফানের মোকাবেলায় ইতস্তত না করার এবং এই পথে যেসব কষ্ট ও বিপদ আপদ আসে সবরের সাথে তা বরদাশ্ত করার যোগ্যতা অর্জন করেন। কোন শক্তিই তাঁকে নিজের অবস্থান থেকে এক বিন্দু সরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখতো না। এই বক্ষদেশ উন্মোচন এবং হৃদয়ের অংগন প্রশস্ত করার অমূল্য সম্পদ যখন তাঁকে দান করা হয়েছে তখন কাজের সূচনা লগ্নে যেসব সমস্যা সংকুল-বিপদ-কষ্ট দেখা দিয়েছে তাতে তিনি মর্মাহত হচ্ছেন কেন?

কোন কোন তাফসীরকার বক্ষদেশ উন্মুক্ত করাকে বক্ষ বিদীর্ণ করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। মূলত এই মু'জিযাটির প্রমাণ হাদীস নির্ভর। কুরআন থেকে এর প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। আরবী ভাষার দিক দিয়ে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করাকে (شرح صدر) কোনভাবেই বক্ষবিদীর্ণ করার (شق صدر) অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে না। আল্লামা আলূসী রুহুল মা'আনী গ্রন্থে বলেন ঃ

حمل الشرح فى الاية على شق الصدر ضعيف عند المحققين

"গবেষক আলেমগণের মতে এই আয়াতে উন্মুক্ত করাকে বক্ষবিদীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা একটি দুর্বল কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

২. কোন কোন মুফাস্‌সির এর অর্থ এভাবে নিয়েছেন যে, নবুওয়াত পূর্ব জাহেলী যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কিছু ত্রুটি করেছিলেন যেগুলোর চিন্তায় তিনি অত্যন্ত পেরেশান থাকতেন এবং যেগুলো তাঁর কাছে অত্যন্ত ভারী মনে হতো। এই আয়াতটি নাযিল করে আল্লাহ তাঁর এই ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন বলে তাঁকে নিশ্চিন্ত করে দেন। কিন্তু আমার মতে, এখানে এই অর্থ গ্রহণ করা এক মারাত্মক পর্যায়ের ভুল। প্রথমত "বিয্‌রুন" (وزر) শব্দের অর্থ যে অবশ্যই গোনাহ হতে হবে তা নয়। বরং ভারী বোঝা অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাই অযথা একে খারাপ অর্থে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয়ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত পূর্ব জীবনও এত বেশী পাক পরিচ্ছন্ন ছিল যার ফলে কুরআন মজীদের বিরোধীদের সামনে তাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তাই কাফেরদেরকে সম্বোধন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে একথা বলানো হয়েছে ঃ

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ "এই কুরআন পেশ করার আগে তোমাদের মধ্যে আমি জীবনের একটি বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছি।" (ইউনুস ১৬ আয়াত) আবার সবাইকে লুকিয়ে গোপনে গোপনে একটি গোনাহ করবেন এমন ধরনের লোকও তিনি ছিলেন না। (নাউযুবিল্লাহ) এমনটি যদি হতো, তাহলে আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত থাকতেন না এবং নিজের চরিত্রে গোপন কলংক বহন করে ফিরছেন এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে সর্ব সমক্ষে সূরা ইউনুসের পূর্বোল্লিখিত আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা বলাতেন না। কাজেই আসলে এই আয়াতে "বিয্‌র" শব্দের সঠিক অর্থ হচ্ছে ভারী বোঝা। আর এই ভারী বোঝা বলতে নিজের জাতির মূর্খতা ও জাহেলী কর্মকাণ্ড দেখে তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মন যেভাবে দুঃখ, ব্যথা, কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে

উঠেছিল তাই এখানে বুঝানো হয়েছে। তিনি দেখছিলেন লোকেরা হাতে বানানো মূর্তির পূজা করছে। চারদিকে শিরক ও শিরক উৎপাদিত কল্পনাবাদ ও কুসংস্কারের ছড়াছড়ি নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও নৈতিক চরিত্রের অবনতি গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমাজে জুলুম, নিপীড়ন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। শক্তিশালীদের পাঞ্জার নীচে শক্তিহীনরা পিষে মরছিল। মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া হচ্ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে লুটতরাজ করতো। কোন কোন ক্ষেত্রে শত শত বছর পর্যন্ত চলতো প্রতিশোধমূলক লড়াইয়ের জের। কারো পেছনে শক্তিশালী দলীয় শক্তি ও মজবুত জনবল না থাকলে তার ধন, প্রাণ, ইজ্জত, আবরু সংরক্ষিত থাকতো না। এই অবস্থা দেখে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হতেন। কিন্তু এই গলদ দূর করার কোন পথই তিনি দেখছিলেন না। এই চিন্তাই তাঁর কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। মহান আল্লাহ হেদায়াতের পথ দেখিয়ে এই বিরাট বোঝা তাঁর ওপর থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের দায়িত্বে সমাসীন হতেই তিনি জানতে পেরেছিলেন, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনাই এমন একটি চাবিকাঠি যা দিয়ে মানব জীবনের সব রকমের বিকৃতির তালা খোলা যেতে পারে এবং জীবনের সকল দিকে সংশোধনের পথ পরিষ্কার করা যেতে পারে। মহান আল্লাহর এই পথনির্দেশনা তাঁর মানসিক দুশ্চিন্তার সমস্ত বোঝা হালকা করে দিয়েছিল। এর মাধ্যমে তিনি কেবল আরবের নয় বরং আরবের বাইরে ও সমগ্র দুনিয়ার মানব সমাজ যেসব অন্যায় ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত ছিল তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে পারবেন বলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন।

৩. যে সময় একথা বলা হয়েছিল তখন কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, মাত্র হাতেগোণা কয়েকজন লোক যে ব্যক্তির সংগী হয়েছে এবং কেবলমাত্র মক্কা শহরের মধ্যে যার সমস্ত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ, তাঁর আওয়াজ আবার কেমন করে সারা দুনিয়ায় বুলন্দ হবে এবং কোন্ ধরনের খ্যাতিই বা তিনি অর্জন করবেন। কিন্তু এই অবস্থায় আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ সুসংবাদ দিলেন এবং অদ্ভুত পদ্ধতিতে তা বাস্তবায়িতও করলেন। সর্বপ্রথম তাঁর নাম বুলন্দ ও তাঁর চর্চা ব্যাপক করার কাজ সম্পন্ন করলেন তিনি তাঁর শত্রুদের সাহায্যে। মক্কার কাফেররা তার ক্ষতি করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলো। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ হজ্জের সময় আরবের সমগ্র এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক লোক মক্কা শহরে জমায়েত হতো। এ সময় কাফেরদের প্রতিনিধি দল হাজীদের প্রত্যেকটি তাঁবুতে যেতো এবং তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতো যে, এখানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে একজন ভয়ংকর লোকের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি লোকদের ওপর এমনভাবে যাদু করেন যার ফলে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কাজেই আপনারা তার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলবেন। হজ্জের মওসুম ছাড়া অন্যান্য দিনেও যারা কাবা শরীফ যিয়ারত করতে আসতো অথবা ব্যবসায় উপলক্ষে যারা মক্কায় আসতো তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাতো কিন্তু এর ফলে আরবের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায়ও তাঁর নাম পৌঁছে গেলো। মক্কার অপরিচিত গণ্ডীর ভেতর থেকে বের করে এনে শত্রুরাই সারা আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল। এরপর লোকদের মনে এই প্রশ্ন জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই লোকটি কে? কি বলতে চায়? সে কেমন লোক? তার যাদুতে কারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং তাদের ওপর তার যাদুর কি প্রভাব পড়ছে? মক্কার কাফেরদের

প্রচারণা যত বেশী বেড়েছে লোকদের মধ্যে এই জানার আগ্রহ তত বেশী বেড়েছে। তারপর অনুসন্ধানের মাধ্যমে লোকেরা তাঁকে জেনেছে। তাঁর চরিত্র ও কাজ–কারবারের সাথে পরিচিত হয়েছে। লোকেরা কুরআন শুনেছে। তিনি যেসব বিষয় পেশ করছেন সেগুলো জেনেছে। যখন তারা দেখলো, যে জিনিসকে যাদু বলা হচ্ছে, তাতে যারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের জীবন ধারা আরবের সাধারণ লোকদের জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে, তখন দুর্নাম সুনামে রূপান্তরিত হয়ে যেতে লাগলো। এমন কি হিজরতের আগেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো যার ফলে দূরের ও কাছের এমন কোন আরব গোত্রই ছিল না যার কোন না কোন লোক বা পুরা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং যার কিছু কিছু লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল ও আগ্রহী হয়ে ওঠেনি। এটি ছিল তাঁর খ্যাতির কথা বুলন্দ হবার প্রথম পর্যায়। এরপর হিজরতের পর থেকে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়ে গেলো। এর মধ্যে একদিকে মোনাফেক, ইহুদি ও সমগ্র আরবের মুশরিক প্রধানরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্নাম রটাতে তৎপর হয়ে উঠলো এবং অন্যদিকে মদীনা তাইয়েবার ইসলামী রাষ্ট্রটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহ ভীতি, তাকওয়া, ইবাদাত, বন্দেগী, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা, সুষ্ঠু সামাজিকতা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, মানবিক সাম্য, ধনীদের বদান্যতা, গরীবদেরকে সাহায্য সহায়তা দান, অংগীকার ও শপথ রক্ষা এবং মানুষের সাথে ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সততার এমন বাস্তব নমুনা পেশ করছিল, যা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছিল। শত্রুরা যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর এই বর্ধিষ্ণু প্রভাব বিলীন করতে চাইলো। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে ঈমানদারদের শক্তিশালী জামায়াত তৈরী হয়েছিল। নিয়ম–শৃংখলা, বীরত্ব–সাহসিকতা, মৃত্যুকে ভয় না করা এবং যুদ্ধাবস্থায়ও নৈতিক সীমারেখাকে কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে এই জামায়াত নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যার ফলে সমগ্র আরব তার প্রভাবাধীন হয়ে গেলো। দশ বছরের মধ্যে তাঁর খ্যাতির কথা বুলন্দ হয়ে গেল। অর্থাৎ যে দেশে তাঁর বিরোধীরা তাঁকে বদনাম করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সমগ্র এলাকায় এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে ও সর্বত্র "আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। তারপর এই তৃতীয় পর্যায়টি শুরু হলো খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামল থেকে। সে সময় তাঁর মুবারক নাম সারা দুনিয়ায় উচ্চারিত হতে লাগলো। এই সিলসিলাটি আজ পর্যন্ত বেড়েই চলছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বেড়ে যেতেই থাকবে। দুনিয়ার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মুসলমানদের কোন জনপদ নেই এবং দিনের মধ্যে পাঁচবার আযানের মধ্যে বুলন্দ আওয়াজে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের ঘোষণা করা হচ্ছে না, নামাযে রসূলুল্লাহর (সা) ওপর দরূদ পড়া হচ্ছে না, জুম'আর খুতবায় তাঁর পবিত্র নাম পাঠ করা হচ্ছে না এবং বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন সময় এমন নেই যখন সারা দুনিয়ার কোন না কোন জায়গায় তাঁর মুবারক নাম উচ্চারিত হচ্ছে না। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে যখন আল্লাহ বলেছিলেন (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) (আর তোমার নাম ও খ্যাতির কথা আমি বুলন্দ করে দিয়েছি অর্থাৎ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করেছি।) তখন কেউ একথা অনুমানই করতে পারতো না যে, এমন সাড়ম্বরে ও ব্যাপকভাবে এই নাম বুলন্দ করার কাজটি সম্পন্ন হবে। এটি কুরআনের সত্যতার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন ঃ "জিব্রীল আমার কাছে আসেন। আমাকে বলেন, আমার রব ও আপনার রব জিজ্ঞেস করছেন ঃ আমি কিভাবে তোমার নাম বুলন্দ (رَفَعْ ذِكْرَ) করেছি? আমি আরজ করি, আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি বলেন, আল্লাহর উক্তি হচ্ছে ঃ যখন আমার নাম বলা হয় তখন সেই সাথে তোমার নামও বলা হবে।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, মুসনাদে আবু লাইলা, ইবনুল মুনযির, ইবনে হিব্বান, ইবনে মারদুইয়া ও আবু নু'আইম) পরবর্তীকালের সমগ্র ইতিহাস সাক্ষ দিচ্ছে, একথাটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে।

৪. একথাটি দু'বার বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরোপুরি সান্ত্বনা দেয়াই এর উদ্দেশ্য। সে সময় তিনি যে কঠিন অবস্থা ও পর্যায় অতিক্রম করেছিলেন তা বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকবে না বরং এরপর শিগৃগির ভালো অবস্থা শুরু হবে, একথা তাঁকে বুঝিয়ে দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। আপাত দৃষ্টিতে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা এবং দারিদ্র্যের সাথে সচ্ছলতা এ দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিস একই সময় একসাথে জমা হতে পারে না। কিন্তু তবুও সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা না বলে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা এই অর্থে বলা হয়েছে যে, প্রশস্ততার যুগ এত বেশী নিকটবর্তী যেন মনে হয় সে তার সাথেই চলে আসছে।

৫. অবসর পাওয়ার অর্থ হচ্ছে, নিজের কাজকাম থেকে অবসর পাওয়া, তা ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও ইসলাম প্রচারের কাজ হতে পারে বা ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে শিক্ষা ও তরবিয়ত দানের কাজও হতে পারে অথবা নিজের ঘরের ও বাইরের বৈষয়িক কাজও হতে পারে। এই নির্দেশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন আর কোন কাজ থাকবে না তখন নিজের অবসর সময়টুকু ইবাদাতের পরিশ্রম ও সাধনায় ব্যয় করো এবং সবদিক থেকে দৃষ্টি ও মনোযোগ ফিরিয়ে এনে একমাত্র নিজের রবের প্রতি মনোযোগী হয়ে যাও।

আত তীন

৯৫

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আত্‌তীন (اَلتِّيْنِ) –কে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

কাতাদাহ এটিকে মাদানী সূরা বলেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে দু'টি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। একটি বক্তব্যে একে মক্কী এবং অন্যটিতে মাদানী বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেম একে মক্কী গণ্য করেছেন। এর মক্কী হবার সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এই যে, এই সূরায় মক্কা শহরের জন্য هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (এই নিরাপদ শহরটি) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, যদি মদীনায় এটি নাযিল হতো তাহলে মক্কার জন্য "এই শহরটি" বলা ঠিক হতো না। তাছাড়াও সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে এটিকে মক্কা মু'আয্‌যমারও প্রথম দিকের সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত বলে মনে হয়। কারণ এর নাযিলের সময় কুফর ও ইসলামের সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল এমন কোন চিহ্নও এতে পাওয়া যায় না। বরং এর মধ্যে মক্কী যুগের প্রথম দিকের সূরাগুলোর মতো একই বর্ণনাভংগী পাওয়া যায়। এই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি অপরিহার্য এবং একান্ত যুক্তিসঙ্গত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তির স্বীকৃতি। এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মহান মর্যাদাশালী নবীগণের আত্মপ্রকাশের স্থানসমূহের কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তব বিষয়টি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কোথাও বলা হয়েছে ঃ মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে তার সামনে সিজদা করার হুকুম দিয়েছেন। (আল বাকারাহ ৩০–৩৪, আল আরাফ ১১, আল আন'আম ১৬৫, আল হিজর ২৮–২৯, আন নাম্‌ল ৬২, সাদ ৭১–৭৩ আয়াত) কোথাও বলা হয়েছে ঃ মানুষ আল্লাহর এমন একটি আমানতের বাহক হয়েছে যা বহন করার শক্তি পৃথিবী, আকাশ ও পাহাড় কারো ছিল না। (আল আহযাব ৭২ আয়াত) আবার কোথাও বলা হয়েছে ঃ আমি বনী আদমকে মর্যাদাশালী করেছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (বনী ইসরাঈল ৭০ আয়াত) কিন্তু এখানে বিশেষ করে নবীগণের আত্মপ্রকাশের

স্থানগুলোর কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, মানুষকে এমন উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে যার ফলে তার মধ্যে নবুওয়াতের মত সর্বাধিক উন্নত পদমর্যাদা সম্পন্ন লোক জন্ম নিয়েছে। আর এই নবুওয়াতের চাইতে উঁচু পদমর্যাদা আল্লাহর অন্য কোন সৃষ্টি লাভ করেনি।

এরপর বলা হয়েছে, দুনিয়ায় দুই ধরনের মানুষ পাওয়া যায়। এক ধরনের মানুষ এই সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হবার পর দুষ্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে বেং নৈতিক অধপতনের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে একেবারে সর্বনিম্ন গভীরতায় পৌঁছে যায়। সেখানে তাদের চাইতে নীচে আর পৌঁছতে পারে না। দ্বিতীয় ধরনের মানুষ ঈমান ও সৎকাজের পথ অবলম্বন করে এই পতন থেকে রক্ষা পায়। তাদেরকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার অপরিহার্য দাবী যে উন্নত স্থান সে স্থানেই তারা প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব জাতির মধ্যে এই দুই ধরনের লোকের অস্তিত্ব এমন একটি বাস্তব সত্য যাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। কারণ মানুষের সমাজে সব জায়গায় সবসময় এটি দেখা যাচ্ছে।

সবশেষে এই বাস্তব সত্যটির মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে যখন এই দু'টি আলাদা আলাদা এবং পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ পাওয়া যায় তখন কাজের প্রতিদানের ব্যাপারটি কেমন করে অস্বীকার করা যেতে পারে? যারা অধপতনের গভীর গর্তে নেমে গেছে এবং যারা উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌঁছে গেছে তাদেরকে যদি কোন প্রতিদান না দেয়া হয় এবং উভয় দলের পরিণতি একই হয়, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর রাজত্বে কোন ইনসাফ নেই। অথচ শাসককে ইনসাফ অবশ্যি করতে হবে, এটা মানুষের সাধারণ জ্ঞান এবং মানবিক প্রকৃতির দাবী। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ যিনি সকল শাসকের বড় শাসক তিনি ইনসাফ করবেন না, একথা কেমন করে কল্পনা করা যেতে পারে।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

তীন ও যায়তূন,[১] সিনাই পর্বত[২] এবং এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা) কসম। আমি মানুষকে পয়দা করেছি সর্বোত্তম কাঠামোয়।[৩] তারপর তাকে উল্টো ফিরিয়ে নীচতমদেরও নীচে পৌঁছিয়ে দিয়েছি[৪] তাদেরকে ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করতে থাকে। কেননা তাদের রয়েছে এমন পুরস্কার যা কোনদিন শেষ হবে না।[৫] কাজেই (হে নবী!) এরপর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে কে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে?[৬] আল্লাহ কি সব শাসকের চাইতে বড় শাসক নন?[৭]

১. এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে অনেক বেশী মতবিরোধ দেখা যায়। হাসান বসরী, ইকরামাহ, আতা ইবনে আবী রাবাহ, জাবের ইবনে যায়েদ, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখ্‌য়ী রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, তীন বা ইন্‌জীর (গোল হাল্‌কা কাল্‌চে বর্ণের এক রকম মিষ্টি ফল) বলতে এই সাধারণ তীনকে বুঝানো হয়েছে, যা লোকেরা খায়। আর যায়তূন বলতেও এই যায়তূনই বুঝানো হয়েছে, যা থেকে তেল বের করা হয়। ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম এরি সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। যেসব তাফসীরকার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন তারা তীন ও যায়তূনের বিশেষ গুণাবলী ও উপকারিতা বর্ণনা করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এসব গুণের কারণে মহান আল্লাহ এই দু'টি ফলের কসম খেয়েছেন। সন্দেহ নেই, একজন সাধারণ আরবী জানা ব্যক্তি তীন ও যায়তূন শব্দ শুনে সাধারণভাবে আরবীতে এর পরিচিত অর্থটিই গ্রহণ করবেন। কিন্তু দু'টি কারণে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। এক, সামনে সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের কসম খাওয়া হয়েছে। আর দু'টি ফলের সাথে দু'টি শহরের কসম খাওয়ার ব্যাপারে কোন মিল নেই। দুই, এই চারটি জিনিসের কসম খেয়ে সামনের দিকে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের আলোচনা তার সাথে খাপ খায় কিন্তু এই ফল দু'টির

আলোচনা তার সাথে মোটেই খাপ খায় না। মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে যেখানেই কোন জিনিসের কসম খেয়েছেন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উপকারিতা গুণের জন্য খাননি। বরং কসম খাবার পর যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সেই বিষয়ের জন্যই কসম খেয়েছেন। কাজেই এই ফল দু'টির বিশেষ গুণাবলীকে কসমের কারণ হিসেবে উপস্থাপিত করা যায় না।

অন্য কোন কোন তাফসীরকার তীন ও যায়তূন বলতে কোন কোন স্থান বুঝিয়েছেন। কা'ব আহবার, কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ বলেন, তীন বলতে দামেশ্‌ক এবং যায়তূন বলতে বায়তুল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তি ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, তীন বলতে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম জূদী পাহাড়ে যে মসজিদ বানিয়েছিলেন তাকে বুঝানো হয়েছে। আর যায়তূন বলতে বায়তুল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। কিন্তু একজন সাধারণ আরবের মনে "ওয়াত্‌ তীন্‌ ওয়ায্‌ যায়তূনে" (وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ) শব্দগুলো শুনামাত্রই এই অর্থ উকি দিতে পারতো না এবং তীন ও যায়তূন যে এই দু'টি স্থানের নাম কুরআনের প্রথম শ্রোতা আরববাসীদের কাছে তা মোটেই সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত ছিল না।

তবে যে এলাকায় যে ফলটি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হতো অনেক সময় সেই ফলের নামে সেই এলাকার নামকরণ করার রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই প্রচলন অনুসারে তীন ও যায়তূন শব্দের অর্থ এই ফল দু'টি উৎপাদনের সমগ্র এলাকা হতে পারে। আর এটি হচ্ছে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকা। কারণ সে যুগের আরবে তীন ও যায়তূন উৎপাদনের জন্য এ দু'টি এলাকাই পরিচিত ছিল। ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম, যামাখ্‌শারী ও আলুসী রাহেমাহমুল্লাহ এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে ইবনে জারীর প্রথম বক্তব্যটিকে অগ্রাধিকার দিলেও একথা মেনে নিয়েছেন যে, তীন ও যায়তূন মানে এই ফল দু'টি উৎপাদনের এলাকাও হতে পারে। হাফেজ ইবনে কাসীরও এই ব্যাখ্যাটি প্রণিধানযোগ্য মনে করেছেন।

২. আসলে বলা হয়েছে তূরে সীনীনা। (طُوْرِ سِيْنِيْنَ) হচ্ছে সিনাই উপদ্বীপের দ্বিতীয় নাম। একে সাইনা বা সীনাই এবং সীনীনও বলা হয়। কুরআনে এক জায়গায় "তূরে সাইনা" (طور سيناء) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে যে এলাকায় তূর পর্বত অবস্থিত তা সীনাই নামেই খ্যাত। তাই আমি অনুবাদে সীনাই শব্দ ব্যবহার করেছি।

৩. একথাটির ওপরই তীন ও যায়তূনের এলাকা অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এবং তূর পর্বত ও মক্কার নিরাপদ শহরের কসম খাওয়া হয়েছে। মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে, একথার মানে হচ্ছে এই যে, তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের দৈহিক সৌষ্ঠব দান করা হয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি। তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের চিন্তা, উপলব্ধি জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করা হয়েছে, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। তারপর যেহেতু নবীগণই হচ্ছেন মানব জাতির প্রতি এই অনুগ্রহ ও পূর্ণতাগুণের সবচেয়ে উন্নত পর্যায়ের নমুনা এবং মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে নবুওয়াত দান করার জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছেন তার জন্য এর চাইতে বড় মর্যাদা আর কিছুই হতে পারে না, তাই মানুষের সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হবার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহর নবীদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহের কসম খাওয়া হয়েছে। সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত অসংখ্য নবীর

আবির্ভাব ঘটে। তূর পর্বতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নবুওয়াত লাভ করেন। আর মক্কা মু'আযযমার ভিত্তি স্থাপিত হয় হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈলের (আ) হাতে। তাঁদেরই বদৌলতে এটি আরবের সবচেয়ে পবিত্র কেন্দ্রীয় নগরে পরিণত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) এ দোয়া করেছিলেন ঃ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا "হে আমার রব! একে একটি নিরাপদ শহরে পরিণত করো।" (আল বাকারাহ ১২৬) আর এই দোয়ার বরকতে আরব উপদ্বীপের সর্বত্র বিশৃংখলার মধ্যে একমাত্র এই শহরটিই আড়াই হাজার বছর থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কাজেই এখানে বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে ঃ আমি মানব জাতিকে এমন উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি যে, তার মধ্যে নবুওয়াতের ন্যায় মহান মর্যাদার অধিকারী মানুষের জন্ম হয়েছে।

৪. মুফাসসিরগণ সাধারণত এর দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক, আমি তাকে বার্ধক্যের এমন এক অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি যেখানে সে কিছু চিন্তা করার, বুঝার ও কাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। দুই, আমি তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন পর্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বক্তব্যের যে উদ্দেশ্যটি প্রমাণ করার জন্য এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে এই দু'টি অর্থকে তার জন্য প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে না। সূরাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, আখেরাতে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা যে যথার্থ সত্য তা প্রমাণ করা। এদিক দিয়ে মানুষদের মধ্যে থেকে অনেককে চরম দুর্বলতম অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেয়া হয় এবং মানুষদের একটি দলকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে—এ দু'টি কথার একটিও এই অর্থের সাথে খাপ খায় না। প্রথম কথাটি শাস্তি ও পুরস্কারের প্রমাণ হতে পারে না। কারণ ভালো ও খারাপ উভয় ধরনের লোক বার্ধক্যের শিকার হয়। কাউকে তার কাজের শাস্তি ভোগ করার জন্য এই অবস্থার শিকার হতে হয় না। অন্যদিকে দ্বিতীয় কথাটি আখেরাতে কার্যকর হবে একে কেমন করে এমন সব লোকের কাছে হিসেবে পেশ করা যেতে পারে যাদের থেকে আখেরাতে শাস্তি ও পুরস্কার লাভের ব্যবস্থার পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য এই সমস্ত যুক্তি–প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে? তাই আমার মতে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার পর যখন মানুষ নিজের দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলোকে দুষ্কৃতির পথে ব্যবহার করে তখন আল্লাহ তাকে দুষ্কৃতিরই সুযোগ দান করেন এবং নিচের দিকে গড়িয়ে দিতে দিতে তাকে এমন নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেন যে, অন্য কোন সৃষ্টি সেই পর্যায়ে নেমে যেতে পারে না। এটি একটি বাস্তব সত্য। মানুষের সমাজে সচরাচর এমনটি দেখা যায়। লোভ, লালসা, স্বার্থবাদিতা, কামান্ধতা, নেশাখোরী, নীচতা, ক্রোধ এবং এই ধরনের অন্যান্য বদ স্বভাব যেসব লোককে পেয়ে বসে তারা সত্যিই নৈতিক দিক দিয়ে নীচতমদেরও নীচে পৌঁছে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুধু মাত্র একটি কথাই ধরা যাক। একটি জাতি যখন অন্য জাতির প্রতি শত্রুতা পোষণ করার ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যায় তখন সে হিংস্রতায় দুনিয়ার হিংস্র পশুদেরকেও হার মানায়। একটি হিংস্র পশু কেবলমাত্র নিজের ক্ষুধার খাদ্য যোগাড় করার জন্য অন্য পশু শিকার করে। যে ব্যাপকভাবে পশুদের হত্যা করে চলে না। কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে চলছে। পশুরা কেবলমাত্র নিজেদের নখর ও দাঁত ব্যবহার করে শিকার করে। কিন্তু এই সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্ট মানুষ নিজের বুদ্ধির সাহায্যে বন্দুক, কামান, ট্যাংক, বিমান, আণবিক বোমা, উদজান বোমা এবং অন্যান্য অসংখ্য মারণাস্ত্র তৈরী করেছে এবং সেগুলোর

সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে সুবিশাল জনপদগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে। পশুরা কেবল আহত বা হত্যা করে। কিন্তু মানুষ নিজদেরই মতো মানুষকে নির্যাতন করার জন্য এমন সব ভয়াবহ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যেগুলোর কথা পশুরা কোন দিন কল্পনাও করতে পারে না। তারপর নিজেদের শত্রুতা ও প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য তারা নীচতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারা মেয়েদের উলংগ করে তাদের মিছিল বের করে। এক একজন মেয়ের ওপর দশ বিশ জন ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। বাপ, ভাই ও স্বামীদের সামনে তাদের স্ত্রী ও মা–বোনদের শ্লীলতাহানি করে। মা–বাপের সামনে সন্তানদেরকে হত্যা করে। নিজের গর্ভজাত সন্তানদের রক্ত পান করার জন্য মাকে বাধ্য করে। মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে এবং জীবন্ত কবর দেয়। দুনিয়ায় পশুদের মধ্যেও এমন কোন হিংস্রতম গোষ্ঠী নেই যাদের বর্বরতাকে কোন পর্যায়ে মানুষদের এই বর্বরতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মানুষের অন্যান্য বড় বড় গুণের ব্যাপারেও এই একই কথা বলা যায়। এগুলোর মধ্য থেকে যেটির দিকে মানুষ মুখ ফিরিয়েছে সেটির ব্যাপারেই নিজেকে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি প্রমাণ করেছে। এমনকি ধর্ম যা মানুষের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, তাকেও সে এমন সংকীর্ণ করে দিয়েছে, যার ফলে সে গাছপালা, জীব–জন্তু ও পাথরের পূজা করতে করতে অবনতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে নারী ও পুরুষের লিংগেরও পূজা করতে শুরু করেছে। দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধর্ম মন্দিরে দেবদাসী রাখছে। তাদের সাথে ব্যভিচার করাকে পুণ্যের কাজ মনে করছে। যাদেরকে তারা দেবতা ও উপাস্য গণ্য করেছে তাদের সাথে সম্পর্কিত দেবকাহিনীতে এমন সব কুৎসিত কাহিনী জুড়ে দিয়েছে যা জঘন্য ও নিকৃষ্টতম মানুষের জন্যও লজ্জার ব্যাপার।

৫. যেসব মুফাস্সির "আসফালা সা-ফেলীন" (اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ) –এর অর্থ করেছেন, বার্ধক্যের এমন একটি অবস্থা যখন মানুষ নিজের চেতনা ও স্বাভাবিক জ্ঞান–বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তারা এই আয়াতের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন, "কিন্তু যারা নিজেদের যৌবনকালে ও সুস্থাবস্থায় ঈমান এনে সৎকাজ করে তাদের জন্য বার্ধক্যের এই অবস্থায়ও সেই একই নেকী লেখা হবে এবং সেই অনুযায়ী তারা প্রতিদানও পাবে। বয়সের এই পর্যায়েও তারা ঐ ধরনের সৎকাজগুলো করেনি বলে তাদের ভালো প্রতিদান দেবার ক্ষেত্রে কিছুই কম করা হবে না।" আর যেসব মুফাস্সির "আসফালা সাফেলীনের" দিকে উল্টো ফিরিয়ে দেবার অর্থ 'জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করা' করেছেন তাদের মতে এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ "ঈমান এনে যারা সৎকাজ করে তারা এর বাইরে তাদেরকে এই পর্যায়ে উল্টো ফেরানো হবে না। বরং তারা এমন পুরস্কার পাবে যার ধারাবাহিকতা কোনদিন খতম হবে না।" কিন্তু এই সূরায় শাস্তি ও পুরস্কারের সত্যতার পক্ষে যে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তার সাথে এই উভয় অর্থের কোন মিল নেই। আমার মতে এই আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, মানুষের সমাজে যেমন সাধারণভাবে দেখা যায়, যেসব লোকের নৈতিক অধপতন শুরু হয় তারা অধপাতে যেতে যেতে একেবারে নীচতমদের নীচে চলে যায়, ঠিক তেমনি প্রতি যুগে সাধারণভাবে দেখা যায়, যারা আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজের কাঠামোয় নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজিয়ে নেয় তারা এই পতনের হাত থেকে বেঁচে গেছে এবং আল্লাহ মানুষকে যে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছিলেন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই তারা অশেষ শুভ প্রতিদানের অধিকারী। অর্থাৎ তারা এমন পুরস্কার পাবে, যা তাদের যথার্থ পাওনা থেকে কম হবে না এবং যার ধারাবাহিকতা কোনদিন শেষও হবে না।

৬. এই আয়াতটির আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে : "কাজেই (হে মানুষ) এরপর কোন্ জিনিসটি তোমাকে শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে?" উভয় অর্থের ক্ষেত্রে লক্ষ ও মূল বক্তব্য একই থাকে। অর্থাৎ মানুষের সমাজে প্রকাশ্যে দেখা যায় সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্ট মানুষদের একটি দল নৈতিক অধপাতে যেতে যেতে একেবারে নীচতমদেরও নীচে পৌছে যায় আবার অন্য একটি দল সৎকাজের পথ অবলম্বন করে এই পতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে এবং মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্য ছিল তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ অবস্থায় পুরস্কার ও শাস্তিকে কেমন করে মিথ্যা বলা যেতে পারে? বুদ্ধি কি একথা বলে, উভয় ধরনের মানুষের একই পরিণাম হবে? ইনসাফ কি একথাই বলে, অধপাতে যেতে যেতে নীচতমদেরও নীচে যারা পৌছে যায় তাদেরকে কোন শাস্তিও দেয়া যাবে না এবং এই অধপতন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে যারা পবিত্র জীবন যাপন করে তাদেরকে কোন পুরস্কারও দেয়া যাবে না? এই কথাটিকেই কুরআনের অন্যান্য স্থানে এভাবে বলা হয়েছে :

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ - مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ -

"আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেবো? তোমাদের কি হয়ে গেছে? তোমরা কেমন ফায়সালা করছো? (আল্ কলম ৩৫-৩৬ আয়াত)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ -

"দুষ্কৃতকারীরা কি একথা মনে করেছে, আমি তাদেরকে এমন লোকদের মতো করে দেবো যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে? উভয়ের জীবন ও মৃত্যু এক রকম হবে? খুবই খারাপ সিদ্ধান্ত যা এরা করছে।" (আল জাসিয়া ২১ আয়াত)

৭. অর্থাৎ যখন দুনিয়ার ছোট ছোট শাসকদের থেকেও তোমরা চাও এবং আশা করে থাকো যে, তারা ইনসাফ করবে, অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবে এবং ভালো কাজ যারা করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবে তখন আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা কি মনে করো? তিনি কি সব শাসকের বড় শাসক নন? যদি তোমরা তাঁকে সবচেয়ে বড় শাসক বলে স্বীকার করে থাকো তাহলে কি তাঁর সম্পর্কে তোমরা ধারণা করো যে, তিনি ইনসাফ করবেন না? তাঁর সম্পর্কে কি তোমরা এই ধারণা পোষণ করো যে, তিনি মন্দ ও ভালোকে একই পর্যায়ে ফেলবেন? তোমরা কি মনে করো তাঁর দুনিয়ায় যারা সবচেয়ে খারাপ কাজ করবে আর যারা সবচেয়ে ভালো কাজ করবে তারা সবাই মরে মাটির সাথে মিশে যাবে। কাউকে তার খারাপ কাজের শাস্তি দেয়া হবে না এবং কাউকে তার ভালো কাজের পুরস্কারও দেয়া হবে না?

ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনুল মুনযির, বায়হাকী, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়া হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন "ওয়াত তীনে ওয়াযযায়তূনে" সূরা পড়তে পড়তে أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ আয়াতটিতে পৌছে তখন যেন সে বলে। بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (হাঁ, এবং আমি তার ওপর সাক্ষদানকারীদের একজন)। আবার কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই আয়াতটি পড়তেন, তিনি বলতেন, سُبْحَانَكَ فَبَلَى (হে আল্লাহ তুমি পবিত্র। আর তুমি এই যা বলছো তা সত্য।

আল'আলাক

৯৬

নামকরণ

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আলাক (عَلَق) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরাটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি اقْرَأْ থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম আয়াতে مَالَمْ يَعْلَمْ এ গিয়ে শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশটি كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশটি যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহী এ ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমার আলেম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত। এ প্রসংগে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অসংখ্য সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তা সর্বাধিক সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য। এ হাদীসে হযরত আয়েশা নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ওহী শুরু হবার সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও ইবনে আব্বাস (রা), আবু মূসা আশ'আরী (রা) ও সাহাবীগণের একটি দলও একথা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম কুরআনের এই আয়াতগুলোই নাযিল হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হারম শরীফে নামায পড়া শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তখন দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়।

অহীর সূচনা

মুহাদ্দিসগণ অহীর সূচনাপর্বের ঘটনা নিজের নিজের সনদের মাধ্যমে ইমাম যুহ্রী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহ্রী এ ঘটনা হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে এবং তিনি নিজের খালা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের (কোন কোন বর্ণনা অনুসারে ভালো স্বপ্নের) মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, মনে হতো যেন দিনের আলোয় তিনি তা দেখছেন। এরপর তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়েন। এরপর কয়েকদিন হেরা গুহায় অবস্থান করে দিনরাত ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়ে দিতে থাকেন। (হযরত আয়েশা (রা) তাহান্নুস (تَحَنُّث) শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইমাম যুহ্রী তা'আব্বুদ (تَعَبُّد) বা ইবাদাত-বন্দেগী শব্দের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি কোন্

ধরনের ইবাদাত করতেন? কারণ তখনো পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদাতের পদ্ধতি তাঁকে শেখানো হয়নি) ঘর থেকে খাবার-দাবার নিয়ে তিনি কয়েকদিন সেখানে কাটাতেন। তারপর হযরত খাদীজার (রা) কাছে ফিরে আসতেন। তিনি আবার কয়েক দিনের খাবারসামগ্রী তাঁকে যোগাড় করে দিতেন। একদিন তিনি হেরা গুহার মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ওপর অহী নাযিল হলো। ফেরেশ্‌তা এসে তাঁকে বললেন : "পড়ো" এরপর হযরত আয়েশা (রা) নিজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : আমি বললাম, "আমি তো পড়তে জানি না।" একথায় ফেরেশতা আমাকে ধরে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন। এমনকি আমি তা সহ্য করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেল্লাম। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো!" আমি বললাম, "আমি তো, পড়তে জানি না।" তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে বুকের সাথে ধরে ভয়ানক চাপ দিলেন। আমার সহ্য করার শক্তি প্রায় শেষ হতে লাগলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো!" আমি আবার বললাম, "আমি তো পড়া জানি না।" তিনি তৃতীয়বার আমাকে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন আমার সহ্য করার শক্তি খতম হবার উপক্রম হলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (পড়ো নিজের রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন) এখান থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানতো না) পর্যন্ত। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে ফিরলেন। তিনি হযরত খাদীজার (রা) কাছে ফিরে এসে বললেন : "আমার গায়ে কিছু (চাদর-কম্বল) জড়িয়ে দাও। আমার গায়ে কিছু (চাদর-কম্বল) জড়িয়ে দাও!" তখন তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেয়া হলো। তাঁর মধ্য থেকে ভীতির ভাব দূর হয়ে গেলে তিনি বললেন : "হে খাদীজা! আমার কি হয়ে গেলো? তারপর তিনি তাঁকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার নিজের জানের ভয় হচ্ছে।" হযরত খাদীজা বললেন : "মোটেই না। বরং খুশী হয়ে যান। আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। সত্য কথা বলেন। (একটি বর্ণনায় বাড়তি বলা হয়েছে, আপনি আমানত পরিশোধ করে দেন,) অসহায় লোকদের বোঝা বহন করেন। নিজে অর্থ উপার্জন করে অভাবীদেরকে দেন। মেহমানদারী করেন। ভালো কাজে সাহায্য করেন।" তারপর তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই। জাহেলী যুগে তিনি ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আরবী ও ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, ভাইজান! আপনার ভাতিজার ঘটনাটা একটু শুনুন। ওয়ারাকা রসূলুল্লাহকে (সা) বললেন : "ভাতিজা! তুমি কি দেখেছো?" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা বললেন : "ইনি সেই নামূস (অহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ মূসার (আ) ওপর নাযিল করেছিলেন। হায়, যদি আমি আপনার নবুওয়াতের জামানায় শক্তিশালী যুবক হতাম! হায়, যদি আমি তখন জীবিত থাকি যখন আপনার কওম আপনাকে বের করে দেবে।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : "এরা কি আমাকে বের করে দেবে?" ওয়ারাকা বললেন : "হাঁ, কখনো এমনটি হয়নি, আপনি যা নিয়ে এসেছেন কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে এবং তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। যদি আমি আপনার

সেই আমলে বেঁচে থাকি তাহলে আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবো।" কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ওয়ারাকা ইন্তিকাল করেন।

এ ঘটনা নিজেই একথা প্রকাশ করছে যে, ফেরেশতার আসার এক মুহূর্ত আগেও রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবী বানিয়ে পাঠানো হবে এ সম্পর্কে তিনি বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তাঁর এই জিনিসের প্রত্যাশী বা আকাংক্ষী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সাথে যে এই ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে, একথা তিনি আদৌ কখনো কল্পনা করতে পারেননি। অহী নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার এভাবে সামনে এসে যাওয়া তাঁর জন্যে ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা। এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর ঠিক তাই হয়েছে যা একজন বেখবর ব্যক্তির সাথে এত বড় একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। এ কারণেই যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে আসেন তখন মক্কার লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সব রকমের আপত্তি উঠায় কিন্তু তাদের একজনও একথা বলেনি, আমরা তো আগেই আশংকা করেছিলাম আপনি কোন একটা কিছু হওয়ার দাবী করবেন, কারণ আপনি বেশ কিছুকাল থেকে নবী হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এ ঘটনা থেকে নবুওয়াতের আগে তাঁর জীবন কেমন পবিত্র ছিল এবং তাঁর চরিত্র ও কর্মকাণ্ড কত উন্নত পর্যায়ের ছিল সে কথাও জানা যায়। হযরত খাদীজা (রা) কোন অল্প বয়স্কা মহিলা ছিলেন না। বরং এই ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর। পনের বছর ধরে তিনি রসূলের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোন দুর্বলতা গোপন থাকতে পারে না। এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে এমনিই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে পেয়েছিলেন যে, যখনই তিনি তাঁকে হেরা গুহার ঘটনা শুনান তখনই নির্দ্বিধায় তিনি স্বীকার করে নেন যে, যথার্থই আল্লাহর ফেরেশতা তাঁর কাছে অহী নিয়ে এসেছিলেন। অনুরূপভাবে ওয়ারাকা ইবনে নওফলও মক্কার একজন বয়োবৃদ্ধ বাসিন্দা ছিলেন। তিনি শৈশব থেকেই মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা) জীবন দেখে আসছিলেন, তাছাড়া পনের বছরের নিকট আত্মীয়তার কারণে তাঁর অবস্থা তিনি আরো গভীরভাবে অবগত ছিলেন। তিনিও এ ঘটনা শুনে একে কোন প্ররোচনা মনে করেননি। বরং শুনার সাথে সাথেই বলে দেন, ইনি সেই একই "নামূস" যিনি মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, তাঁর মতেও মুহাম্মাদ (সা) এমনই উন্নত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না।

দ্বিতীয় অংশ নাযিলের প্রেক্ষাপট

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা'বা শরীফে ইসলামী পদ্ধতিতে নামায পড়তে শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, ঠিক সে সময় এই সূরার দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়। দেখা যায়, নবী হবার পর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে হারম শরীফে নামায পড়তে শুরু করেন এবং এ কাজটির কারণে কুরাইশরা প্রথমবার অনুভব করে যে, তিনি কোন নতুন দীনের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা অবাক চোখে এ দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু আবু

জেহেলের জাহেলী শিরা-উপশিরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সে এভাবে হারম শরীফে ইবাদাত করা যাবে না বলে তাঁকে ধমকাতে থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে কয়েকটি হাদীসে আবু জেহেলের এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দুষ্কৃতি উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আবু জেহেল কুরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করে, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম) কি তোমাদের সামনে যমীনের ওপর মুখ রাখছে? লোকেরা জবাব দেয়, "হাঁ"। একথায় সে বলে, "লাত ও উয্যার কসম, যদি আমি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি তাহলে তার ঘাড়ে পা রেখে দেবো এবং মাটিতে তার মুখ রগড়ে দেবো।" তারপর একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখে সে তাঁর ঘাড়ের ওপর পা রাখার জন্যে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ লোকেরা দেখে সে পিছনের দিকে সরে আসছে এবং কোন জিনিস থেকে নিজের মুখ বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার কি হয়েছে? সে বলে, আমার ও তার মাঝখানে আগুনের একটি পরিখা, একটি ভয়াবহ জিনিস ও কিছু ডানা ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে যদি আমার ধারেকাছে ঘেঁসতো তাহলে ফেরেশতারা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। (আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, আবু নাঈম ইসফাহানী ও বায়হাকী)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ আবু জেহেল বলে, যদি আমি মুহম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বার কাছে নামায পড়তে দেখি তাহলে পায়ের নীচে তার ঘাড় চেপে ধরবো। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, যদি সে এমনটি করে তাহলে ফেরেশতারা প্রকাশ্যে তাকে এসে ধরবে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, আব্দ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া)

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত আর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ছিলেন, আবু জেহেল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এ থেকে নিষেধ করিনি? একথা বলে সে তাঁকে ধমকাতে শুরু করলো। জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কঠোরভাবে ধমক দিলেন। তাঁর ধমকানি শুনে সে বললো, হে মুহাম্মাদ! কিসের জোরে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম! এই উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনযির, তাবারানী ও ইবনে মারদুইয়া)

এই ঘটনাবলীর কারণে كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ থেকে সূরার যে অংশটি শুরু হচ্ছে সেটি নাযিল হয়। কুরআনের এই সূরাটিতে এই অংশটিকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে স্বাভাবিকভাবে এর মর্যাদা তাই হওয়া উচিত। কারণ প্রথম অহী নাযিল হবার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রথম প্রকাশ করেন নামাযের মাধ্যমে এবং এই ঘটনার ভিত্তিতেই কাফেরদের সাথে তাঁর প্রথম সংঘাত হয়।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

পড়ো[১] (হে নবী), তোমার রবের নামে।[২] যিনি সৃষ্টি করেছেন।[৩] জমাট বাঁধা রক্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[৪] পড়ো, এবং তোমার রব বড় মেহেরবান, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন।[৫] মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতো না।[৬]

১. ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলে এসেছি, ফেরেশতা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, পড়ো। তিনি জবাব দিলেন, আমি পড়া জানি না। এ থেকে জানা যায়, ফেরেশতা অহীর এই শব্দগুলো লিখিত আকারে তাঁর সামনে পেশ করেছিলেন এবং তাঁকে সেগুলো পড়তে বলেছিলেন। কারণ ফেরেশতার কথার অর্থ যদি এই হতো, আমি বলতে থাকি এবং আপনি পড়তে থাকুন তাহলে আমি পড়া জানি না একথা বলার তাঁর প্রয়োজন হতো না।

২. অর্থাৎ তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো। অন্য কথায়, বিসমিল্লাহ বলো এবং পড়ো। এ থেকে একথাও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অহী আসার আগে একমাত্র আল্লাহকেই নিজের রব হিসেবে জানতেন ও মানতেন। এ জন্যই তাঁর রবকে, একথা বলার প্রয়োজন হয়নি বরং বলতে হয়েছে, তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো।

৩. শুধু বলা হয়েছে, "সৃষ্টি করেছেন।" কাকে সৃষ্টি করেছেন তা বলা হয়নি। এ থেকে আপনা আপনিই এ অর্থ বের হয়ে আসে, সেই রবের নাম নিয়ে পড়ো যিনি স্রষ্টা, যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহান এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

৪. সাধারণভাবে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টির কথা বলার পর বিশেষ করে মানুষের কথা বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কেমন হীন অবস্থা থেকে তার সৃষ্টিপর্ব শুরু করে তাকে পূর্ণাংগ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। আলাক (عَلَق) হচ্ছে আলাকাহ (عَلَقَه) শব্দের বহুবচন। এর মানে জমাট বাঁধা রক্ত। গর্ভ সঞ্চারের পর প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এটি হচ্ছে সেই প্রাথমিক অবস্থা। তারপর তা গোশ্‌তের আকৃতি ধারণ

كَلَّآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ۝٦ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ۝٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝٨ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝١٠

কখনই নয়,[৭] মানুষ সীমালংঘন করে। কারণ সে নিজেকে দেখে অভাবমুক্ত।[৮] (অথচ) নিশ্চিতভাবেই তোমার রবের দিকেই ফিরে আসতে হবে।[৯] তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে যে এক বান্দাকে নিষেধ করে যখন সে নামায পড়ে?[১০]

করে। এরপর পর্যায়ক্রমে মানুষের আকৃতি লাভের কার্যক্রম শুরু হয়। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হজ্জ ৫ আয়াত, ৫ থেকে ৭ টীকা)

৫. অর্থাৎ তাঁর অশেষ মেহেরবানী। এই হীনতম অবস্থা থেকে শুরু করে তিনি মানুষকে জ্ঞানের অধিকারী করেছেন এটি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় গুণ হিসেবে স্বীকৃত। আর তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞানের অধিকারীই করেননি, কলম ব্যবহার করে তাকে লেখার কৌশল শিখিয়েছেন। এর ফলে কলম জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার, উন্নতি এবং বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যদি তিনি ইলহামী চেতনার সাহায্যে মানুষকে কলম ব্যবহার করার ও লেখার কৌশল না শেখাতেন তাহলে মানুষের জ্ঞানগত যোগ্যতা স্তব্ধ ও পংগু হয়ে যেতো। তার বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার এবং বংশানুক্রমিক অগ্রগতি তথা এক বংশের জ্ঞান আর এক বংশে পৌঁছে যাবার এবং সামনের দিকে আরো উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করার সুযোগই তিরোহিত হতো।

৬. অর্থাৎ মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আল্লাহর কাছ থেকেই সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। আল্লাহ যে পর্যায়ে মানুষের জন্য জ্ঞানের দরজা যতটুকু খুলতে চেয়েছেন ততটুকুই তার জন্য খুলে গিয়েছে। আয়াতুল কুরসীতে একথাটিই এভাবে বলা হয়েছে : وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ "আর লোকেরা তাঁর জ্ঞান থেকে তিনি যতটুকু চান তার বেশী কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না।" (আল বাকারাহ ২৫৫) যেসব জিনিসকে মানুষ নিজের তাত্বিক আবিষ্কার বলে মনে করে সেগুলো আসলে প্রথমে তার জ্ঞানের আওতায় ছিল না। আল্লাহ যখন চেয়েছেন তখনই তার জ্ঞান তাকে দিয়েছেন। মানুষ কোনক্রমেই অনুভব করতে পারেনি যে, আল্লাহ তাকে এ জ্ঞান দান করছেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল সেগুলোর আলোচনা এখান পর্যন্ত শেষ। যেমন হযরত আয়েশার (রা) হাদীস থেকে জানা যায় : এই প্রথম অভিজ্ঞতাটি খুব বেশী কঠিন ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাইতে বেশী বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। তাই তখন কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, তিনি যে রবকে প্রথম থেকে জানেন ও মানেন তিনি সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অহীর সিলসিলা শুরু হয়ে গেছে এবং তাঁকে তিনি নিজের নবী বানিয়ে নিয়েছেন। এর বেশ কিছুকাল পরে সূরা আল মুদ্দাসসিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে নবুওয়াত

লাভ করার পর এখন কি কি কাজ করতে হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল মুদ্দাসসিরের ভূমিকা)।

৭. অর্থাৎ যে মেহেরবান আল্লাহ এত বড় মেহেরবানী করেছেন তাঁর মোকাবেলায় মূর্খতার বশবর্তী হয়ে কখনো এমন কর্মনীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যা সামনের দিকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি যা কিছু সে চাইতো তার সবই সে লাভ করেছে এ দৃশ্য দেখে সে কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে বরং বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে এবং সীমালংঘন করতে শুরু করেছে।

৯. অর্থাৎ দুনিয়ায় সে যাই কিছু অর্জন করে থাকুক না কেন এবং তার ভিত্তিতে অহংকার ও বিদ্রোহ করে ফিরুক না কেন, অবশেষে তাকে তোমার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন এই মনোভাব ও কর্মনীতির পরিণাম সে জানতে পারবে।

১০. বান্দা বলতে এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে কুরআনের কয়েক জায়গায় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا -

"পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে নিয়ে গিয়েছেন এক রাতে মসজিদে হারম থেকে মসজিদে আকসার দিকে।" (বনি ইসরাঈল ১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ

"সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন কিতাব।" (আল কাহফ ১)

وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا -

"আর আল্লাহর বান্দা যখন তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো।" (আল জিন ১৯)

এ থেকে জানা যায়, এটা ভালোবাসার একটা বিশেষ ধরনের প্রকাশভংগী। এ পদ্ধতিতে আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ নবুওয়াতের দায়িত্বে নিযুক্ত করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআনের কোথাও এই পদ্ধতির কথা বলা হয়নি। কোথাও বলা হয়নি, হে নবী! তুমি এভাবে নামায পড়ো। কাজেই কুরআনে যে অহী লিখিত হয়েছে কেবলমাত্র এই অহীটুকুই যে রসূলের (সা) ওপর নাযিল হতো না— এটি তার আর একটি প্রমাণ। বরং এরপরও অহীর মাধ্যমে আরো এমন সব বিষয়ের তালিম দেয়া হতো যা কুরআনে লিখিত হয়নি।

أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٢﴾ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿١٩﴾

তুমি কি মনে করো, যদি (সেই বান্দা) সঠিক পথে থাকে অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়? তুমি কি মনে করো, যদি (এই নিষেধকারী সত্যের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়? সে কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন?[১১] কখনই নয়,[১২] যদি সে বিরত না হয় তাহলে আমি তার কপালের দিকের চুল ধরে তাকে টানবো, সেই কপালের চুল (ওয়ালা) যে মিথ্যুক ও কঠিন অপরাধকারী।[১৩] সে তার সমর্থক দলকে ডেকে নিক[১৪] আমিও ডেকে নিই আযাবের ফেরেশতাদেরকে।[১৫] কখনই নয়, তার কথা মেনে নিয়ো না, তুমি সিজ্‌দা করো এবং (তোমার রবের) নৈকট্য অর্জন করো।[১৬]

১১. বাহ্যত মনে হয়, এখানে প্রত্যেকটি ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তুমি কি সেই ব্যক্তির কার্যকলাপ দেখেছো যে আল্লাহর এক বান্দাকে ইবাদাত করা থেকে বিরত রাখছে? যদি সেই বান্দা সঠিক পথে থাকে অথবা মানুষকে আল্লাহর ভয় দেখায় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, আর এই ইবাদাতে বাধাপ্রদানকারী সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার এই তৎপরতা সম্পর্কে তুমি কি মনে করো? যে ব্যক্তি এই কর্মনীতি অবলম্বন করেছে সে যদি জানতো, যে বান্দা নেকীর কাজ করে আল্লাহ তাকেও দেখেন আবার যে সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট তাকেও দেখেন তাহলে সে কি এই কর্মনীতি অবলম্বন করতে পারতো? আল্লাহ জালেমের জুলুম দেখছেন এবং মজলুমের মজলুমীও দেখছেন। তাঁর এই দেখা এ বিষয়টিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে যে, তিনি জালেমের শাস্তি দেবেন এবং মজলুমের ফরিয়াদ শুনবেন।

১২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি নামায পড়েন তাহলে এই ব্যক্তি নিজের পায়ের চাপে তার ঘাড় পিষে ফেলবে বলে যে হুমকি দিচ্ছে তা কখনো সম্ভবপর হবে না। সে কখনো এমনটি করতে পারবে না।

১৩. কপালের দিক বলে এখানে যার কপাল তাকে বুঝানো হয়েছে।

১৪. যেমন ভূমিকায় আমরা বলেছি, আবু জেহেলের হুমকির জবাবে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধমক দিয়েছিলেন তখন সে বলেছিল, হে

মুহাম্মাদ! তুমি কিসের জোরে আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম, এই উপত্যকায় আমার সমর্থকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তার এই কথায় এখানে বলা হচ্ছে ঃ নাও, এখন তাহলে তোমার সেই সমর্থকদের ডেকে নাও।

১৫. মূলে 'যাবানীয়াহ' (زبانية) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাতাদাহর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি আরবী ভাষায় পুলিশের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর 'যাবান' (زبن) শব্দের আসল মানে হচ্ছে, ধাক্কা দেয়া। রাজা বাদশাহদের দরবারে লাঠিধারী চোবদার থাকতো। তাদের কাজ হতো যার প্রতি বাদশাহ নারাজ হতেন তাকে ধাক্কা দিয়ে দরবার থেকে বের করে দেয়া। কাজেই এখানে আল্লাহর বাণীর অর্থ হচ্ছে, সে তার সমর্থকদেরকে ডেকে আনুক, আর আমি আমার পুলিশ বাহিনী তথা আযাবের ফেরেশাতাদেরকে ডেকে আনি। এই আযাবের ফেরেশতারা তার সমর্থকদেরকে ঠাণ্ডা করে দিক।

১৬. সিজদা করা মানে নামায পড়া। অর্থাৎ হে নবী! তুমি নির্ভয়ে আগের মতো নামায পড়তে থাকো। এর মাধ্যমে নিজের রবের নৈকট্য লাভ করো। সহীহ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ "বান্দা সিজদায় থাকা অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়।" আবার মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরার (রা) এ রেওয়ায়াতটিও উদ্ধৃত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি পড়তেন তখন তেলাওয়াতে সিজ্দা করতেন।

আল কাদ্‌র

৯৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আল কদ্‌র' (اَلْقَدْرِ) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে দ্বিমত রয়ে গেছে। আবু হাইয়ান বাহরুল মুহীত গ্রন্থে দাবী করেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটা মাদানী সূরা। আলী ইবনে আহমাদুল ওয়াহেদী তাঁর তাফসীরে বলেছেন, এটি মদীনায় নাযিলকৃত প্রথম সূরা। অন্যদিকে আল মাওয়ারদী বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মক্কী সূরা। ইমাম সুয়ূতী ইতকান গ্রন্থে একথাই লিখেছেন। ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে যুবাইর (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল। সূরার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলেও একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এর মক্কায় নাযিল হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। সামনের আলোচনায় আমি একথা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

লোকদেরকে কুরআন মজীদের মূল্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করাই এই সূরাটির বিষয়বস্তু। কুরআন মজীদের বিন্যাসের ক্ষেত্রে একে সূরা আলাকের পরে রাখাই একথা প্রকাশ করে যে, সূরা আলাকের প্রাথমিক পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে যে পবিত্র কিতাবটির নাযিল শুরু হয়েছিল তা কেমন ভাগ্য নির্ণয়কারী রাতে নাযিল হয়, কেমন মহান মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব এবং তার এই নাযিল হওয়ার অর্থ কি—এই সূরায় সেকথাই লোকদেরকে জানানো হয়েছে।

প্রথমেই আল্লাহ বলেছেন, আমি এটি নাযিল করেছি। অর্থাৎ এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা নয় বরং আমিই এটি নাযিল করেছি।

এরপর বলেছেন, কদরের রাতে আমার পক্ষ থেকে এটি নাযিল হয়েছে। কদরের রাতের দু'টি অর্থ। দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, এটি এমন একটি রাত যে রাতে তকদীরের ফায়সালা করা হয়। অথবা অন্য কথায় এটি সাধারণ রাতের মতো কোন মামুলি রাত নয়। বরং এ রাতে ভাগ্যের ভাঙা গড়া চলে। এই রাতে এই কিতাব নাযিল হওয়া নিছক একটি কিতাব নাযিল হওয়া নয় বরং এটি শুধুমাত্র কুরাইশ ও আরবের নয়,

সারা দুনিয়ার ভাগ্য পাল্টে দেবে। একথাটিই সূরা দুখানেও বলা হয়েছে (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা দুখানের ভূমিকা ও ৩ নম্বর টীকা) দুই, এটি বড়ই মর্যাদা, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের রাত। সামনের দিকে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটি হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। এর সাহায্যে মক্কার কাফেরদেরকে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশকৃত এই কিতাবকে নিজেদের জন্য একটি বিপদ মনে করেছো। তোমাদের ওপর এ এক আপদ এসে পড়েছে বলে তোমরা তিরস্কার করছো। অথচ যে রাতে এর নাযিল হবার ফায়সালা জারী করা হয় সেটি ছিল পরম কল্যাণ ও বরকতের রাত। এই একটি রাতে মানুষের কল্যাণের জন্য এত বেশী কাজ করা হয়েছে যা মানুষের ইতিহাসে হাজার মাসেও করা হয়নি। একথাটিও সূরা দুখানের তৃতীয় আয়াতে অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা দুখানের ভূমিকায় আমি এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছি।

সবশেষে বলা হয়েছে, এই রাতে ফেরেশতারা এবং জিব্রীল নিজেদের রবের অনুমতি নিয়ে সব রকমের আদেশ নির্দেশ সহকারে নাযিল হন। (সূরা দুখানের চতুর্থ আয়তে একে أَمْرٍ حَكِيمٍ জ্ঞানময় বা সুষ্ঠু বিধান বলা হয়েছে।) সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত এটি হয় পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার রাত। অর্থাৎ কোন প্রকার অনিষ্ট এ রাতে প্রভাব ফেলতে পারে না। কারণ আল্লাহর সমস্ত ফায়সালার মূল লক্ষ্য হয় কল্যাণ। মানুষের জন্য তার মধ্যে কোন অকল্যাণ থাকে না। এমনকি তিনি কোন জাতিকে ধ্বংস করার ফায়সালা করলেও তা করেন মানুষের কল্যাণের জন্য, তার অকল্যাণের জন্য নয়।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

আমি এ (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে।[১] তুমি কি জানো, কদরের রাত কি? কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও বেশী ভালো।[২] ফেরেশতারা ও রূহ[৩] এই রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে নাযিল হয়।[৪] এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময় ফজরের উদয় পর্যন্ত।[৫]

১. মূল শব্দ হচ্ছে আন্‌যালনাহু (أَنزَلْنَاهُ) "আমি একে নাযিল করেছি" কিন্তু আগে কুরআনের কোন উল্লেখ না করেই কুরআনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, "নাযিল করা" শব্দের মধ্যেই কুরআনের অর্থ রয়ে গেছে। যদি আগের বক্তব্য বা বর্ণনাভংগী থেকে কোন্ সর্বনাম কোন্ বিশেষ্যের জায়গায় বসেছে তা প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে এমন অবস্থায় আগে বা পরে কোথাও সেই বিশেষ্যটির উল্লেখ না থাকলেও সর্বনামটি ব্যবহার করা যায়। কুরআনে এর একাধিক দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে। (এ ব্যাপারে আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন আন্ নাজ্‌ম ৯ টীকা)

এখানে বলা হয়েছে, আমি কদরের রাতে কুরআন নাযিল করেছি আবার সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ "রমযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (১৮৫ আয়াত) এ থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হেরা গুহায় যে রাতে আল্লাহর ফেরেশতা অহী নিয়ে এসেছিলেন সেটি ছিল রমযান মাসের একটি রাত। এই রাতকে এখানে কদরের রাত বলা হয়েছে। সূরা দুখানে একে মুবারক রাত বলা হয়েছে। বলা হয়েছে : إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ "অবশ্যি আমি একে একটি বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি।" (৩ আয়াত)

এই রাতে কুরআন নাযিল করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এই রাতে সমগ্র কুরআন অহীর ধারক ফেরেশতাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়। তারপর অবস্থা ও ঘটনাবলী অনুযায়ী তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে জিব্রীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমে তার

আয়াত ও সূরাগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করতে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রা) এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন। (ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী) এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এই রাত থেকেই কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। এটি ইমাম শা'বীর উক্তি। অবশ্যি ইবনে আব্বাসের (রা) ওপরে বর্ণিত বক্তব্যের মতো তাঁর একটি উক্তিও উদ্ধৃত করা হয়। (ইবনে জারীর) যা হোক, উভয় অবস্থায় কথা একই থাকে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কুরআন নাযিলের সিলসিলা এই রাতেই শুরু হয় এবং এই রাতেই সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। তবুও এটি একটি অভ্রান্ত সত্য, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং তাঁর ইসলামী দাওয়াতের জন্য কোন ঘটনা বা ব্যাপারে সঠিক নির্দেশ লাভের প্রয়োজন দেখা দিলে তখনই আল্লাহ কুরআনের সূরা ও আয়াতগুলো রচনা করতেন না। বরং সমগ্র বিশ্ব–জাহান সৃষ্টির পূর্বে অনাদিকালে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানব জাতির সৃষ্টি, তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ, নবীদের ওপর কিতাব নাযিল, সব নবীর পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো এবং তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল করার সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিলেন। কদরের রাতে কেবলমাত্র এই পরিকল্পনার শেষ অংশের বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই সময় যদি সমগ্র কুরআন অহী ধারক ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তা মোটেই বিস্ময়কর নয়।

কোন কোন তাফসীরকার কদরকে তকদীর অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এই রাতে আল্লাহ তকদীরের ফায়সালা জারী করার জন্য তা ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেন। সূরা দুখানের নিম্নোক্ত আয়াতটি এই বক্তব্য সমর্থন করে ঃ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ "এই রাতে সব ব্যাপারে জ্ঞানগর্ভ ফায়সালা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।" (৪ আয়াত) অন্যদিকে ইমাম যুহরী বলেন, কদর অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা। অর্থাৎ এটি অত্যন্ত মর্যাদাশালী রাত। এই অর্থ সমর্থন করে এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতটি "কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও উত্তম।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কোন্‌ রাত ছিল? এ ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। এ সম্পর্কে প্রায় ৪০টি মতের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে আলেম সমাজের সংখ্যাগুরু অংশের মতে রমযানের শেষ দশ তারিখের কোন একটি বেজোড় রাত হচ্ছে এই কদরের রাত। আবার তাদের মধ্যেও বেশীরভাগ লোকের মত হচ্ছে সেটি সাতাশ তারিখের রাত। এ প্রসংগে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো এখানে উল্লেখ করছি।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলেন ঃ সেটি সাতাশের বা উনত্রিশের রাত। (আবু দাউদ) হযরত আবু হুরাইরার (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে সেটি রমযানের শেষ রাত। (মুসনাদে আহমাদ)

যির ইবনে হুবাইশ হযরত উবাই ইবনে কা'বকে (রা) কদরের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি হলফ করে কোন কিছুকে ব্যতিক্রম হিসেবে দাঁড় না করিয়ে বলেন, এটা সাতাশের রাত। (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান)

হযরত আবু যারকে (রা) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা), হযরত হুযাইফা (রা) এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু সাহাবার মনে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে, এটি রমযানের সাতাশতম রাত। (ইবনে আবী শাইবা)

হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর যেমন একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ, উনত্রিশ বা শেষ রাতের মধ্যে রয়েছে কদরের রাত। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাকে খোঁজ রমযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে যখন মাস শেষ হতে আর নয় দিন বাকি থাকে। অথবা সাত দিন বা পাঁচ দিন বাকি থাকে। (বুখারী) অধিকাংশ আলেম এর অর্থ করেছেন এভাবে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে বেজোড় রাতের কথা বলতে চেয়েছেন।

হযরত আবু বকরাহ (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নয় দিন বাকি থাকতে বা সাত দিন বা পাঁচ দিন বা এক দিন বাকি থাকতে অথবা শেষ রাত। তাঁর বক্তব্যের অর্থ ছিল, এই তারিখগুলোতে কদরের রাতকে তালাশ করো। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কদরের রাতকে রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে তালাশ করো। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী) হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এও বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশ রাতে ইতিকাফ করেছেন।

এ প্রসংগে হযরত মু'আবীয়া (রা) হযরত ইবনে উমর (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ যে রেওয়ায়াত করেছেন তার ভিত্তিতে পূর্ববর্তী আলেমগণের বিরাট অংশ সাতাশ রমযানকেই কদরের রাত বলে মনে করেন। সম্ভবত কদরের রাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম থেকে লাভবান হবার আগ্রহে যাতে লোকেরা অনেক বেশী রাত ইবাদাতে কাটাতে পারে এবং কোন একটি রাতকে যথেষ্ট মনে না করে সে জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোন একটি রাত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, যখন মক্কা মু'আয্‌যমায় রাত হয় তখন দুনিয়ার একটি বিরাট অংশে থাকে দিন, এ অবস্থায় এসব এলাকার লোকেরা তো কোন দিন কদরের রাত লাভ করতে পারবে না। এর জবাব হচ্ছে, আরবী ভাষায় 'রাত' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিন ও রাতের সমষ্টিকে বলা হয়। কাজেই রমযানের এই তারিখগুলোর মধ্য থেকে যে তারিখটিই দুনিয়ার কোন অংশে পাওয়া যাবে তার দিনের পূর্বেকার রাতটিই সেই এলাকার জন্য কদরের রাত হতে পারে।

২. মুফাস্‌সিরগণ সাধারণভাবে এর অর্থ করেছেন, এ রাতের সৎকাজ হাজার মাসের সৎকাজের চেয়ে ভালো। কদরের রাত এ গণনার বাইরে থাকবে। সন্দেহ নেই একথাটির মধ্যে যথার্থ সত্য রয়ে গেছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রাতের আমলের বিপুল ফযীলত বর্ণনা করেছেন। কাজেই বুখারী ও মুসলিমে হযরত

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদাতের জন্যে দাঁড়ালো তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হয়েছে।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কদরের রাত রয়েছে রমযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে। যে ব্যক্তি প্রতিদান লাভের আকাংক্ষা নিয়ে এসব রাতে ইবাদাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আল্লাহ তার আগের পিছনের সব গোনাহ্ মাফ করে দেবেন্।" কিন্তু আয়াতে উচ্চারিত শব্দগুলোয় একথা বলা হয়নি اَلْعَمَلُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْعَمَلِ فِىْ اَلْفِ شَهْرٍ (কদরের রাতের আমল হাজার রাতের আমলের চেয়ে ভালো) বরং বলা হয়েছে, "কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে ভালো।" আর মাস বলতে একেবারে গুণে গুণে তিরাশি বছর চার মাস নয়। বরং আরববাসীদের কথার ধরনই এই রকম ছিল, কোন বিপুল সংখ্যার ধারণা দেবার জন্য তারা "হাজার" শব্দটি ব্যবহার করতো। তাই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এই একটি রাতে এত বড় নেকী ও কল্যাণের কাজ হয়েছে যা মানবতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন দীর্ঘতম কালেও হয়নি।

৩. রূহ্ বলতে জিব্রীল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণে সমস্ত ফেরেশতা থেকে আলাদা করে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তারা নিজেদের তরফ থেকে আসে না। বরং তাদের রবের অনুমতিক্রমে আসে। আর প্রত্যেকটি হুকুম বলতে সূরা দুখানের ৫ আয়াতে "আমরে হাকীম" (বিজ্ঞতাপূর্ণ কাজ) বলতে যা বুঝনো হয়েছে এখানে তার কথাই বলা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারাটা রাত শুধু কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেখানে ফিতনা, দুষ্কৃতি ও অনিষ্টকারিতার ছিটেফোটাও নেই।

আল বাইয়েনাহ

৯৮

নামকরণ

প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ আল বাইয়েনাহ (اَلْبَيِّنَةُ) থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটিরও মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। অনেক মুফাস্‌সির বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মক্কী সূরা। আবার অনেক মুফাস্‌সির বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মাদানী সূরা। ইবনুল যুবাইর ও আতা ইবনে ইয়াসারের উক্তি মতে এটি মাদানী সূরা। ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহর এ ব্যাপারে দু'ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। এক উক্তি অনুযায়ী এটি মক্কী এবং অন্য উক্তি অনুযায়ী মাদানী সূরা। হযরত আয়েশা (রা) একে মক্কী গণ্য করেন। বাহরুল মুহীত গ্রন্থ প্রণেতা আবু হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন গ্রন্থ প্রণেতা আবদুল মুনঈম ইবনুল ফারাস এর মক্কী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দেন। অন্যদিকে সূরাটির বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কোন আলামত পাওয়া যায় না যা থেকে এর মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত ফায়সালা করা যেতে পারে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কুরআন মজীদের বিন্যাসের ক্ষেত্রে একে সূরা আলাক ও সূরা কদরের পরে রাখাটাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সূরা আলা'কে সর্বপ্রথম নাযিলকৃত অহী লিপিবদ্ধ হয়েছে। সূরা কদরে বলা হয়েছে সেগুলো কবে নাযিল হয়। আর এই সূরায় এই পবিত্র কিতাবের সাথে একজন রসূল পাঠানো জরুরী ছিল কেন তা বলা হয়েছে।

সর্বপ্রথম রসূল পাঠাবার প্রয়োজন বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, আহলি কিতাব ও মুশরিক নির্বিশেষে দুনিয়াবাসীরা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে। একজন রসূল পাঠানো ছাড়া এই কুফরীর বেড়াজাল ভেদ করে তাদের বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। এ রসূলের অস্তিত্ব তাঁর রিসালাতের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হতে হবে এবং তিনি লোকদের সামনে আল্লাহর কিতাবকে তার আসল ও সঠিক আকৃতিতে পেশ করবেন। অতীতের আসমানী কিতাবসমূহে যেমন বাতিলের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল তেমন কোন মিশ্রণ তাতে থাকবে না এবং তা হবে পুরোপুরি সত্য ও সঠিক শিক্ষা সমন্বিত।

এরপর আহলি কিতাবদের গোমরাহী তুলে ধরা হয়েছে, বলা হয়েছে তাদের এই বিভিন্ন ভুল পথে ছুটে বেড়ানোর মানে এ নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখাননি। বরং

তাদের সামনে সঠিক পথের বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে এসে যাবার পরপরই তারা ভুল পথে পাড়ি জমিয়েছে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ হয়, নিজেদের ভুলের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। এখন আবার আল্লাহর এই রসূলের মাধ্যমে সত্য আর এক দফা সুস্পষ্ট হবার পরও যদি তারা বিভ্রান্তের মতো ভুল পথে ছুটে বেড়াতে থাকে তাহলে তাদের দায়িত্বের বোঝা আরো বেশী বেড়ে যাবে।

এ প্রসংগে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব নবী এসেছিলেন তাঁরা সবাই একটি মাত্র হুকুম দিয়েছিলেন এবং যেসব কিতাব পাঠানো হয়েছিল সেসবে একটি মাত্র হুকুমই বর্ণিত হয়েছিল। সেটি হচ্ছে ঃ সব পথ ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করো। তাঁর ইবাদাত, বন্দেগী ও আনুগত্যের সাথে আর কারোর ইবাদাত–বন্দেগী, আনুগত্য ও উপাসনা আরাধনা শামিল করো না। নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও। চিরকাল এটিই সঠিক দীন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এ থেকেও স্বাভাবিকভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আহলি কিতাবরা এই আসল দীন থেকে সরে গিয়ে নিজেদের ধর্মে যেসব নতুন নতুন কথা বাড়িয়ে নিয়েছে সেগুলো সবই বাতিল। আর আল্লাহর এই নবী যিনি এখন এসেছেন তিনি তাদেরকে এই আসল দীনের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দিচ্ছেন।

সবশেষে পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে, যেসব আহলি কিতাব ও মুশরিক এই রসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। তাদের শাস্তি চিরন্তন জাহান্নাম। আর যারা ঈমান এনে সৎকর্মের পথ অবলম্বন করবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করবে তারা সর্বোত্তম সৃষ্টি। তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। এই তাদের পুরস্কার। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও হয়েছে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾

আহলি কিতাব ও মুশরিকদের[১] মধ্যে যারা কাফের ছিল[২] তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তারা (নিজেদের কুফরী থেকে) বিরত থাকতে প্রস্তুত ছিল না।[৩] (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল[৪] যিনি পবিত্র সহীফা পড়ে শুনাবেন,[৫] যাতে একেবারে সঠিক কথা লেখা আছে।

১. আহলি কিতাব ও মুশরিক উভয় দলই কুফরী কর্মকাণ্ডে জড়িত হলেও দু'দলকে দু'টি পৃথক নাম দেয়া হয়েছে। যাদের কাছে আগের নবীদের আনা কোন আসমানী কিতাব ছিল, তা যত বিকৃত আকারেই থাক না কেন, তারা তা মেনে চলতো, তাদেরকে বলা হয় আহলি কিতাব। আর যারা কোন নবীর অনুসারী ছিল না কোন আসমানী কিতাবও মানতো না তারা মুশরিক। কুরআন মজীদের বহু স্থানে আহলি কিতাবদের শির্কের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তারা বলে, আল্লাহ তিন খোদার একজন।" (আল মায়েদাহ ৭৩) "তারা মসীহকেও খোদা বলে।" (আল মায়েদাহ ১৭) "তারা মসীহকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে।" (আত তাওবা ৩০) আবার ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "তারা উযাইরকে আল্লাহর পুত্র বলে" (আত তাওবা ৩০) কিন্তু এসব সত্ত্বেও কুরআনের কোথাও তাদের জন্য মুশরিক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়নি। বরং তাদের উল্লেখ করা হয়েছে "আহলি কিতাব" বা "যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল" শব্দের মাধ্যমে। অথবা ইয়াহুদ ও নাসারা শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে। কারণ তারা আসল তাওহিদী ধর্ম মানতো, তারপর শির্ক করতো। বিপরীত পক্ষে অ–আহ্লি কিতাবদের জন্য পারিভাষিক পর্যায়ে মুশরিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তারা শির্ককেই আসল ধর্ম গণ্য করতো। তাওহীদকে তারা পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করতো। এ দু'টি দলের মধ্যকার এ পার্থক্যটা শুধুমাত্র পরিভাষার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, শরীয়াতের বিধানের মধ্যেও এ পার্থক্য ছিল। আহলি কিতাবরা আল্লাহর নাম নিয়ে যদি কোন হালাল প্রাণীকে সঠিক পদ্ধতিতে যবেহ করে তাহলে তা মুসলমানদের জন্য হালাল গণ্য করা হয়েছে।

তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করারও অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে মুশরিকদের যবেহ করা প্রাণীও হালাল নয় এবং তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করারও অনুমতি দেয়া হয়নি।

২. এখানে কুফরী শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার কুফরী দৃষ্টিভংগী এর অন্তরভুক্ত। যেমন কেউ এই অর্থে কাফের ছিল যে, সে আদৌ আল্লাহকে মানতো না। আবার কেউ আল্লাহকে মানতো ঠিকই কিন্তু তাঁকে একমাত্র মাবুদ বলে মানতো না। বরং আল্লাহর সত্তা ও তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতায় কোন না কোনভাবে অন্যদেরকে শরীক করে তাদের বন্দেগীও করতো। কেউ আল্লাহর একত্ব স্বীকার করতো কিন্তু এ সত্ত্বেও আবার কোন না কোন ধরনের শির্‌কও করতো। কেউ আল্লাহকে মানতো কিন্তু তাঁর নবীদেরকে মানতো না এবং নবীদের মাধ্যমে যে হেদায়াত এসেছিল তাকে মানতে অস্বীকার করতো। কেউ এক নবীকে মানতো কিন্তু অন্য নবীকে অস্বীকার করতো। মোটকথা, বিভিন্ন ধরনের কুফরীতে লোকেরা লিপ্ত ছিল। এখানে 'আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল', একথা বলার অর্থ এ নয় যে, তাদের মধ্যে তাহলে কিছু লোক ছিল যারা কুফরীতে লিপ্ত ছিল না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, কুফরীতে লিপ্ত দু'টি দল ছিল, একটি আহলি কিতাব ও অন্যটি মুশরিক। এখানে মিন (مِنْ) শব্দটি কতক বা কিছু অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং 'মিন' এখানে বর্ণনামূলক। যেমন সূরা হজ্জের ৩০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ অর্থাৎ মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। এর অর্থ এ নয় যে, মূর্তিদের মধ্যে যে অপবিত্রতা আছে তা থেকে দূরে থাকো। তেমনি الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ এর অর্থও হচ্ছে ঃ যারা কুফরী করে, যারা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের দলের অন্তরভুক্ত। এর অর্থ এ নয় যে, এই দু'টি দলের মধ্য থেকে যারা কুফরী করে।

৩. অর্থাৎ একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে তাদেরকে কুফরীর প্রতিটি গলদ ও সত্য বিরোধী বিষয় বুঝাবে এবং যুক্তি–প্রমাণের সাহায্যে সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে সত্য সঠিক পথ তাদের সামনে পেশ করবে, এ ছাড়া এই কুফরীর অবস্থা থেকে বের হবার আর কোন পথ তাদের সামনে ছিল না। এর মানে এ নয় যে, এই সুস্পষ্ট প্রমাণটি এসে যাবার পর তারা সবাই কুফরী পরিত্যাগ করবে। বরং এর মানে হচ্ছে এই প্রমাণটির অনুপস্থিতিতে তাদের এই অবস্থার মধ্য থেকে বের হয়ে আসা সম্ভবপরই ছিল না। তবে তার আসার পরও তাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তায়। এরপর তারা আল্লাহর কাছে অভিযোগ করতে পারবে না যে, আপনি আমাদের হেদায়াতের কোন ব্যবস্থা করেননি। এই ধরনের কথা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। যেমন সূরা নাহলে বলা হয়েছে ঃ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ "সোজা পথ দেখানো আল্লাহরই দায়িত্ব।" (৯ আয়াত) সূরা লাইলে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى "পথ দেখাবার দায়িত্ব আমার।" (১২ আয়াত)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ....

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ -

"আমি তোমার প্রতি ঠিক তেমনিভাবে অহী পাঠিয়েছি যেভাবে নূহ ও তারপর নবীদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম.........................এই রসূলদেরকে সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী করা হয়েছে যাতে রসূলদের পর লোকদের জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে।" (আন নিসা ১৬৩-১৬৫)

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ ز فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ -

"হে আহলি কিতাব! রসূলদের সিলসিলা দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আমার রসূল এসেছে। যাতে তোমরা বলতে না পারো আমাদের কাছে না কোন সুসংবাদদানকারী এসেছিল, না এসেছিল কোন সতর্ককারী। কাজেই নাও, এখন তোমাদের কাছে সুসংবাদদানকারী এসে গেছে এবং সতর্ককারীও।" (আল মায়েদাহ ১৯)

৪. এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ বলা হয়েছে। কারণ তাঁর নবুওয়াত লাভের আগের ও পরের জীবন, নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কুরআনের মতো কিতাব পেশ করা, তাঁর শিক্ষা ও সাহচর্যের প্রভাবে ঈমান গ্রহণকারীদের জীবনে অস্বাভাবিক পরিবর্তন সূচিত হওয়া, তাঁর পুরোপুরি যুক্তিসংগত আকীদা-বিশ্বাস, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ইবাদাত-বন্দেগী, চূড়ান্ত পর্যায়ের পবিত্র ও নিষ্কলুষ নৈতিক চরিত্র এবং মানব জীবন গঠনের জন্য সবচেয়ে ভালো মূলনীতি ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া, তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে পুরোপুরি সামঞ্জস্য থাকা এবং সব ধরনের বিরোধিতা ও বাধা-বিপত্তির মোকাবেলায় সীমাহীন দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা সহকারে তাঁর নিজের দাওয়াতের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—এসব বিষয়ই তিনি যে যথার্থই আল্লাহর রসূল সে কথারই ছিল সুস্পষ্ট আলামত।

৫. আভিধানিক অর্থে 'সহীফা' বলা হয় "লিখিত পাতাকে।" কিন্তু কুরআন মজীদে এ শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে নবীগণের ওপর নাযিলকৃত কিতাব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর পবিত্র সহীফা মানে হচ্ছে এমন সব সহীফা যার মধ্যে কোন প্রকার বাতিল, কোন ধরনের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা এবং কোন নৈতিক অপবিত্রতার মিশ্রণ নেই। কোন ব্যক্তি এই কথাগুলোর পুরোপুরি গুরুত্ব তখনই অনুধাবন করতে পারবেন যখন তিনি কুরআনের পাশাপাশি বাইবেল (এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থগুলোও) অধ্যয়ন করবেন। সেখানে তিনি দেখবেন সঠিক কথার সাথে সাথে এমন কথাও লেখা আছে, যা সত্য ও ন্যায় এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী। আবার এই সংগে নৈতিক দিক দিয়েও অত্যন্ত নিম্নমানের। এসব কথা পড়ার পর কুরআন পড়লে যে কোন ব্যক্তি তার অসাধারণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

প্রথমে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে তো বিভেদ সৃষ্টি হলো তাদের কাছে (সত্য পথের) সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর।[৬] তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোন হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, এটিই যথার্থ সত্য ও সঠিক দীন।[৭]

৬. অর্থাৎ ইতিপূর্বে আহলি কিতাবরা বিভিন্ন ভুল পথে পাড়ি জমিয়ে যেসব বিভিন্ন দল ও উপদলের উদ্ভব ঘটিয়েছিল তার কারণ এ ছিল না যে, মহান আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে পথ দেখাবার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ পাঠাবার ব্যাপারে কোন ফাঁক রেখেছিলেন। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পথনির্দেশনা আসার পর তারা নিজেরাই এ কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল। কাজেই নিজেদের গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী ছিল। কারণ তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য পূর্ণাংগ ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্রমাণ পূর্ণ করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে এখন যেহেতু তাদের সহীফাগুলো পাক–পবিত্র ছিল না এবং তাদের কিতাবগুলো একেবারে সত্য সঠিক, শিক্ষা সম্বলিত ছিল না, তাই মহান আল্লাহ একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে নিজের একজন রসূল পাঠিয়ে এবং তাঁর মাধ্যমে পুরোপুরি সত্য–সঠিক শিক্ষা সম্বলিত পাক–পবিত্র সহীফা পেশ করে আবার তাদের ওপর প্রমাণ পূর্ণ করে দিলেন। ফলে এর পরেও যদি তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয় তাহলে এর দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে। আল্লাহর মোকাবেলায় তারা কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। কুরআন মজীদের বহু জায়গায় একথা বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা আল বাকারা ২১৩–২৫৩ আয়াত, আলে ইমরান ১৯ আয়াত, আল মায়েদাহ ৪৪–৫০ আয়াত, ইউসুফ ৯৩ আয়াত, আশ শূরা ১৩–১৫ আয়াত, আল জাসিয়াহ ১৬–১৮ আয়াত। এই সাথে তাফহীমুল কুরআনে এসব আয়াতের আমি যে ব্যাখ্যাগুলো লিখেছি সেগুলোর ওপরও যদি একবার নজর বুলানো যায় তাহলে বক্তব্যটি অনুধাবন করা আরো সহজ হবে।

৭. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনটি পেশ করছেন। আহলি কিতাবদের কাছে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল এবং তাদের কাছে যেসব নবী এসেছিলেন তারাও তাদেরকে সেই একই দীনের তালীম দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যেসব বাতিল আকীদা–বিশ্বাস গ্রহণ করে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ–কর্মের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তার কোনটিরও হুকুম তারা দেননি। সবসময় সত্য ও সঠিক দীন একটিই ছিল। আর সেটি হচ্ছে ঃ একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে। তাঁর

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝٨

আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে[৮] তারা নিশ্চিতভাবে জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারা সৃষ্টির অধম।[৯] যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা নিশ্চিতভাবে সৃষ্টির সেরা।[১০] তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এসব সে ব্যক্তির জন্য যে তার রবকে ভয় করে।[১১]

বন্দেগীর সাথে আর কারো বন্দেগীর মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে একমাত্র আল্লাহর পূজারী এবং তাঁর ফরমানের অনুগত হতে হবে। নামায কায়েম করতে হবে। যাকাত দিতে হবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল আ'রাফ ১৯ টীকা, ইউনুস ১০০-১০৯ টীকা, আররূম ৪৩-৪৭ টীকা এবং আয যুমার ৩-৪ টীকা।

এই আয়াতে 'দীনুল 'কাইয়েমা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির একে دِيْنُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ অর্থাৎ "সত্য-সঠিক পথাশ্রয়ী মিল্লাতের দ্বীন" অর্থে নিয়েছেন। আবার কেউ কেউ একে বিশেষ্যের সাথে বিশেষণের সম্বন্ধ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং قَيِّمَةٌ এর ة কে عَلَّامَةٌ ও فَهَّامَةٌ এর মধ্যস্থিত ة এর মতো অত্যধিক বৃদ্ধি অর্থে গ্রহণ করেছেন। আমি এখানে অনুবাদে যে অর্থ গ্রহণ করেছি তাদের মতে এর অর্থও তাই।

৮. এখানে কুফরী মানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মেনে নিতে অস্বীকার করা। অর্থাৎ মুশরিক ও আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যারা এই রসূলের নবুওয়াত লাভের পর তাঁকে মানেনি। অথচ তাঁর অস্তিত্বই একটি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল লিপি সম্বলিত মত পবিত্র সহীফা পাঠ করে তাদেরকে শুনাচ্ছেন। এ ধরনের লোকদের পরিণাম তাই হবে যা সামনের দিকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

৯. অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আর নেই। এমন কি তারা পশুরও অধম। কারণ পশুর বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা ও কর্মশক্তি নেই। কিন্তু এরা বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা ও কর্মশক্তি সত্ত্বেও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১০. অর্থাৎ তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবার এমনকি ফেরেশতাদেরও সেরা। কারণ ফেরেশতারা আল্লাহর নাফরমানি করার স্বাধীন ক্ষমতা রাখে না। আর মানুষ এই নাফরমানি করার স্বাধীন ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে।

১১. অন্য কথায় যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে নির্ভীক এবং তাঁর মোকাবিলায় দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হয়ে জীবন যাপন করে না। বরং দুনিয়ায় প্রতি পদে পদে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে। প্রতি পদক্ষেপে যে ব্যক্তি মনে করে, কোথাও আমি এমন কোন কাজ তো করে বসিনি যার ফলে আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করে ফেলেন, তার জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে এই প্রতিদান ও পুরস্কার।

আয যিলযাল

৯৯

নামকরণ

প্রথম আয়াতের যিলযালাহা (زِلْزَالَهَا) শব্দ থেকে এই নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী বা মাদানী হবার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে মাসউদ (রা), আতা, জাবের ও মুজাহিদ বলেন, এটি মক্কী সূরা। ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তিও এর সমর্থন করে। অন্যদিকে কাতাদাহ ও মুকাতিল বলেন, এটি মাদানী সূরা। এর মাদানী হবার সমর্থনে ইবনে আব্বাসেরও (রা) আর একটি উক্তি পাওয়া যায়। ইবনে আবী হাতেম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে যে রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন তার থেকেও এর মাদানী হবার সমর্থনে প্রমাণ পেশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে : যখন فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ – وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার আমল দেখবো? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। আমি বললাম, এই বড় বড় গোনাহগুলোও দেখবো? জবাব দিলেন, হাঁ। বললাম, আর এই ছোট ছোট গোনাহগুলোও? জবাব দিলেন হাঁ। একথা শুনে আমি বললাম, তাহলে তো আমি মারা পড়েছি। তিনি বললেন, আনন্দিত হও, হে আবু সাঈদ কারণ প্রত্যেক নেকী তার নিজের মতো দশটি নেকীর সমান হবে। এই হাদীস থেকে এই সূরাটির মাদানী হবার ভিত্তিমূলক প্রমাণ পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) মদীনার অধিবাসী ছিলেন। ওহোদ যুদ্ধের পরে তিনি বালেগ হন। তাই যদি তাঁর উপস্থিতিতে নাযিল হয়ে থাকে তাহলে এর মাদানী হওয়া উচিত। কিন্তু আয়াত ও সূরার শানেনুযুল বর্ণনা সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেঈগণের যে পদ্ধতি ছিল তা ইতিপূর্বে সূরা দাহর এর ভূমিকায় আমি বর্ণনা করে এসেছি। তা থেকে জানা যায়, কোন আয়াত সম্পর্কে সাহাবীর একথা বলা যে, এ আয়াতটি উমুক ঘটনা প্রসংগে নাযিল হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট আয়াতটির ঐ সময় নাযিল হওয়ার চূড়ান্ত প্রামণ নয়। হতে পারে হযরত আবু সাঈদ জ্ঞান হবার পর যখন সর্বপ্রথম আয়াতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনেন তখন তার শেষ অংশ তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করে থাকবে এবং তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওপরে বর্ণিত প্রশ্নগুলো করে থাকবেন। আর এই ঘটনাটিকে তিনি এমনভাবে বর্ণনা করে থাকবেন যাতে মনে হবে এই আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই প্রশ্নগুলো করেন। যদি এই হাদীসটি সামনে না থাকে তাহলে কুরআনকে বুঝে অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করবেন এটি একটি

মক্কী সূরা। বরং এর বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনাভংগী থেকে অনুভূত হবে, এটি মক্কায় প্রাথমিক যুগে এমন সময় নাযিল হয় যখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে ইসলামের বুনিয়াদি আকিদা–বিশ্বাস মানুষের সামনে পেশ করা হচ্ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং সেখানে দুনিয়ায় করা সমস্ত কাজের হিসেব মানুষের সামনে এসে যাওয়া। সর্বপ্রথম তিনটি ছোট ছোট বাক্যে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর মানুষের দ্বিতীয় জীবনের সূত্রপাত কিভাবে হবে এবং মানুষের জন্য তা হবে কেমন বিস্ময়কর। তারপর দু'টি বাক্যে বলা হয়েছে, মানুষ এই পৃথিবীর বুকে অবস্থান করে নিশ্চিন্তে সব রকমের কাজ করে গেছে। সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি যে, এই নিষ্প্রাণ জিনিস কোনদিন তার কাজকর্মের পক্ষে–বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহর হুকুমে সেদিন সে কথা বলতে থাকবে। প্রত্যেকটি লোকের ব্যাপারে সে বলবে, কোন্ সময় কোথায় সে কি কাজ করেছিল। তারপর বলা হয়েছে, সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষের নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে দলে দলে আসতে থাকবে। তাদের কর্মকাণ্ড তাদেরকে দেখানো হবে। এমন পূর্ণাংগ ও বিস্তারিতভাবে এই কর্মকাণ্ড পেশ করা হবে যে, সামান্য বালুকণা পরিমাণ নেকী বা পাপও সামনে এসে যাবে।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ② وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤

যখন পৃথিবীকে প্রবলবেগে ঝাঁকুনি দেয়া হবে।[১] পৃথিবী তার ভেতরের সমস্ত ভার বাইরে বের করে দেবে।[২] আর মানুষ বলবে, এর কী হয়েছে?[৩] সেদিন সে তার নিজের (ওপর যা কিছু ঘটেছে সেই) সব অবস্থা বর্ণনা করবে।[৪] কারণ তোমার রব তাকে (এমনটি করার) হুকুম দিয়ে থাকবেন।

১. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا 'যালযালাহ' মানে হচ্ছে, একাদিক্রমে পরপর জোরে জোরে ঝাড়া দেয়া। কাজেই زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ বলতে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে এবং ভূমিকম্পের পর ভূমিকম্পের মাধ্যমে পৃথিবীকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দেয়া হবে। আর যেহেতু পৃথিবীকে নাড়া দেবার কথা বলা হয়েছে তাই এথেকে আপনা–আপনিই এই অর্থ বের হয়ে আসে যে, পৃথিবীর কোন একটি অংশ কোন একটি স্থান বা অঞ্চল নয় বরং সমগ্র পৃথিবীকে কম্পিত করে দেয়া হবে। তারপর এই নাড়া দেবার এই ভূকম্পনের ভয়াবহতা আরো বেশী করে প্রকাশ করার জন্য তার সাথে বাড়তি زِلْزَالَهَا শব্দটিও বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এ শব্দটির শাব্দিক মানে হচ্ছে, "কম্পিত হওয়া।" অর্থাৎ তার মতো বিশাল ভূগোলককে যেভাবে ঝাঁকানি দিলে কাঁপে অথবা যেভাবে ঝাঁকানি দিলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে ভীষণভাবে কাঁপে ঠিক সেভাবে তাকে ঝাঁকানি দেয়া হবে। কোন কোন মুফাস্সির এই কম্পনকে প্রথম কম্পন ধরে নিয়েছেন। তাদের মতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের সূচনা হবে যে কম্পন থেকে এটি হচ্ছে সেই কম্পন। অর্থাৎ যে কম্পনের পর দুনিয়ার সব সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার সমগ্র ব্যবস্থাপনা ওলট–পালট হয়ে যাবে। কিন্তু মুফাস্সিরগণের একটি বড় দলের মতে যে কম্পনের মাধ্যমে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে অর্থাৎ যখন আগের পিছের সমস্ত মানুষ পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠবে, এটি সেই কম্পন। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি বেশী নির্ভুল। কারণ পরবর্তী সমস্ত আলোচনায় এই বিষয়টির প্রকাশ ঘটেছে।

২. এই বিষয়টি সূরা ইনশিকাকের ৪ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ "আর যা কিছু তার মধ্যে রয়েছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়ে খালি হয়ে যাবে।" এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, মরা মানুষ মাটির বুকে যেখানে যে অবস্থায় যে আকৃতিতে আছে তাদের সবাইকে বের করে এনে সে বাইরে ফেলে দেবে। আর পরবর্তী বাক্য থেকে একথা প্রকাশ হচ্ছে যে, সে সময় তাদের শরীরের সমস্ত চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলো এক জায়গায় জমা হয়ে নতুন করে আবার সেই একই আকৃতি সহকারে জীবিত হয়ে উঠবে যেমন সে তার প্রথম জীবনের অবস্থায় ছিল। দুই, এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, কেবলমাত্র মরা মানুষদেরকে সে বাইরে নিক্ষেপ করে ক্ষ্যান্ত হবে না বরং তাদের প্রথম জীবনের সমস্ত কথা ও কাজ এবং যাবতীয় আচার–আচরণের রেকর্ড ও সাক্ষ্য–প্রমাণের যে বিশাল স্তূপ তার গর্ভে চাপা পড়ে আছে সেগুলোকেও বের করে বাইরে ফেলে দেবে। পরবর্তী বাক্যটিতে একথারই প্রকাশ ঘটেছে। তাতে বলা হয়েছে, যমীন তার ওপর যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করবে। তিন, কোন কোন মুফাস্সির এর তৃতীয় একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে, সোনা, রূপা, হীরা, মণি–মাণিক্য এবং অন্যান্য যেসব মূল্যবান সম্পদ ভূ–গর্ভে সঞ্চিত রয়েছে সেগুলোর বিশাল বিশাল স্তূপও সেদিন যমীন উগড়ে দেবে। মানুষ দেখবে, এগুলোর জন্য তারা দুনিয়ায় প্রাণ দিতো। এগুলো কবজা করার জন্য তারা পরস্পর হানাহানি ও কাটাকাটি করতো। হকদারদের হক মেরে নিতো। চুরি–ডাকাতি করতো, জলে স্থলে দস্যুতা করতো। যুদ্ধ–বিগ্রহে লিপ্ত হতো এবং এক একটি সম্প্রদায় ও জাতিকে ধ্বংস করে দিতো। আজ এসব কিছু তাদের সামনে উপস্থিত। অথচ এগুলো এখন আর তাদের কোন কাজে লাগবে না বরং উলটো তাদের জন্য আযাবের সরঞ্জাম হয়ে রয়েছে।

৩. মানুষ অর্থ প্রত্যেকটি মানুষ হতে পারে। কারণ পুনরায় জীবন লাভ করে চেতনা ফিরে পাবার সাথে সাথেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া এটিই হবে যে, এসব কি হচ্ছে? এটা যে হাশরের দিন একথা সে পরে বুঝতে পারবে। আবার মানুষ অর্থ আখেরাত অস্বীকারকারী মানুষও হতে পারে। কারণ যে বিষয়কে অসম্ভব মনে করতো তা তার সামনে ঘটে যেতে থাকবে এবং সে এসব দেখে অবাক ও পেরেশান হবে। তবে ঈমানদারদের মনে এ ধরনের বিস্ময় ও পেরেশানি থাকবে না। কারণ তখন তাদের আকীদা–বিশ্বাস ও প্রত্যয় অনুযায়ীই সবকিছু হতে থাকবে। সূরা ইয়াসিনের ৫২ আয়াতটি এই দ্বিতীয় অর্থটি কতকটা সমর্থন করে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে সময় আখেরাত অস্বীকারকারীরা বলবে : مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا "কে আমাদের শয়নাগার থেকে আমাদের উঠালো?" এর জবাব আসবেঃ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ "এটি সেই জিনিস যার ওয়াদা করুণাময় করেছিলেন এবং আল্লাহর পাঠানো রসূলগণ সত্য বলেছিলেন।" ঈমানদাররাই যে কাফেরদেরকে এই জবাব দেবে, এ ব্যাপারে এ আয়াতটি সুস্পষ্ট নয়। কারণ আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে ঈমানদারদের পক্ষ থেকে তারা এই জবাব পাবে, এ সম্ভাবনা অবশ্যি এখানে আছে।

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পড়ে জিজ্ঞেস করেন : "জানো তার সেই অবস্থা কি?" লোকেরা জবাব দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। রসূল (সা) বলেন : "সেই অবস্থা হচ্ছে,

যমীনের পিঠে প্রত্যেক মানব মানবী যে কাজ করবে সে তার সাক্ষ্য দেবে। সে বলবে, এই ব্যক্তি উমুক দিন উমুক কাজ করেছিল। এই হচ্ছে সেই অবস্থা, যা যমীন বর্ণনা করবে।" (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে জারীর, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া এবং বায়হাকী ফিশ্‌শু'আব) হযরত রাবআহ আল খারাশী রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যমীন থেকে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করে চলবে। কারণ এ হচ্ছে তোমাদের মূল ভিত্তি। আর এমন কোন ব্যক্তি নেই যে এর ওপর ভালো–মন্দ কোন কাজ করে এবং সে তার খবর দেয় না।" (মু'জামুত তাবরানী) হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন যমীন এমন প্রতিটি কাজ নিয়ে আসবে যা তার পিঠের ওপর করা হয়েছে।" তারপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। (ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী) হযরত আলী (রা) সংক্রান্ত জীবনীগ্রন্থে লিখিত হয়েছে ঃ বায়তুলমালের সমুদয় সম্পদ যখন তিনি হকদারদের মধ্যে বন্টন করে সব খালি করে দিতেন তখন সেখানে দু'রাকাত নফল নামায পড়তেন। তারপর বলতেন ঃ "তোকে সাক্ষ্য দিতে হবে, আমি তোকে সত্য সহকারে ভরেছি এবং সত্য সহকারে খালি করেছি।"

যমীনের ওপর যা কিছু ঘটে গেছে তার সবকিছু সে কিয়ামতের দিন বলে দেবে, যমীন সম্পর্কে একথাটি প্রাচীন যুগে মানুষকে অবাক করে দিয়ে থাকবে, এতে সন্দেহ নেই। কারণ তারা মনে করে থাকবে, যমীন আবার কেমন করে কথা বলবে? কিন্তু আজ পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত নতুন নতুন জ্ঞান–গবেষণা, আবিষ্কার–উদ্ভাবন এবং সিনেমা, লাউড স্পীকার, রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার ও ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদির আবিষ্কারের এ যুগে যমীন তার নিজের অবস্থা ও নিজের ওপর ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী কিভাবে বর্ণনা করবে একথা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। মানুষ তার মুখ থেকে যা কিছু উচ্চারণ করে তার পূর্ণ অবয়ব বাতাসে, রেডিও তরংগে, ঘরের দেয়ালে, মেঝে ও ছাদের প্রতি অণু–পরমাণুতে এবং কোন পথে, ময়দানে বা ক্ষেতে কোন কথা বলে থাকলে সেখানকার প্রতিটি অণু–কণিকায় তা গেঁথে আছে। আল্লাহ যখনি চাইবেন একথাগুলোকে এসব জিনিসের মাধ্যমে তখনই হুবহু ঠিক তেমনিভাবে শুনিয়ে দিতে পারবেন যেভাবে সেগুলো একদিন মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। সে সময় মানুষ নিজের কানেই নিজের এই আওয়াজ শুনে নেবে। তার পরিচিত জনেরাও তার এই আওয়াজ চিনে নেবে এবং তারা একে তারই কণ্ঠধ্বনি ও বাকভংগীমা বলে সনাক্ত করবে। তারপর মানুষ যমীনের যেখানেই যে অবস্থায় যে কোন কাজ করেছে তার প্রতিটি নড়াচড়া ও অংগভংগির প্রতিচ্ছবি তার চারপাশের সমস্ত বস্তুতে পড়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে সেসব চিত্রায়িত হয়ে রয়েছে। একেবারে নিকষ কালো আঁধারের বুকে সে কোন কাজ করে থাকলেও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীন এমনসব রশ্মি রয়েছে যেগুলোর কাছে আলো–আঁধার সমান, তারা সকল অবস্থায় তার ছবি তুলতে পারে। এসব ছবি কিয়ামতের দিন একটি সচল ফিল্মের মতো মানুষের সামনে এসে যাবে এবং সারাজীবন সে কোথায় কি করেছে তা তাকে দেখিয়ে দেবে।

আসলে প্রত্যেক মানুষের কর্মকাণ্ড আল্লাহ সরাসরি জানলেও আখেরাতে যখন তিনি আদালত কায়েম করবেন তখন সেখানে যাকেই শাস্তি দেবেন ইনসাফ ও ন্যায়নীতির দাবী

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

সেদিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে,[৫] যাতে তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে দেখানো যায়।[৬] তারপর যে অতি অল্প পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখে নেবে এবং যে অতি অল্প পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তা দেখে নেবে।[৭]

পুরোপুরি পালন করেই শাস্তি দেবেন। তাঁর আদালতে প্রত্যেকটি অপরাধী মানুষের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হবে তার সপক্ষে এমনসব অকুটিল সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হবে যার ফলে তার অপরাধী হবার ব্যাপারে কারো কোন কথা বলার অবকাশ থাকবে না। সর্বপ্রথম পেশ করা হবে তার আমলনামা। সবসময় তার সাথে লেগে থাকা কেরামান কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজ রেকর্ড করছেন। (সূরা কাফ-১৭ আয়াত, সূরা ইনফিতার ১০-১২ আয়াত) এ আমলনামা তার হাতে দিয়ে দেয়া হবে। তাকে বলা হবে, তোমার জীবনের এই কার্যবিবরণী পড়ো। নিজের হিসেব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (বনি ইসরাঈল ১৪) মানুষ তা পড়ে অবাক হয়ে যাবে। কারণ ছোট বড় এমন কোন বিষয় নেই যা তাতে যথাযথভাবে সংযোজিত হয়নি। (আল কাহাফ ৪৯) এরপর হচ্ছে মানুষের নিজের শরীর। দুনিয়ায় এই শরীরের সাহায্যে সে সমস্ত কাজ করেছে। আল্লাহর আদালতে তার জিহবা সাক্ষ দেবে, সে দুনিয়ায় কি কি কথা বলেছে। তার নিজের হাত-পা সাক্ষ দেবে, তাদেরকে দিয়ে সে কোন কোন কাজ করিয়েছে। (আন নূর ২৪) তার চোখজোড়া সাক্ষ্য দেবে। তার কান সাক্ষ দেবে, তার সাহায্যে সে কি কি কথা শুনেছে। তার শরীরের গায়ে লেপ্টে থাকা চামড়া তার যাবতীয় কাজের সাক্ষ দেবে। সে পেরেশান হয়ে নিজের অংগ-প্রত্যংগকে বলবে, তোমরাও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ দিচ্ছো? তার অংগ-প্রত্যংগ জবাব দেবে, আজ যে আল্লাহর হুকুমে সমস্ত জিনিস চলছে তাঁরই হুকুমে আমরাও চলছি। (হা-মীম সাজদাহ ২০ থেকে ২২) এর পরে আছে আরো অতিরিক্ত সাক্ষ। এই সাক্ষগুলো পেশ করা হবে যমীন ও তার চারপাশের সমগ্র পরিবেশ থেকে। সেখানে নিজের আওয়াজ মানুষ নিজের কানে শুনবে। নিজের প্রতিটি কাজকর্মের প্রতিচ্ছবি নিজের চোখেই দেখবে। এর চাইতেও অগ্রসর হয়ে দেখা যাবে, মানুষের মনে যেসব চিন্তা, ইচ্ছা, সংকল্প ও উদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল এবং যেসব নিয়তের মাধ্যমে সে নিজের সমস্ত কাজ করেছিল, তাও সব সামনে এনে রেখে দেয়া হবে। যেমন সামনে সূরা আদিয়াতে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে। এ কারণে এবং এ ধরনের চূড়ান্ত ও জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ সামনে এসে যাবার পর মানুষ অবাক ও নির্বাক হয়ে যাবে। নিজের পক্ষ থেকে ওজর পেশ করার কোন সুযোগই তার থাকবে না। (আল মুরসালাত ৩৫-৩৬)।

৫. এর দু'টো অর্থ হতে পারে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী তার ব্যক্তিগত অবস্থায় অবস্থান করবে। পরিবার, গোষ্ঠী, জোট, দল, সম্প্রদায় ও জাতি সব ভেঙে চুরমার হয়ে

যাবে। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও একথা বলা হয়েছে। যেমন সূরা আন'আমে রয়েছে, সেদিন মহান আল্লাহ লোকদের বলবেন ঃ "নাও, এখন তুমি এমনিতেই একাকী আমার সমনে হাজির হয়ে গেছো, যেমন আমি প্রথমবার তোমাকে সৃষ্টি করেছিলাম।" (৯৪ আয়াত) আর সূরা মারয়ামে বলা হয়েছে ঃ "একাকী আমার কাছে আসবে।" (৮০ আয়াত) আরো বলা হয়েছে ঃ "তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে একাকী হাযির হবে।" (৯৫ আয়াত) দুই, এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, বিগত হাজার হাজার বছরে সমস্ত মানুষ যে যেখানে মরেছিল সেখান থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে চলে আসতে থাকবে। যেমন সূরা নাবায় বলা হয়েছে ঃ "যে দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তোমরা দলে দলে এসে যাবে। (১৮ আয়াত) এ ছাড়া বিভিন্ন তাফসীরকার এর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তার অবকাশ এখানে উল্লেখিত "আশতাতান" (اَشْتَاتًا) শব্দের মধ্যে নেই। তাই আমার মতে সেগুলো এই শব্দটির অর্থগত সীমাচৌহদ্দীর বাইরে অবস্থান করছে। যদিও বক্তব্য হিসেবে সেগুলো সঠিক এবং কুরআন ও হাদীস বর্ণিত কিয়ামতের অবস্থা ও ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রাখে।

৬. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তাদের আমল তাদেরকে দেখানো হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে দুনিয়ায় কি কাজ করে এসেছে তা তাকে বলা হবে। দুই, তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল দেখানো হবে। যদিও لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ বাক্যটির জন্য এই দ্বিতীয় অর্থটিও গ্রহণ করা যেতে পারে তবুও যেহেতু আল্লাহ এখানে لِيُرَوْا جَزَاءَ اَعْمَالِهِمْ (তাদের কাজের প্রতিফল দেখাবার জন্য) না বলে বলেছেন لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ (তাদের কাজগুলো দেখানো হবে) তাই সংগতভাবেই প্রথম অর্থটি এখানে অগ্রাধিকার পাবে। বিশেষ করে যখন কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কাফের ও মু'মিন, সৎকর্মশীল ও ফাসেক, আল্লাহর হুকুমের অনুগত ও নাফরমান সবাইকে অবশ্যি তাদের আমলনামা দেয়া হবে। (উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা আল হাক্কার ১৯ ও ২৫ এবং সূরা আল ইনশিকাকের ৭-১০ আয়াত) একথা সুস্পষ্ট, কাউকে তার কার্যাবলী দেখিয়ে দেয়া এবং তার আমলনামা তার নিজের হাতে সোপর্দ করার মধ্যে কোন তফাত নেই। তাছাড়া যমীন যখন তার ওপর অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী পেশ করবে তখন হক ও বাতিলের যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ শুরু থেকে চলে আসছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, তার সম্পূর্ণ চিত্রও সবার সামনে এসে যাবে। সেখানে সবাই দেখবে, সত্যের জন্য যারা কাজ করেছিল তারা কি কি কাজ করেছে এবং মিথ্যার সমর্থকরা তাদের মোকাবেলায় কি কি কাজ করেছে। হিদায়াতের পথে আহবানকারী ও গোমরাহী বিস্তারকারীদের সমস্ত শুনবে, এটা কোন অসম্ভব কথা নয়। উভয়পক্ষের সমগ্র রচনা ও সাহিত্যের রেকর্ড অবিকল সবার সামনে এনে রেখে দেয়া হবে। হকপন্থীদের ওপর বাতিল পন্থীদের জুলুম এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতসমূহের দৃশ্যাবলী হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকেরা নিজেদের চোখেই দেখে নেবে।

৭. এটি হচ্ছে এর একটি সহজ সরল অর্থ। আবার একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, মানুষের অণু পরিমাণ নেকী বা পাপ এমন হবে না যা তার আমলনামায় লিখিত হবে না। তাকে সে অবশ্য দেখে নেবে। কিন্তু দেখে নেবার মানে যদি এই হয় যে, তার পুরস্কার ও শাস্তি দেখে নেবে, তাহলে এর এ অর্থ নেয়া ভুল হবে যে, আখেরাতে প্রত্যেকটি সামান্যতম নেকীর

পুরস্কার এবং প্রত্যেকটি সামান্যতম পাপের শাস্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেয়া হবে। আর কোন ব্যক্তিও সেখানে নিজের কোন নেকীর পুরস্কার থেকে বঞ্চিত এবং পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। কারণ তাই যদি হয় তাহলে প্রথমত এর মানে হবে, প্রত্যেকটি খারাপ কাজের শাস্তি এবং প্রত্যেকটি ভালো কাজের পুরস্কার আলাদা আলাদা দেয়া হবে। দ্বিতীয়ত এর মানে এও হবে, কোন উচ্চ পর্যায়ের সৎ ও মু'মিন কোন ক্ষুদ্রতম গোনাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। আর কোন জঘন্যতম কাফের, জালেম এবং পাপীও কোন ক্ষুদ্রতম সৎকাজের পুরস্কার না পেয়ে যাবে না। এ দু'টি অর্থ কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য বিরোধী এবং বুদ্ধিও একে ইনসাফের দাবী বলে মেনে নিতে পারে না। বুদ্ধির দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা কেমন করে বোধগম্য হতে পারে যে, আপনার একজন কর্মচারী আপনার একান্ত অনুগত, বিশ্বস্ত ও নিবেদিত প্রাণ কিন্তু তার কোন সামান্যতম ত্রুটিও আপনি মাফ করেন না? তার প্রতিটি সেবা–কর্মের পুরস্কার দেবার সাথে সাথে তার প্রতিটি ত্রুটির জন্যও আপনি গুণে গুণে তাকে শাস্তিও দেবেন? ঠিক তেমনি বুদ্ধির দৃষ্টিতে একথাও দুর্বোধ্য যে, আপনার অর্থ ও সাহায্য–সহযোগিতায় লালিত পালিত কোন ব্যক্তি যার প্রতি রয়েছে আপনার অসংখ্য অনুগ্রহ, সে আপনার সাথে বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং অনুগ্রহের জবাবে হামেশা নিমকহারামী করতে থাকে। কিন্তু আপনি তার সামগ্রিক কার্যক্রম ও দৃষ্টিভংগী উপেক্ষা করে তার প্রতিটি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য তাকে পৃথক শাস্তি এবং তার ছোট–খাটো কোন সেবামূলক কাজের জন্য হয়তো সে কখনো আপনাকে খাবার জন্য এক গ্লাস পানি এনে দিয়েছিল বা কখনো আপনাকে পাখা দিয়ে বাতাস করে ছিল—আপনি তাকে আলাদাভাবে পুরস্কৃত করবেন আর কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে বলা যেতে পারে, সেখানে সুস্পষ্টভাবে মুমিন, মোনাফেক, কাফের, সৎ মু'মিন, গোনাহগার মু'মিন, জালেম ও ফাসেক মু'মিন, নিছক কাফের এবং জালেম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফের ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লোকদের পুরস্কার ও শাস্তির জন্য একটি বিস্তারিত আইন বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই পুরস্কার ও শাস্তি মানুষের সমগ্র জীবনের ওপর পরিব্যাপ্ত।

এ প্রসংগে কুরআন মজীদ নীতিগতভাবে কয়েকটি কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বর্ণনা করে ঃ

এক ঃ কাফের, মুশরিক ও মোনাফেকের কর্মকাণ্ড (অর্থাৎ এমনসব কর্মকাণ্ড যেগুলোকে নেকী মনে করা হয়) নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আখেরাতে তারা এর কোন প্রতিদান পাবে না। এগুলোর যা প্রতিদান, তা তারা দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। এ জন্য উদাহরণ স্বরূপ দেখুন আল আরাফ ১৪৭, আত তাওবা ১৭, ৬৭–৬৯, হুদ ১৫–১৬, ইবরাহীম ১৮, আল কাহফ ১০৪–১০৫, আন নূর ৩৯, আল ফুরকান ২৩, আল আহযাব ১৯, আয যুমার ৬৫ এবং আল আহকাফ ২০ আয়াত।

দুই ঃ পাপের শাস্তি ততটুকু দেয়া হবে যতটুকু পাপ করা হয়। কিন্তু নেকীর পুরস্কার মূল কাজের তুলনায় বেশী দেয়া হবে। বরং কোথাও বলা হয়েছে প্রত্যেক নেকীর প্রতিদান দেয়া হবে দশগুণ। আবার কোথাও বলা হয়েছে, আল্লাহ নিজের ইচ্ছেমতো নেকীর প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। দেখুন আল বাকারাহ ২৬১, আল আনআম ১৬০, ইউনুস ২৬–২৭, আন নূর ৩৮, আল কাসাস ৮৪, সাবা ৩৭ এবং আল মু'মিন ৪০ আয়াত।

তিন ঃ মু'মিন যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে থাকে তাহলে তার ছোট গোনাহগুলো মাফ করে দেয়া হবে। দেখুন আন নিসা ৩১, আশ্ শূরা ৩৭ এবং আন নাজম ৩২ আয়াত।

চার ঃ সৎ মু'মিনের কাছ থেকে হালকা হিসেব নেয়া হবে। তার গোনাহগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হবে। তার ভালো ও উত্তম আমলগুলোর দৃষ্টিতে বিচার করে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। দেখুন আনকাবুত ৭, আযযুমার ৩৫, আল আহকাফ ১৬ এবং আল ইনশিকাক ৮ আয়াত।

হাদীসের বক্তব্য এ বিষয়টিকে একেবারে পরিস্কার করে দেয়। ইতিপূর্বে সূরা ইনশিকাকের ব্যাখ্যায় কিছু হাদীস উল্লেখ করেছি। কিয়ামতের দিন হালকা ও কড়া হিসেবের বিষয়টিকে বুঝাবার জন্য রসূলুল্লাহ (সা) এ ব্যাখ্যা করেছেন। (এ জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ইনশিকাক ৬ টীকা) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আহার করছিলেন এমন সময় এই আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত আবু বকর (রা) খাবার থেকে হাত গুটিয়ে নেন। তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহর রসূল! যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ আমি করেছি তার ফলও কি আমি দেখে নেবো?" জবাব দেন ঃ "হে আবু বকর! দুনিয়ায় যেসব বিষয়েরই তুমি সম্মুখীন হও তার মধ্যে যেগুলো তোমার কাছে অপছন্দনীয় ও অপ্রীতিকর ঠেকে সেগুলোই তুমি যেসব অণু পরিমাণ অসৎকাজ করেছো তার বদলা এবং সেসব অণু পরিমাণ নেকীর কাজই তুমি করো সেগুলো আল্লাহ আখেরাতে তোমার জন্য সংরক্ষণ করে রাখছেন।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, বাইহাকী ফিশ শু'আব, ইবনুল মুনযির, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও আবদ ইবনে হুমাইদ) এই আয়াতটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু আইউব আনসারীকেও বলেছিলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই নেকী করবে তার পুরস্কার সে পাবে আখেরাতে। আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে বিপদ-আপদ ও রোগের আকারে এই দুনিয়ায় তার শাস্তি পেয়ে যাবে।" (ইবনে মারদুইয়া)। কাতাদাহ হযরত আনাসের (রা) বরাত দিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ "আল্লাহ মু'মিনের প্রতি জুলুম করেন না। দুনিয়ায় তার নেকীর প্রতিদানে তাকে রিযিক দান করেন এবং আখেরাতে আবার এর পুরস্কার দেবেন। আর কাফেরের ব্যাপারে দুনিয়ায় তার সৎকাজের প্রতিদান দিয়ে দেন, তারপর যখন কিয়ামত হবে তখন তার খাতায় কোন নেকী লেখা থাকবে না।" (ইবনে জারীর) মাসরূক হযরত আয়েশা (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, "আবদুল্লাহ ইবনে জুদ'আন জাহেলী যুগে আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করতো, মিসকিনকে আহার করাতো, মেহমানদের আপ্যায়ন করতো, বন্দিদের মুক্তিদান করতো। আখেরাতে এগুলো কি তার জন্য উপকারী হবে?" রসূলুল্লাহ (সা) জবাব দেন, "না, সে মরার সময় পর্যন্ত একবারও বলেনি, رَبِّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ (হে আমার রব। শেষ বিচারের দিন আমার ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দিয়ো।)" (ইবনে জারীর) অন্যান্য আরো কিছু লোকের ব্যাপারেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই একই জাবাব দেন। তারাও জাহেলী যুগে সৎকাজ করতো কিন্তু কাফের ও মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কোন বাণী থেকে জানা

যায়, কাফেরের সৎকাজ তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না ঠিকই তবে জালেম, ফাসেক ব্যভিচারী কাফেরকে জাহান্নামে যে ধরনের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে তার শাস্তি তেমনি পর্যায়ের হবে না। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ হাতেম তাঈ–এর দানশীলতার কারণে তাকে হালকা আযাব দেয়া হবে। (রূহুল মা'আনী)।

তবুও এ আয়াতটি মানুষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ব্যাপারে সজাগ করে দেয়। সেটি হচ্ছে, প্রত্যেকটি সামান্যতম ও নগণ্যতম সৎকাজেরও একটি ওজন ও মূল্য রয়েছে এবং অনুরূপ অবস্থা অসৎকাজেরও। অর্থাৎ অসৎকাজ যত ছোটই হোক না কেন অবশ্যি তার হিসেব হবে এবং তা কোনক্রমেই উপেক্ষা করার মতো নয়। তাই কোন ছোট সৎকাজকে ছোট মনে করে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ এই ধরনের অনেক সৎকাজ মিলে আল্লাহর কাছে একটি অনেক বড় সৎকাজ গণ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে কোন ছোট ও নগণ্য অসৎকাজও না করা উচিত। কারণ এই ধরনের অনেকগুলো ছোট গোনাহ একত্র হয়ে একটি বিরাট গোনাহের স্তূপ জমে উঠতে পারে। একথাটিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদীসে ব্যক্ত করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো—তা এক টুকরা খেজুর দান করার বা একটি ভালো কথা বলার বিনিময়েই হোক না কেন" হযরত আদী ইবনে হাতেম থেকে সহীহ রেওয়ায়াতের মাধ্যমে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন সৎকাজকেও সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, যদিও তা কোন পানি পানেচ্ছু ব্যক্তির পাত্রে এক মগ পানি ঢেলে দেয়াই হয় অথবা তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাই হয়।" বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "হে মুসলিম মেয়েরা! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশিনীর বাড়িতে কোন জিনিস পাঠানোকে সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, তা ছাগলের পায়ের একটি খুর হলেও।" মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ–এ হযরত আয়েশার (রা) একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "হে আয়েশা! যেসব গোনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকো। কারণ আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "সাবধান, ছোট গোনাহসমূহ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ সেগুলো সব মানুষের ওপর একত্র হয়ে তাকে ধ্বংস করে দেবে।" (গোনাহ কবীরা ও গোনাহ সগীরার পার্থক্য বুঝার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা ৫৩ টীকা ও আন নাজম ৩২ টীকা)।

আল আদিয়াত

১০০

নামকরণ

প্রথম শব্দ আল আদিয়াতকে (الْعٰدِيٰتِ) এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরাটির মক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), জাবের (রা), হাসান বসরী, ইকরামা ও আতা বলেন, এটি মক্কী সূরা। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ও কাতাদাহ একে মাদানী সূরা বলেন। অন্যদিকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে দুই ধরনের মত উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর একটি মত হচ্ছে এটি মক্কী সূরা এবং অন্য একটি বক্তব্যে তিনি একে মাদানী সূরা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূরার বক্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি কেবল মক্কী সূরাই নয় বরং মক্কী যুগেরও প্রথম দিকে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মানুষ আখেরাতকে অস্বীকার করে অথবা তা থেকে গাফেল হয়ে কেমন নৈতিক অধপাতে যায় একথা লোকদের বুঝানোই এই সূরাটির উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে আখেরাতে কেবল মানুষের বাইরের কাজকর্মই নয়, তাদের মনের গোপন কথাগুলোও যাচাই–বাছাই করা হবে, এ সম্পর্কেও এই সূরায় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

এ উদ্দেশ্যে আরবে সাধারণভাবে যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে ছিল এবং যার ফলে সমগ্র দেশবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। সারা দেশের চতুর্দিকে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চলছিল। লুণ্ঠন, রাহাজানী, এক গোত্রের ওপর অন্য গোত্রের আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। রাতে কোন ব্যক্তিও নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারতো না। কারণ সবসময় আশংকা থাকতো, এই বুঝি কোন দুশমন অতি প্রত্যুষে তাদের জনপদ আক্রমণ করে বসলো। দেশের এই অবস্থার কথা আরবের সবাই জানতো। তারা এর ক্ষতি ও অনিষ্ট সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ ছিল। যার সবকিছু লুণ্ঠিত হতো, সে এ অবস্থার জন্য মাতম করতো এবং যে লুণ্ঠন করতো সে আনন্দে উৎফুল্ল হতো। কিন্তু এই লুণ্ঠনকারী আবার যখন লুণ্ঠিত হতো, তখন সেও অনুভব করতো, এ কেমন খারাপ অবস্থার মধ্যে কেমন দুর্বিসহ জীবন আমরা যাপন করে চলেছি।

এ পরিস্থিতির ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন এবং সেখানে আল্লাহর সামনে জবাদিহি করার ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে। সে আল্লাহর দেয়া ক্ষমতাগুলোকে জুলুম-নিপীড়নের কাজে ব্যবহার করছে। সে ধন-সম্পদের প্রেমে অন্ধ হয়ে তা অর্জন করার জন্য যে কোন অন্যায়, অসৎ ও গর্হিত পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় না। তা অবস্থা নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে, সে নিজের রবের দেয়া শক্তিগুলোর অপব্যবহার করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাহীনতার প্রকাশ করছে। যদি সে সেই সময়ের কথা জানতো যখন কবর থেকে জীবিত হয়ে আবার উঠতে হবে এবং যেসব ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও স্বার্থপ্রবণাতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে দুনিয়ায় নানান ধরনের কাজ করেছিল সেগুলোকে তার মনের গভীর তলদেশ থেকে বের করে এনে সামনে রেখে দেয়া হবে, তাহলে সে এই দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি কখনই অবলম্বন করতে পারতো না। দুনিয়ায় কে কি করে এসেছে এবং কার সাথে কোন ধরনের ব্যবহার করা উচিত মানুষের রব সে সময় সেকথা খুব ভালোভাবেই জানবেন।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝

কসম সেই (ঘোড়া) গুলোর যারা হ্রেষারব সহকারে দৌড়ায়।[১] তারপর (খুরের আঘাতে) আগুনের ফুলকি ঝরায়।[২] তারপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় প্রভাতকালে।[৩] তারপর এ সময় ধূলা উড়ায় এবং এ অবস্থায় কোন জনপদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আসলে মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।[৪] আর সে নিজেই এর সাক্ষী।[৫] অবশ্য সে ধন-দৌলতের মোহে খুব বেশী মত্ত।[৬]

১. দৌড়ায় শব্দের মাধ্যমে যে এখানে ঘোড়া বুঝানো হয়েছে আয়াতের শব্দগুলো থেকে একথা মোটেই স্পষ্ট নয়। বরং এখানে শুধু বলা হয়েছে وَالْعٰدِيٰتِ অর্থাৎ "কসম তাদের যারা দৌড়ায়।" এ কারণে কারা দৌড়ায় এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। সাহাবী ও তাবেঈগণের একটি দল বলেছেন, ঘোড়া এবং অন্য একটি দল বলেছেন উট। কিন্তু যেহেতু দৌড়াবার সময় বিশেষ আওয়াজ, যাকে ضَبْحٌ (হ্রেষারব) বলা হয়, একমাত্র ঘোড়ার মুখ দিয়েই দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চলার কারণে বের হয় এবং পরের আয়াতগুলোতে অগ্নি স্ফুলিংগ ঝরাবার, খুব সকালে কোন জনপদে অতর্কিত আক্রমণ চালাবার এবং সেখানে ধূলা উড়াবার কথা বলা হয়েছে, আর এগুলো একমাত্র ঘোড়ার সাথেই খাপ খায়, তাই অধিকাংশ গবেষক একে ঘোড়ার সাথেই সংশ্লিষ্ট করেছেন। ইবনে জারীর বলেন, "এ ব্যাপারে যে দু'টি বক্তব্য পাওয়া যায় তার মধ্যে ঘোড়া দৌড়ায় এই বক্তব্যটি অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য। কারণ উট হ্রেষারব করে না, ঘোড়া হ্রেষারব করে। আর আল্লাহ বলেছেন, যারা হ্রেষারব করে দৌড়ায় তাদের কসম।" ইমাম রাজী বলেন, "এই আয়াতগুলোর বিভিন্ন শব্দ চিৎকার করে চলছে, এখানে ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ ঘোড়া ছাড়া আর কেউ হ্রেষারব করে না। আর আগুনের স্ফুলিংগ ঝরাবার কাজটিও পাথরের ওপর ঘোড়ার খুরের আঘাতেই সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া অন্য কোন ভাবেই তা হতে পারে না। অন্য দিকে খুব সকালে আক্রমণ চালাবার কাজটিও অন্য কোন প্রাণীর তুলনায় ঘোড়ার সাহায্যে সম্পন্ন করাই সহজতর হয়।"

২. আগুনের ফুলকি ঝরায় ইত্যাকার শব্দগুলো একথাই প্রকাশ করে যে, রাত্রিকালে ঘোড়া দৌড়ায়। কারণ তাদের পায়ের খুর থেকে যে আগুনের ফুলকি ঝরে তা রাতের বেলায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

৩. আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোন জনপদে অতর্কিত আক্রমণ করতে হলে তারা রাতের আঁধারে বের হয়ে পড়তো। এর ফলে শত্রুপক্ষ পূর্বাহ্নে সতর্ক হতে পারতো না। এভাবে একেবারে খুব সকালে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। প্রভাতে আলো যেটুকু ছড়িয়ে পড়তো তাতে তারা সবকিছু দেখতে পেতো। আবার দিনের আলো খুব বেশী উজ্জ্বল না হবার কারণে প্রতিপক্ষ দূর থেকে তাদের আগমন দেখতে পেতো না। ফলে তারা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে পারতো না।

৪. রাতের বেলা হ্রেষারব করে আগুনের ফুলকি ঝরাতে ঝরাতে যেসব ঘোড়া দৌড়ায়, তারপর খুব সকালে ধূলি উড়িয়ে কোন জনপদে চড়াও হয় এবং প্রতিরোধকারীদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে, সেসব ঘোড়ার কসম খাওয়া হয়েছে যে কথাটি বলার জন্য এটিই সেই কথা। অধিকাংশ তফসীরকার এই ঘোড়া বলতে যে ঘোড়া বুঝিয়েছেন তা দেখে অবাক হতে হয়। জিহাদকারী গাযীদের ঘোড়াকে তারা এই ঘোড়া বলে চিহ্নিত করেছেন এবং যে ভীড়ের মধ্যে এই ঘোড়া প্রবেশ করে তাকে তারা কাফেরদের সমাবেশ মনে করেছেন। অথচ "মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ" এ কথাটির ওপরই কসম খাওয়া হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর পথে জিহাদকারী গাযীদের ঘোড়ার দৌড়াদৌড়ি এবং কাফেরদের কোন দলের ওপর তাদের ঝাঁপিয়ে পড়ায় একথা বুঝায় না যে মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আর মানুষ নিজেই তার এই অকৃতজ্ঞতার সাক্ষী এবং সে ধন-দৌলতের মোহে বিপুলভাবে আক্রান্ত—এই পরবর্তী বাক্যগুলোও এমন সব লোকদের সাথে খাপ খায় না যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের হয়। তাই নিশ্চিতভাবে একথা মেনে নিতে হবে যে, এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে যে কসম খাওয়া হয়েছে তা সে সময়ের আরবে সাধারণভাবে যে লুণ্ঠতরাজ, হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত চলছিল সেদিকেই ইংগিত করছে। জাহেলী যুগে রাতগুলো হতো বড়ই ভয়াবহ। প্রত্যেক গোত্র ও জনপদের লোকেরা আশংকা করতো, না জানি রাতের আঁধারে তাদের ওপর কোন দুশমন চড়াও হবার জন্য ছুটে আসছে। আর দিনের আলো প্রকাশিত হবার সাথে সাথে তারা নিশ্চিন্ত হতো। কারণ রাতটা নির্ঝনঝাটে ও ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে। সেখানে গোত্রে গোত্রে কেবলমাত্র প্রতিশোধমূলক লড়াই হতো না। বরং এক গোত্র আর এক গোত্রের ওপর আক্রমণ চালাতো তার ধন-দৌলত লুটে নেবার, তার উট, ভেড়া ইত্যাদি পশু কেড়ে নেবার এবং তার মেয়েদের ও শিশুদের গোলাম বানাবার জন্য। এসব লুটতরাজ ও জুলুম নিপীড়ন করা হতো সাধারণত ঘোড়ায় চড়ে। মানুষ যে তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ এই বক্তব্যের সপক্ষে এ বিষয়গুলোকে আল্লাহ প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। অর্থাৎ যে শক্তিকে তারা ব্যয় করছে লুটতরাজ, হানাহানি, খুন-খারাবি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য সে শক্তি তো আল্লাহ তাদেরকে মূলত এ কাজে ব্যয় করার জন্য দেননি। কাজেই আল্লাহর দেয়া এ উপকরণ ও শক্তিগুলোকে আল্লাহর সবচেয়ে বেশী অপ্রিয় যে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করা তার পিছনে ব্যয় করা তাঁর প্রতি সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

তবে কি সে সেই সময়ের কথা জানে না যখন কবরের মধ্যে যা কিছু (দাফন করা) আছে সেসব বের করে আনা হবে[৭] এবং বুকের মধ্যে যা কিছু (লুকানো) আছে সব বের করে এনে যাচাই করা হবে?[৮] অবশ্য সেদিন তাদের রব তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত থাকবেন।[৯]

৫. অর্থাৎ তার বিবেক এর সাক্ষী। আবার অনেক কাফের নিজ মুখেই প্রকাশ্যে এই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কারণ তাদের মতে আদতে আল্লাহর কোন অস্তিত্বই নেই। সে ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতি তাঁর কোন অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে অপরিহার্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৬. কুরআনের মূল শব্দগুলো হচ্ছে ঃ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ এর শাব্দিক তরজমা হচ্ছে, "সে ভালোর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করে।" কিন্তু আরবী ভাষায় 'খাইর' শব্দটি কেবলমাত্র ভালো ও নেকীর প্রতিশব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না বরং ধন-দৌলত অর্থেও এর ব্যবহার প্রচলিত। সূরা আল বাকারার ১৮০ আয়াতে "খাইর" শব্দটি ধন-সম্পদ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে কোথায় এ শব্দটি নেকী অর্থে এবং কোথায় ধন-সম্পদ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তা অনুধাবন করা যায়। এই আয়াতটির পূর্বাপর আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যে, এখানে "খাইর" বলতে ধন-সম্পদ বুঝানো হয়েছে, নেকী বুঝানো হয়নি। কারণ যে ব্যক্তি নিজের রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজের অকৃতজ্ঞতার সপক্ষে সাক্ষ পেশ করছে তার ব্যাপারে কখনো একথা বলা যেতে পারে না যে, সে নেকী ও সৎবৃত্তির প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করে।

৭. অর্থাৎ মরা মানুষ যেখানে যে অবস্থায় আছে সেখান থেকে তাকে বের করে এনে জীবিত মানুষের আকারে দাঁড় করানো হবে।

৮. অর্থাৎ বুকের মধ্যে যেমন ইচ্ছা ও নিয়ত, স্বার্থ ও উদ্দেশ্য, চিন্তা, ভাবধারা এবং বাহ্যিক কাজের পেছনে যেসব গোপন অভিপ্রায় (Motives) লুকিয়ে আছে সেসব খুলে সামনে রেখে দেয়া হবে। সেগুলো যাচাই বাছাই করে ভালো ও খারাপগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেয়া হবে। অন্য কথায় শুধুমাত্র বাইরের চেহারা দেখে মানুষ বাস্তবে যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়া হবে না। বরং মনের মধ্যে লুকানো রহস্যগুলোকে বাইরে বের করে এনে দেখা হবে যে, মানুষ যেসব কাজ করেছে তার পেছনে কি উদ্দেশ্য ও স্বার্থ-প্রেরণা লুকিয়েছিল। এ বিষয়টি চিন্তা করলে মানুষ একথা স্বীকার না করে পারে না যে, আসল ও পূর্ণাংগ ইনসাফ একমাত্র আল্লাহর আদালত ছাড়া আর কোথাও কায়েম হতে পারে না। নিছক বাইরের কাজকর্ম দেখে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া যায় না বরং কি উদ্দেশ্যে সে এ কাজ করেছে তাও দেখতে হবে। দুনিয়ার ধর্মহীন

আইন ব্যবস্থাগুলোও নীতিগতভাবে একথা জরুরী মনে করে। তবে নিয়ত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে তার সঠিক চেহারা সনাক্ত করার মতো উপকরণ দুনিয়ার কোন আদালতেরও নেই। একমাত্র আল্লাহই এ কাজ করতে পারেন। একমাত্র তিনিই মানুষের প্রত্যেকটি কাজের বাইরের চেহারার পেছনে যে গোপন প্রেরণা ও উদ্দীপনা সক্রিয় থাকে তা যাচাই করে সে কোন্ ধরনের পুরস্কার বা শাস্তির অধিকারী হতে পারে তা নির্ধারণ করতে পারেন। তাছাড়া আয়াতের শব্দাবলী থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, মনের ভেতরে, ইচ্ছা, সংকল্প ও নিয়ত সম্পর্কে আল্লাহ পূর্বাহ্নেই যে জ্ঞান রাখেন নিছক তার ভিত্তিতে এ ফায়সালা হবে না। বরং কিয়ামতের দিন এ রহস্যগুলো উন্মুক্ত করে সবার সামনে রেখে দেয়া হবে এবং প্রকাশ্য আদালতে যাচাই ও পর্যালোচনা করে এর কতটুকু ভালো ও কতটুকু খারাপ ছিল তা দেখিয়ে দেয়া হবে। এজন্য এখানে حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ বলা হয়েছে। কোন জিনিসকে বের করে বাইরে নিয়ে আসাকে 'হুসসিলা' বা 'তাহসীল' বলে। যেমন, বাইরের ছাল বা খোসা ছাড়িয়ে ভেতরের মগজ বের করা। এভাবে বিভিন্ন ধরনের জিনিসকে ছেটে পরস্পর থেকে আলাদা করার জন্যও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাজেই মনের মধ্যে লুকানো রহস্যসমূহের 'তাহসীল' বা বের করে আনার মধ্যে এ দু'টি অর্থই শামিল হবে। সেগুলোকে খুলে বাইরে বের করে দেয়াও হবে আবার সেগুলো ছেটে ভালো ও মন্দ আলাদা করে দেয়াও হবে। এ বক্তব্যটিই সূরা আত তারিকে এভাবে বলা হয়েছে ঃ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ "যেদিন গোপন রহস্য যাচাই বাছাই করা হবে।" (৯ আয়াত)।

৯. অর্থাৎ কে কি এবং কে কোন্ ধরনের শাস্তি বা পুরস্কারের অধিকারী তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানবেন।

আল কারি'আহ

১০১

নামকরণ

প্রথম শব্দ اَلْقَارِعَةُ -কে এর নাম গণ্য করা হয়েছে। এটা কেবল নামই নয় বরং এর বক্তব্য বিষয়ের শিরোনামও। কারণ এর মধ্যে শুধু কিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত। বরং এর বক্তব্য বিষয় থেকে প্রকাশ হয়, এটিও মক্কা মু'আযযমার প্রথম যুগে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। সর্বপ্রথম লোকদেরকে একটি মহাদুর্ঘটনা! বলে আতংকিত করে দেয়া হয়েছে, কি সেই মহাদুর্ঘটনা? তুমি কী জানো সেই মহা–দুর্ঘটনাটি কী? এভাবে শ্রোতাদেরকে একটি ভয়াবহ ঘটনা অনুষ্ঠিত হবার খবর শোনার জন্য প্রস্তুত করার পর দু'টি বাক্যে তাদের সামনে কিয়ামতের নকশা এঁকে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন লোকেরা আতংকগ্রস্ত হয়ে এমনভাবে চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে যেমন প্রদীপের আলোর চারদিকে পতংগরা নির্লিপ্তভাবে ছুটাছুটি করতে থাকে। পাহাড়গুলো সমূলে উৎপাটিত হয়ে স্থানচ্যুত হবে। তাদের বাঁধন থাকবে না। তারা তখন হয়ে যাবে ধূনা পশমের মতো। তারপর বলা হয়েছে, আখেরাতে লোকদের কাজের হিসেব নিকেশ করার জন্য যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে তখন কার সৎকাজ তার অসৎকাজের চাইতে ওজনে ভারী এবং কার সৎকাজ তার অসৎকাজের চাইতে ওজনে হালকা, এরি ভিত্তিতে সেখানে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধরনের লোকেরা আরামের ও সুখের জীবন লাভ করে আনন্দিত হবে। আর দ্বিতীয় ধরনের লোকদেরকে এমন গভীর গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে যেগুলো থাকবে শুধু আগুনে ভরা।

اَلْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

মহাদুর্ঘটনা![১] কী সেই মহাদুর্ঘটনা? তুমি কী জানো সেই মহাদুর্ঘটনাটি কি? সেদিন যখন লোকেরা ছড়িয়ে থাকা পতংগের মতো এবং পাহাড়গুলো রং বেরঙের ধূনা পশমের মতো হবে।[২] তারপর[৩] যার পাল্লা ভারী হবে সে মনের মতো সুখী জীবন লাভ করবে আর যার পাল্লা হালকা হবে[৪] তার আবাস হবে গভীর খাদ।[৫] আর তুমি কী জানো সেটি কি? (সেটি) জ্বলন্ত আগুন।[৬]

১. কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে "কা-রিআহ" قَارِعَةٌ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, "যে ঠোকে"। কারা'আ (قرع) মানে কোন জিনিসকে কোন জিনিসের ওপর এমন জোরে মারা যার ফলে তা থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ হয়। এই শাব্দিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও বড় রকমের মারাত্মক বিপদের ক্ষেত্রে "কারি'আহ" শব্দ বলা হয়ে থাকে। যেমন আরবরা বলে, قَرَعَتْهُمُ الْقَارِعَةُ অর্থাৎ উমুক উমুক পরিবার ও গোত্রের লোকদের ওপর ভয়াবহ বিপদ নেমে এসেছে। কুরআন মজীদের এক জায়গায়ও এই শব্দটি কোন জাতির ওপর বড় ধরনের মুসিবত নাযিল হবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা রা'আদে বলা হয়েছেঃ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ "যারা কুফরী করেছে তাদের ওপর তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে কোন না কোন বিপদ নাযিল হতে থাকে।" (৩১ আয়াত) কিন্তু এখানে "আল কারি'আহ" শব্দটি কিয়ামতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আবার সূরা আল হা-ক্কায় কিয়ামতকে এই শব্দটি দিয়েই চিহ্নিত করা

হয়েছে। (আয়াত ৪) এখানে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, এখানে কিয়ামতের প্রথম পর্যায় থেকে নিয়ে শেষ পর্যায় পর্যন্ত পুরো আখেরাতের আলোচনা একসাথে করা হচ্ছে।

২. এ পর্যন্ত কিয়ামতের প্রথম পর্যায়ের আলোচনা চলেছে। অর্থাৎ যখন মহাদুর্ঘটনা ঘটে যাবে। আর এর ফলে সারা দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে লোকেরা আতংকগ্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে যেমন আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া পতংগরা চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। পাহাড়গুলো রং বেরঙের ধূনা পশমের মতো উড়তে থাকবে। পাহাড়গুলোর রং বিভিন্ন হওয়ার কারণে আসলে তাদেরকে রং বেরঙের পশমের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৩. এখান থেকে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। লোকেরা পুনর্বার জীবিত হয়ে আল্লাহর আদালতে হাযির হবার পর থেকে এই পর্যায়টির শুরু।

৪. মূলে মাওয়াযীন (مَوَازِيْنُ) ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি মাওযূন (مَوْزُوْنٌ) এর বহুবচন হতে পারে। আবার মীযান (مِيْزَانٌ) এরও বহুবচন হতে পারে। যদি এটি মাওযূনের বহুবচন হয় তাহলে "মাওয়াযীন" অর্থ হবে এমন ধরনের কর্মকাণ্ড, আল্লাহর দৃষ্টিতে যার কোন ওজন আছে এবং যা তাঁর কাছে কোন ধরনের মর্যাদালাভের যোগ্যতা রাখে। আর যদি একে মীযানের বহুবচন গণ্য করা হয় তাহলে মাওয়াযীন অর্থ হবে দাঁড়িপাল্লার পাল্লা। প্রথম অবস্থায় মাওয়াযীনের ভারী বা হালকা হবার মানে হবে অসৎকর্মের মোকাবেলায় সৎকর্মের ভারী বা হালকা হওয়া। কারণ আল্লাহর দৃষ্টিতে কেবলমাত্র সৎকাজই ভারী ও মূল্যবান। দ্বিতীয় অবস্থায় মাওয়াযীনের ভারী হবার মানে হয় মহান আল্লাহর আদালতে নেকীর পাল্লা পাপের পাল্লার তুলনায় বেশী ভারী হওয়া। আর এর হালকা হবার মানে হয় নেকীর পাল্লা পাপের পাল্লার তুলনায় হালকা হওয়া। এছাড়া আরবী ভাষায় মীযান শব্দ ওজন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর এই অর্থের দৃষ্টিতে ওজনের ভারী ও হালকা হবার মানে হয় নেকীর ওজন ভারী বা হালকা হওয়া। যাহোক মাওয়াযীন শব্দটি মাওযূন, মীযান বা ওজন যে কোন অর্থেই ব্যবহার করা হোক না কেন সব অবস্থায়ই প্রতিপাদ্য একই থাকে এবং সেটি হচ্ছে ঃ মানুষ আমলের যে পুঁজি নিয়ে আল্লাহর আদালতে আসবে তা ভারী না হালকা, অথবা মানুষের নেকী তার পাপের চেয়ে ওজনে বেশী না কম—এরি ভিত্তিতে সেখানে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলো সব সামনে রাখলে এর অর্থ পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব হবে। সূরা আরাফে বলা হয়েছে ঃ "আর ওজন হবে সেদিন সত্য। তারপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।" (৮–৯ আয়াত) সূরা কাহাফে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী! এই লোকদেরকে বলে দাও, আমি কি তোমাদের জানাবো নিজেদের আমলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ কারা? তারাই ব্যর্থ যাদের দুনিয়ার জীবনে সমস্ত কর্মকাণ্ড সত্য–সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থেকেছে এবং যারা মনে করতে থেকেছে, তারা সবকিছু ঠিক করে যাচ্ছে। এই লোকেরাই তাদের রবের আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে হাযির হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওজন দেবো না।" (১০৪–১০৫ আয়াত) সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে ঃ "কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ

ওজন করার দাঁড়িপাল্লা রেখে দেবো। তারপর কারো ওপর অণু পরিমাণও জুলুম হবে না। যার সরিষার দানার পরিমাণও কোন কাজ থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসেব করার জন্য আমি যথেষ্ট।" (৪৭ আয়াত) এই আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, কুফরী করা এবং সত্যকে অস্বীকার করা বৃহত্তম অসৎকাজের অন্তরভুক্ত। গুনাহের পাল্লা তাতে অনিবার্যভাবে ভারী হয়ে যায়। আর কাফেরের এমন কোন নেকী হবে না নেকীর পাল্লায় যার কোন ওজন ধরা পড়ে এবং তার ফলে পাল্লা ঝুঁকে পড়তে পারে। তবে মু'মিনের পাল্লায় ঈমানের ওজনও হবে এবং এই সংগে সে দুনিয়ায় যেসব নেকী করেছে সেগুলোর ওজনও হবে। অন্যদিকে তার সমস্ত গোনাহ গোনাহর পাল্লায় রেখে দেয়া হবে। তারপর নেকীর পাল্লা ঝুঁকে আছে না গোনাহর পাল্লা ঝুঁকে আছে, তা দেখা হবে।

৫. মূল শব্দ হচ্ছে أُمُّهُ هَاوِيَةٌ "তার মা হবে হাবিয়া।" হাবিয়া (هَاوِيَةٌ) শব্দটি এসেছে হাওয়া (هَاوِىْ) থেকে। এর অর্থ হচ্ছে উঁচু জায়গা থেকে নীচুতে পড়ে যাওয়া। আর যে গভীর গর্তে কোন জিনিস পড়ে যায় তাকে হাবিয়া বলে। জাহান্নামকে হাবিয়া বলার কারণ হচ্ছে এই যে, জাহান্নাম হবে অত্যন্ত গভীর এবং জাহান্নামবাসীদেরকে তার মধ্যে ওপর থেকে নিক্ষেপ করা হবে। আর তার মা হবে জাহান্নাম একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, মায়ের কোল যেমন শিশুর অবস্থান হয় তেমনি জাহান্নামবাসীদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কোন অবস্থান হবে না।

৬. অর্থাৎ সেটি শুধুমাত্র একটি গভীর খাদ হবে না বরং জ্বলন্ত আগুনেও পরিপূর্ণ হবে।

আত তাকাসুর

১০২

নামকরণ

প্রথম শব্দ আততাকাসুরকে (اَلتَّكَاثُرُ) এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

আবু হাইয়ান ও শওকানী বলেন, সকল তাফসীরকার একে মক্কী সূরা গণ্য করেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম সুয়ুতির বক্তব্য হচ্ছে, মক্কী সূরা হিসেবেই এটি বেশী খ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু কিছু কিছু বর্ণনায় একে মাদানী সূরা বলা হয়েছে। যেমন ঃ

ইবনে আবু হাতেম আবু বুরাইদার (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ বনী হারেসা ও বনিল হারস নামক আনসারদের দু'টি গোত্রের ব্যাপারে এ সূরাটি নাযিল হয়। উভয় গোত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রথমে নিজেদের জীবিত লোকদের গৌরব গাঁথা বর্ণনা করে। তারপর কবরস্তানে গিয়ে মৃত লোকদের গৌরবগাঁথা বর্ণনা করে। তাদের এই আচরণের ফলে আল্লাহর এই বাণী اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ নাযিলহয়। কিন্তু শানেনুযুল বা নাযিল হওয়ার কারণ ও উপলক্ষ বর্ণনার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা সামনে রাখলে এই রেওয়ায়াত যে উপলক্ষে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে এই সূরা নাযিলের উপলক্ষ বলে মেনে নেবার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। বরং এ থেকে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, এই দু'টি গোত্রের কর্মকাণ্ডের সাথে সূরাটি খাপ খেয়ে যায়।

ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কাবের (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ "আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটিকে لَوْ اَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنّٰى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَاُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ (বনি আদমের কাছে যদি দুই উপত্যকা সমান সম্পদ থাকে তারপরও সে তৃতীয় একটি উপত্যকা আকাংখা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভরে না)—কুরআনের মধ্যে মনে করতাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত আলহাকুমুত তাকাসুর সূরাটি নাযিল হয়।" হযরত উবাই মদীনায় মুসলমান হয়েছিলেন বলে এই হাদীসটিকে সূরা আত তাকাসুরের মদীনায় অবতীর্ণ হবার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। কিন্তু হযরত উবাইর এই বক্তব্য থেকে সাহাবায়ে কেরাম কোন্ অর্থে রসূলের এই বাণীটিকে কুরআনের মধ্যে মনে করতেন তা সুস্পষ্ট হয় না। যদি এর অর্থ এই হয়ে থাকে যে, তাঁরা একে কুরআনের একটি আয়াত মনে করতেন তাহলে একথা মেনে নেয়া যেতে পারে না। কারণ সাহাবীগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কুরআনের প্রতিটি হরফ সম্পর্কে অবহিত

ছিলেন। এই হাদীসটিকে কুরআনের আয়াত মনে করার মতো ভুল ধারণা তাঁরা কেমন করে পোষণ করতে পারতেন! আর কুরআনের মধ্যে হবার মানে যদি কুরআন থেকে গৃহীত হওয়া মনে করা হয় তাহলে এই হাদীসটির এ অর্থও হতে পারে যে, মদীনা তাইয়েবায় যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন তাঁরা প্রথমবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র কণ্ঠে এই সূরা উচ্চারিত হতে শুনে মনে করেন, সূরাটি এই মাত্র নাযিল হয়েছে এবং রসূলের উপরোল্লিখিত বাণী সম্পর্কে তাঁরা মনে করতে থাকেন এটি এই সূরা থেকেই গৃহীত।

ইবনে জারীর, তিরমিযী ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আলীর (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ "কবরের আযাব সম্পর্কে আমরা সব সময় সন্দেহের মধ্যে ছিলাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত 'আলহা-কুমুত তাকাসুর' নাযিল হলো।" হযরত আলীর (রা) এই বক্তব্যটিকে এই সূরার মাদানী হবার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, কবরের আযাবের আলোচনা মদীনায় শুরু হয়। মক্কায় এ সম্পর্কে কোন আলোচনাই হয়নি। কিন্তু একথাটি আসলে ঠিক নয়। কুরআনের মক্কী সূরাগুলোর বিভিন্ন স্থানে এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কবরের আযাবের কথা বলা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই সেখানে নেই। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা আন'আম ৯৩ আয়াত, আন নামল ২৮ আয়াত, আল মু'মিনূন ৯৯-১০০ আয়াত, আল মু'মিন ৪৫-৪৬ আয়াত। এগুলো সবই মক্কী সূরা। তাই হযরত আলীর (রা) উক্তি থেকে যদি কোন জিনিস প্রমাণ হয় তাহলে তা হচ্ছে এই যে, উপরোল্লিখিত মক্কী সূরাগুলো নাযিলের পূর্বে সূরা আত তাকাসুর নাযিল হয় এবং এই সূরাটি নাযিল হবার ফলে সাহাবীগণের মধ্যে বিরাজিত কবরের আযাব সম্পর্কিত সংশয় দূর হয়ে যায়।

এ কারণে এই হাদীসগুলো সত্ত্বেও মুফাস্সিরগণের অধিকাংশই এর মক্কী হবার ব্যাপারে একমত। আমার মতে এটি শুধু মক্কী সূরাই নয় বরং মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই সূরায় মানুষকে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এই ভালোবাসা ও স্বার্থ পূজার কারণে মানুষ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বেশী বেশী ধন-সম্পদ আহরণ, পার্থিব লাভ, স্বার্থ উদ্ধার, ভোগ, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ এবং তার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে একজন আর একজনকে টপকে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আর এসব অর্জন করার ব্যাপারে অহংকারে মেতে থাকে। এই একটি মাত্র চিন্তা তাদেরকে এমনভাবে মশগুল করে রেখেছে যার ফলে এর চেয়ে উন্নততর কোন জিনিসের প্রতি নজর দেবার মানসিকতাই তাদের নেই। এর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে, এই যেসব নিয়ামত তোমরা নিশ্চিন্তে সংগ্রহ করতে ব্যস্ত, এগুলো শুধুমাত্র নিয়ামত নয় বরং এগুলো তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তুও। এগুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটি নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ① حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ② كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ③ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑤ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ⑥ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ⑦ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ⑧

বেশী বেশী এবং একে অপরের থেকে বেশী দুনিয়ার স্বার্থ লাভ করার মোহ তোমাদের গাফলতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।[১] এমনকি (এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে) তোমরা কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও।[২] কখ্খনো না, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।[৩] আবার (শুনে নাও) কখ্খনো না, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। কখ্খনো না, যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে (এই আচরণের পরিণাম) জানতে (তাহলে তোমরা এ ধরনের কাজ করতে না)। তোমরা জাহান্নাম দেখবেই। আবার (শুনে নাও) তোমরা একেবারে স্থির নিশ্চিতভাবে তা দেখবেই। তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৪]

১. মূলে বলা হয়েছে أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ এখানে মাত্র দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি শব্দের অর্থের মধ্যে এত বেশী ব্যাপকতা রয়েছে যা মাত্র একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

'আলহাকুম' (أَلْهٰكُمْ) শব্দটির মূলে রয়েছে লাহউন। لهو এর আসল অর্থ গাফলতি। কিন্তু যেসব কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ এত বেশী বেড়ে যায় যে সে তার মধ্যে মগ্ন হয়ে অন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফেল হয়ে পড়ে সেই ধরনের প্রত্যেকটি কাজের জন্য আরবী ভাষায় এ শব্দটি বলা হয়ে থাকে। আলহাকুম শব্দটিকে যখন এর মূল অর্থে বলা হবে তখন এর অর্থ হবে কোন 'লাহওয়া' তোমাকে তার মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে রেখেছে যে, তার চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিসের প্রতি আর তোমার আকর্ষণ ও আগ্রহ থাকেনি। তার মোহ তোমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তারি চিন্তায় তুমি নিমগ্ন। আর এই মোহ ও নিমগ্নতা তোমাকে একেবারে গাফেল করে দিয়েছে।

তাকাসুর (تَكَاثُر) এর মূল কাসরাত (كَثْرَت) । এর তিনটি অর্থ হয়। এক, মানুষের বেশী বেশী প্রাচুর্য লাভ করার চেষ্টা করা। দুই, প্রাচুর্য লাভ করার জন্য মানুষের পরস্পরের অগ্রবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা। তিন, লোকদের অন্যের তুলনায় বেশী প্রাচুর্য লাভ করার কথা নিয়ে পরস্পরের মোকাবেলায় বড়াই করে বেড়ানো।

কাজেই "আলহাকুমুত তাকাসুরের" অর্থ দাঁড়ায় তাকাসুর বা প্রাচুর্য তোমাদেরকে তার নিজের মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে নিয়েছে, যার ফলে তার প্রতি মোহাচ্ছন্নতা তোমাদের তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে। 'তাকাসুরের মধ্যে কোন জিনিসের প্রাচুর্য রয়েছে, 'আলহাকুম'–এ কোন জিনিস থেকে গাফেল হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং আলহাকুম–এ কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে– এ বাক্যে সে কথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থের এই অস্পষ্টতার কারণে এই শব্দগুলো ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহারের দুয়ার খুলে গেছে। এ ক্ষেত্রে 'তাকাসুর' বা প্রাচুর্যের অর্থ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। বরং দুনিয়ার সমস্ত সুবিধা ও লাভ, বিলাস দ্রব্য, ভোগের সামগ্রী, শক্তি ও কর্তৃত্বের উপকরণ বেশী বেশী অর্জন করার প্রচেষ্টা চালানো, এগুলো অর্জন করার জন্য একে অন্যের থেকে অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করা এবং এগুলোর প্রাচুর্যের কারণে পরস্পরের মোকাবেলায় বড়াই করা এর অর্থের অন্তরভুক্ত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে 'আলহাকুম'–এ যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারাও সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। বরং প্রত্যেক যুগের লোকেরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও সামগ্রিকভাবে এর সম্বোধনের আওতাভুক্ত হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, বেশী বেশী বৈষয়িক স্বার্থ অর্জন করা, তার মধ্যে একে অন্যের অগ্রবর্তী হওয়া এবং অন্যের মোকাবেলায় তা নিয়ে গর্ব করার মোহ যেমন ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আচ্ছন্ন করে গোত্র ও জাতিকেও। অনুরূপভাবে 'আলহাকুমুত তাকাসুর'–এ যেহেতু একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, প্রাচুর্য লোকদেরকে নিজের মধ্যে নিমগ্ন করে কোন জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে, তাই এর অর্থের মধ্যেও ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এই প্রাচুর্যের মোহ লোকদেরকে এর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে। তারা আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে গেছে। আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে গেছে। নৈতিকতার সীমা ও নৈতিক দায়িত্ব থেকে গাফেল হয়ে গেছে। অধিকারীর অধিকার এবং তা আদায় করার ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে গাফেল হয়ে গেছে। তারা নিজেদের জীবন যাপনের মান উন্নয়নের চিন্তায় ব্যাকুল। মানবতার মান কত নেমে যাচ্ছে সে চিন্তা তাদেরকে একটুও ব্যতিব্যস্ত করে না। তাদের চাই বেশী বেশী অর্থ। কোন পথে এ অর্থ অর্জিত হচ্ছে তার কোন পরোয়াই তাদের নেই। তারা বিলাস দ্রব্য ও ভোগের সামগ্রী বেশী বেশী চায়। এই প্রবৃত্তি পূজায় লিপ্ত হয়ে তারা এহেন আচরণের পরিণাম থেকে সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে গেছে। তারা বেশী বেশী শক্তি, সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চিন্তায় মশগুল। এ প্রশ্নে তারা একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এ চিন্তা করছেনা যে, এগুলো আল্লাহর দুনিয়াকে জুলুমে পরিপূর্ণ করার এবং মানবতাকে ধ্বংস ও বরবাদ করার সরঞ্জাম মাত্র। মোটকথা, এভাবে অসংখ্য ধরনের 'তাকাসুর' ব্যক্তি ও জাতিদেরকে তার মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে

রেখেছে যে, দুনিয়া এবং বৈষয়িক স্বার্থ ও ভোগের চাইতে বড় কোন জিনিসের কথা তারা মুহূর্তকালের জন্যও চিন্তা করে না।

২. অর্থাৎ সারাটা জীবন তোমরা এই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছো। মরার এক মুহূর্ত আগেও এ চিন্তা থেকে তোমাদের রেহাই নেই।

৩. অর্থাৎ তোমরা ভুল ধারণার শিকার হয়েছো। বৈষয়িক সম্পদের এ প্রাচুর্য এবং এর মধ্যে পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়াকেই তোমরা উন্নতি ও সাফল্য মনে করে নিয়েছো। অথচ এটা মোটেই উন্নতি ও সাফল্য নয়। শিঘ্রই তোমরা এর অশুভ পরিণতি জানতে পারবে। সারাটা জীবন যে ভুলের মধ্যে তোমরা লিপ্ত ছিলে সেটা যে কত বড় ভুল ছিল তা তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। শীঘ্রই অর্থ আখেরাতও হতে পারে। কারণ আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্রকাল ব্যাপী যে সত্তার দৃষ্টি প্রসারিত তাঁর কাছে কয়েক হাজার বা কয়েক লাখ বছরও কালের সামান্য একটি অংশ মাত্র। কিন্তু এর অর্থ মৃত্যুও হতে পারে। কারণ কোন মানুষ থেকে তার অবস্থান বেশী দূরে নয়। আর মানুষ তার সারা জীবন যে সব কাজের মধ্যে কাটিয়ে এসেছে সে মরে যাবার সাথে সাথেই সেগুলো তার জন্য সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ও অশুভ পরিণামের বাহন ছিল কিনা তা তার কাছে একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

৪. এই বাক্যে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই অর্থে 'তারপর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। বরং এর অর্থ হচ্ছে ঃ তারপর এ খবরটিও আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি যে, এসব নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর আদালতে হিসেব নেবার সময় এ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন সে সম্পর্কে মু'মিন ও কাফের সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। এটা আলাদা ব্যাপার, যারা নিয়ামত অস্বীকার করেনি এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করেছে তারা এই জিজ্ঞাসাবাদে সফলকাম হবে। আর যারা আল্লাহর নিয়ামতের হক আদায় করেনি এবং নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অথবা উভয়ের সাহায্যে তাঁর নাফরমানি করেছে তারা ব্যর্থ হবে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এখানে এলেন। আমরা তাঁকে তাজা খেজুর খাওয়ালাম এবং ঠাণ্ডা পানি পান করালাম। তিনি বললেন ঃ "এগুলো এমন সব নিয়ামতের অন্তরভুক্ত যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, আবদ ইবনে হুমাইদ ও বাইহাকী ফিশ্ শু'আব)।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমরকে (রা) বললেন, চলো আবুল হাইসাম ইবনুত তাইহান আনসারীর ওখানে যাই। কাজেই তাদেরকে নিয়ে তিনি ইবনুত তাইহানের খেজুর বাগানে গেলেন। তিনি এক কাঁদি খেজুর এনে মেহমানদের সামনে রাখলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি নিজে খেজুর ছিঁড়ে আনলে না কেন?

তিনি বললেন, আমি চাচ্ছিলাম আপনারা নিজেরা বেছে বেছে খেজুর খাবেন। কাজেই তারা খেজুর খেলেন এবং ঠাণ্ডা পানি পান করলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ সমর্পিত, কিয়ামতের দিন যেসব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই ঠাণ্ডা ছায়া, ঠাণ্ডা খেজুর ও ঠাণ্ডা পানি—এগুলো তার অন্তরভুক্ত।" (এই ঘটনা মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর ও আবুল ইয়ালা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে আবু হুরাইরাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এদের কেউ কেউ উক্ত আনসার সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র একজন আনসারী বলেই ক্ষ্যান্ত হয়েছেন। এ ঘটনাটি বিভিন্ন সূত্রে এবং বিস্তারিত আকারে ইবনে আবু হাতেম হযরত উমর থেকে এবং ইমাম আহমাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবু আসী নামক একজন মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে হাইয়ান ও ইবনে মারদুইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তা থেকে জানা যায়, প্রায় এ একই ধরনের ঘটনা হযরত আবু আইউব আনসারীর ওখানেও ঘটেছিল)।

এই হাদীসগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিজ্ঞাসাবাদ কেবল কাফেরদেরকে করা হবে না, সৎ মু'মিনদেরকেও করা হবে। আর আল্লাহ মানুষকে যে নিয়ামতগুলো দান করেছেন সেগুলো সীমা সংখ্যাহীন। সেগুলো গণনা করা সম্ভব নয়। বরং এমন অনেক নিয়ামতও আছে যেগুলোর মানুষ কোন খবরই রাখে না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا অর্থাৎ "যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতগুলো গণনা করতে থাকো তাহলে সেগুলো পুরোপুরি গণনা করতেও পারবে না।" (ইবরাহীম ৩৪ আয়াত) এই নিয়ামতগুলোর মধ্য থেকে অসংখ্য নিয়ামত মহান আল্লাহ সরাসরি মানুষকে দিয়েছেন। আবার বিপুল সংখ্যক নিয়ামত মানুষকে দান করা হয় তার নিজের উপার্জনের মাধ্যমে। নিজের উপার্জিত নিয়ামতগুলো মানুষ কিভাবে উপার্জন ও ব্যয় করেছে সে সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি যে নিয়ামতগুলো সে লাভ করেছে সেগুলোকে সে কিভাবে ব্যবহার করেছে তার হিসেব তাকে দিতে হবে। আর সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে তাকে বলতে হবে যে, সেগুলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এর স্বীকৃতি সে দিয়েছিল কিনা এবং নিজের ইচ্ছা, মনোভাব ও কর্মের সাহায্যে সেগুলোর জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল কি না? অথবা সে কি একথা মনে করতো, এ সবকিছু হঠাৎ ঘটনাক্রমেই সে পেয়ে গেছে? অথবা সে কি একথা মনে করেছিল যে, অনেকগুলো খোদা তাকে এগুলো দিয়েছেন? অথবা সে এই বিশ্বাস পোষণ করতো যে, এগুলো একজন আল্লাহরই নিয়ামত ঠিকই কিন্তু এগুলো দান করার ব্যাপারে আরো অনেক সত্তার হাত রয়েছে? এ কারণে তাদেরকে মাবুদ গণ্য করেছিল এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল?

আল আসর

১০৩

নামকরণ

প্রথম আয়াতের "আল আসর" (اَلْعَصْرِ) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল একে মাদানী বলেছেন। কিন্তু মুফাস্সিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একে মক্কী সূরা হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এই সূরার বিষয়বস্তু সাক্ষ দেয়, এটি মক্কী যুগেরও প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। সে সময় ইসলামের শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বাক্যের সাহায্যে বর্ণনা করা হতো। এভাবে শ্রোতা একবার শুনার পর ভুলে যেতে চাইলেও তা আর ভুলতে পারতো না এবং আপনা আপনি লোকদের মুখে মুখেও তা উচ্চারিত হতে থাকতো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটি ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য সমন্বিত বাণীর একটি অতুলনীয় নমুনা। কয়েকটা মাপাজোকা শব্দের মধ্যে গভীর অর্থের এমন এক ভাণ্ডার রেখে দেয়া হয়েছে যা বর্ণনা করার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থও যথেষ্ট নয়। এর মধ্যে সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের এবং তার ধ্বংস ও সর্বনাশের পথ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেঈ যথার্থই বলেছেন, লোকেরা যদি এই সূরাটি সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে তাহলে এই একটি সূরাই তাদের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট। সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হিস্ন দারেমী আবু মাদীনার বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি যখন পরস্পর মিলিত হতেন তখন তারা একজন অপরজনকে সূরা আসর না শুনানো পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিদায় নিতেন না। (তাবারানী)।

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

সময়ের কসম। মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে।[১]

১. এ সূরায় একথার ওপর সময়ের কসম খাওয়া হয়েছে যে, মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং এই ক্ষতি থেকে একমাত্র তারাই রক্ষা পেয়েছে যারা চারটি গুণাবলীর অধিকারী ঃ (১) ঈমান, (২) সৎকাজ, (৩) পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয়া এবং (৪) একে অন্যকে সবর করার উপদেশ দেয়া। আল্লাহর এই বাণীর অর্থ সুস্পষ্টভাবে জানার জন্য এখন এখানে প্রতিটি অংশের ওপর পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

কসম সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি বহুবার সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছি। আল্লাহ সৃষ্টিকুলের কোন বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব, অভিনবত্ব ও বিস্ময়করতার জন্য কখনো তার কসম খাননি।। বরং যে বিষয়টি প্রমাণ করা উদ্দেশ্য এই বস্তুটি তার সত্যতা প্রমাণ করে বলেই তার কসম খেয়েছেন। কাজেই সময়ের কসমের অর্থ হচ্ছে, যাদের মধ্যে উল্লেখিত চারটি গুণাবলী রয়েছে তারা ছাড়া বাকি সমস্ত মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে, সময় এর সাক্ষী।

সময় মানে বিগত সময়—অতীত কালও হতে পারে আবার চলতি সময়ও। এই চলতি বা বর্তমান কাল আসলে কোন দীর্ঘ সময়ের নাম নয়। বর্তমান কাল প্রতি মুহূর্তে বিগত হচ্ছে এবং অতীতে পরিণত হচ্ছে। আবার ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে প্রতিটি মুহূর্ত বের হয়ে এসে বর্তমানে পরিণত হচ্ছে এবং বর্তমান থেকে আবার তা অতীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখানে যেহেতু কোন বিশেষত্ব ছাড়াই শুধু সময়ের কসম খাওয়া হয়েছে, তাই দুই ধরনের সময় বা কাল এর অন্তরভুক্ত হয়। অতীতকালের কসম খাওয়ার মানে হচ্ছে ঃ মানুষের ইতিহাস এর সাক্ষ দিচ্ছে, যারাই এই গুণাবলী বিবর্জিত ছিল তারাই পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর বর্তমানকালের কসম খাওয়ার অর্থ বুঝতে হলে প্রথমে একথাটি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, বর্তমানে যে সময়টি অতিবাহিত হচ্ছে সেটি আসলে এমন একটি সময় যা প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতিকে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য দেয়া হয়েছে।

পরীক্ষার হলে একজন ছাত্রকে প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার জন্য যে সময় দেয়া হয়ে থাকে তার সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। নিজের ঘড়িতে কিছুক্ষণের জন্য সেকেণ্ডের কাঁটাটির চলার গতি লক্ষ করলে এই সময়ের দ্রুত গতিতে অতিবাহিত হবার বিষয়টি উপলব্ধি করা যাবে। অথচ একটি সেকেণ্ডও সময়ের একটি বিরাট অংশ। একমাত্র একটি সেকেণ্ডে আলো এক লাখ ছিয়াশী হাজার মাইলের পথ অতিক্রম করে। এখনো আমরা না জানতে পারলেও আল্লাহর রাজ্যে এমন অনেক জিনিসও থাকতে পারে যা এর চাইতেও দ্রুত গতি সম্পন্ন। তবুও ঘড়ির সেকেণ্ডের কাটার চলার যে গতি আমরা দেখি সময়ের চলার গতি যদি তাই ধরে নেয়া হয় এবং যা কিছু ভালো–মন্দ কাজ আমরা করি আর যেসব কাজেও আমরা ব্যস্ত থাকি সবকিছুই দুনিয়ায় আমাদের কাজ করার জন্য যে সীমিত জীবন কাল দেয়া হয়েছে তার মধ্যেই সংঘটিত হয়, এ ব্যাপারটি নিয়ে যদি আমরা চিন্তা–ভাবনা করি তাহলে আমরা অনুভব করতে পারি যে, এই দ্রুত অতিবাহিত সময়ই হচ্ছে আমাদের আসল মূলধন। ইমাম রাযী এই পর্যায়ে একজন মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন : "একজন বরফওয়ালার কাছ থেকে আমি সূরা আসূরের অর্থ বুঝেছি। সে বাজারে জোর গলায় হেঁকে চলছিল— দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি গলে যাচ্ছে। দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি গলে যাচ্ছে। তার একথা শুনে আমি বললাম, এটিই হচ্ছে আসলে وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ বাক্যের অর্থ : মানুষকে যে আয়ুষ্কাল দেয়া হয়েছে তা বরফ গলে যাবার মতো দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। একে যদি নষ্ট করে ফেলা হয় অথবা ভুল কাজে ব্যয় করা হয় তাহলে সেটিই মানুষের জন্য ক্ষতি।" কাজেই চলমান সময়ের কসম খেয়ে এই সূরায় যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ এই যে, এই দ্রুত গতিশীল সময় সাক্ষ দিচ্ছে, এই চারটি গুণাবলী শূন্য হয়ে মানুষ যে কাজেই নিজের জীবন কাল অতিবাহিত করে তার সবটুকুই ক্ষতির সওদা বৈ কিছুই নয়। এই চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে যারা দুনিয়ায় কাজ করে একমাত্র তারাই লাভবান হয়। এটি ঠিক তেমনি ধরনের একটি কথা যেমন একজন ছাত্র পরীক্ষার হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার পরিবর্তে অন্য কাজে সময় নষ্ট করছে, তাকে আমরা হলের দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়ির দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলি : এই দ্রুত গতিশীল সময় বলে দিচ্ছে, তুমি নিজের ক্ষতি করছো। যে ছাত্র এই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার কাজে ব্যয় করছে একমাত্র সেই লাভবান।

মানুষ শব্দটি একবচন। কিন্তু পরের বাক্যে চারটি গুণ সম্পন্ন লোকদেরকে তার থেকে আলাদা করে নেয়া হয়েছে। এ কারণে একথাটি অবশ্যি মানতে হবে যে, এখানে মানুষ শব্দটি জাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি ও সমগ্র মানব সম্প্রদায় এর মধ্যে সমানভাবে শামিল। কাজেই উপরোল্লিখিত চারটি গুণাবলী কোন ব্যক্তি, জাতি বা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যার–ই মধ্যে থাকবে না সে–ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই বিধানটি সর্বাবস্থায় সত্য প্রমাণিত হবে। এটি ঠিক তেমনি ধরনের ব্যাপার যেমন আমরা বলি, বিষ মানুষের জন্য ধ্বংসকর। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, বিষ সর্বাবস্তায় ধ্বংসকর হবে, এক ব্যক্তি খেলেও, একটি জাতি খেলেও বা সারা দুনিয়ার মানুষেরা সবাই মিলে খেলেও বিষের ধ্বংসকর ও সংহারক গুণ অপরিবর্তনীয়। এক ব্যক্তি বিষ খেয়েছে বা একটি জাতি বিষ খেয়েছে অথবা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ বিষ খাবার ব্যাপারে একমত হয়ে গেছে, এ দৃষ্টিতে তার মধ্যে গুণগত কোন ফারাক দেখা যাবে না। অনুরূপভাবে মানুষের জন্য সূরায়

উল্লেখিত চারটি গুণাবলী শূন্য হওয়া যে ক্ষতির কারণ, এটিও একটি অকাট্য সত্য। এক ব্যক্তি এই গুণাবলী শূন্য হোক অথবা কোন জাতি বা সারা দুনিয়ার মানুষেরা কুফরী করা, অসৎকাজ করা এবং পরস্পরকে বাতিল কাজে উৎসাহিত করা ও নফসের বন্দেগী করার উপদেশ দেবার ব্যাপারে একমত হয়ে যাক তাতে এই সার্বজনীন মূলনীতিতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

এখন দেখা যাক 'ক্ষতি' শব্দটি কুরআন মজীদে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে ক্ষতি হচ্ছে লাভের বিপরীত শব্দ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার এমন সময় হয় যখন কোন একটি সওদায় লোকসান হয়। পুরা ব্যবসাটায় যখন লোকসান হতে থাকে তখনো এর ব্যবহার হয়। আবার সমস্ত পুঁজি লোকসান দিয়ে যখন কোন ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যায় তখনো এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কুরআন মজীদ এই একই শব্দকে নিজের বিশেষ পরিভাষায় পরিণত করে কল্যাণ ও সফলতার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করছে। কুরআনের সাফল্যের ধারণা যেমন নিছক পার্থিব সমৃদ্ধির সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত ও যথার্থ সাফল্য এর অন্তরভুক্ত, অনুরূপভাবে তার ক্ষতির ধারণাও নিছক পার্থিব ব্যর্থতা ও দুরবস্থার সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের সমস্ত যথার্থ ব্যর্থতা ও অসাফল্য এর আওতাভুক্ত হয়ে যায়। সাফল্য ও ক্ষতির কুরআনী ধারণার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন স্থানে করে এসেছি। তাই এখানে আবার তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন দেখি না। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল 'আরাফ ৯ টীকা, আল আনফাল ৩০ টীকা, ইউনুস ২৩ টীকা, বনি ইসরাঈল ১০২ টীকা, আল হাজ্জ ১৭ টীকা, আল মু'মিনূন ১, ২, ১১ ও ৫০ টীকা এবং লোকমান ৪ টীকা, আয্ যুমার ৩৪ টীকা।) এই সংগে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, যদিও কুরআনের দৃষ্টিতে আখেরাতে মানুষের সাফল্যই তার আসল সাফল্য এবং আখেরাতে তার ব্যর্থতাই আসল ব্যর্থতা. তবুও এই দুনিয়ায় মানুষ যেসব জিনিসকে সাফল্য নামে অভিহিত করেছে তা আসলে সাফল্য নয় বরং এই দুনিয়াতেই তার পরিণাম ক্ষতির আকারে দেখা দিয়েছে এবং যে জিনিসকে মানুষ ক্ষতি মনে করেছে তা আসলে ক্ষতি নয় বরং এই দুনিয়াতেই তা সাফল্যে পরিণত হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এই সত্যটি বর্ণনা করা হয়েছে। যথার্থ স্থানে আমি এর ব্যাখ্যা করে এসেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন আন নাম্ল ৯৯ টীকা, মারয়াম ৫৩ টীকা, ত্বা–হা ১০৫ টীকা) কাজেই কুরআন যখন পূর্ণ বলিষ্ঠতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘোষণা দিচ্ছে, "আসলে মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে," তখন এর অর্থ হয় দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানের ক্ষতি। আর যখন সে বলে, এই ক্ষতির হাত থেকে একমাত্র তারাই রেহাই পেয়েছে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে, তখন এর অর্থ হয় ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া এবং সাফল্য লাভ করা।

এখন এই সূরার দৃষ্টিতে যে চারটি গুণাবলীর উপস্থিতিতে মানুষ ক্ষতিমুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে সে সম্পর্কিত আলোচনায় আসা যাক।

এর প্রথম গুণটি হচ্ছে ঈমান। যদিও এ শব্দটি কুরআন মজীদের কোন কোন স্থানে নিছক মৌখিক স্বীকারোক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন আন নিসা ১৩৭ আয়াত, আল মায়েদাহ ৫৪ আয়াত, আল আনফাল ২০ ও ২৭ আয়াত, আত তাওবা ৩৮ আয়াত এবং

আসসাফ ২ আয়াত) তবুও আসল ব্যবহার হয়েছে সাচ্চা দিলে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা অর্থে। আরবী ভাষায়ও এই শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক দৃষ্টিতে اٰمَنَ لَهٗ তার অর্থ হয় صَدَّقَهٗ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ (তাকে সত্য বলেছে ও তার প্রতি আস্থা স্থাপন করেছে) আর اٰمَنَ بِهٖ এর অর্থ হয় اَيْقَنَ بِهٖ (তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে)। কুরআন যে ঈমানকে প্রকৃত ঈমান বলে গণ্য করে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে তাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

اِنَّمَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا

"মু'মিন তো আসলে তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে আর তারপর সংশয়ে লিপ্ত হয় না।" (আল হুজুরাত ১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

"যারা বলেছে, আল্লাহ আমাদের রব আর তারপর তার ওপর অবিচল হয়ে গেছে।"

(হা-মীম আস সাজদাহ ৩০)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

"আসলে তারাই মু'মিন, আল্লাহর কথা উচ্চারিত হলে যাদের দিল কেঁপে ওঠে।"

(আনফাল ২)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ – (البقرة : ١٦٥)

"যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ও অত্যন্ত মজবুতির সাথে ভালোবাসে।"

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا –

"কাজেই, না (হে নবী!) তোমার রবের কসম, তারা কখনোই মু'মিন নয়, যতক্ষণ না তাদের পারস্পরিক বিরোধে তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে না মেনে নেয়। তারপর যা কিছু তুমি ফায়সালা করো সে ব্যাপারে তারা মনে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করে না বরং মনে প্রাণে মেনে নেয়।" (আন নিসা ৬৫)

নিম্নোক্ত আয়াতটিতে ঈমানের মৌখিক স্বীকারোক্তি ও প্রকৃত ঈমানের মধ্যে পার্থক্য আরো বেশী করে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, আসল লক্ষ হচ্ছে প্রকৃত ঈমান, মৌখিক স্বীকারোক্তি নয় ঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো।" (আন নিসা ১৩৬)

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, ঈমান আনা বলতে কিসের ওপর ঈমান আনা বুঝাচ্ছে? এর জবাবে বলা যায়, কুরআন মজীদে একথাটি একেবারে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহকে মানা। নিছক তাঁর অস্তিত্ব মেনে নেয়া নয়। বরং তাঁকে এমনভাবে মানা

যাতে বুঝা যায় যে, তিনি একমাত্র প্রভু ও ইলাহ। তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বে কোন অংশীদার নেই। একমাত্র তিনিই মানুষের ইবাদাত, বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। তিনিই ভাগ্য গড়েন ও ভাঙেন। বান্দার একমাত্র তাঁরই কাছে প্রার্থনা এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করা উচিত। তিনিই হুকুম দেন ও তিনিই নিষেধ করেন। তিনি যে কাজের হুকুম দেন তা করা ও যে কাজ থেকে বিরত রাখতে চান তা না করা বান্দার ওপর ফরয। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। মানুষের কোন কাজ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকা তো দূরের কথা, যে উদ্দেশ্য ও নিয়তের ভিত্তিতে মানুষ কাজটি করে তাও তাঁর অগোচরে থাকে না। দ্বিতীয়ত রসূলকে মানা। তাঁকে আল্লাহর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে মানা। তিনি যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে দিয়েছেন, তা সবই সত্য এবং অবশ্যি গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়া। ফেরেশতা, অন্যান্য নবীগণ, আল্লাহর কিতাবসমূহ এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনাও এই রসূলের প্রতি ঈমান আনার অন্তরভুক্ত। কারণ আল্লাহর রসূলই এই শিক্ষাগুলো দিয়েছেন। তৃতীয়ত আখেরাতকে মানা। মানুষের এই বর্তমান জীবনটিই প্রথম ও শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে, নিজের এই দুনিয়ার জীবনে সে যা কিছু কাজ করেছে আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহি করতে হবে এবং হিসেব-নিকেশে যেসব লোক সৎ গণ্য হবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা অসৎ গণ্য হবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, এই অর্থে আখেরাতকে মেনে নেয়া। ঈমান, নৈতিক চরিত্র ও জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের জন্য এটি একটি মজবুত বুনিয়াদ সরবরাহ করে। এর ওপর একটি পাক–পবিত্র জীবনের ইমারত গড়ে উঠতে পারে। নয়তো যেখানে আদতে ঈমানের অস্তিত্বই নেই সেখানে মানুষের জীবন যতই সৌন্দর্য বিভূষিত হোক না কেন তার অবস্থা একটি নোঙ্গর বিহীন জাহাজের মতো। এই জাহাজ ঢেউয়ের সাথে ভেসে যেতে থাকে এবং কোথাও স্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

ঈমানের পরে মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য সেটি হচ্ছে সৎকাজ। কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় সালেহাত। (صالحات) সমস্ত সৎকাজ এর অন্তরভুক্ত। কোন ধরনের সৎকাজ ও সৎবৃত্তি এর বাইরে থাকে না। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে যে কাজের মূলে ঈমান নেই এবং যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রদত্ত হেদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়নি তা কখনো 'সালেহাত' তথা সৎকাজের অন্তরভুক্ত হতে পারে না। তাই কুরআন মজীদের সর্বত্র সৎকাজের আগে ঈমানের কথা বলা হয়েছে এবং এই সূরায়ও ঈমানের পরেই এর কথা বলা হয়েছে। কুরআনের কোন এক জায়গায়ও ঈমান ছাড়া সৎকাজের কথা বলা হয়নি এবং কোথাও ঈমান বিহীন কোন কাজের পুরস্কার দেবার আশ্বাসও দেয়া হয়নি। অন্যদিকে মানুষ নিজের কাজের সাহায্যে যে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ পেশ করে সেটিই হয় নির্ভরযোগ্য ও কল্যাণকর ঈমান। অন্যথায় সৎকাজ বিহীন ঈমান একটি দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ এই দাবী সত্ত্বেও যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে তখন আসলে সে নিজেই তার এই দাবীর প্রতিবাদ করে। ঈমান ও সৎকাজের সম্পর্ক বীজ ও বৃক্ষের মতো। বীজ মাটির মধ্যে না থাকা পর্যন্ত কোন বৃক্ষ জন্মাতে পারে না। কিন্তু যদি বীজ মাটির মধ্যে থাকে এবং কোন বৃক্ষ না জন্মায় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় মাটির বুকে বীজের সমাধি রচিত হয়ে গেছে। এজন্য কুরআন মজীদে যতগুলো সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা এমন সব লোকদেরকে দেয়া

হয়েছে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে। এই সূরায়ও একথাটিই বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটির অপরিহার্য প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ঈমান আনার পর সৎকাজ করা। অন্য কথায়, সৎকাজ ছাড়া নিছক ঈমান মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

উপরোক্ত গুণগুলো তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে। এরপর এ সূরাটি আরো দু'টি বাড়তি গুণের কথা বলে। ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এ গুণ দু'টি থাকা জরুরী। এ গুণ দু'টি হচ্ছে, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের পরস্পরকে হক কথা বলার ও হক কাজ করার এবং ধৈর্যের পথ অবলম্বন করার উপদেশ দিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রথমত ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসেবে অবস্থান না করা উচিত। বরং তাদের সম্মিলনে একটি মু'মিন ও সৎসমাজদেহ গড়ে উঠতে হবে। দ্বিতীয়ত এই সমাজ যাতে বিকৃত না হয়ে যায় সে দায়িত্ব সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপলব্ধি করতে হবে। এ জন্য এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে হক পথ অবলম্বন ও সবর করার উপদেশ দেবে, এটা তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হক শব্দটি বাতিলের বিপরীত। সাধারণত এ শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একঃ সঠিক, নির্ভুল, সত্য, ন্যায় ও ইনসাফ অনুসারী এবং আকীদা ও ঈমান বা পার্থিব বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য অনুসারী কথা। দুই ঃ আল্লাহর, বান্দার বা নিজের যে হকটি আদায় করা মানুষের জন্য ওয়াজিব হয়ে থাকে। কাজেই পরস্পরকে হকের উপদেশ দেবার অর্থ হচ্ছে, ঈমানদারদের এই সমাজটি এমনি অনুভূতিহীন নয় যে, এখানে বাতিল মাথা উঁচু করতে এবং হকের বিরুদ্ধে কাজ করে যেতে থাকলেও লোকেরা তার নিরব দর্শক হয় মাত্র। বরং যখন ও যেখানেই বাতিল মাথা উঁচু করে তখনই সেখানে হকের আওয়াজ বুলন্দকারীরা তার মোকাবেলায় এগিয়ে আসে, এই সমাজে এই প্রাণশক্তি সর্বক্ষণ প্রবাহিত থাকে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই কেবল সত্যপ্রীতি, সত্য নীতি ও ন্যায় নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না এবং হকদারদের হক আদায় করেই ক্ষান্ত হয় না বরং অন্যদেরকে এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার উপদেশ দেয়। এই জিনিসটিই সমাজকে নৈতিক পতন ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জামানত দেয়। যদি কোন সমাজে এই প্রাণ শক্তি না থাকে তাহলে সে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। যারা নিজেদের জায়গায় হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু নিজেদের সমাজে হককে বিধ্বস্ত হতে দেখে নিরব থাকবে তারাও একদিন এই ক্ষতিতে লিপ্ত হবে। একথাটিই সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা ইবনে মারয়ামের মুখ দিয়ে বনি ইসরাঈলদের ওপর লানত করা হয়েছে। আর এই লানতের কারণ ছিল এই যে, তাদের সমাজে গোনাহ ও জুলুম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং লোকেরা পরস্পরকে খারাপ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থেকেছিল (৭৮–৭৯ আয়াত) আবার একথাটি সূরা আরাফে এভাবে বলা বলা হয়েছে ঃ বনী ইস্রাঈলরা যখন প্রকাশ্যে শনিবারের বিধান অমান্য করে মাছ ধরতে শুরু করে তখন তাদের ওপর আযাব নাযিল করা হয় এবং সেই আযাব থেকে একমাত্র তাদেরকেই বাঁচানো হয় যারা লোকদেরকে এই গোনাহর কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করতো। (১৬৩–১৬৬ আয়াত) সূরা আনফালে আবার একথাটি এভাবে বলা হয়েছে ঃ সেই ফিত্নাটি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো যার ক্ষতিকর প্রভাব

বিশেষভাবে শুধুমাত্র সেসব লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না যারা তোমাদের মধ্যে গোনাহ করেছে। (২৫ আয়াত)–এ জন্যই সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখাকে উম্মাতে মুসলিমার দায়িত্ব ও কর্তব্য গণ্য করা হয়েছে। (আলে ইমরান ১০৪) সেই উম্মাতকে সর্বোত্তম উম্মাত বলা হয়েছে, যারা এই দায়িত্ব পালন করে। (আলে ইমরান ১১০)

হকের নসিহত করার সাথে সাথে দ্বিতীয় যে জিনিসটিকে ঈমানদারগণকে ও তাদের সমাজকে ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এই সমাজের ব্যক্তিবর্গ পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দিতে থাকবে। অর্থাৎ হককে সমর্থন করতে ও তার অনুসারী হতে গিয়ে যেসব সমস্যা ও বাধা–বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এপথে যেসব কষ্ট, পরিশ্রম, বিপদ–আপদ, ক্ষতি ও বঞ্চনা মানুষকে নিরন্তর পীড়িত করে তার মোকাবেলায় তারা পরস্পরকে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকার উপদেশ দিতে থাকবে। সবরের সাথে এসব কিছু বরদাশ্‌ত করার জন্য তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে সাহস যোগাতে থাকবে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আদ্‌ দাহর ১৬ টীকা এবং আল বালাদ ১৪ টীকা)।

আল হুমাযাহ

১০৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের হুমাযাহ (هُمَزَةٍ) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির মক্কী হবার ব্যাপারে সকল মুফাস্‌সির একমত পোষণ করেছেন। এর বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনাভংগী বিশ্লেষণ করলে এটিও রসূলের নবুওয়াত পাওয়ার পর মক্কায় প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই সূরায় এমন কিছু নৈতিক অসৎবৃত্তির নিন্দা করা হয়েছে যেগুলো জাহেলী সমাজে অর্থলোলুপ ধনীদের মধ্যে পাওয়া যেতো। প্রত্যেক আরববাসী জানতো, এই অসৎ–প্রবণতাগুলো যথার্থই তাদের সমাজে সক্রিয় রয়েছে। সবাই এগুলোকে খারাপ মনে করতো। একজনও এগুলোকে সৎগুণ মনে করতো না এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখতো না। এই জঘন্য প্রবণতাগুলো পেশ করার পর আখেরাতে এই ধরনের চরিত্রের অধিকারী লোকদের পরিণাম কি হবে তা বলা হয়েছে। এই দু'টি বিষয় (অর্থাৎ একদিকে এই চরিত্র এবং অন্যদিকে আখেরাতে তার এই পরিণাম) এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে শ্রোতা নিজে নিজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন যে, এই ধরনের কাজের ও চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির পরিণাম এটিই হয়ে থাকে। আর যেহেতু দুনিয়ায় এই ধরনের চরিত্রের লোকেরা কোন শাস্তি পায় না বরং উলটো তাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখা যায়, তাই আখেরাত অনিবার্যভাবে অনুষ্ঠিত হবেই।

সূরা যিলযাল থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো সূরা চলে এসেছে এই সূরাটিকে সেই ধারাবাহিকতায় রেখে বিচার করলে মক্কা মু'আয্‌যমার প্রথম যুগে ইসলামী আকীদা– বিশ্বাস ও তার নৈতিক শিক্ষাবলী মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল তা মানুষ খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। সূরা যিলযালে বলা হয়েছে, আখেরাতে মানুষের সমগ্র আমলনামা তার সামনে রেখে দেয়া হবে। সে দুনিয়ায় যে সামান্য বালুকণা পরিমাণ নেকী বা গোনাহ করেছিল তা সেখানে তার সামনে আসবে না এমনটি হবে না। সূরা আদিয়াত–এ আরবের চতুর্দিকে যেসব লুটতরাজ, হানাহানি, খুনাখুনি ও দস্যুতা জারী ছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিগুলোর এহেন অপব্যবহার তাঁর প্রতি বিরাট অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়, এ

অনুভূতি জাগ্রত করার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারটি এই দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যাবে না বরং মৃত্যুর পর আর একটি জীবন শুরু হচ্ছে, সেখানে কেবল তোমাদের সমস্ত কাজেরই নয় বরং নিয়তও যাচাই বা পর্যালোচনা করা হবে। আর কোন ব্যক্তি কোন ধরনের ব্যবহার লাভের যোগ্য তা তোমাদের রব খুব ভালোভাবেই জানে। সূরা আল কারিয়াহতে কিয়ামতের নকশা পেশ করার পর লোকদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মানুষের নেকীর পাল্লা ভারী না গোনাহর পাল্লা ভারী হচ্ছে এরি ওপর নির্ভর করবে আখেরাতে তার ভালো বা মন্দ পরিণাম। যে বস্তুবাদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়ার লাভ, স্বার্থ, আয়েশ–আরাম, ভোগ ও মর্যাদা বেশী বেশী করে অর্জন করার ও পরস্পর থেকে অগ্রবর্তী হবার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে সূরা তাকাসুরে তার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। তারপর এই গাফলতির অশুভ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করে বলা হয়েছে—এ দুনিয়া কোন লুটের মাল নয় যে, তার ওপর তোমরা ইচ্ছামতো হাত সাফাই করতে থাকবে। বরং এখানে তুমি এর যেসব নিয়ামত পাচ্ছো তার প্রত্যেকটি কিভাবে অর্জন করেছো এবং কিভাবে ব্যবহার করেছো তার জন্য তোমার রবের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সূরা আসর–এ একেবারে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে, যদি মানবজাতির ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঈমান ও সৎকাজ না থাকে এবং তার সমাজ ব্যবস্থায় হক পথ অবলম্বন ও সবর করার উপদেশ দেবার রীতি ব্যাপকতা লাভ না করে, তাহলে তার প্রত্যেক ব্যক্তি, দেশ, জাতি এমনকি সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করবে। এর পরপরই আসছে সূরা 'আল হুমাযাহ।' এখানে জাহেলী যুগের নেতৃত্বের একটি নমুনা পেশ করে লোকদের সামনে যেন এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, এই ধরনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কেন?

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝٣ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝٦ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝٧ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনা সামনি) লোকদের ধিক্কার দেয় এবং (পেছনে) নিন্দা করতে অভ্যস্ত।[১] যে অর্থ জমায় এবং তা গুণে গুণে রাখে।[২] সে মনে করে তার অর্থ–সম্পদ চিরকাল তার কাছে থাকবে।[৩] কখনো নয়, তাকে তো চূর্ণ–বিচূর্ণকারী জায়গায়[৪] ফেলে দেয়া হবে।[৫] আর তুমি কি জানো সেই চূর্ণ–বিচূর্ণকারী জায়গাটি কি? আল্লাহর আগুন,[৬] প্রচণ্ডভাবে উৎক্ষিপ্ত, যা হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে যাবে।[৭] তা তাদের ওপর ঢেকে দিয়ে বন্ধ করা হবে[৮] (এমন অবস্থায় যে তা) উঁচু উঁচু থামে (ঘেরাও হয়ে থাকবে)।[৯]

১. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ। আরবী ভাষায় এই শব্দ দু'টি অর্থের দিক দিয়ে অনেক বেশী কাছাকাছি অবস্থান করছে। এমন কি কখনো শব্দ দু'টি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য হয়। কিন্তু সে পার্থক্যটা এমন পর্যায়ের যার ফলে একদল লোক "হুমাযাহ'র যে অর্থ করে, অন্য একদল লোক "লুমাযা"রও সেই একই অর্থ করে। আবার এর বিপরীত পক্ষে কিছু লোক "লুমাযাহ"র যে অর্থ বর্ণনা করে, অন্য কিছু লোকের কাছে "হুমাযাহ"র ও অর্থ তাই। এখানে যেহেতু দু'টি শব্দ এক সাথে এসেছে এবং "হুমাযাহ" ও "লুমাযাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাই উভয় মিলে এখানে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে ঃ সে কাউকে লাঞ্ছিত ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। কারোর প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে অংগুলি নির্দেশ করে। চোখের ইশারায় কাউকে ব্যঙ্গ করে কারো বংশের নিন্দা করে। কারো ব্যক্তি সত্তার বিরূপ সমালোচনা করে। কারো মুখের ওপর তার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করে। কারো পেছনে তার দোষ বলে বেড়ায়। কোথাও চোখলখুরী করে এবং এর কথা ওর কানে লাগিয়ে বন্ধুদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে

দেয়। কোথাও ভাইদের পারস্পরিক ঐক্যে ফাটল ধরায়। কোথাও লোকদের নাম বিকৃত করে খারাপ নামে অভিহিত করে। কোথাও কথার খোঁচায় কাউকে আহত করে এবং কাউকে দোষারোপ করে। এসব তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

২. প্রথম বাক্যটির পর এই দ্বিতীয় বাক্যটির থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থই প্রকাশিত হয় যে, নিজের অগাধ ধনদৌলতের অহংকারে সে মানুষকে এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। অর্থ জমা করার জন্য جَمَعَ مَالًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে অর্থ প্রাচুর্য বুঝা যায়। তারপর 'গুণে গুণে রাখা' থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কার্পণ্য ও অর্থ লালসার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

৩. এর আর একটি অর্থ হতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, সে মনে করে তার অর্থ–সম্পদ তাকে চিরন্তন জীবন দান করবে। অর্থাৎ অর্থ জমা করার এবং তা গুণে রেখে দেবার কাজে সে এত বেশী মশগুল যে নিজের মৃত্যুর কথা তার মনে নেই। তার মনে কখনো এ চিন্তার উদয় হয় না যে, এক সময় তাকে এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে খালি হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।

৪. মূলে হুতামা (حُطَمَةُ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হাতম (حَطَمَ) । হাতম মানে ভেঙ্গে ফেলা, পিষে ফেলা ও টুকরা টুকরা করে ফেলা। জাহান্নামকে হাতম নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে যা কিছু ফেলে দেয়া হবে তাকে সে নিজের গভীরতা ও আগুনের কারণে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে রেখে দেবে।

৫. আসলে বলা হয়েছে لَيُنْبَذَنَّ । আরবী ভাষায় কোন জিনিসকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া অর্থে نَبْذ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এ থেকে আপনা আপনি এই ইংগিত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নিজের ধনশালী হওয়ার কারণে সে দুনিয়ায় নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে ঘৃণাভরে জাহান্নামে ছুঁড়ে দেয়া হবে।

৬. কুরআন মজীদের একমাত্র এখানে ছাড়া আর কোথাও জাহান্নামের আগুনকে আল্লাহর আগুন বলা হয়নি। এখানে এই আগুনকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে কেবলমাত্র এর প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতারই প্রকাশ হচ্ছে না। বরং এই সংগে এও জানা যাচ্ছে যে, দুনিয়ার ধন–সম্পদ লাভ করে যারা অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় মেতে ওঠে তাদেরকে আল্লাহ কেমন প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এ কারণেই তিনি জাহান্নামের এই আগুনকে নিজের বিশেষ আগুন বলেছেন এবং এই আগুনেই তাকে নিক্ষেপ করা হবে।

৭. আসল বাক্যটি হচ্ছে, تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ 'এখানে তাত্তালিউ' (تَطَّلِعُ) শব্দটির মূলে হচ্ছে 'ইত্তিলা' (اطلاع) 'ইত্তিলা' এর একটি অর্থ হচ্ছে চড়া, আরোহণ করা ও ওপরে পৌঁছে যাওয়া। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, অবগত হওয়া ও খবর পাওয়া। আফ্‌ইদাহ্ (اَفْئِدَةَ) হচ্ছে বহুবচন। এর একবচন ফুওয়াদ (فواد) এর মানে হৃদয়। কিন্তু বুকের মধ্যে যে হৃদপিণ্ডটি সবসময় ধুক ধুক করে তার জন্যও ফুওয়াদ শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। বরং মানুষের চেতনা, জ্ঞান, আবেগ, আকাংক্ষা, চিন্তা, বিশ্বাস, সংকল্প ও নিয়্যতের কেন্দ্রস্থলকেই এই শব্দটি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। হৃদয় পর্যন্ত এই আগুন পৌঁছবার একটি

অর্থ হচ্ছে এই যে, এই আগুন এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে মানুষের অসৎচিন্তা, ভুল আকীদা–বিশ্বাস, অপবিত্র ইচ্ছা, বাসনা, প্রবৃত্তি, আবেগ এবং দুষ্ট সংকল্প ও নিয়তের কেন্দ্র। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর এই আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো অন্ধ হবে না। সে দোষী ও নির্দোষ সবাইকে জ্বালিয়ে দেবে না। বরং প্রত্যেক অপরাধীর হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে সে তার অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে এবং প্রত্যেককে তার দোষ ও অপরাধ অনুযায়ী আযাব দেবে।

৮. অর্থাৎ অপরাধীদেরকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে ওপর থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হবে। কোন দরজা তো দূরের কথা তার কোন একটি ছিদ্রও খোলা থাকবে না।

৯. ফি আমাদিম মুমাদ্দাদাহ (فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ) এর একাধিক মানে হতে পারে। যেমন এর একটি মানে হচ্ছে, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর উঁচু উঁচু থাম গেঁড়ে দেয়া হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এই অপরাধীরা উঁচু উঁচু থামের গায়ে বাঁধা থাকবে। এর তৃতীয় অর্থ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, এই আগুনের শিখাগুলো লম্বা লম্বা থামের আকারে ওপরের দিকে উঠতে থাকবে।

আল ফীল

১০৫

নামকরণ

প্রথম আয়াতের আসহাবিল ফীল (أَصْحٰبِ الْفِيْلِ) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত। এর ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রাখলে মক্কা মু'আযযমায় ইসলামের প্রথম যুগে এটি নাযিল হয় বলে মনে হবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এর আগে সূরা বুরুজের ৪ টীকায় উল্লেখ করে এসেছি, ইয়ামনের ইহুদী শাসক যুনুওয়াস নাজরানে ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর যে জুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেবার জন্য হাবশার (বর্তমান ইথিয়পিয়া) খৃষ্টীয় শাসনকর্তা ইয়ামন আক্রমণ করে হিম্‌ইয়ারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। ৫২৫ খৃষ্টাব্দে এই সমগ্র এলাকাটিতে হাবশার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আসলে কনস্টান্টিনোপলের রোমীয় শাসনকর্তা ও হাবশার শাসকের পারস্পরিক সহযোগিতায় এই সমগ্র অভিযান পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ সে সময় হাবশার শাসকদের কাছে কোন উল্লেখযোগ্য নৌবহর ছিল না। রোমীয়রা এ নৌবহর সরবরাহ করে। এর মাধ্যমে হাবশা তার ৭০ হাজার সৈন্য ইয়ামন উপকূলে নামিয়ে দেয়। পরবর্তী বিষয়গুলো অনুধাবন করার জন্য শুরুতেই জেনে নেয়া উচিত যে, নিছক ধর্মীয় আবেগ তাড়িত হয়ে এসব কিছু করা হয়নি। বরং এসবের পেছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও সক্রিয় ছিল। বরং সম্ভবত সেগুলোই এর মূলে আসল প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল এবং খৃষ্টান মজলুমদের খুনের বদলা নেবার ব্যাপারটি একটি বাহানাবাজী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আসলে সেকালে পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ ও রোম অধিকৃত এলাকার মধ্যে যে ব্যবসা চলতো তার ওপর আরবরা শত শত বছর থেকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে চলে আসছিল। রোমান শাসকরা মিসর ও সিরিয়া দখল করার পর থেকেই এই ব্যবসার ওপর থেকে আরবদের আধিপত্য বিলুপ্ত করে একে পুরোপুরি নিজেদের কর্তৃত্বাধীন করতে চাইছিল। কেননা মাঝখান থেকে আরব ব্যবসায়ীদেরকে হটিয়ে দিতে পারলে এর পুরো মুনাফা তারা সরাসরি নিজেরা লাভ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে খৃষ্টপূর্ব ২৪ বা ২৫ অব্দে কাইজার আগাষ্টাস রোমান জেনারেল ইলিয়াস গালুসের (Aelius Gallus) নেতৃত্বে একটি বিরাট সেনাদল আরবের পশ্চিম

উপকূলে নামিয়ে দেয়। দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমুদ্রপথ অধিকার করে নেয়াই ছিল এর লক্ষ। (তাফহীমুল কুরআনের সূরা আনফালের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এ বাণিজ্য পথের নকশা পেশ করেছি।) কিন্তু আরবের চরম প্রতিকূল ভৌগলিক অবস্থা ও পরিবেশ এ অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়। এরপর রোমানরা লোহিত সাগরে তাদের নৌবহর স্থাপন করে। এর ফলে সমুদ্র পথে আরবদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের ব্যবসার জন্য কেবলমাত্র স্থলপথ উন্মুক্ত থেকে যায়। এই স্থলপথটি দখল করে নেবার জন্য তারা হাবশার খৃষ্টান সরকারের সাথে চক্রান্ত করে এবং সামুদ্রিক নৌবহরের সহায়তায় তাকে ইয়ামনের ওপর কর্তৃত্ব দান করে।

ইয়ামন আক্রমণকারী হাবশী সেনাদল সম্পর্কে আরব ঐতিহাসিকগণ যে বিবরণ পেশ করেছেন তাতে বেশ মতপার্থক্য দেখা যায়। ঐতিহাসিক হাফেজ ইবনে কাসীর লিখেছেন, এ সেনাদল পরিচালিত হয়েছিল দু'জন সেনাপতির অধীনে। তাদের একজন ছিল আরইয়াত এবং অন্যজন আবরাহা। অন্যদিকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে আরইয়াত ছিল এই সেনাবাহিনীর সেনাপতি এবং আবরাহা ছিল এর একজন সদস্য। এরপর এ দু'জন ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পরে আরইয়াত ও আবরাহার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। যুদ্ধে আরইয়াতের মৃত্যু হয়। আবরাহা ইয়ামন দখল করে। তারপর তাকে হাবশার অধীনে ইয়ামনের গভর্ণর নিযুক্ত করার ব্যাপারে সে হাবশা সম্রাটকে সম্মত করতে সক্ষম হয়। বিপরীত পক্ষে গ্রীক ও সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন বিবরণ পেশ করেছেন। তাদের বর্ণনা মতে, ইয়ামন জয় করার পরে হাবশী সৈন্যরা যখন প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী ইয়ামনী সরদারদেরকে একের পর এক হত্যা করে চলছিল তখন তাদের "আস্ সুমাইফি আশ্ওয়া" যাকে গ্রীক ঐতিহাসিকরা বলেছেন Esymphaeus নামক একজন সরদার হাবশীদের আনুগত্য স্বীকার করে জিজিয়া দেবার অংগীকার করে এবং হাবশা সম্রাটের কাছ থেকে ইয়ামনের গভর্ণর হবার পরোয়ানা হাসিল করে কিন্তু হাবশী সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। তারা আবরাহাকে তার জায়গায় গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত করে। আবরাহা ছিল হাবশার আদুলিস বন্দরের একজন গ্রীক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস। নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে সে ইয়ামন দখলকারী হাবশী সেনাদলে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। হাবশা সম্রাট তাকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠায়। কিন্তু এই সেনাদল হয় তার পক্ষে যোগ দেয় অথবা সে এই সেনাদলকে পরাজিত করে। অবশেষে হাবশা সম্রাটের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী তাকে ইয়ামনে নিজের গভর্ণর হিসেবে স্বীকার করে নেয়। (গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তার নাম বলেছেন আবরামিস (Abrames) এবং সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ তাকে আবরাহাম (Abraham) নামে উল্লেখ করেছেন। আবরাহা সম্ভবত এরই হাবশী উচ্চারণ। কারণ আরবীতে তো এর উচ্চারণ ইবরাহীম।)

এ ব্যক্তি ধীরে ইয়ামনের স্বাধীন বাদশাহ হয়ে বসে। তবে নামকাওয়াস্তে হাবশা সম্রাটের প্রাধান্যের স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছিল এবং নিজের নামের সাথে সম্রাট প্রতিনিধি লিখতো। তার প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছিল। একটি ব্যাপার থেকে এ সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে। ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে সদ্দে মাআরিব–এর সংস্কার কাজ শেষ করে সে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করে। এই উৎসবে রোমের কাইজার,

ইরানের বাদশাহ, হীরার বাদশাহ এবং গাস্সানের বাদশাহর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। সদ্দে মাআরিবে আবরাহা স্থাপিত শিলালিপিতে এ সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা সংরক্ষিত রয়েছে। এই শিলালিপি আজো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। গ্লীসার (Glaser) তার গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা ৩৭ টীকা)।

এই অভিযান শুরুর গোড়াতেই রোমান সাম্রাজ্য ও তার মিত্র হাবশী খৃষ্টানদের সামনে যে উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল ইয়ামনে নিজের কর্তৃত্ব পুরোপুরি মজবুত করার পর আবরাহা সেই উদ্দেশ্য সফল করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল, একদিকে আরবে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করা এবং অন্যদিকে আরবদের মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্য ও প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে যে ব্যবসা চলতো তাকে পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিয়ে আসা। ইরানের সাসানী সাম্রাজ্যের সাথে রোমানদের কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বের ফলে প্রাচ্য দেশে রোমানদের ব্যবসার অন্যান্য সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে এর প্রয়োজন আরো বেশী বেড়ে যায়।

এ উদ্দেশ্যে আবরাহা ইয়ামনের রাজধানী 'সান্‌আ'য় একটি বিশাল গীর্জা নির্মাণ করে। আরব ঐতিহাসিকগণ একে 'আল কালীস' বা 'আল কুলীস' অথবা 'আল কুল্লাইস' নামে উল্লেখ করেছেন। এটি গ্রীক Ekklesia শব্দের আরবীকরণ। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, একাজটি সম্পন্ন করার পর সে হাবশার বাদশাহকে লিখে জানায়, আমি আরবদের হজ্জকে মক্কার কা'বার পরিবর্তে সানআর এ গীর্জার দিকে ফিরিয়ে না দিয়ে ক্ষান্ত হবো না।* ইবনে কাসীর লিখেছেন, সে ইয়ামনে প্রকাশ্যে নিজের এই সংকল্পের কথা প্রকাশ করে এবং চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেয়। আমাদের মতে তার এ ধরনের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর ফলে আরবরা ক্রুদ্ধ হয়ে এমন কোন কাজ করে বসবে যাকে বাহানা বানিয়ে সে মক্কা আক্রমণ করে কাবাঘর ধ্বংস করে দেবার সুযোগ লাভ করবে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তার এ ধরনের ঘোষণায় ক্রুদ্ধ হয়ে জনৈক আরব কোন প্রকারে তার গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে মল ত্যাগ করে। ইবনে কাসীর বলেন, এ কাজটি করেছিল একজন কুরাইশী। অন্যদিকে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের বর্ণনা মতে, কয়েকজন কুরাইশ যুবক গিয়ে সেই গীর্জায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এর মধ্য থেকে যে কোন একটি ঘটনাই যদি সত্যি সত্যিই ঘটে থাকে তাহলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ আবরাহার এ ঘোষণাটি ছিল নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। এ কারণে প্রাচীন জাহেলী যুগের কোন আরব বা কুরাইশীর অথবা কয়েকজন কুরাইশী যুবকের পক্ষে উত্তেজিত হয়ে গীর্জাকে নাপাক করা অথবা তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া কোন অস্বাভাবিক বা দুর্বোধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আবরাহার নিজের পক্ষেও নিজের কোন লোক লাগিয়ে গোপনে গোপনে এই ধরনের কোন কাণ্ড করে ফেলাটাও অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় না। কারণ সে এভাবে মক্কা আক্রমণ করার বাহানা সৃষ্টি

* ইয়ামনের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করার পর খৃষ্টানরা মক্কার কা'বাঘরের মোকাবিলায় দ্বিতীয় একটি কা'বা তৈরি করার এবং সমগ্র আরবে তাকে কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা নাজরানেও একটি কা'বা নির্মাণ করেছিল। সূরা বুরুজের ৪ টীকায় এর আলোচনা এসেছে।

করতে এবং কুরাইশদেরকে ধ্বংস ও সমগ্র আরববাসীকে ভীত–সন্ত্রস্ত করে দিয়ে নিজের উভয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হতে পারবে বলে মনে করছিল। মোটকথা দু'টি অবস্থার মধ্য থেকে যেকোন একটিই সঠিক হোক না কেন, আবরাহার কাছে যখন এ রিপোর্ট পৌছল যে, কাবার ভক্ত অনুরক্তরা তার গীর্জার অবমাননা করেছে তখন সে কসম খেয়ে বসে, কা'বাকে গুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি স্থির হয়ে বসবো না।

তারপর ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে সে ৬০ হাজার পদাতিক, ১৩টি হাতি (অন্য বর্ণনা মতে ৯টি হাতি) সহকারে মক্কার পথে রওয়ানা হয়। পথে প্রথমে যু–নফর নামক ইয়ামনের একজন সরদার আরবদের একটি সেনাদল সংগ্রহ করে তাকে বাধা দেয়। কিন্তু যুদ্ধে সে পরাজিত ও ধৃত হয়। তারপর খাশ'আম এলাকায় নুফাইল ইবনে হাবীব খাশ'আমী তার গোত্রের লোকদের নিয়ে তার পথ রোধ করে। কিন্তু সেও পরাজিত ও গ্রেফতার হয়ে যায়। সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আবরাহার সেনাদলের পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ সেনাদল তায়েফের নিকটবর্তী হলে বনু সকীফ অনুভব করে এত বড় শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের নেই এবং এই সংগে তারা এ আশংকাও করতে থাকে যে, হয়তো তাদের লাত দেবতার মন্দিরও তারা ভেঙে ফেলবে। ফলে তাদের সরদার মাসউদ একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আবরাহার সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাকে বলে, আপনি যে উপাসনালয়টি ভাঙতে এসেছেন আমাদের এ মন্দিরটি সে উপাসনালয় নয়। সেটি মক্কায় অবস্থিত। কাজেই আপনি আমাদেরটায় হাত দেবেন না। আমরা মক্কার পথ দেখাবার জন্য আপনাকে পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করে দিচ্ছি। আবরাহা তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। ফলে বনু সাকীফ আবু রিগাল নামক এক ব্যক্তিকে তার সাথে দিয়ে দেয়। মক্কা পৌছুতে যখন আর মাত্র তিন ক্রোশ পথ বাকি তখন আল মাগাম্মাস বা আল মুগাম্মিস নামক স্থানে পৌছে আবু রিগাল মারা যায়। আরবরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার কবরে পাথর মেরে এসেছে। বনী সাকীফকেও তারা বছরের পর বছর ধরে এই বলে ধিক্কার দিয়ে এসেছে। —তোমরা লাতের মন্দির বাঁচাতে গিয়ে আল্লাহর ঘরের ওপর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছো।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, আল মাগাম্মেস থেকে আবরাহা তার অগ্রবাহিনীকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। তারা তিহামার অধিবাসীদের ও কুরাইশদের উট, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বহু পালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা আবদুল মুত্তালিবেরও দু'শো উট ছিল। এরপর সে মক্কাবাসীদের কাছে নিজের একজন দূতকে পাঠায়। তার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের কাছে এই মর্মে বাণী পাঠায় ঃ আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমি এসেছি শুধুমাত্র এই ঘরটি (কাবা) ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে। যদি তোমরা যুদ্ধ না করো তাহলে তোমাদের প্রাণ ও ধন–সম্পত্তির কোন ক্ষতি আমি করবো না। তাছাড়া তার এক দূতকেও মক্কাবাসীদের কাছে পাঠায়। মক্কাবাসীরা যদি তার সাথে কথা বলতে চায় তাহলে তাদের সরদারকে তার কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। আবদুল মুত্তালিব তখন ছিলেন মক্কার সবচেয়ে বড় সরদার। দূত তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আবরাহার পয়গাম তাঁর কাছে পৌছিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আবরাহার সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। এটা আল্লাহর ঘর তিনি চাইলে তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। দূত বলে, আপনি আমার সাথে

আবরাহার কাছে চলুন। তিনি সম্মত হন এবং দূতের সাথে আবরাহার কাছে যান। তিনি এতই সুশ্রী, আকর্ষণীয় ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আবরাহা তাকে দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সে সিংহাসন থেকে নেমে এসে নিজে তাঁর কাছে বসে পড়ে। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি চান? তিনি বলেন, আমার যে উটগুলো ধরে নেয়া হয়েছে সেগুলো আমাকে ফেরত দেয়া হোক। আবরাহা বলল, আপনাকে দেখে তো আমি বড়ই প্রভাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি নিজের উটের দাবী জানাচ্ছেন, অথচ এই যে ঘরটা আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মের কেন্দ্র সে সম্পর্কে কিছুই বলছেন না, আপনার এ বক্তব্য আপনাকে আমার দৃষ্টিতে মর্যাদাহীন করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি তো কেবল আমার উটের মালিক এবং সেগুলোর জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আর এই ঘর। এর একজন রব, মালিক ও প্রভু আছেন। তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আবরাহা জবাব দেয়, তিনি একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, এ ব্যাপারে আপনি জানেন ও তিনি জানেন। একথা বলে তিনি সেখান থেকে উঠে পড়েন। আবরাহা তাঁকে তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দেয়।

ইবনে আব্বাস (রা) ভিন্ন ধরনের বর্ণনা পেশ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় উট দাবীর কোন কথা নেই। আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, আবু নু'আইম ও বাইহাকী তাঁর থেকে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেন, আবরাহা আসসিফাই (আরাফাত ও তায়েফের পাহাড়গুলোর মধ্যে হারম শরীফের সীমানার কাছাকাছি একটি স্থান) পৌঁছে গেলে আবদুল মুত্তালিব নিজেই তার কাছে যান এবং তাকে বলেন, আপনার এখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল? আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকলে আমাদের কাছে বলে পাঠাতেন। আমরা নিজেরাই সে জিনিস নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছে যেতাম। জবাবে সে বলে, আমি শুনেছি, এটি শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর। আমি এর শান্তি ও নিরাপত্তা খতম করতে এসেছি। আবদুল মুত্তালিব বলেন, এটি আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত তিনি কাউকে এর ওপর চেপে বসতে দেননি। আবরাহা জবাব দেয়, আমি একে বিধ্বস্ত না করে এখান থেকে সরে যাবো না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, আপনি যা কিছু চান আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে যান। কিন্তু আবরাহা অস্বীকার করে। আবদুল মুত্তালিবকে পেছনে রেখে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

উভয় বর্ণনার এ বিভিন্নতাকে যদি আমরা যথাস্থানে রেখে দিই এবং এদের মধ্য থেকে একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য না দিই তাহলে যে ঘটনাটিই ঘটুক না কেন আমাদের কাছে একটি জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সেটি হচ্ছে, মক্কা ও তার চারপাশের গোত্রগুলো এতবড় সেনাদলের সাথে যুদ্ধ করে কাবাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখতো না। কাজেই একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কুরাইশরা তাদেরকে বাধা দেবার চেষ্টাই করেনি। কুরাইশরা তো আহযাবের যুদ্ধের সময় মুশরিক ও ইহুদি গোত্রগুলোকে সাথে নিয়ে বড় জোর দশ বারো হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। কাজেই তারা ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবিলা করতো কিভাবে?

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আবরাহার সেনাদলের কাছ থেকে ফিরে এসে আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদেরকে বলেন, নিজেদের পরিবার পরিজনদের নিয়ে পাহাড়ের ওপর চলে যাও, এভাবে তারা ব্যাপক গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। তারপর তিনি ও কুরাইশদের কয়েকজন সরদার হারম শরীফে হাযির হয়ে যান। তারা কাবার দরজার কড়া

ধরে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করতে থাকেন যে, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তাঁর খাদেমদের হেফাজত করেন। সে সময় কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। কিন্তু এই সংকটকালে তারা সবাই এই মূর্তিগুলোর কথা ভুলে যায়। তারা একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য হাত ওঠায়। ইতিহাসের বইগুলোতে তাদের প্রার্থনা বাণী উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে আবদুল মুত্তালিবের নিম্নোক্ত কবিতাসমূহ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

لَاهُمَّ ان العبد يمنع رحله فامنع حلالك

"হে আল্লাহ! বান্দা নিজের ঘর রক্ষা করে
তুমিও তোমার ঘর রক্ষা করো।"

لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك

"আগামীকাল তাদের ক্রুশ ও তাদের কৌশল যেন
তোমার কৌশলের ওপর বিজয় লাভ না করে।"

ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر مابدالك

"যদি তুমি ছেড়ে দিতে চাও তাদেরকে ও আমাদের কিবলাহকে
তাহলে তাই করো যা তুমি চাও।"

সুহাইলী 'রওযুল উনুফ' গ্রন্থে এ প্রসংগে নিম্নোক্ত কবিতাও উদ্ধৃত করেছেন ঃ

وانصرنا على ال الصليب وعابديه اليوم الك

"ক্রুশের পরিজন ও তার পূজারীদের মোকাবিলায়
আজ নিজের পরিজনদেরকে সাহায্য করো।"

আবদুল মুত্তালিব দোয়া করতে করতে যে, কবিতাটি পড়েছিলেন ইবনে জারীর সেটিও উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে ঃ

يارب لا ارجو لهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا

ان عدو البيت من عاداكا امنعهم ان يخربوا قراكا

"হে আমার রব! তাদের মোকাবিলায়
তুমি ছাড়া কারো প্রতি আমার আশা নেই,
হে আমার রব! তাদের হাত থেকে
তোমার হারমের হেফাজত করো।
এই ঘরের শত্রু তোমার শত্রু,
তোমার জনপদ ধ্বংস করা থেকে
তাদেরকে বিরত রাখো।"

এ দোয়া করার পর আবদুল মুত্তালিব ও তার সাথিরাও পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরের দিন আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু তার বিশেষ হাতী মাহমুদ ছিল

সবার আগে, সে হঠাৎ বসে পড়ে। কুড়ালের বাঁট দিয়ে তার গায়ে অনেকক্ষণ আঘাত করা হয়। তারপর বারবার অংকুশাঘাত করতে করতে তাকে আহত করে ফেলা হয়। কিন্তু এত বেশী মারপিট ও নির্যাতনের পরেও সে একটুও নড়ে না। তাকে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে মুখ করে চালাবার চেষ্টা করলে সে ছুটতে থাকে কিন্তু মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে দিলে সংগে সংগেই গ্যাট হয়ে বসে পড়ে। কোন রকমে তাকে আর একটুও নড়ানো যায় না।

এ সময় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঠোঁটে ও পাঞ্জায় পাথর কণা নিয়ে উড়ে আসে। তারা এ সেনাদলের ওপর পাথর বর্ষণ করতে থাকে। যার ওপর পাথর কণা পড়তো তার দেহ সংগে সংগে গলে যেতে থাকতো। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও ইকরামার বর্ণনা মতে, এটা ছিল বসন্ত রোগ এবং আরব দেশে সর্বপ্রথম এ বছরই বসন্ত দেখা যায়। ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা মতে, যার ওপরই পাথর কণা পড়তো তার সারা গায়ে ভীষণ চুলকানি শুরু হতো এবং চুলকাতে চুলকাতে চামড়া ছিঁড়ে গোশত ঝরে পড়তে থাকতো। ইবনে আব্বাস (রা) আর একটি বর্ণনায় বলেছেন, গোশত ও রক্ত পানির মতো ঝরতে থাকতো এবং হাড় বের হয়ে পড়তো। আবরাহা নিজেও এই অবস্থার সম্মুখীন হয়। তার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তো এবং যেখান থেকে এক টুকরো গোশত খসে পড়তো সেখান থেকে রক্ত ও পুঁজ ঝরে পড়তে থাকতো। বিশৃংখলা ও হুড়োহুড়ি ছুটাছুটির মধ্যে তারা ইয়ামনের দিকে পালাতে শুরু করে। খাশ'আম এলাকা থেকে যে নুফাইল ইবনে হাবীব খাশ'আমীকে তারা পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়ে আসে তাকে খুঁজে পেয়ে সামনে নিয়ে আসা হয় এবং তাকে ফিরে যাবার পথ দেখিয়ে দিতে বলা হয়। কিন্তু সে সরাসরি অস্বীকার করে বসে। সে বলে ঃ

اين المفرو الاله الطالب والا شرم المغلوب ليس الغالب

"এখন পালাবার জায়গা কোথায়
যখন আল্লাহ নিজেই করছেন পশ্চাদ্ধাবন?
আর নাককাটা আবরাহা পরাজিত
সে বিজয়ী নয়।"

এই পলায়ন তৎপরতার মধ্যে লোকেরা পথে ঘাটে এখানে সেখানে পড়ে মরতে থাকে। আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন তখনই এক সাথে সবাই মারা যায়নি। বরং কিছু লোক সেখানে মারা পড়ে আর দৌড়াতে দৌড়াতে কিছু লোক পথের ওপর পড়ে যেতে থাকে। এভাবে সারাটা পথে তাদের লাশ বিছিয়ে থাকে। আবরাহাও খাশ্'আম এলাকায় পৌঁছে মারা যায়।*

* মহান আল্লাহ হাবশীদেরকে শুধুমাত্র শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি বরং তিন চার বছরের মধ্যে ইয়ামনের ওপর থেকে হাবশী কর্তৃত্ব পুরোপুরি খতম করে দেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হাতির ঘটনার পর ইয়ামনে তাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে ইয়ামনী সরদাররা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়াতে থাকে। সাইফ ইবনে যী ইয়াযান নামক একজন ইয়ামনী সরদার ইরানের বাদশাহর কাছ থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে। ছয়টি জাহাজে চড়ে ইরানের এক হাজার সৈন্য ইয়ামনে অবতরণ করে। হাবশী শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য এ এক হাজার সৈন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। এটা ৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

মুয্‌দালিফা ও মিনার মধ্যে অবস্থিত মহাসাব উপত্যকার সন্নিকটে মুহাস্‌সির নামক স্থানে এ ঘটনাটি ঘটে। ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের যে ঘটনা ইমাম জাফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে চলেন তখন মুহাস্‌সির উপত্যকায় তিনি চলার গতি দ্রুত করে দেন। ইমাম নববী এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আসহাবে ফীলের ঘটনা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ জায়গাটা দ্রুত অতিক্রম করে যাওয়াটাই সুন্নাত। মুআত্তায় ইমাম মালিক রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুযদালিফার সমগ্র এলাকাটাই অবস্থান স্থল। তবে মুহাস্‌সির উপত্যকায় অবস্থান না করা উচিত। ইবনে ইসহাক নুফাইল ইবনে হাবীবের যেসব কবিতা উদ্ধৃত করেছেন তাতে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ এভাবে পেশ করা হয়েছে ঃ

رُدَيْنَةُ لور أَيتِ ولا تَريه لَدَى جنب المحصَّب ما رَأينا

حمدت اللّٰه اذا بصرت طيراً وخفت حجارة تلقى علينا

وكل القوم يسئال عن نفيل كأنّ على للجشان دَينا

"হায়, যদি তুমি দেখতে হে রুদাইনা।
তবে তুমি দেখতে পাবে না যা কিছু দেখেছি আমি
মুহাস্‌সাব উপত্যকার কাছে।
আল্লাহর শোকর করেছি আমি
যখন দেখেছি পাখিদেরকে
শঙ্কিত হচ্ছিলাম বুঝিবা পাথর ফেলে আমাদের ওপরও।
নুফাইলের সন্ধানে ফিরছিল তাদের সবাই
আমি যেন হাবশীদের কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা।"

এটা একটা মস্তবড় ঘটনা ছিল। সমগ্র আরবে এ ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ে। অনেক কবি এ নিয়ে কবিতা লেখেন। এ সমস্ত কবিতার একক বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, সবখানেই একে আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কোন একটি কবিতাতেই ইশারা-ইংগিতেও একথা বলা হয়নি যে, কা'বার অভ্যন্তরে রক্ষিত যেসব মূর্তির পূজা করা হতো তাদের কারো এতে সামান্যতম হাত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে যিবা'রা বলেন ঃ

ستّون الفالم يؤبوا ارضهم ولم يعش بعد الاياب سقيمها

كانت بها عادوجرهم قبلهم واللّٰه من فوق العباد يقيمها

"ষাট হাজার ছিল তারা
ফিরতে পারেনি নিজেদের স্বদেশ ভূমিতে,
আর ফেরার পরে তাদের রুগ্ন ব্যক্তি (আবরাহা) জীবিত থাকেনি।
এখানে তাদের পূর্বে ছিল আদ ও জুরহুম,
আর আল্লাহ বান্দাদের ওপর রয়েছেন,
তাদেরকে রেখেছেন তিনি প্রতিষ্ঠিত করে।"

আবু কায়েস ইবনে আস্‌লাত তার কবিতায় বলেন ঃ

فقوموا فصلوا ربكم وتمسّحوا　　بار كان هٰذا البيت بين الاخاشب

فلما اتاكم نصرذى العرشى ردّهم　　جنود المليك بين ساف وحاصب

"ওঠো, তোমার রবের ইবাদাত করো,
এবং মক্কা ও মিনার পাহাড়গুলোর মাঝখানে
বাইতুল্লার কোণগুলো স্পর্শ করো।
আরশবাসীদের সাহায্য যখন পৌছুল তোমাদের কাছে
তখন সেই বাদশাহর সেনাবাহিনী
তাদেরকে ফিরিয়ে দিল এমন অবস্থায়–
তাদের কেউ পড়ে ছিল মৃত্তিকার পরে
আর কেউ ছিল প্রস্তরাঘাতে ছিন্নভিন্ন।"

শুধু এখানেই শেষ নয় বরং হযরত উম্মে হানী (রা) ও যুবাইর ইবনুল আওয়ামের (র) বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কুরাইশরা ১০ বছর (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী ৭ বছর) পর্যন্ত এক ও লাশরীক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করেনি। উম্মে হানীর রেওয়ায়াতটি ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে এবং তাবারানী, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী তাদের হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আসাকির হযরত যুবাইরের (রা) বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। খতীব বাগদাদী তার ইতিহাস গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের যে মুরসাল রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

যে বছর এ ঘটনাটি ঘটে, আরববাসীরা সে বছরটিকে 'আমুল ফীল' (হাতির বছর) বলে আখ্যায়িত করে। সেই বছরেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয়। আসহাবে ফীলের ঘটনাটি ঘটে মহররম মাসে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয় রবিউল আউয়াল মাসে। এ বিষয়ে সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক একমত পোষণ করেন। অধিকাংশের মতে, রসূলের (সা) জন্ম হয় হাতির ঘটনার ৫০ দিন পরে।

মূল বক্তব্য

ওপরের যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো সামনে রেখে চিন্তা করলে এ সূরায় কেন শুধুমাত্র আসহাবে ফীলের ওপর মহান আল্লাহর আযাবের কথা বর্ণনা করেই শেষ করে দেয়া হয়েছে তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়। ঘটনা খুব বেশী পুরানো ছিল না। মক্কার সবাই এ ঘটনা জানতো। আরবের লোকেরা সাধারণভাবে এ সম্পর্কে অবহিত ছিল। সমগ্র আরববাসী স্বীকার করতো আবরাহার এ আক্রমণ থেকে কোন দেবতা বা দেবী নয় বরং আল্লাহ কা'বার হেফাজত করেছেন। কুরাইশ সরদাররা আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করেছিল। আবার এ ঘটনা কুরাইশদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত এত বেশী প্রভাবিত করে রেখেছিল যে, তারা সে সময় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করেনি। তাই সূরা ফীলে এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। বরং শুধুমাত্র এ ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। এভাবে স্মরণ করিয়ে দেবার ফলে বিশেষ করে কুরাইশরা এবং সাধারণভাবে সমগ্র আরববাসী মনে মনে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করতে পারে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ের দিকে আহবান জানাচ্ছেন সেটি অন্যান্য মাবুদদেরকে ত্যাগ করে একমাত্র লাশরীক আল্লাহর ইবাদাত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া তারা একথাটিও ভেবে দেখার সুযোগ পাবে যে, এ হকের দাওয়াত যদি তারা বল প্রয়োগ করে দমন করতে চায় তাহলে যে আল্লাহ আসহাবে ফীলকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন তারা তাঁরই ক্রোধের শিকার হবে।

তুমি কি দেখনি[১] তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কি করেছেন?[২] তিনি কি তাদের কৌশল[৩] ব্যর্থ করে দেননি?[৪] আর তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান,[৫] যারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিল পোড়া মাটির পাথর।[৬] তারপর তাদের অবস্থা করে দেন পশুর খাওয়া ভূষির মতো।[৭]

১. বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু মূলত এখানে শুধু কুরাইশদেরকেই নয় বরং সমগ্র আরববাসীকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তারা এই সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। কুরআন মজীদের বহু স্থানে 'আলাম তারা' (তুমি কি দেখনি?) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নয় বরং সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করাই উদ্দেশ্য। (উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দেখুন ঃ ইবরাহীম ১৯ আয়াত, আল হাজ্জ ১৮ ও ৬৫ আয়াত, আন নূর ৪৩ আয়াত, লোকমান ২৯ ও ৩১ আয়াত, ফাতের ২৭ আয়াত এবং আয্ যুমার ২১ আয়াত) তাছাড়া দেখা শব্দটি এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, মক্কায় ও তার আশেপাশে এবং আরবের বিস্তৃত এলাকায় এ আসহাবে ফীলের ঘটনাটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে এ ধরনের বহু লোক সে সময় জীবিত ছিল। কারণ তখনো এই ঘটনার পর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যায়নি। লোক মুখে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ সরাসরি এত বেশী বেশী সূত্রে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যার ফলে এটা প্রায় সব লোকেরই চোখে দেখা ঘটনার পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল।

২. এই হাতিওয়ালা কারা ছিল, কোথায় থেকে এসেছিল, কি উদ্দেশ্যে এসেছিল এসব কথা আল্লাহ এখানে বলছেন না। কারণ এগুলো সবাই জানতো।

৩. মূলে কাইদা (كَيْد) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি করবার জন্য গোপন কৌশল অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে গোপন কি ছিল? ষাট হাজার লোকের একটি সেনাবাহিনী কয়েকটি হাতি নিয়ে প্রকাশ্যে ইয়ামন থেকে মক্কায় আসে। তারা যে কা'বা শরীফ ভেঙ্গে ফেলতে এসেছে, একথাও তারা গোপন করেনি। কাজেই এ কৌশলটি গোপন ছিল না। তবে হাবশীরা কা'বা ভেঙে ফেলে কুরাইশদেরকে বিধ্বস্ত ও পর্যদস্ত করে এবং এভাবে সমগ্র আরববাসীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথ আরবদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছিল। এটা ছিল তাদের মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যটিকে তারা গোপন করে রাখে। অন্যদিকে তারা প্রকাশ করতে থাকে কয়েকজন আরব তাদের গীর্জার যে অবমাননা করেছে, কা'বা শরীফ ভেঙে ফেলে তারা তার প্রতিশোধ নিতে চায়।

৪. মূলে বলা হয়েছে فِىْ تَضْلِيْلٍ অর্থাৎ তাদের কৌশলকে তিনি ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী কৌশলকে ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করার মানে হয় তাকে নষ্ট ও বিধ্বস্ত করে দেয়া অথবা নিজের উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাকে ব্যর্থ করে দেয়া। যেমন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তির তীর লক্ষ ভ্রষ্ট হয়েছে, তার সব প্রচেষ্টা ও কলাকৌশল ব্যর্থ হয়েছে। কুরআন মজীদের এক জায়গায় বলা হয়েছে وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ "কিন্তু কাফেরদের কলাকৌশল ব্যর্থ হয়েছে।" (আল মু'মিন ২৫) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে : وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ "আর আল্লাহ খেয়ানতকারীদের কৌশলকে সফলতার দ্বারে পৌছিয়ে দেন না।" (ইউসূফ ৫২) আরববাসীরা ইমরাউল কায়েসকে اَلْمَلِكُ الضِّلِّيْلُ "বিনষ্টকারী বাদশাহ" বলতো। কারণ সে তার বাপের কাছ থেকে পাওয়া বাদশাহী হারিয়ে ফেলেছিল।

৫. মূলে বলা হয়েছে طَيْرًا اَبَابِيْلَ আরবীতে আবাবীল মানে হচ্ছে, বহু ও বিভিন্ন দল যারা একের পর এক বিভিন্ন দিক থেকে আসে। তারা মানুষও হতে পারে আবার পশুও হতে পারে। ইকরামা ও কাতাদাহ বলেন, লোহিত সাগরের দিক থেকে এ পাখিরা দলে দলে আসে। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও ইকরামা বলেন, এ ধরনের পাখি এর আগে কখনো দেখা যায়নি এবং এর পরেও দেখা যায়নি। এগুলো নজদ, হেজায, তেহামা বা লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী উপকূল এলাকার পাখি ছিল না। ইবনে আব্বাস বলেন, তাদের চঞ্চু ছিল পাখিদের মতো এবং পাঞ্জা কুকুরের মতো। ইকরামার বর্ণনা মতে তাদের মাথা ছিল শিকারী পাখীর মাথার মত। প্রায় সকল বর্ণনাকারীর সর্বসম্মত বর্ণনা হচ্ছে, প্রত্যেকটি পাখির ঠোঁটে ছিল একটি করে পাথরের কুচি এবং পায়ে ছিল দু'টি করে পাথরের কুচি। মক্কার অনেক লোকের কাছে এই পাথর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। আবু নু'আইম নওফাল ইবনে আবী মু'আবীয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, আসহাবে ফীলের ওপর যে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল আমি তা দেখেছি। সেগুলোর এক একটি ছিল ছোট মটর দানার সমান। গায়ের রং ছিল লাল কালচে। আবু নু'আইম ইবনে আব্বাসের যে রওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে, সেগুলো ছিল চিলগুজার* সমান। অন্যদিকে ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনা মতে, সেগুলো ছিল ছাগলের লেদীর সমান। মোটকথা, এসবগুলো পাথর সমান মাপের ছিল না। অবশ্যি কিছু না কিছু পার্থক্য ছিল।

* চিলগুজা চীনাবাদাম জাতীয় এক ধরনের শুকনা ফল। লম্বায় ও চওড়ায় একটি চীনাবাদামের প্রায় সমান।

৬. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ অর্থাৎ সিজ্জীল ধরনের পাথর। ইবনে আব্বাস বলেন, এ শব্দটি মূলত ফারসীর "সংগ" ও "গীল" শব্দ দু'টির আরবী করণ।* এর অর্থ এমন পাথর যা কাদা মাটি থেকে তৈরি এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হয়েছে। কুরআন মজীদ থেকেও এই অর্থের সত্যতা প্রমাণি হয়। সূরা হূদের ৮২ ও সূরা হুজুরাতের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে, লূত জাতির ওপর সিজ্জীল ধরনের পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং এই পাথর সম্পর্কে সূরা যারিয়াতের ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে, সেগুলো ছিল মাটির পাথর অর্থাৎ কাদামাটি থেকে সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল।

মাওলানা হামীদুদ্দিন ফারাহী মরহুম ও মগফুর বর্তমান যুগে কুরআনের অর্থ বর্ণনা ও গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি এ আয়াতে "তারমীহিম" (তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিল) শব্দের কর্তা হিসেবে মক্কাবাসী ও অন্যান্য আরববাসীদেরকে চিহ্নিত করেছেন। "আলাম তারা" (তুমি কি দেখনি) বাক্যাংশেও তাঁর মতে এদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। পাখিদের সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা পাথর নিক্ষেপ করছিল না বরং তারা এসেছিল আসহাবে ফীলের লাশগুলি খেয়ে ফেলতে। এই ব্যাখ্যার সপক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তার নির্যাস হচ্ছে এই যে, আবদুল মুত্তালিবের আবরাহার কাছে গিয়ে কা'বার পরিবর্তে নিজে উট ফেরত নেবার জন্য দাবী জানানোর ব্যাপারটি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অন্যদিকে কুরাইশরা এবং অন্যান্য যেসব লোকেরা হজ্জের জন্য এসেছিল তারা হানাদার সেনাদলের কোন মোকাবেলা না করে কাবাঘরকে তাদের করুণা ও মেহেরবানির ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পাহাড়ের ওপর গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করবে, একথাও দুর্বোধ্য মনে হয়। তাই তাঁর মতে আসল ঘটনা হচ্ছে, আরবরা আবরাহার সেনাদলের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহ পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত করে এই সেনাদলকে বিধ্বস্ত করেন। তারপর তাদের লাশ খেয়ে ফেলার জন্য পাখি পাঠান। কিন্তু ভূমিকায় আমরা বলেছি, আবদুল মুত্তালিব তার উট দাবী করতে গিয়েছিলেন, রেওয়ায়াতে কেবল একথাই বলা হয়নি। বরং রেওয়ায়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটের দাবীই জানাননি এবং আবরাহাকে তিনি কাবা আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টাও করেছিলেন। আমরা একথাও বলেছি, সমস্ত নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আবরাহা মহররম মাসে এসেছিল। তখন হাজীরা ফিরে যাচ্ছিল আর একথাও আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে, ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করা কুরাইশদের ও তাদের আশেপাশের গোত্রগুলোর সামর্থের বাইরে ছিল। আহযাব যুদ্ধের সময় বিরাট ঢাক ঢোল পিটিয়ে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে আরব মুশরিক ও ইহুদি গোত্রগুলোর যে সেনাদল তারা এনেছিল তার সংখ্যা দশ বারো হাজারের বেশী ছিল না। কাজেই ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করার সাহস তারা কেমন করে করতে পারতো? তবুও এ সমস্ত যুক্তি বাদ দিয়ে যদি শুধু মাত্র সূরা ফীলের বাক্য বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে এ ব্যাখ্যা তার বিরোধী প্রমাণিত হয়। আরবরা পাথর মারে এবং তাতে আসহাবে ফীল মরে ছাতু হয়ে যায় আর তারপর পাখিরা আসে তাদের লাশ খাবার জন্য, ঘটনা যদি এমনি ধরা হতো তাহলে বাক্য বিন্যাস হতো নিম্নরূপভাবে ঃ

* সংগ মানে পাথর এবং গীল মানে কাদা।—অনুবাদক

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيْلٍ ـ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ ـ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ـ

(তোমরা তাদেরকে মারছিলে পোড়া মাটির পাথর। তারপর আল্লাহ তাদেরকে করে দিলেন ভুক্ত ভূষির মতো। আর আল্লাহ তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন) কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, প্রথমে আল্লাহ পাখির ঝাঁক পাঠাবার কথা জানালেন তারপর তার সাথে সাথেই বললেন ঃ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيْلٍ অর্থাৎ যারা তাদেরকে পোড়া মাটির তৈরী পাথরের কুচি দিয়ে মারছিল। সবশেষে বললেন, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ভুক্ত ভূষির মতো করে দিলেন।

৭. আসল শব্দ হচ্ছে, كَعَصْفٍ مَّاكُوْلٍ আসফ শব্দ সূরা আর রহমানের ১২ আয়াতে এসেছে ঃ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ "শস্য ভূষি ও চারাওয়ালা।" এ থেকে জানা যায়, আসফ মানে হচ্ছে খোসা, যা শস্য দানার গায়ে লাগানো থাকে এবং কৃষক শস্য দানা বের করে নেবার পর যাকে ফেলে দেয় তারপর পশু তা খেয়েও ফেলে। আবার পশুর চিবানোর সময় কিছু পড়েও যায় এবং তার পায়ের তলায় কিছু পিশেও যায়।

কুরাইশ

১০৬

নামকরণ

প্রথম আয়াতের কুরাইশ (قُرَيْش) শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

যাহ্হাক ও কাল্বী একে মাদানী বললেও মুফাস্সিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এর মক্কী হবার ব্যাপারে একমত। তাছাড়া এ সরার শব্দাবলীর মধ্যেও এর মক্কী হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিহিত রয়েছে। যেমন رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (এ ঘরের রব)। এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হলে কাবাঘরের-জন্য "এ ঘর" শব্দ দু'টি কেমন করে উপযোগী হতে পারে? বরং সূরা আল ফীলের বিষয়বস্তুর সাথে এর এত গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, সম্ভবত আল ফীল নাযিল হবার পর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে বলে মনে হয়। উভয় সূরার মধ্যে এই গভীর সম্পর্ক ও সামঞ্জস্যের কারণে প্রথম যুগের কোন কোন মনীষী এ দু'টি সূরাকে মূলত একটি সূরা হবার মত পোষণ করতেন। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) তাঁর সংকলিত কুরআনের অনুলিপিতে এ দু'টি সূরাকে একসাথে লিখেছেন এবং সেখানে এ দু'য়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা ছিল না। এ ধরনের রেওয়ায়াত পূর্বোক্ত চিন্তাকে আরো শক্তিশালী করেছে। তাছাড়া হযরত উমর (রা) একবার কোন ভেদ চিহ্ন ছাড়াই এই সূরা দু'টি এক সাথে নামাযে পড়েছিলেন। কিন্তু এ রায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাইয়েদুনা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের সহযোগিতায় সরকারীভাবে কুরআন মজীদের যে অনুলিপি তৈরি করে ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন তাতে এ উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা ছিল। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার সমস্ত কুরআন মজীদ এ দু'টি আলাদা আলাদা সূরা হিসেবেই লিখিত হয়ে আসছে। এ ছাড়াও এ সূরা দু'টির বর্ণনা ভংগী পরস্পর থেকে এত বেশী বিভিন্ন যে, এ দু'টির ভিন্ন ভিন্ন সূরা হবার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ কুসাই ইবনে কিলাবের সময় পর্যন্ত কুরাইশ গোত্র হিজাযে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করছিল। কুসাই সর্বপ্রথম তাদেরকে মক্কায় একত্র করে। এভাবে বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব তাদের হাতে আসে। এ জন্য কুসাইকে "মুজাম্মে" বা একত্রকারী উপাধি দান করা হয়। এ ব্যক্তি নিজের উন্নত পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক কুশলতা ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যে মক্কায় একটি নগর রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপন করে। আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজীদের খেদমতের উত্তম ব্যবস্থা করে। এর ফলে ধীরে ধীরে আরবের সকল গোত্রের মধ্যে এবং সমস্ত এলাকায় কুরাইশদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কুসাইয়ের পর তার পুত্র আবদে মান্নাফ ও আবদুদ্দারের

মধ্যে মক্কা রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে পিতার আমলেই আবদে মান্নাফ অধিকতর খ্যাতি লাভ করে এবং সমগ্র আরবে তার মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। আবৃদে মান্নাফের ছিল চার ছেলে : হাশেম, আবৃদে শামস, মুত্তালিব ও নওফাল। এদের মধ্য থেকে আবদুল মুত্তালিবের পিতা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ হাশেমের মনে সর্বপ্রথম আরবের পথে প্রাচ্য এলাকার দেশসমূহ এবং সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যে আন্তরজাতিক বাণিজ্য চলতো তাতে অংশগ্রহণ করার এবং এই সংগে আরববাসীদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কিনে আনার চিন্তা জাগে। তার ধারণামতে এভাবে বাণিজ্য পথের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোত্ররা তাদের কাছ থেকে দ্রব্য–সামগ্রী কিনবে এবং মক্কার বাজারসমূহে দেশের অভ্যন্তরের ব্যবসায়ীরা সামগ্রী কেনার জন্য ভিড় জমাবে। এটা এমন এক সময়ের কথা যখন উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহ ও পারস্য উপসাগরের পথে রোম সাম্রাজ্য ও প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে যে আন্তরজাতিক বাণিজ্য চলতো তার ওপর ইরানের সাসানীয় সম্রাটরা পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ কারণে দক্ষিণ আরব থেকে লোহিত সাগরের উপকূল ঘেঁসে সিরিয়া ও মিসরের দিকে প্রসারিত বাণিজ্য পথে ব্যবসা বিপুলভাবে জমে উঠেছিল। আরবের অন্যান্য বাণিজ্য কাফেলার তুলনায় কুরাইশদের বাড়তি সুবিধা ছিল। কাবার খাদেম হবার কারণে পথের সমস্ত গোত্র তাদেরকে মর্যাদার চোখে দেখতো। হজ্জের সময় কুরাইশ বংশীয় লোকেরা যে আন্তরিকতা, উদারতা ও বদান্যতা সহকারে হাজীদের খেদমত করতো সে জন্য সবাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কাজেই কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার ওপর পথে ডাকাতদের আক্রমণ হবে এ আশংকা ছিল না। পথের বিভিন্ন গোত্র অন্যান্য বাণিজ্য কাফেলার কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ পথকর আদায় করতো তাও তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতো না। এসব দিক বিবেচনা করে হাশেম একটি বাণিজ্য পরিকল্পনা তৈরি করে এবং এই পরিকল্পনায় তার অন্য তিন ভাইকেও শামিল করে। হাশেম সিরিয়ার গাস্‌সানী বাদশাহ থেকে, আবৃদে শামস হাবশার বাদশাহর থেকে, মুত্তালিব ইয়ামনের গভর্ণরদের থেকে এবং নওফল ইরাক ও পারস্যের সরকারদের থেকে বাণিজ্যের সুযোগ–সুবিধা লাভ করে। এভাবে তাদের ব্যবসা দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। ফলে তারা চার ভাই "মুত্তাজিরীন" বা সওদাগর নামে খ্যাত হয়। আর এই সংগে তারা আশপাশে গোত্রদের ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল সে জন্য তাদেরকে "আসহাবুল ঈলাফ" তথা প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টিকারী বলা হতো।

এ ব্যবসার কারণে কুরাইশবংশীয় লোকেরা সিরিয়া, মিসর, ইরান, ইয়ামন ও হাবশার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করে। সরাসরি বিভিন্ন দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতার সংস্পর্শে আসার কারণে তাদের দেখার, জানার ও উপলব্ধি করার মান অনেক উন্নত হতে থাকে। ফলে আরবের দ্বিতীয় কোন গোত্র তাদের সমপর্যায়ে পৌছতে পারেনি। ধন–সম্পদের দিক দিয়েও তারা আরবের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। মক্কা পরিণত হয়েছিল সমগ্র আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রে। এ আন্তরজাতিক সম্পর্কের একটি বড় সুফল হিসেবে তারা ইরাক থেকে বর্ণমালাও আমদানী করে। পরবর্তী কালে কুরআন মজীদ লেখার জন্য এ বর্ণমালাই ব্যবহৃত হয়। আরবের কোন গোত্রে কুরাইশদের মতো এত বেশী লেখাপড়া জানা লোক ছিল না। এসব কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : قُرَيْشٌ قَادَةُ النَّاسِ

অর্থাৎ কুরাইশরা হচ্ছে জনগণের নেতা। (মুসনাদে আহমাদ ঃ আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত হাদীস সমষ্টি) বাইহাকী হযরত আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

كَانَ هٰذَا الْاَمْرُ فِىْ حِمْيَرَ فَنَزَعَهُ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَجَعَلَهُ فِىْ قُرَيْشٍ

"প্রথমে আরবদের নেতৃত্ব ছিল হিময়ারী গোত্রের দখলে তারপর মহান আল্লাহ তা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুরাইশদেরকে দান করেন।"

কুরাইশরা এভাবে একের পর এক উন্নতির মনযিল অতিক্রম করে চলছিল। এমন সময় আবরাহার মক্কা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। যদি সে সময় আবরাহা কা'বা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হতো তাহলে আরবদেশে শুধু মাত্র কুরাইশদেরই নয়, কা'বা শরীফের মর্যাদাও খতম হয়ে যেতো। এটি যে সত্যিই বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর, জাহেলী যুগের আরবদের এই বিশ্বাসের ভিতও নড়ে উঠতো। এ ঘরের খাদেম হিসেবে সারা দেশে কুরাইশদের যে মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাও মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে যেতো। হাবশীদের মক্কা দখল করার পর রোম সম্রাট সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়া ও মক্কার মাঝখানের বাণিজ্য পথও দখল করে নিতো। ফলে কুসাই ইবনে কিলাবের আগে কুরাইশরা যে দুর্গত অবস্থার শিকার ছিল তার চাইতেও মারাত্মক দুরবস্থার মধ্যে তারা পড়তো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতের খেলা দেখান। পক্ষীবাহিনী পাথর মেরে মেরে আবরাহার ৬০ হাজারের বিশাল হাবশীবাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়। মক্কা থেকে ইয়ামন পর্যন্ত সারাটা পথে বিধ্বস্ত সেনাবাহিনীর লোকেরা পড়ে মরে যেতে থাকে। এ সময় কা'বা শরীফের আল্লাহর ঘর হবার ব্যাপারে সমস্ত আরববাসীর ঈমান আগের চাইতে কয়েকগুণ বেশী মজবুত হয়ে যায়। এই সংগে সারা দেশে কুরাইশদের প্রতিপত্তি আগের চাইতেও আরো অনেক বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন আরবদের মনে বিশ্বাস জন্মে, এদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। ফলে এরা নির্বিঘ্নে আরবের যে কোন অংশে যেতো এবং নিজেদের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যে কোন এলাকা অতিক্রম করতো। এদের গায়ে হাত দেবার সাহস কারো হতো না। এদের গায়ে হাত দেয়া তো দূরের কথা এদের নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় কোন অকুরাইশী থাকলেও তাকে কেউ বিরক্ত করতো না।

মূল বক্তব্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে যেহেতু এ অবস্থা সবার জানা ছিল তাই এসব কথা আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণে এ ছোট্ট সূরাটিতে চারটি বাক্যের মধ্য দিয়ে কুরাইশদেরকে কেবলমাত্র এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, যখন তোমরা নিজেরাই এ ঘরটিকে (কাবা ঘর) দেবমূর্তির মন্দির নয় বরং আল্লাহর ঘর বলে মনে করো এবং যখন তোমরা ভালোভাবেই জানো যে, আল্লাহই তোমাদেরকে এ ঘরের বদৌলতে এ পর্যায়ের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন, তোমাদের ব্যবসায় এহেন উন্নতি দান করেছেন এবং অভাব-অনাহার থেকে রক্ষা করে তোমাদেরকে এ ধরনের সমৃদ্ধি দান করেছেন তখন তোমাদের তো আসলে তাঁরই ইবাদাত করা উচিত।

যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে,[১] (অর্থাৎ) শীতের ও গ্রীষ্মের সফরে অভ্যস্ত।[২] কাজেই তাদের এই ঘরের রবের ইবাদাত করা উচিত,[৩] যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রেহাই দিয়ে খাবার দিয়েছেন[৪] এবং ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।[৫]

১. মূল শব্দ হচ্ছে لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ । এখানে ঈলাফ (ايلاف) শব্দটি এসেছে উলফাত (الفت) শব্দ থেকে। এর অর্থ হয় অভ্যস্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া, বিচ্ছেদের পর মিলিত হওয়া এবং কোন জিনিসের অভ্যাস গড়ে তোলা। ঈলাফ শব্দের পূর্বে যে 'লাম'টি ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে অনেক আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিত এ মত প্রকাশ করেছেন যে, আরবী প্রচলন ও বাক্‌রীতি অনুযায়ী এর মাধ্যমে বিস্ময় প্রকাশ করা বুঝায়। যেমন আরবরা বলে, لِزَيْدٍ وَمَا صَنَعْنَا بِهِ "এই যায়েদের ব্যাপারটা দেখো, আমরা তার সাথে ভালো ব্যবহার করলাম কিন্তু সে আমাদের সাথে কেমন ব্যবহারটা করলো!" কাজেই لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ মানে হচ্ছে, কুরাইশদের ব্যবহারে বড়ই অবাক হতে হয়। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহে তারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হবার পর একত্র হয়েছে এবং এমন ধরনের বাণিজ্য সফরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যা তাদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। অথচ তারা সেই আল্লাহর বন্দেগী করতে অস্বীকার করছে! ভাষাতত্ত্ববিদ আখ্‌ফশ, কিসাঈ ও ফাররা এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে জারীর এ মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে লিখেছেন, আরবরা যখন এ 'লাম' ব্যবহার করে কোন কথা বলে তখন সেই কথাটি এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হয় যে, একথার পরও যে ব্যক্তি কোন আচরণ করে তা বিস্ময়কর। বিপরীতপক্ষে খলীল ইবনে আহমদ, সিবওয়াইহে ও যামাখ্‌শারী প্রমুখ ভাষাতত্ত্ব ও অলংকার শাস্ত্রবিদগণ বলেন, এখানে লাম অব্যয় সূচক এবং এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে আগের বাক্য فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ এর সাথে। এর অর্থ হচ্ছে, এমনিতেই তো কুরাইশদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত সীমা-সংখ্যাহীন, কিন্তু অন্য কোন নিয়ামতের ভিত্তিতে না হলেও আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে তারা এই বাণিজ্য সফরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, অন্তত এই একটি নিয়ামতের কারণে তাদের আল্লাহর বন্দেগী করা উচিত। কারণ এটা মূলত তাদের প্রতি একটা বিরাট অনুগ্রহ।

২. শীত ও গ্রীষ্মের সফরের মানে হচ্ছে গ্রীষ্মকালে কুরাইশরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে বাণিজ্য সফর করতো। কারণ এ দু'টি শীত প্রধান দেশ। আর শীতকালে সফর করতো দক্ষিণ আরবের দিকে। কারণ সেটি গ্রীষ্ম প্রধান এলাকা।

৩. এ ঘর মানে কা'বা শরীফ। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, এ ঘরের বদৌলতেই কুরাইশরা এই নিয়ামতের অধিকারী হয়েছে। তারা নিজেরাই একথা মেনে নিয়েছে যে, এই যে ৩৬০টি মূর্তিকে তারা পূজা করে এরা এ ঘরের রব নয়। বরং একমাত্র আল্লাহই এর রব। তিনিই আসহাবে ফীলের আক্রমণ থেকে তাদেরকে বাঁচিয়েছেন। আবরাহার সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছেই তারা আবেদন জানিয়েছিল। তাঁর ঘরের আশ্রয় লাভ করার আগে যখন তারা আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল তখন তাদের কোন মর্যাদাই ছিল না। আরবের অন্যান্য গোত্রের ন্যায় তারাও একটি বংশধারার বিক্ষিপ্ত দল ছিল মাত্র। কিন্তু মক্কায় এই ঘরের চারদিকে একত্র হবার এবং এর সেবকের দায়িত্ব পালন করতে থাকার পর সমগ্র আরবে তারা মর্যাদাশালী হয়ে উঠেছে। সবদিকে তাদের বাণিজ্য কাফেলা নির্ভয়ে যাওয়া আসা করছে। কাজেই তারা যা কিছুই লাভ করেছে এ ঘরের রবের বদৌলতেই লাভ করেছে। কাজেই তাদের একমাত্র সেই রবেরই ইবাদাত করা উচিত।

৪. মক্কায় আসার পূর্বে কুরাইশরা যখন আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তখন তারা অনাহারে মরতে বসেছিল। এখানে আসার পর তাদের জন্য রিযিকের দরজাগুলো খুলে যেতে থাকে। তাদের সপক্ষে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই বলে দোয়া করেছিলেন—'হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদাশালী ঘরের কাছে, একটি পানি ও শস্যহীন উপত্যকায় আমার সন্তানদের একটি অংশের বসতি স্থাপন করিয়েছি, যাতে তারা নামায কায়েম করতে পারে। কাজেই তুমি লোকদের হৃদয়কে তাদের অনুরাগী করে দিয়ো, তাদের খাবার জন্য ফলমূল দান করো।' (সূরা ইবরাহীম ৩৭) তাঁর এই দোয়া অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়।

৫. অর্থাৎ যে ভীতি থেকে আরব দেশে কেউ নিরাপদ নয়, তা থেকে তারা নিরাপদ রয়েছে। সে যুগে আরবের অবস্থা এমন ছিল যে, সারা দেশে এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানে লোকেরা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতো। কারণ সবসময় তারা আশংকা করতো, এই বুঝি কোন লুটেরা দল রাতের অন্ধকারে হঠাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাদের সবকিছু লুট করে নিয়ে গেলো। নিজের গোত্রের সীমানার বাইরে পা রাখার সাহস কোন ব্যক্তির ছিল না। কারণ একাকী কোন ব্যক্তির জীবিত ফিরে আসা অথবা গ্রেফতার হয়ে গোলামে পরিণত হবার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া যেন অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কোন কাফেলা নিশ্চিন্তে সফর করতে পারতো না। কারণ পথে বিভিন্ন স্থানে তার ওপর ছিল দস্যু দলের আক্রমণের ভয়। ফলে পথ-পার্শ্বের প্রভাবশালী গোত্র সরদারদেরকে ঘুষ দিয়ে দিয়ে বাণিজ্য কাফেলাগুলো দস্যু ও লুটেরাদের হাত থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রেখে এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু কুরাইশরা মক্কায় সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। তাদের নিজেদের ওপর কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না। তাদের ছোট বড় সব রকমের কাফেলা দেশের প্রত্যেক এলাকায় যাওয়া আসা করতো। হারাম শরীফের খাদেমদের কাফেলা, একথা জানারপর কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করার সাহস করতো না। এমন কি একজন কুরাইশী একাই যদি কখনো কোন জায়গায় যেতো এবং সেখানে কেউ তার ক্ষতি করতে যেতো তাহলে তার পক্ষে শুধুমাত্র হারমী (حرمى) বা أنا من حرم الله আমি হারম শরীফের লোক বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। একথা শুনার সাথে সাথেই আক্রমণকারীর হাত নিচের দিকে নেমে আসতো।

আল মাউন

১০৭

নামকরণ

শেষ আয়াতের শেষ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

ইবনে মারদুইয়া ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে যুবাইরের (রা) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তাঁরা এ সূরাকে মক্কী হিসেবে গণ্য করেছেন। আতা ও জাবেরও এ একই উক্তি করেছেন। কিন্তু আবু হাইয়ান বাহরুল মুহীত গ্রন্থে ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যাহ্হাকের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এটি মাদানী সূরা। আমাদের মতে, এই সূরার মধ্যে এমন একটি আভ্যন্তরীণ সাক্ষ রয়েছে যা এর মাদানী হবার প্রমাণ পেশ করে। সেটি হচ্ছে, এ সূরায় এমন সব নামাযীদেরকে ধ্বংসের বার্তা শুনানো হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে গাফলতি করে এবং লোক দেখানো নামায পড়ে। এ ধরনের মুনাফিক মদীনায় পাওয়া যেতো। কারণ ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীরা সেখানে এমন পর্যায়ের শক্তি অর্জন করেছিল, যার ফলে বহু লোককে পরিস্থিতির তাগিদে ঈমান আনতে হয়েছিল এবং তাদের বাধ্য হয়ে মসজিদে আসতে হতো। তারা নামাযের জামায়াতে শরীক হতো এবং লোক দেখানো নামায পড়তো। এভাবে তারা মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হতে চাইতো। বিপরীতপক্ষে মক্কায় লোক দেখাবার জন্য নামায পড়ার মতো কোন পরিবেশই ছিল না। সেখানে তো ঈমানদারদের জন্য জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা করাই দুরূহ ছিল। গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নামায পড়তে হতো। কেউ প্রকাশ্যে নামায পড়লে ভয়ানক সাহসিকতার পরিচয় দিতো। তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকতো। সেখানে যে ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতে তারা লোক দেখানো ঈমান আনা বা লোক দেখানো নামায পড়ার দলভুক্ত ছিল না। বরং তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী হবার ব্যাপারটি জেনে নিয়েছিল এবং মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের কেউ কেউ নিজের শাসন ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব বহাল রাখার জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে পিছপাও হচ্ছিল। আবার কেউ কেউ নিজেদের চোখের সামনে মুসলমানদেরকে যেসব বিপদ–মুসিবতের মধ্যে ঘেরাও দেখছিল ইসলাম গ্রহণ করে নিজেরাও তার মধ্যে ঘেরাও হবার বিপদ কিনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। সূরা আনকাবুতের ১০–১১ আয়াতে মক্কী যুগের মুনাফিকদের এ অবস্থাটি বর্ণিত হয়েছে। (আরো জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আল আনকাবুত ১৩–১৬ টীকা)

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আখেরাতের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের মধ্যে কোন্ ধরনের নৈতিকতা জন্ম নেয় তা বর্ণনা করাই এর মূল বিষয়বস্তু। ২ ও ৩ আয়াতে এমনসব কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা প্রকাশ্যে আখেরাতকে মিথ্যা বলে। আর শেষ চার আয়াতে যেসব মুনাফিক আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান মনে হয় কিন্তু যাদের মনে আখেরাত এবং তার শাস্তি–পুরস্কার ও পাপ–পূণ্যের কোন ধারণা নেই, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আখেরাত বিশ্বাস ছাড়া মানুষের মধ্যে একটি মজবুত শক্তিশালী ও পবিত্র–পরিচ্ছন্ন চরিত্র গড়ে তোলা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, এ সত্যটি মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়াই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে উভয় ধরনের দলের কার্যধারা বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ۝٦ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

তুমি কি তাকে দেখেছো[১] যে আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তিকে[২] মিথ্যা বলছে?[৩] সে-ই তো[৪] এতিমকে ধাক্কা দেয়[৫] এবং মিসকিনকে খাবার দিতে[৬] উদ্বুদ্ধ করে না।[৭] তারপর সেই নামাযীদের জন্য ধ্বংস,[৮] যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে,[৯] যারা লোক দেখানো কাজ করে[১০] এবং মামুলি প্রয়োজনের জিনিসপাতি[১১] (লোকদেরকে) দিতে বিরত থাকে।

১. 'তুমি কি দেখেছো' বাক্যে এখানে বাহ্যত সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনাভংগী অনুযায়ী দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন লোকদেরকেই এ সম্বোধন করা হয়ে থাকে। আর দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখাও হয়। কারণ সামনের দিকে লোকদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে। আবার এর মানে জানা, বুঝা ও চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে। আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায়ও এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, "আচ্ছা, ব্যাপারটা আমাকে দেখতে হবে।" অর্থৎ আমাকে জানতে হবে। অথবা আমরা বলি, "এ দিকটাও তো একবার দেখো।" এর অর্থ হয়, "এ দিকটা সম্পর্কে একটু চিন্তা করো।" কাজেই "আরাআইতা" (أَرَءَيْتَ) শব্দটিকে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করলে আয়াতের অর্থ হবে, "তুমি কি জানো সে কেমন লোক যে শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা বলে?" অথবা "তুমি কি ভেবে দেখেছো সেই ব্যক্তির অবস্থা যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে?"

২. আসলে বলা হয়েছে : يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ । কুরআনের পরিভাষায় "আদ্ দীন" শব্দটি থেকে আখেরাতে কর্মফল দান বুঝায়। দীন ইসলাম অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু

সামনের দিকে যে বিষয়ের আলোচনা হয়েছে তার সাথে প্রথম অর্থটিই বেশী খাপ খায় যদিও বক্তব্যের ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে দ্বিতীয় অর্থটিও খাপছাড়া নয়। ইবনে আব্বাস (রা) দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ তাফসীরকার প্রথম অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে সমগ্র সূরার বক্তব্যের অর্থ হবে, আখেরাত অস্বীকারের আকীদা মানুষের মধ্যে এ ধরনের চরিত্র ও আচরণের জন্ম দেয়। আর দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে দীন ইসলামের নৈতিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট করাটাই সমগ্র সূরাটির মূল বক্তব্যে পরিণত হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের অর্থ হবে, এ দীন অস্বীকারকারীদের মধ্যে যে চরিত্র ও আচরণ বিধি পাওয়া যায় ইসলাম তার বিপরীত চরিত্র সৃষ্টি করতে চায়।

৩. বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে মনে হয়, এখানে এ প্রশ্ন দিয়ে কথা শুরু করার উদ্দেশ্য একথা জিজ্ঞেস করা নয় যে, তুমি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো কি না। বরং আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কার অস্বীকার করার মনোবৃত্তি মানুষের মধ্যে কোন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করে শ্রোতাকে সে সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করার দাওয়াত দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এই সংগে কোন্ ধরনের লোকেরা এ আকীদাকে মিথ্যা বলে সে কথা জানার আগ্রহ তার মধ্যে সৃষ্টি করাই এর লক্ষ। এভাবে সে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার নৈতিক গুরুত্ব বুঝার চেষ্টা করবে।

৪. আসলে فَذٰلِكَ الَّذِىْ বলা হয়েছে। এ বাক্যে "فَ" অক্ষরটি একটি সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ পেশ করছে। এর মানে হচ্ছে, "যদি তুমি না জেনে থাকো তাহলে তুমি জেনে নাও," "সে–ই তো সেই ব্যক্তি" অথবা এটি এ অর্থে যে, "নিজের এ আখেরাত অস্বীকারের কারণে সে এমন এক ব্যক্তি যে ...."

৫. মূলে يَدُعُّ الْيَتِيْمَ বলা হয়েছে এর কয়েকটি অর্থ হয়। এক, সে এতিমের হক মেরে খায় এবং তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বেদখল করে তাকে সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। দুই, এতিম যদি তার কাছে সাহায্য চাইতে আসে তাহলে দয়া করার পরিবর্তে সে তাকে ধিক্কার দেয়। তারপরও যদি সে নিজের অসহায় ও কষ্টকর অবস্থার জন্য অনুগ্রহ লাভের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। তিন, সে এতিমের ওপর জুলুম করে। যেমন তার ঘরেই যদি তার কোন আত্মীয় এতিম থাকে তাহলে সারাটা বাড়ির ও বাড়ির লোকদের সেবা যত্ন করা এবং কথায় কথায় গালমন্দ ও লাথি ঝাঁটা খাওয়া ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না। তাছাড়া এ বাক্যের মধ্যে এ অর্থও নিহিত রয়েছে যে, সেই ব্যক্তি মাঝে মাঝে কখনো কখনো এ ধরনের জুলুম করে না বরং এটা তার অভ্যাস ও চিরাচরিত রীতি সে যে এটা একটা খারাপ কাজ করছে, এ অনুভূতিও তার থাকে না। বরং বড়ই নিশ্চিন্তে সে এ নীতি অবলম্বন করে যেতে থাকে। সে মনে করে, এতিম একটা অক্ষম ও অসহায় জীব। কাজেই তার হক মেরে নিলে, তার ওপর জুলুম–নির্যাতন চালালে অথবা সে সাহায্য চাইতে এলে তাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিলে কোন ক্ষতি নেই।

এ প্রসংগে কাজী আবুল হাসান আল মাওয়ারদী তাঁর "আলামুন নুবুওয়াহ" কিতাবে একটি অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে ঃ আবু জেহেল ছিল একটি এতিম ছেলের অভিভাবক। ছেলেটি একদিন তার কাছে এলো। তার গায়ে একটুকরা কাপড়ও ছিল না। সে কাকুতি মিনতি করে তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাকে কিছু দিতে

বললো। কিন্তু জালেম আবু জেহেল তার কথায় কানই দিল না। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর শেষে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। কুরাইশ সরদাররা দুষ্টুমি করে বললো, "যা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে চলে যা। সেখানে গিয়ে তার কাছে নালিশ কর। সে আবু জেহেলের কাছে সুপারিশ করে তোর সম্পদ তোকে দেবার ব্যবস্থা করবে।" ছেলেটি জানতো না আবু জেহেলের সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি সম্পর্ক এবং এ শয়তানরা তাকে কেন এ পরামর্শ দিচ্ছে। সে সোজা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে গেলো এবং নিজের অবস্থা তাঁর কাছে বর্ণনা করলো। তার ঘটনা শুনে নবী (সা) তখনই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকে সংগে নিয়ে নিজের নিকৃষ্টতম শত্রু আবু জেহেলের কাছে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে আবু জেহেল তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। তারপর যখন তিনি বললেন, এ ছেলেটির হক একে ফিরিয়ে দাও তখন সে সংগে সংগেই তাঁর কথা মেনে নিল এবং তার ধন-সম্পদ এনে তার সামনে রেখে দিল। ঘটনার পরিণতি কি হয় এবং পানি কোন্ দিকে গড়ায় তা দেখার জন্য কুরাইশ সরদাররা ওঁৎ পেতে বসেছিল। তারা আশা করছিল দু'জনের মধ্যে বেশ একটা মজার কলহ জমে উঠবে। কিন্তু এ অবস্থা দেখে তারা অবাক হয়ে গেলো। তারা আবু জেহেলের কাছে এসে তাকে ধিক্কার দিতে লাগলো। তাকে বলতে লাগলো, তুমিও নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছো। আবু জেহেল জবাব দিল, আল্লাহর কসম! আমি নিজের ধর্ম ত্যাগ করিনি। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডাইনে ও বাঁয়ে এক একটি অস্ত্র রয়েছে। আমি তার ইচ্ছার সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ করলে সেগুলো সাজা আমার শরীরের মধ্যে ঢুকে যাবে। এ ঘটনাটি থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় না যে, সে যুগে আরবের সবচেয়ে বেশী উন্নত ও মর্যাদাশালী গোত্রের বড় বড় সরদাররা পর্যন্ত এতিম ও সহায়-সম্বলহীন লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতো বরং এই সংগে একথাও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুদের ওপরও তাঁর এ চারিত্রিক প্রভাব কতটুকু কার্যকর হয়েছিল। ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আম্বিয়া ৫ টীকায় আমি এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে জবরদস্ত নৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে কুরাইশরা তাঁকে যাদুকর বলতো এ ঘটনাটি তারই মূর্ত প্রকাশ।

৬. اِطْعَامِ الْمِسْكِيْنِ নয় বরং طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ বলা হয়েছে "ইত্'আমুল মিসকিন" বললে অর্থ হতো," সে মিসকিনকে খানা খাওয়াবার ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। কিন্তু "তাআমুল মিসকিন" বলায় এর অর্থ দাঁড়িয়েছে, "সে মিসকিনকে খানা দিতে উৎ-সাহিত করে না।" অন্য কথায়, মিসকিনকে যে খাবার দেয়া হয় তা দাতার খাবার নয় বরং ঐ মিসকিনেরই খাবার। তা ঐ মিসকিনের হক এবং দাতার ওপর এ হক আদায় করার দায়িত্ব বর্তায়। কাজেই দাতা এটা মিসকিনকে দান করছে না বরং তার হক আদায় করছে। সূরা আয্ যারিয়াতের ১৯ আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ "আর তাদের ধন সম্পদে রয়েছে ভিখারী ও বঞ্চিতদের হক।"

৭. لَا يَحُضُّ শব্দের মানে হচ্ছে, সে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে না, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না যে, সমাজে যেসব গরীব ও অভাবী লোক অনাহারে মারা যাচ্ছে তাদের হক আদায় করো এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কিছু করো।

এখানে মহান আল্লাহ শুধুমাত্র দু'টি সুস্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে আসলে আখেরাত অস্বীকার প্রবণতা মানুষের মধ্যে কোন্ ধরনের নৈতিক অসৎবৃত্তির জন্ম দেয় তা বর্ণনা করেছেন। আখেরাত না মানলে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ না করার মতো দু'টো দোষ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় বলে শুধুমাত্র এ দু'টি ব্যাপারে মানুষকে পাকড়াও ও সমালোচনা করাই এর আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং এই গোমরাহীর ফলে যে অসংখ্য দোষ ও ত্রুটির জন্ম হয় তার মধ্য থেকে নমুনা স্বরূপ এমন দু'টি দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেক সুস্থ বিবেক ও সৎবিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যেগুলোকে নিকৃষ্টতম দোষ বলে মেনে নেবে। এই সংগে একথাও হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়াই উদ্দেশ্য যে, এ ব্যক্তিটিই যদি আল্লাহর সামনে নিজের উপস্থিতি ও নিজের কৃতকর্মের জবাবদিহির স্বীকৃতি দিতো, তাহলে এতিমের হক মেরে নেবার, তার ওপর জুলুম-নির্যাতন করার, তাকে ধিক্কার দেবার এবং মিসকিনকে নিজে খাবার না দেবার ও অন্যকে দিতে উদ্বুদ্ধ না করার মতো নিকৃষ্টতম কাজ সে করতো না। আখেরাত বিশ্বাসীদের গুণাবলী সূরা আসর ও সূরা বালাদে বয়ান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা করার জন্য তারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় এবং وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ তারা পরস্পরকে সত্যপ্রীতি ও অধিকার আদায়ের উপদেশ দেয়।

৮. এখানে শব্দ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে "ফা" (فَ) ব্যবহার করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রকাশ্যে যারা আখেরাত অস্বীকার করে তাদের অবস্থা তুমি এখনই শুনলে, এখন যারা নামায পড়ে অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে শামিল মুনাফিকদের অবস্থাটা একবার দেখো। তারা যেহেতু বাহ্যত মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আখেরাতকে মিথ্যা মনে করে, তাই দেখো তারা নিজেদের জন্য কেমন ধ্বংসের সরঞ্জাম তৈরি করছে।

"মুসাল্লীন" মানে নামায পাঠকারীগণ। কিন্তু যে আলোচনা প্রসংগে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সামনের দিকে তাদের যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষিতে এ শব্দটির মানে আসলে নামাযী নয় বরং নামায আদায়কারী দল অর্থাৎ মুসলমানদের দলের অন্তরভুক্ত হওয়া।

৯. فِى صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ যদি বলা হতো "ফী সালাতিহিম" তাহলে এর মানে হতো, নিজের নামাযে ভুলে যায়। কিন্তু নামায পড়তে পড়তে ভুলে যাওয়া ইসলামী শরীয়াতে নিফাক তো দূরের কথা গোনাহের পর্যায়েও পড়ে না। বরং এটা আদতে কোন দোষ বা পাকড়াও যোগ্য কোন অপরাধও নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজেরও নামাযের মধ্যে কখনো ভুল হয়েছে। তিনি এই ভুল সংশোধনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। এর বিপরীতে

عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ মানে হচ্ছে, তারা নিজেদের নামাযের থেকে গাফেল। নামায পড়া ও না পড়া উভয়টিরই তাদের দৃষ্টিতে কোন গরুত্ব নেই। কখনো তারা নামায পড়ে আবার কখনো পড়ে না। যখন পড়ে, নামাযের আসল সময় থেকে পিছিয়ে যায় এবং সময় যখন একেবারে শেষ হয়ে আসে তখন উঠে গিয়ে চারটে ঠোকর দিয়ে আসে। অথবা নামাযের জন্য ওঠে ঠিকই কিন্তু একেবারে যেন উঠতে মন চায়না এমনভাবে ওঠে এবং নামায পড়ে নেয় কিন্তু মনের দিক থেকে কোন সাড়া পায় না। যেন কোন আপদ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নামায পড়তে পড়তে কাপড় নিয়ে খেলা করতে থাকে। হাই তুলতে থাকে। আল্লাহর স্মরণ সামান্যতম তাদের মধ্যে থাকে না। সারাটা নামাযের মধ্যে তাদের এ অনুভূতি থাকে না যে, তারা নামায পড়ছে। নামাযের মধ্যে কি পড়ছে তাও তাদের খেয়াল থাকে না নামায পড়তে থাকে এবং মন অন্যত্র পড়ে থাকে। তাড়াহুড়া করে এমনভাবে নামাযটা পড়ে নেয় যাতে কিয়াম, রুকূ ও সিজদা কোনটাই ঠিক হয় না। কোননা কোন প্রকারে নামায পড়ার ভান করে দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করে। আবার এমন অনেক লোক আছে, যারা কোন জায়গায় আটকা পড়ে যাবার কারণে বেকায়দায় পড়ে নামাযটা পড়ে নেয় কিন্তু আসলে তাদের জীবনে এ ইবাদাতটার কোন মর্যাদা নেই। নামাযের সময় এসে গেলে এটা যে নামাযের সময় এ অনুভূতিটাও তাদের থাকে না। মুয়ায্যিনের আওয়াজ কানে এলে তিনি কিসের আহবান জানাচ্ছেন, কাকে এবং কেন জানাচ্ছেন একথাটা একবারও তারা চিন্তা করে না। এটাই আখেরাতের প্রতি ঈমান না থাকার আলামত। কারণ ইসলামের এ তথাকথিত দাবীদাররা নামায পড়লে কোন পুরস্কার পাবে বলে মনে করে না এবং না পড়লে তাদের কপালে শাস্তি ভোগ আছে একথা বিশ্বাস করে না। এ কারণে তারা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। এ জন্য হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ও হযরত আতা ইবনে দীনার বলেন ঃ আল্লাহর শোকর তিনি "ফী সালাতিহিম সাহুন" বলেননি বরং বলেছেন, "আন সালাতিহিম সাহুন।" অর্থাৎ আমরা নামাযে ভুল করি ঠিকই কিন্তু নামায থেকে গাফেল হই না। এ জন্য আমরা মুনাফিকদের অন্তরভুক্ত হবো না।

কুরআন মজীদের অন্যত্র মুনাফিকদের এ অবস্থাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ

"তারা যখনই নামাযে আসে অবসাদগ্রস্তের মতো আসে এবং যখনই (আল্লাহর পথে) খরচ করে অনিচ্ছাকৃতভাবে করে।" (তাওবা ৫৪)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

تِلْكَ صلوة المنافق ، تلك صلوة المنافق ، تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقراربعا لايذكر الله فيها الا قليلا –

"এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে আসরের সময় বসে সূর্য দেখতে থাকে। এমনকি সেটা শয়তানের দু'টো শিংয়ের

মাঝখানে পৌঁছে যায়। (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়) তখন সে উঠে চারটে ঠোকর মেরে নেয়। তাতে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করা হয়।" বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে তাঁর পুত্র মুসআব ইবনে সা'দ রেওয়ায়াত করেন, যারা নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে তাদের সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, যারা গড়িমসি করতে করতে নামাযের সময় শেষ হয় হয় এমন অবস্থায় নামায পড়ে তারাই হচ্ছে এসব লোক। (ইবনে জারীর, আবু ইয়ালা, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান। এ রেওয়ায়াতটি হযরত সা'দের নিজের উক্তি হিসেবেও উল্লেখিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এর সনদ বেশী শক্তিশালী। আবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হিসেবে এ রেওয়ায়াতটির সনদ বাইহাকী ও হাকেমের দৃষ্টিতে দুর্বল) হযরত মুস'আবের দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি হচ্ছে, তিনি নিজের মহান পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, এ আয়াতটি নিয়ে কি আপনি চিন্তা–ভাবনা করেছেন? এর অর্থ কি নামায ত্যাগ করা? অথবা এর অর্থ নামায পড়তে পড়তে মানুষের চিন্তা অন্য কোনদিকে চলে যাওয়া? আমাদের মধ্যে কে এমন আছে নামাযের মধ্যে যার চিন্তা অন্য দিকে যায় না? তিনি জবাব দেন, না এর মানে হচ্ছে নামাযের সময়টা নষ্ট করে দেয়া এবং গড়িমসি করে সময় শেষ হয় হয় এমন অবস্থায় তা পড়া। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, আবু ইয়া'লা, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস্ সুনান)

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, নামাযের মধ্যে অন্য চিন্তা এসে যাওয়া এক কথা এবং নামাযের প্রতি কখনো দৃষ্টি না দেয়া এবং নামায পড়তে পড়তে সবসময় অন্য বিষয় চিন্তা করতে থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রথম অবস্থাটি মানবিক দুর্বলতার স্বাভাবিক দাবি। ইচ্ছা ও সংকল্প ছাড়াই অন্যান্য চিন্তা এসে যায় এবং মু'মিন যখনই অনুভব করে, তার মন নামায থেকে অন্যদিকে চলে গেছে তখনই সে চেষ্টা করে আবার নামাযে মনোনিবেশ করে। দ্বিতীয় অবস্থাটি নামাযে গাফলতি করার পর্যায়ভুক্ত। কেননা এ অবস্থায় মানুষ শুধুমাত্র নামাযের ব্যায়াম করে। আল্লাহকে স্মরণ করার কোন ইচ্ছা তার মনে জাগে না। নামায শুরু করা থেকে নিয়ে সালাম ফেরা পর্যন্ত একটা মুহূর্তও তার মন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যেসব চিন্তা মাথায় পুরে সে নামাযে প্রবেশ করে তার মধ্যেই সবসময় ডুবে থাকে।

১০. এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে আবার পূর্বের বাক্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। একে স্বতন্ত্র বাক্য গণ্য করলে এর অর্থ হবে, কেননা সৎকাজও তারা আন্তরিক সংকল্প সহকারে আল্লাহর জন্য করে না। বরং যা কিছু করে অন্যদের দেখাবার জন্য করে। এভাবে তারা নিজেদের প্রশংসা শুনাতে চায়। তারা চায়, লোকেরা তাদের সৎ লোক মনে করে তাদের সৎকাজের ডংকা বাজাবে। এর মাধ্যমে তারা কোন না কোনভাবে দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করবে। আর আগের বাক্যের সাথে একে সম্পর্কিত মনে করলে এর অর্থ হবে তারা লোক দেখানো কাজ করে। সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ দ্বিতীয় অর্থটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ প্রথম নজরেই টের পাওয়া যায় আগের বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ "এখানে মোনাফিকদের কথা বলা হয়েছে,

যারা লোক দেখানো নামায পড়তো। অন্য লোক সামনে থাকলে নামায পড়তো এবং অন্য লোক না থাকলে পড়তো না।" অন্য একটি রেওয়ায়াতে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে," একাকী থাকলে পড়তো না। আর সর্ব সমক্ষে পড়ে নিতো।" (ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিশ শু'আব) কুরআন মজীদেও মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا –

"আর যখন তারা নামাযের জন্য ওঠে অবসাদগ্রস্তের ন্যায় ওঠে। লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে খুব কমই।" (আন নিসা ১৪২)

১১. মূলে মাউন (مَاعُون) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আলী (রা), ইবনে উমর (রা), সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া, যাহ্হাক, ইবনে যায়েদ, ইকরামা, মুজাহিদ আতা ও যুহরী রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, এখানে এই শব্দটি থেকে যাকাত বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে মাসউদ (র) ইবরাহীম নাখয়ী (র) আবু মালেক (র) এবং অন্যান্য লোকদের উক্তি হচ্ছে, এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস–পত্র যেমন, হাড়ী–পাতিল, বালতী, দা,–কুড়াল, দাড়িপাল্লা, লবণ, পানি, আগুন, চকমাকি(বর্তমানে এর স্থান দখল করেছে দেয়াশলাই) ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। কারণ লোকেরা সাধারণত এগুলো দৈনন্দিন কাজের জন্য পরস্পরের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। সাঈদ ইবনে জুবাইর ও মুজাহিদের একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়। হযরত আলীর (রা) এক উক্তিতেও বলা হয়েছে, এর অর্থ যাকাত হয় আবার ছোট ছোট নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রও হয়। ইবনে আবী হাতেম ইকরামা, থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, মাউনের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে যাকাত এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে কাউকে চালুনী, বালতী বা দেয়াশলাই ধার দেয়া। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহিসসাল্লামের সাথীরা বলতাম (কোন কোন হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক জামানায় বলতাম) ঃ মাউন বলতে হাঁড়ি, কুড়াল, বালতি, দাঁড়িপাল্লা এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস অন্যকে ধার দেয়া বুঝায়। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, আবু দাউদ, নাসায়ী, বায্যার, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান) সাঈদ ইবনে ইয়ায স্পষ্ট নাম উল্লেখ না করেই প্রায় এ একই বক্তব্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তার অর্থ হচ্ছে, তিনি বিভিন্ন সাহাবী থেকে একথা শুনেছেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শাইবা) দাইলামী, ইবনে আসাকির ও আবু নু'আইম হযরত আবু হুরাইরার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এ থেকে কুড়াল, বালতি এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস বুঝানো হয়েছে। এ হাদীসটি যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত এটি অন্য লোকেরা জানতেন না। জানলে এরপর কখনো তারা এর অন্য কোন ব্যাখ্যা করতেন না।

মূলত মাউন ছোট ও সামান্য পরিমাণ জিনিসকে বলা হয়। এমন ধরনের জিনিস যা লোকদের কোন কাজে লাগে বা এর থেকে তারা ফায়দা অর্জন করতে পারে। এ অর্থে যাকাতও মাউন। কারণ বিপুল পরিমাণ সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসেবে গরীবদের সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়। আর এই সংগে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং তাঁর সমমনা লোকেরা অন্যান্য যেসব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোও মাউন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, সাধারণত প্রতিবেশীরা একজন আর একজনের কাছ থেকে দৈনন্দিন যেসব জিনিস চেয়ে নিতে থাকে সেগুলোই মাউনের অন্তরভূক্ত। এ জিনিসগুলো অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া কোন আপমানজনক বিষয় নয়। কারণ ধনী–গরীব সবার এ জিনিসগুলো কোন না কোন সময় দরকার হয়। অবশ্যি এ ধরনের জিনিস অন্যকে দেবার ব্যাপারে কার্পণ্য করা হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। সাধারণত এ পর্যায়ের জিনিসগুলো অপরিবর্তিত থেকে যায় এবং প্রতিবেশীরা নিজেদের কাজে সেগুলো ব্যবহার করে, কাজ শেষ হয়ে গেলে অবিকৃত অবস্থায়ই তা ফেরত দেয়। কারো বাড়িতে মেহমান এলে প্রতিবেশীর কাছে খাটিয়া বা বিছানা–বালিশ চাওয়াও এ মাউনের অন্তরভুক্ত। অথবা নিজের প্রতিবেশীর চূলায় একটু রান্নাবান্না করে নেয়ার অনুমতি চাওয়া কিংবা কেউ কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে এবং নিজের কোন মূল্যবান জিনিস অন্যের কাছে হেফাজত সহকারে রাখতে চাওয়াও মাউনের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই এখানে আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, আখেরাত অস্বীকৃতি মানুষকে এতবেশী সংকীর্ণমনা করে দেয় যে, সে অন্যের জন্যে সামান্যতম ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি হয় না।

আল কাউসার

১০৮

নামকরণ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ এ বাক্যের মধ্য থেকে 'আল কাওসার' শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

ইবনে মারদুইয়া, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটি মক্কী সূরা। কাল্‌বী ও মুকাতিল একে মক্কী বলেন। অধিকাংশ তাফসীরকারও এ মত পোষণ করেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, মুজাহিদ ও কাতাদাহ একে মাদানী বলেন। ইমাম সুয়ূতী তাঁর ইতকান গ্রন্থে এ বক্তব্যকেই সঠিক গণ্য করেছেন। ইমাম মুসলিমও তাঁর শারহে মুসলিম গ্রন্থে এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণের হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি। এ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে তাঁর মাথা উঠালেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি মুচকি হাসছেন কেন? আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, তিনি নিজেই লোকদের বললেন ঃ এখনি আমার ওপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তারপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে তিনি সূরা আল কাওসারটি পড়লেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, জানো কাওসার কি? সাহাবীরা বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। বললেন ঃ সেটি একটি নহর। আমার রব আমাকে জান্নাতে সেটি দান করেছেন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে সামনের দিকে আল কাওসারের ব্যাখ্যা প্রসংগে।) এ হাদীসটির ভিত্তিতে এ সূরাটিকে মাদানী বলার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আনাস (রা) মক্কায় নয় বরং মদীনায় ছিলেন। এ সূরাটির মাদানী হবার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তিনি বলেছেন, তাঁর উপস্থিতিতেই এ সূরাটি নাযিল হয়।

কিন্তু প্রথমত এটা হযরত আনাস (রা) থেকেই ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে জারীর রেওয়ায়াত করেছেন যে, জান্নাতের এ নহরটি (কাওসার), রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মি'রাজে দেখানো হয়েছিল। আর সবাই জানেন মি'রাজ মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিজরাতের আগে। দ্বিতীয়ত মি'রাজে যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে কেবলমাত্র এটি দান করারই খবর দেননি বরং এটিকে তাঁকে দেখিয়েও দিয়েছিলেন সেখানে আবার তাঁকে এর সুসংবাদ দেবার জন্য মদীনা তাইয়েবায় সূরা কাওসার নাযিল করার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তৃতীয়ত

যদি হযরত আনাসের উপরোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সাহাবীগণের একটি সমাবেশে সূরা কাওসার নাযিল হবার খবর দিয়ে থাকেন এবং তার অর্থ এ হয়ে থাকে যে, প্রথমবার এ সূরাটি নাযিল হলো, তাহলে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের মতো সতর্ক সাহাবীগণের পক্ষে কিভাবে এ সূরাটিকে মক্কী গণ্য করা সম্ভব? অন্যদিকে মুফাস্‌সিরগণের অধিকাংশই বা কেমন করে একে মক্কী বলেন? এ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করলে হযরত আনাসের রেওয়ায়াতের মধ্যে একটি ফাঁক রয়েছে বলে পরিষ্কার মনে হয়। যে মজলিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছিলেন সেখানে আগে থেকে কি কথাবার্তা চলছিল তার কোন বিস্তারিত বিবরণ তাতে নেই। সম্ভবত সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ব্যাপারে কিছু বলছিলেন। এমন সময় অহীর মাধ্যমে তাঁকে জানানো হলো, সূরা কাওসারে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর তখন তিনি একথাটি এভাবে বলেছেন : আমার প্রতি এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। তাই মুফাস্‌সিরগণ কোন কোন আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, সেগুলো দু'বার নাযিল হয়েছে। এ দ্বিতীয়বার নাযিল হবার অর্থ হচ্ছে, আয়াত তো আগেই নাযিল হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়বার কোন সময় অহীর মাধ্যমে নবীর (সা) দৃষ্টি এ আয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়ে থাকবে। এ ধরনের রেওয়ায়াতে কোন আয়াতের নাযিল হবার কথা উল্লেখ থাকাটা তার মক্কী বা মাদানী হবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

হযরত আনাসের এ রেওয়ায়াতটি যদি সন্দেহ সৃষ্টি করার কারণ না হয় তাহলে সূরা কাওসারের সমগ্র বক্তব্যই তার মক্কা মু'আযযমায় নাযিল হবার সাক্ষ পেশ করে। এমন এক সময় নাযিল হওয়ার সাক্ষ পেশ করে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত কঠিন হতাশা ব্যঞ্জক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইতিপূর্বে সূরা দুহা ও সূরা আলাম নাশরাহ–এ দেখা গেছে, নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সমগ্র জাতি তাঁর সাথে শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, বাধার বিরাট পাহাড়গুলো তাঁর পথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, চতুর্দিকে প্রবল বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ও তাঁর মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাথী বহুদূর পর্যন্ত কোথাও সাফল্যের কোন আলামত দেখতে পাচ্ছিলেন না। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ও তাঁর মনে সাহস সঞ্চারের জন্য মহান আল্লাহ বহু আয়াত নাযিল করেন এর মধ্যে সূরা দুহায় তিনি বলেন :

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

"আর অবশ্যি তোমার জন্য পরবর্তী যুগ (অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের পরের যুগ) পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো এবং শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমনসব কিছু দেবেন যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে।"

অন্যদিকে আলাম নাশরাহে বলেন ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ "আর আমি তোমার আওয়াজ বুলন্দ করে দিয়েছি।" অর্থাৎ শত্রু সারা দেশে তোমার দুর্নাম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমার নাম উজ্জ্বল করার এবং তোমাকে সুখ্যাতি দান করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এই সাথে আরো বলেন ঃ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا "কাজেই, প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে। নিশ্চিন্তভাবেই সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও আছে।" অর্থাৎ বর্তমানে কঠিন অবস্থা দেখে পেরেশান হয়ো না। শীঘ্রই এ দুখের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাফল্যের যুগ এই তো শুরু হয়ে যাচ্ছে।

এমনি এক অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সূরা কাওসার নাযিল করে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দান করেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দেবার ভবিষ্যদ্বাণীও শুনিয়ে দেন। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা বলতো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার অবস্থা হয়ে গেছে একজন সহায় ও বান্ধবহীন ব্যক্তির মতো। ইকরামা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন নবীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তিনি কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন তখন কুরাইশরা বলতে থাকে بتر محمد منا অর্থাৎ "মুহাম্মাদ নিজের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছে যেমন কোন গাছের শিকড় কেটে দেয়া হলে তার অবস্থা হয়। কিছুদিনের মধ্যে সেটি শুকিয়ে মাটির সাথে মিশে যায়।" (ইবনে জারীর) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, মক্কার সরদার আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমির সামনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উঠলেই সে বলতো ঃ "সে তো একজন আবতার অর্থাৎ শিকড় কাটা। কোন ছেলে সন্তান নেই। মরে গেলে তার নাম নেবার মতো কেউ থাকবে না।" শিমার ইবনে আতীয়্যার বর্ণনা মতে উকবা ইবনে আবু মু'আইতও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমনি ধরনের কথা বলতো। (ইবনে জারীর) ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা মতে, একবার কাব ইবনে আশরাফ (মদীনার ইহুদি সরদার) মক্কায় আসে। কুরাইশ সরদাররা তাকে বলে ঃ

أَلَا تَرَى إِلَى هٰذَا الصَّبِيِّ الْمُنْبَتِرِ مِنْ قَوْمِهِ يَزْعَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِّنَّا وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيْجِ وَأَهْلُ السَّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَايَةِ -

"এ ছেলেটির ব্যাপার–স্যাপার দেখো। সে তার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে মনে করে, সে আমাদের থেকে ভালো। অথচ আমরা হজ্জের ব্যবস্থাপনা করি, হাজীদের সেবা করি ও তাদের পানি পান করাই।" (বাযযার)

এ ঘটনাটি সম্পর্কে ইকরামা বলেন, কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে الصنبور المنبتر من قومه বলে অভিহিত করতো। অর্থাৎ "তিনি এক অসহায়, বন্ধু–বান্ধবহীন, দুর্বল ও নিসন্তান ব্যক্তি এবং নিজের জাতি থেকেও তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।" (ইবনে জারীর) ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় ছেলের নাম ছিল কাসেম (রা) তার ছোট ছিলেন হযরত যয়নব(রা)। তার

ছোট ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা)। তারপর জন্ম নেয় যথাক্রমে তিন কন্যা; হযরত উম্মে কুলসুম (রা), হযরত ফাতেমা (রা) ও হযরত রুকাইয়া (রা)। এদের মধ্যে সর্ব প্রথম মারা যান হযরত কাসেম। তারপর মারা যান হযরত আবদুল্লাহ। এ অবস্থা দেখে আস ইবনে ওয়ায়েল বলে, "তার বংশই খতম হয়ে গেছে। এখন সে আবতার (অর্থাৎ তার শিকড় কেটে গেছে)। কোন কোন রেওয়ায়াতে আরো একটু বাড়িয়ে আসের এই বক্তব্য এসেছে ঃ

اِنَّ مُحَمَّدًا اَبْتَرُ لاَ ابْنَ لَهُ يَقُوْمَ مَقَامَهُ بَعْدَهُ فَاِذَا مَاتَ انْقَطَعَ ذِكْرُهُ وَاسْتَرَحْتُمْ مِنْهُ –

"মুহাম্মাদ একজন শিকড় কাটা। তার কোন ছেলে নেই, যে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। সে মরে গেলে দুনিয়া থেকে তার নাম মিটে যাবে। আর তখন তোমরা তার হাত থেকে নিস্তার পাবে।"

আবদ ইবনে হুমাইদ ইবনে আব্বাসের যে রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর আবু জেহেলও এই ধরনের কথা বলেছিল। ইবনে আবী হাতেম শিমার ইবনে আতীয়াহ থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শোকে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে উকবা ইবনে আবী মু'আইতও এই ধরনের হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। আতা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় পুত্রের ইন্তিকালের পর তাঁর চাচা আবু লাহাব (তার ঘর ছিল রসূলের ঘরের সাথে লাগোয়া) দৌড়ে মুশরিকদের কাছে চলে যায় এবং তাদের এই "সুখবর" দেয় ঃ بُتِرَ مُحَمَّدٌ اللَّيْلَةَ অর্থাৎ রাতে মুহাম্মাদ সন্তানহারা হয়ে গেছে অথবা তার শিকড় কেটে গেছে।"

এ ধরনের চরম হতাশাব্যাঞ্জক পরিস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সূরা কাউসার নাযিল করা হয়। তিনি কেবল আল্লাহর বন্দেগী করতেন এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ কারণে কুরাইশরা ছিল তাঁর প্রতি বিরূপ। এ জন্যই নবুওয়াতলাভের আগে সমগ্র জাতির মধ্যে তাঁর যে মর্যাদা ছিল নবুওয়াতলাভের পর তা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাঁকে এক রকম জ্ঞাতি–গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর সংগী-সাথী ছিলেন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। তাঁরাও ছিলেন বন্ধু–বান্ধব ও সহায়–সম্বলহীন। তাঁরাও জুলুম–নিপীড়ন সহ্য করে চলছিলেন। এই সাথে তাঁর একের পর এক সন্তানের মৃত্যুতে তাঁর ওপর যেন দুঃখ ও শোকের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। এ সময় আত্মীয়–স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে সহানুভূতি প্রকাশ ও সান্ত্বনাবাণী শুনাবার পরিবর্তে আনন্দ উচ্ছ্বাস করা হচ্ছিল। এমন একজন লোক যিনি শুধু আপন লোকদের সাথেই নয়, অপরিচিত ও অনাত্মীয়দের সাথেও সবসময় পরম প্রীতিপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে এ ধরনের বিভিন্ন অপ্রীতিকর কথা ও আচরণ তাঁর মন ভেঙে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ অবস্থায় এ ছোট্ট সূরাটির একটি বাক্যে আল্লাহ তাঁকে এমন একটি সুখবর দিয়েছেন যার চাইতে বড় সুখবর দুনিয়ার কোন মানুষকে কোন দিন দেয়া হয়নি। এই সংগে তাঁকে এ সিদ্ধান্তও শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর বিরোধিতাকারীদেরই শিকড় কেটে যাবে।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

(হে নবী!) আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি।[১] কাজেই তুমি নিজের রবেরই জন্য নামায পড়ো ও কুরবানী করো।[২] তোমার দুশমনই[৩] শিকড় কাটা।[৪]

১. কাউসার শব্দটি এখানে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে আমাদের ভাষায় তো দূরের কথা দুনিয়ার কোন ভাষায়ও এক শব্দে এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ শব্দটি মূলে কাসরাত। كَثْرَة থেকে বিপুল ও অত্যধিক পরিমাণ বুঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, সীমাহীন আধিক্য। কিন্তু যে অবস্থায় ও পরিবেশে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে শুধুমাত্র আধিক্য নয় বরং কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য এবং এমন ধরনের আধিক্যের ধারণা পাওয়া যায় যা বাহুল্য ও প্রাচুর্যের সীমান্তে পৌঁছে গেছে। আর এর অর্থ কোন একটি কল্যাণ বা নিয়ামত নয় বরং অসংখ্য কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য। ভূমিকায় আমি এ সূরার যে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছি তার ওপর আর একবার দৃষ্টি বুলানো প্রয়োজন। তখন এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। শত্রুরা মনে করছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবদিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছেন। জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্ধু–বান্ধব ও সহায়–সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন। ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেছে। বংশে বাতি জ্বালাবার জন্য যে ছেলে সন্তান ছিল, সেও মারা গেছে। আবার তিনি এমন দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নেমেছেন যার ফলে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া মক্কা তো দূরের কথা সারা আরব দেশের কোন একটি লোকও তাঁর কথায় কান দিতে প্রস্তুত নয়। কাজেই তাঁর ভাগ্যের লিখন হচ্ছে জীবিত অবস্থায় ব্যর্থতা এবং মারা যাবার পরে দুনিয়ায় তাঁর নাম উচ্চারণ করার মতো একজন লোকও থাকবে না। এ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন বলা হলো, তোমাকে কাওসার দান করেছি তখন স্বাভাবিকভাবে এর মানে দাঁড়ালো : তোমার শত্রুপক্ষীয় নির্বোধরা মনে করছে তুমি ধ্বংস হয়ে গেছো এবং নবুওয়াত লাভের পূর্বে তুমি যে নিয়ামত অর্জন করেছিলে তা তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাকে সীমাহীন কল্যাণ ও অসংখ্য নিয়ামত দান করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নজিরবিহীন উন্নত নৈতিক গুণাবলী দান করা হয়েছিল সেগুলোও এর অন্তরভুক্ত। তাঁকে যে নবুওয়াত, কুরআন এবং জ্ঞান ও তা প্রয়োগ

করার মতো বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ামত দান করা হয়েছিল তাও এর মধ্যে শামিল। তাওহীদ ও এমন ধরনের একটি জীবন ব্যবস্থার নিয়ামত এর অন্তরভুক্ত যার সহজ, সরল, সহজবোধ্য, বুদ্ধি ও প্রকৃতির অনুসারী এবং পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন মূলনীতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার এবং হামেশা ছড়িয়ে পড়তে থাকার ক্ষমতা রাখে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা ব্যাপকতর করার নিয়ামতও এর অন্তরভুক্ত যার বদৌলতে তাঁর নাম চৌদ্দশো বছর থেকে দুনিয়ার সর্বত্র বুলন্দ হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বুলন্দ হতে থাকবে। তাঁর আহবানে অবশেষে এমন একটি বিশ্বব্যাপী উম্মাতের উদ্ভব হয়েছে, যারা দুনিয়ায় চিরকালের জন্যে আল্লাহর সত্য দীনের ধারক হয়েছে, যাদের চাইতে বেশী সৎ, নিষ্কলুষ ও উন্নত চরিত্রের মানুষ দুনিয়ার কোন উম্মাতের মধ্যে কখনো জন্ম লাভ করেনি এবং বিকৃতির অবস্থায় পৌঁছেও যারা নিজেদের মধ্যে দুনিয়ার সব জাতির চাইতেও বেশী কল্যাণ ও নেকীর গুণাবলী বহন করে চলছে। এ নিয়ামতটিও এর অন্তরভুক্ত।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের চোখে নিজের জীবদ্দশায় নিজের দাওয়াতকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উঠতে দেখেছেন এবং তাঁর হাতে এমন জামায়াত তৈরি হয়েছে যারা সারা দুনিয়ার ওপর ছেয়ে যাবার ক্ষমতা রাখতো, এ নিয়ামতটিও এর অন্তরভুক্ত। ছেলে সন্তান থেকে বঞ্চিত হবার পর শত্রুরা মনে করতো তাঁর নাম–নিশানা দুনিয়া থেকে মিটে যাবে। কিন্তু আল্লাহ শুধু মুসলমানদের আকারে তাঁকে এমন ধরনের আধ্যাত্মিক সন্তান দিয়েই ক্ষান্ত হননি যারা কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় তাঁর নাম বুলন্দ করতে থাকবে বরং তাঁকে শুধুমাত্র একটি কন্যা হযরত ফতেমার মাধ্যমে এত বিপুল পরিমাণ রক্তমাংসের সন্তান দান করেছেন যারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং মহান নবীর সাথে সম্পর্কই যাদের সবচেয়ে বড় অহংকার। এটিও এ নিয়ামতের অন্তরভুক্ত।

নিয়ামতগুলো আল্লাহ তাঁর নবীকে এ মরজগতেই দান করেছেন। কত বিপুল পরিমাণে দান করেছেন তা লোকেরা দেখেছে। এগুলো ছাড়াও কাউসার বলতে আরো দু'টো মহান ও বিশাল নিয়ামত বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাঁকে আখেরাতে দান করবেন। সেগুলো সম্পর্কে জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে ছিল না। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সেগুলো সম্পর্কে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ কাউসার বলতে দু'টি জিনিস বুঝানো হয়েছে। একটি হচ্ছে "হাউজে কাউসার" এটি কিয়ামতের ময়দানে তাঁকে দান করা হবে। আর দ্বিতীয়টি "কাউসার ঝরণাধারা।" এটি জান্নাতে তাঁকে দান করা হবে। এ দু'টির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এত বেশী হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এত বিপুল সংখ্যক রাবী এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন যার ফলে এগুলোর নির্ভুল হবার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

হাউজে কাউসার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নরূপ তথ্য পরিবেশন করেছেন ঃ

এক ঃ এ হাউজটি কিয়ামতের দিন তাঁকে দেয়া হবে। এমন এক কঠিন সময়ে এটি তাঁকে দেয়া হবে যখন সবাই 'আল আতশ' 'আল আতশ' অর্থাৎ পিপাসা, পিপাসা বলে চিৎকার করতে থাকবে সে সময় তাঁর উম্মাত তাঁর কাছে এ হাউজের চারদিকে সমবেত হবে এবং এর পানি পান করবে। তিনি সবার আগে সেখানে পৌঁছবেন এবং তার মাঝ বরাবর জায়গায় বসে থাকবেন। তাঁর উক্তি ঃ هو حوض ترد عليه امتى يوم القيامة

"সেটি একটি হাউজ। আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন তার কাছে থাকবে।" (মুসলিম, কিতাবুস সালাত এবং আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ) انا فرطكم على الحوض "আমি তোমাদের সবার আগে সেখানে পৌঁছে যাবো।" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল ফিতান, মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল ও কিতাবুত তাহারাত, ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক ও কিতাবুয যুহদ এবং মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ)।

اِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِىْ الْاٰنَ

"আমি তোমাদের আগে পৌঁছে যাবো, তোমাদের জন্য সাক্ষ দেবো এবং আল্লাহর কসম, আমি এ মুহূর্তে আমার হাউজ দেখতে পাচ্ছি। (বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, কিতাবুল মাগাযী ও কিতাবুর রিকাক)।

আনসারদেরকে সম্বোধন করে একবার তিনি বলেন ঃ

اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ

"আমার পরে তোমরা স্বার্থবাদিতা ও স্বজনপ্রীতির পাল্লায় পড়বে। তখন তার ওপর সবর করবে, আমার সাথে হাউজে কাউসারে এসে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।" (বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার ও কিতাবুল মাগাযী, মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ এবং তিরমিযী কিতাবুল ফিতান।

انا يوم القيمة عند عقر الحوض "কিয়ামতের দিন আমি হাউজের মাঝ বরাবর থাকবো।" (মুসলিম কিতাবুল ফাজায়েল) হযরত আবু বারযাহ আসলামীকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি হাউজ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, "একবার নয়, দু'বার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, পাঁচবার নয়, বারবার শুনেছি। যে ব্যক্তি একে মিথ্যা বলবে আল্লাহ তাকে যেন তার পানি পান না করান।" (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ)। উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ হাউজ সম্পর্কিত রেওয়ায়াত মিথ্যা মনে করতো। এমন কি সে হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রা), বারাআ ইবনে আযেব (রা) ও আয়েদ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতগুলো অস্বীকার করলো। শেষে আবু সাবরাহ একটি লিপি বের করে আনলেন। এ লিপিটি তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের (রা) মুখে শুনে লিখে রেখেছিলেন। তাতে রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহিওয়া সাল্লামের এ বাণী লেখা ছিল ঃ الا ان موعدكم حوضى "জেনে রাখো, আমার ও তোমাদের সাক্ষাতের স্থান হচ্ছে আমার হাউজ।" (মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের রেওয়ায়াতসমূহ)।

দুই ঃ এ হাউজের আয়তন সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা এসেছে। তবে অধিকাংশ রেওয়ায়াতে বলা হয়েছেঃ এটি আইলা (ইসরাঈলের বর্তমান বন্দর আইলাত) থেকে ইয়ামনের সান'আ পর্যন্ত অথবা আইলা থেকে এডেন পর্যন্ত কিংবা আম্মান থেকে এডেন পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর এটি চওড়া হবে আইলা থেকে হুজকাহ (জেদ্দা ও রাবেগের মাঝখানে একটি স্থান) পর্যন্ত জায়গার সমপরিমাণ। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, আবু দাউদ

তায়ালাসী ৯৯৫ হাদীস, মুসনাদে আহমাদ, আবু বকর সিদ্দীক ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ, মুসলিম–কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, তিরমিযি—আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ এবং ইবনে মাজাহ–কিতাবুয যুহ্‌দ।)। এ থেকে অনুমান করা যায়, বর্তমান লোহিত সাগরটিকেই কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারে পরিবর্তিত করে দেয়া হবে। তবে আসল ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই ভালো জানে।

তিন ঃ এ হাউজটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের কাউসার ঝরণাধারা (সামনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) থেকে পানি এনে এতে ঢালা হবে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ يشخب فيه ميزابان من الجنة এবং অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ يعت فيه ميزا بان يمدانه من الجنة অর্থাৎ জান্নাত থেকে দু'টি খাল কেটে এনে তাতে ফেলা হবে এবং এর সাহায্যে সেখান থেকে তাতে পানি সরবরাহ হবে। (মুসলিম কিতাবুল ফাজায়েল) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ يفتح نهر من الكوثر الى الحوض অর্থাৎ জান্নাতের কাওসার ঝরণাধারা থেকে একটি নহর এ হাউজের দিকে খুলে দেয়া হবে এবং তার সাহায্যে এতে পানি সরবরাহ জারী থাকবে (মুসনাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ)।

চার ঃ হাউজে কাউসারের অবস্থা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তার পানি হবে দুধের চাইতে (কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী রূপার চাইতে আবার কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বরফের চাইতে) বেশী সাদা, বরফের চাইতে বেশী ঠাণ্ডা এবং মধুর চাইতে বেশী মিষ্টি। তার তলদেশের মাটি হবে মিশকের চাইতে বেশী সুগন্ধিযুক্ত। আকাশে যত তারা আছে ততটি সোরাহী তার পাশে রাখা থাকবে। তার পানি একবার পান করার পর দ্বিতীয়বার কারো পিপাসা লাগবে না। আর তার পানি যে একবার পান করেনি তার পিপাসা কোনদিন মিটবে না। সামান্য শাব্দিক হেরফেরসহ একথাগুলোই অসংখ্য হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। (বুখারী–কিতাবুর রিকাক, মুসলিম–কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, মুসনাদে আহমাদ–ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস বর্ণিত রেওয়ায়াত সমূহ, তিরমিযী–আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ, ইবনে মাজাহ–কিতাবুয যুহোদ এবং আবু দাউদ আত তায়ালাসী, ৯৯৫ ও ২১৩৫ হাদীস।

পাঁচ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার তাঁর সময়ের লোকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারাই আমার তরিকা পদ্ধতি পরিবর্তন করবে তাদেরকে এ হাউজের কাছ থেকে হটিয়ে দেয়া হবে এবং এর পানির কাছে তাদের আসতে দেয়া হবে না। আমি বলবো, এরা আমার লোক। জবাবে আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কি করেছে। তখন আমিও তাদেরকে তাড়িয়ে দেবো। আমি বলবো, দূর হয়ে যাও। এ বক্তব্যটিও অসংখ্য হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। (বুখারী—কিতাবুল ফিতান ও কিতাবুর রিকাক, মুসলিম—কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, মুসনাদে আহমাদ—ইবনে মাসউদ ও আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসসমূহ, ইবনে মাজাহ—কিতাবুল মানাসিক।) ইবনে মাজাহ এ ব্যাপারে যে

হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তার শব্দগুলো বড়ই হৃদয়স্পর্শী। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلاَ وَاِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَاُكَاثِرُ بِكُمُ الْاُمَمَ فَلاَ تَسْوَدُّوْا وَجْهِىْ

اَلاَ وَاِنِّىْ مُسْتَنْقِذٌ اُنَاسًا وَمُسْتَنْقَذٌ اُنَاسٌ مِنِّىْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِىْ

فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَتَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ –

"সাবধান হয়ে যাও! আমি তোমাদের আগে হাউজে উপস্থিত থাকবো। তোমাদের মাধ্যমে অন্য উম্মাতদের মোকাবিলায় আমি নিজের উম্মাতের বিপুল সংখ্যার জন্য গর্ব করতে থাকবো। সে সময় আমার মুখে কালিমা লেপন করো না। সাবধান হয়ে যাও! কিছু লোককে আমি ছাড়িয়ে নেবো আর কিছু লোককে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হবে। আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার সাহাবী। তিনি বলবেন, তুমি জানো না, তোমার পরে এরা কী অভিনব কাজ কারবার করেছে।" ইবনে মাজার বক্তব্য হচ্ছে, এ শব্দগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আরাফাত ময়দানের ভাষণে বলেছিলেন।

ছয় ঃ এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পর থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময় কালের সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে যারাই আমার পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথে চলবে এবং তার মধ্যে রদবদল করবে তাদেরকে এ হাউজের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। আমি বলবো ঃ হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মাতের লোক। জবাবে বলা হবে ঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি কি পরিবর্তন করেছিল এবং আপনার পথের উল্টোদিকে চলে গিয়েছিল। তখন আমিও তাদেরকে দূর করে দেবো। এবং তাদেরকে হাউজের ধারে কাছে ঘেঁসতে দেবো না। হাদীস গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অসংখ্য হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। (বুখারী—কিতাবুল মুসাকাত, কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল ফিতান, মুসলিম—কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুস সালাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, ইবনে মাজাহ—কিতাবুয যুহদ, মুসনাদে আহমাদ–আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসসমূহ)।

পঞ্চাশ জনেরও বেশী সাহাবী এ হাউজ সংক্রান্ত হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন। প্রথম যুগের আলেমগণ সাধারণভাবে এটিকে হাউজে কাউসার বলেছেন। ইমাম বুখারী কিতাবুর রিকাকের শেষ অনুচ্ছেদের শিরোনাম রাখেন নিম্নোক্তভাবে ঃ بَابٌ فِى الْحَوْضِ وَقَوْلُ اللّٰهِ اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ (হাউজ অনুচ্ছেদ, আর আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি তোমাকে কাউসার দিয়েছি)। অন্য দিকে হযরত আনাসের রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউসার সম্পর্কে বলেছেন ঃ هو حوض ترد عليه امتى "সেটি একটি হাউজ। আমার উম্মাত সেখানে উপস্থিত হবে।"

জান্নাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাউসার নামে যে নহরটি দেয়া হবে সেটির উল্লেখও অসংখ্য হাদীসে পাওয়া যায়। হযরত আনাস (রা) থেকে এ সংক্রান্ত

বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোতে তিনি বলেন (আবার কোন কোনটিতে তিনি স্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি হিসেবেই বর্ণনা করেন) ঃ মি'রাজে রসূলুল্লাহকে (সা) জান্নাতে সফর করানো হয়। এ সময় তিনি একটি নহর দেখেন। এ নহরের তীরদেশে ভিতর থেকে হীরা বা মুক্তার কারুকার্য করা গোলাকৃতির মেহরাবসমূহ ছিল। তার তলদেশের মাটি ছিল খাঁটি মিশকের সুগন্ধিযুক্ত। রসূলুল্লাহ (সা) জিব্রীলকে বা যে ফেরেশতা তাঁকে ভ্রমণ করিয়েছিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? ফেরেশতা জবাব দেন, এটা কাউসার নহর। আল্লাহ আপনাকে এ নহরটি দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ তায়ালাসী ও ইবনে জারীর। হযরত আনাস এক রেওয়ায়াতে বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, অথবা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন ঃ কাউসার কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ একটি নহর যা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দান করেছেন। এর মাটি মিশকের। এর পানি দুধের চাইতেও সাদা এবং মধুর চাইতে মিষ্টি। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর)। মুসনাদে আহমাদের অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) নহরে কাউসারের বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তার তলদেশে কাঁকরের পরিবর্তে মণিমুক্তা পড়ে আছে। ইবনে ওমর (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কাউসার জান্নাতের একটি নহর। এর তীরদেশ সোনার তৈরি এবং মণিমুক্তা ও হীরার ওপর প্রবাহিত হচ্ছে। (অর্থাৎ তার তলায় কাঁকরের পরিবর্তে মূল্যবান পাথর বিছানো আছে)। এর মাটি মিশকের চাইতে বেশী সুগন্ধিযুক্ত। পানি দুধের চাইতে বেশী সাদা। বরফের চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা ও মধুর চেয়ে বেশী মিষ্টি। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবী হাতেম, দারামী, আবু দাউদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আবী শাইবা)। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) একবার হযরত হামযার (রা) বাড়িতে যান। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমানদারী করেন। আলাপ আলোচনা করতে করতে এক সময় তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে বলেছেন, আপনাকে জান্নাতে একটি নহর দেয়া হবে। তার নাম কাউসার। তিনি বলেন ঃ "হাঁ, তার যমীন ইয়াকূত, মারজান, যবরযদ ও মতির সমন্বয়ে গঠিত। (ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুইয়া। এ হাদীসটির সূত্র দুর্বল হলেও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বিপুল সংখ্যক হাদীস পাওয়া যাওয়ার কারণে এর শক্তি বেড়ে গেছে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের অসংখ্য বক্তব্য হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। এ সবগুলোতে কাউসার বলতে জান্নাতের এ নহরই বুঝানো হয়েছে। ওপরে এ নহরের যে সব বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে এ হাদীসগুলোতেও তাই বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), হযরত আয়েশা (রা), মুজাহিদ ও আবুল আলীয়ার উক্তিসমূহ মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শাইবা ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণের কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে।

২. বিভিন্ন মনীষী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ নামায বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায ধরেছেন। কেউ ঈদুল আযহার নামায মনে করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, এখানে নিছক নামাযের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে "ওয়ানহার" অর্থাৎ "নহর কর" শব্দেরও কোন কোন বিপুল মর্যাদার অধিকারী মনীষী অর্থ করেছেন, নামাযে বাম হাতের

ওপর ডান হাত রেখে তা বুকে বাঁধা। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, নামায শুরু করার সময় দুই হাত ওপরে উঠিয়ে তাকবীর বলা কেউ কেউ বলেছেন, এর মাধ্যমে নামায শুরু করার সময় রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুকূ' থেকে উঠে রাফে ইয়াদায়েন করা বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, ঈদুল আযহার নামায পড়া এবং কুরবানী করা। কিন্তু যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ হুকুম দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে এর সুস্পষ্ট অর্থ এই মনে হয় ঃ "হে নবী! তোমার রব যখন তোমাকে এত বিপুল কল্যাণ দান করেছেন তখন তুমি তাঁরই জন্য নামায পড় এবং তাঁরই জন্য কুরবানী দাও।" এ হুকুমটি এমন এক পরিবেশে দেয়া হয়েছিল যখন কেবল কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরাই নয় সমগ্র আরব দেশের মুশরিকবৃন্দ নিজেদের মনগড়া মাবুদদের পূজা করতো এবং তাদের আস্তানায় পশু বলী দিতো। কাজেই এখানে এ হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুশরিকদের বিপরীতে তোমরা নিজেদের কর্মনীতির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। অর্থাৎ তোমাদের নামায হবে আল্লাহরই জন্য, কুরবানীও হবে তাঁরই জন্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ لَاشَرِیْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ -

"হে নবী! বলে দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব–জাহানের রব আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম আনুগত্যের শির নত করি।" (আল আন'আম, ১৬২–১৬৩)।

ইবনে আব্বাস, আতা, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, কাতাদাহ, মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযী, যাহহাক, রাবী' ইবনে আনাস, আতাউল খোরাসানী এবং আরো অন্যান্য অনেক নেতৃস্থানীয় মুফাস্সির এর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন (ইবনে কাসীর)। তবে একথা যথাস্থানে পুরোপুরি সত্য যে, রসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনা তাইয়েবায় আল্লাহর হুকুমে ঈদুল আযহার নামায পড়েন ও কুরবানীর প্রচলন করেন তখন যেহেতু ان صلاتى ونسكى আয়াতে এবং فصل لربك وانحر আয়াতে নামাযকে প্রথমে ও কুরবানীকে পরে রাখা হয়েছে তাই তিনি নিজেও এভাবেই করেন এবং মুসলমানদের এভাবে করার হুকুম দেন। অর্থাৎ এদিন প্রথমে নামায পড়বে এবং তারপর কুরবানী দেবে। এটি এ আয়াতের ব্যাখ্যা বা এর শানেনুযুল নয়। বরং সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিধানটি ইসতেমবাত তথা উদ্ভাবন করেছিলেন। আর রসূলের (সা) ইসতেমবাতও এক ধরনের ওহী।

৩. এখানে شانئك (শা–নিআকা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে شنء (শানউন)। এর মানে এমন ধরনের বিদ্বেষ ও শত্রুতা যে কারণে একজন অন্য জনের বিরুদ্ধে অসদ্ব্যবহার করতে থাকে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا

"আর হে মুসলমানরা! কোন দলের প্রতি শত্রুতা তোমাদের যেন কোন বাড়াবাড়ি করতে উদ্বুদ্ধ না করে যার ফলে তোমরা ইনসাফ করতে সক্ষম না হও।"

কাজেই এখানে "শানিয়াকা" বলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতায় অন্ধ হয়ে তাঁর প্রতি দোষারোপ করে, তাঁকে গালিগালাজ করে, তাঁকে অবমাননা করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানান ধরনের অপবাদ দিয়ে নিজের মনের ঝাল মেটায়।

৪. هو الابتر "সেই আবতার" বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে তোমাকে আবতার বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই আবতার। আমি ইতিপূর্বে এ সূরার ভূমিকায় "আবতার" শব্দের কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছি। এই শব্দের মূলে রয়েছে বাতারা (بتر) এর মানে কাটা। কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। হাদীসে নামাযের যে রাকাতের সাথে অন্য কোন রাকাত পড়া হয় না তাকে বুতাইরা (بتيراء) বলা হয়। অর্থাৎ একক রাকাত। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لاَ يَبْدَاُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ

"যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রসংশাবাণী উচ্চারণ না করে শুরু করাটা আবতার।"

অর্থাৎ তার শিকড় কাটা গেছে। সে কোন প্রতিষ্ঠা ও শক্তিমত্তা লাভ করতে পারে না। অথবা তার পরিণাম ভালো নয়। ব্যর্থকাম ব্যক্তিকেও আবতার বলা হয়। যে ব্যক্তির কোন উপকার ও কল্যাণের আশা নেই এবং যার সাফল্যের সব আশা নির্মূল হয়ে গেছে তাকেও আবতার বলে। যার কোন ছেলে সন্তান নেই অথবা হয়ে মারা গেছে তার ব্যাপারেও আবতার শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ তার অবর্তমানে তার নাম নেবার মতো কেউ থাকে না এবং মারা যাবার পর তার নাম-নিশানা মুছে যায়। প্রায় সমস্ত অর্থেই কুরাইশ কাফেররা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবতার বলতো। তার জবাবে আল্লাহ বলেন, হে নবী! তুমি আবতার নও বরং তোমার এ শত্রুই আবতার। এটা নিছক কোন জবাবী আক্রমণ ছিল না। বরং এটা ছিল আসলে কুরআনের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতবাণীর মধ্য থেকে একটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবতার মনে করতো। তখন কেউ ধারণা করতে পারতো না যে, কুরাইশদের এ বড় বড় সরদাররা আবার কেমন করে আবতার হয়ে যাবে? তারা কেবল মক্কায়ই নয় সমগ্র দেশে খ্যাতিমান ছিল। তারা সফলকাম ছিল। তারা কেবল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী ছিল না বরং সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাদের সহযোগী ও সাহায্যকারী দল। ব্যবসার ইজারাদার ও হজ্জের ব্যবস্থাপক হবার কারণে আরবের সকল গোত্রের সাথে ছিল তাদের সম্পর্ক। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেলো। হিজরী ৫ সনে আহযাব যুদ্ধের সময় কুরাইশরা বহু আরব ও ইহুদি গোত্র নিয়ে মদীনা আক্রমণ করলো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবরুদ্ধ অবস্থায় শহরের চারদিক পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষার লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হলো। কিন্তু এর মাত্র তিন বছর পরে ৮ হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা আক্রমণ করলেন

তখন কুরাইশদের কোন সাহায্য–সহযোগিতা দানকারী ছিল না। নিতান্ত অসহায়ের মতো তাদেরকে অস্ত্র সংবরণ করতে হলো। এরপর এক বছরের মধ্যে সমগ্র আরব দেশ ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের করতলগত। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল এসে তাঁর হাতে বাই'আত হচ্ছিল। ওদিকে তাঁর শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে বন্ধু–বান্ধব ও সাহায্য–সহায়হীন হয়ে পড়েছিল। তারপর তাদের নাম–নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে এমনভাবে মুছে গোলো যে, তাদের সন্তানদের কেউ আজ বেঁচে থাকলেও তাদের কেউই আজ জানে না সে আবু জেহেল আর আবু লাহাব, আস ইবনে ওয়ায়েল বা উকবা ইবনে আবী মু'আইত ইত্যাদি ইসলামের শত্রুদের সন্তান। আর কেউ জানলেও সে নিজেকে এদের সন্তান বলে পরিচয় দিতে প্রস্তুত নয়। বিপরীত পক্ষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গের ওপর আজ সারা দুনিয়ায় দরূদ পড়া হচ্ছে। কোটি কোটি মুসলমান তাঁর সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে গর্ব করে। লাখো লাখো লোক তাঁর সাথেই নয় বরং তাঁর পরিবার–পরিজন এমন কি তাঁর সাথীদের পরিবার পরিজনের সাথেও সম্পর্কিত হওয়াকে গৌরবজনক মনে করে। এখানে কেউ সাইয়েদ, কেউ উলুবী, কেউ আব্বাসী, কেউ হাশেমী, কেউ সিদ্দিকী, কেউ ফারুকী, কেউ উসমানী, কেউ যুবাইরী এবং কেউ আনসারী। কিন্তু নামমাত্রও কোন আবু জেহেলী বা আবু লাহাবী পাওয়া যায় না। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবতার নন বরং তাঁর শত্রুরাই আবতার।

আল কাফিরূন

১০৯

নামকরণ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ আয়াতের "আল কাফিরূন" শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হাসান বসরী ও ইকরামা বলেন, এটি মক্কী সূরা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলেন, মাদানী। অন্যদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ থেকে উভয় মতই উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা একে মক্কী ও মাদানী উভয়ই বলেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এটি মক্কী সূরা। তাছাড়া এর বিষয়বস্তুই এর মক্কী হবার কথা প্রমাণ করে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মক্কায় এমন এক যুগ ছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে কুরাইশদের মুশরিক সমাজে প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহকে (সা) কোন না কোন প্রকারে আপোস করতে উদ্বুদ্ধ করা যাবে বলে কুরাইশ সরদাররা মনে করতো। এ ব্যাপারে তারা তখনো নিরাশ হয়নি। এ জন্য তারা মাঝে মধ্যে তাঁর কাছে আপোসের ফরমূলা নিয়ে হাযির হতো। তিনি তার মধ্য থেকে কোন একটি প্রস্তাব মেনে নিলেই তাঁর ও তাদের মধ্যকার ঝগড়া মিটে যাবে বলে তারা মনে করতো। হাদীসে এ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো ঃ আমরা আপনাকে এত বেশী পরিমাণ ধন–সম্পদ দেবো যার ফলে আপনি মক্কার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। যে মেয়েটিকে আপনি পছন্দ করবেন তার সাথে আপনার বিয়ে দিয়ে দেবো। আমরা আপনার পিছনে চলতে প্রস্তুত। আপনি শুধু আমাদের একটি কথা মেনে নেবেন—আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকবেন। এ প্রস্তাবটি আপনার পছন্দ না হলে আমরা আর একটি প্রস্তাব পেশ করছি। এ প্রস্তাবে আপনার লাভ এবং আমাদেরও লাভ। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, সেটি কি? এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদাত করবেন এবং আমরাও এক বছর আপনার উপাস্যদের ইবাদাত করবো। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, থামো! আমি দেখি

আমার রবের পক্ষ থেকে কি হুকুম আসে।* এর ফলে অহী নাযিল হয় : قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكَٰفِرُونَ .... এবং এই সংগে নাযিল হয় : قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَٰهِلُونَ

"ওদের বলে দাও, হে মূর্খের দল! তোমরা কি আমাকে বলছো, আল্লাহ ছাড়া আমি আর কারো ইবাদাত করবো?" ইবনে আব্বাসের (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো : "হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি আমাদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে চুম্বন করো তাহলে আমরা তোমার মাবুদের ইবাদাত করবো।" একথায় এই সূরাটি নাযিল হয়। (আবদ ইবনে হুমাইদ)

আবুল বখতরীর আযাদকৃত গোলাম সাঈদ ইবনে মীনা রেওয়ায়াত করেন, অলীদ ইবনে মুগীরাহ, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খালফ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে বলে : "হে মুহাম্মাদ! এসো আমরা তোমার মাবুদদের ইবাদাত করি এবং তুমি আমাদের মাবুদদের ইবাদাত করো। আর আমাদের সমস্ত কাজে আমরা তোমাকে শরীক করে নিই। তুমি যা এনেছো তা যদি আমাদের কাছে যা আছে তার চেয়ে ভালো হয় তাহলে আমরা তোমার সাথে তাতে শরীক হবো এবং তার মধ্য থেকে নিজেদের অংশ নিয়ে নেবো। আর আমাদের কাছে যা আছে তা যদি তোমার কাছে যা আছে তার চাইতে ভালো হয়, তাহলে তুমি আমাদের সাথে তাতে শরীক হবে এবং তা থেকে নিজের অংশ নেবে।" একথায় মহান আল্লাহ এ আল কাফেরুন সূরাটি নাযিল করেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। ইবনে হিশামও সীরাতে এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেছেন)।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ রেওয়ায়াত করেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে এই বছর আমরা আপনার দীনে প্রবেশ করবো এবং এক বছর আপনি আমাদের দীনে প্রবেশ করবেন। (আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম।)

এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, একবার একই মজলিসে নয় বরং বহুবার বহু মজলিসে কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ প্রস্তাব পেশ করেছিল। এ কারণে একবার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়ে তাদের এ আশাকে চিরতরে

* এর মানে এ নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রস্তাবটিকে কোন পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য তো দূরের কথা প্রণিধানযোগ্য মনে করেছিলেন। এবং (নাউযুবিল্লাহ) কাফেরদেরকে এ আশায় এ জবাব দিয়েছিলেন যে, হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি গৃহীত হয়ে যাবে। বরং একথাটি আসলে ঠিক এমন পর্যায়ের ছিল যেমন কোন অধীনস্থ অফিসারের সামনে কোন অবাস্তব দাবী পেশ করা হয় এবং তিনি জানেন সরকারের পক্ষে এ ধরনের দাবী গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি নিজে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করার পরিবর্তে দাবী পেশকারীদেরকে বলেন, আমি আপনাদের আবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেখান থেকে যা কিছু জবাব আসবে তা আপনাদের জানিয়ে দেবো। এর ফলে যে প্রতিক্রিয়াটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে, অধীনস্থ অফিসার নিজে অস্বীকার করলে লোকেরা বরাবর পীড়াপীড়ি করতে ও চাপ দিতেই থাকবে, কিন্তু যদি তিনি জানিয়ে দেন, ওপর থেকে কর্তৃপক্ষের যে জবাব এসেছে তা তোমাদের দাবীর বিরোধী তাহলে লোকেরা হতাশ হয়ে পড়বে।

নির্মূল করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিছু দাও আর কিছু নাও—এ নীতির ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন চুক্তি ও আপোশ করবেন না, একথা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া একান্ত জরুরী ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরাটি উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে, আসলে ধর্মীয় উদারতার উপদেশ দেবার জন্য সূরাটি নাযিল হয়নি। যেমন আজকাল কেউ কেউ মনে করে থাকেন বরং কাফেরদের ধর্ম, পূজা অনুষ্ঠান ও তাদের উপাস্যদের থেকে পুরোপুরি দায়িত্ব মুক্তি এবং তার প্রতি অনীহা, অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া আর এই সাথে কুফরী ধর্ম ও দীন ইসলাম পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাদের উভয়ের মিলে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই, একথা ঘোষণা করে দেয়ার জন্যই এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। যদিও শুরুতে একথাটি কুরাইশ বংশীয় কাফেরদেরকে সম্বোধন করে তাদের আপোস ফরমূলার জবাবে বলা হয়েছিল কিন্তু এটি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং একথাগুলোকে কুরআনের অন্তরভুক্ত করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে কিয়ামত পর্যন্ত এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কুফরী ধর্ম দুনিয়ার যেখানেই যে আকৃতিতে আছে তার সাথে সম্পর্কহীনতা ও দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত। কোন প্রকার দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছাড়াই তাদের একথা জানিয়ে দেয়া উচিত যে, দীনের ব্যাপারে তারা কাফেরদের সাথে কোন প্রকার আপোস বা উদারনীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। এ কারণেই যাদের কথার জবাবে এ সূরাটি নাযিল করা হয়েছিল তারা মরে শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এটি পঠিত হতে থেকেছে। যারা এর নাযিলের সময় কাফের ও মুশরিক ছিল তারা মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরও এটি পড়তে থেকেছে। আবার তাদের দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নেবার শত শত বছর পর আজো মুসলমানরা এটি পড়ে চলেছে। কারণ কুফরী ও কাফেরের কার্যকলাপ থেকে সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি ঈমানের চিরন্তন দাবী ও চাহিদা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এ সূরার কি গুরুত্ব ছিল, নিচে উল্লেখিত কয়েকটি হাদীস থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত করেছেন, আমি বহুবার রসূলুল্লাহকে (সা) ফজরের নামাযের আগে ও মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকাতে قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَفِرُونَ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়তে দেখিছি। (এই বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু হাদীস সামান্য শাব্দিক হেরফের সহকারে ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান ও ইবনে মারদুইয়া ইবনে ওমর (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন)।

হযরত খাব্বাব (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি ঘুমুবার জন্য নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ো তখন قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَفِرُونَ পড়ে নাও। আর রসূল (সা) নিজেও যখন বিছানায় ঘুমুবার জন্য শুয়ে পড়তেন তখন এ সূরাটি পড়ে নিতেন। এটি ছিল তাঁর রীতি। (বায়হাকী, তাবারানি ও ইবনে মারদুইয়া)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বলেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি কালেমার কথা বলবো যা তোমাদের শিরক থেকে হেফাযত করবে? সেটি হচ্ছে, তোমরা শোবার সময় قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ে নাও (আবুল ইয়ালা ও তাবারানি)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবনে জাবালকে বলেন, ঘুমুবার সময় قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ পড়ো। কারণ এর মাধ্যমে শিরক থেকে সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি হয়।

ফারওয়াহ ইবনে নওফাল ও আবদুর রহমান ইবনে নওফাল উভয়ে বর্ণনা করেছেন, তাদের পিতা নওফাল ইবনে মু'আবিয়া আল আশজায়ী (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি শোবার সময় পড়তে পারি এমন একটি জিনিস আমাকে বলে দিন। জবাবে তিনি বলেন, قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ শেষ পর্যন্ত পড়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কারণ এটি শিরক থেকে সম্পর্কহীন করে— (মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী ফিশ শু'আব)। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার (রা) ভাই হযরত জাবালাহ ইবনে হারেসা (রা) এ ধরনের আবেদন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে করেছিলেন এবং তাকেও তিনি এ একই জবাব দিয়েছিলেন— (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী)।

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

বলে দাও, হে কাফেররা![১] আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।[২] আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করি।[৩] আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করে আসছো। আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি।[৪] তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমার দীন আমার জন্য।[৫]

১. এ আয়াতে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে ভেবে দেখার মতো ঃ

(ক) যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তুমি কাফেরদের পরিষ্কার বলে দাও। তবুও সামনের আলোচনা জানিয়ে দিচ্ছে, পরবর্তী আয়াতগুলোতে যেসব কথা বলা হয়েছে প্রত্যেক মু'মিনের সে কথাগুলোই কাফেরদেরকে জানিয়ে দিতে হবে। এমনকি যে ব্যক্তি কুফরী থেকে তাওবা করে ঈমান এনেছে তার জন্যও কুফরী ধর্ম, তার পূজা-উপাসনা ও উপাস্যদের থেকে নিজের সম্পর্কহীনতা ও দায়মুক্তির কথা প্রকাশ করতে হবে। কাজেই 'কুল' (বলে দাও) শব্দটির মাধ্যমে প্রধানত ও প্রথমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ হুকুমটি বিশেষভাবে শুধু তাঁকেই করা হয়নি বরং তাঁর মাধ্যমে প্রত্যেক মু'মিনকে করা হয়েছে।

(খ) এ আয়াতে প্রতিপক্ষকে যে "কাফের" বলে সম্বোধন করা হয়েছে, এটা তাদের জন্য কোন গালি নয়। বরং আরবী ভাষায় কাফের মানে অস্বীকারকারী ও অমান্যকারী (Unbeliever)। এর মোকাবিলায় 'মু'মিন' শব্দটি বলা হয়, মেনে নেয়া ও স্বীকার করে নেয়া অর্থে (Beliver)। কাজেই আল্লাহর নির্দেশক্রমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (হে কাফেররা!) বলার অর্থই হচ্ছে এই যে, "হে লোকেরা! তোমরা যারা আমার রিসালাত ও আমার প্রদত্ত শিক্ষা মেনে নিতে অস্বীকার করছো।" অনুরূপভাবে একজন মু'মিন যখন একথা বলবে অর্থাৎ যখন সে বলবে, "হে কাফেররা!" তখন কাফের বলতে তাদেরকে বুঝানো হবে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনেনি।

(গ) "হে কাফেররা!" বলা হয়েছে, "হে মুশরিকরা" বলা হয়নি। কাজেই এখানে কেবল মুশরিকদের উদ্দেশ্যেই বক্তব্য পেশ করা হয়নি বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা আল্লাহর রসূল এবং তিনি যে শিক্ষা ও হিদায়াত দিয়েছেন তাকে আল্লাহর শিক্ষা ও হিদায়াত বলে মেনে নেয় না, তারা ইহুদী, খৃস্টান ও অগ্নি উপাসক বা সারা দুনিয়ার কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক যেই হোক না কেন, তাদের সবাইকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সম্বোধনকে শুধুমাত্র কুরাইশ বা আরবের মুশরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কোন কারণ নেই।

(ঘ) অস্বীকারকারীদেরকে 'হে কাফেররা' বলে সম্বোধন করা ঠিক তেমনি যেমন আমরা কিছু লোককে সম্বোধন করি "ওহে শত্রুরা" বা "ওহে বিরোধীরা" বলে। এ ধরনের সম্বোধনের ক্ষেত্রে আসলে বিরোধী ব্যক্তিরা লক্ষ্য হয় না, লক্ষ হয় তাদের বিরোধিতা ও শত্রুতা। আর এ সম্বোধন ততক্ষণের জন্য হয় যতক্ষণ তাদের মধ্যে এ গুণগুলো থাকে। যখন তাদের কেউ এ শত্রুতা ও বিরোধিতা পরিহার করে অথবা বন্ধু ও সহযোগী হয়ে যায় তখন সে আর এ সম্বোধনের লক্ষ থাকে না। অনুরূপভাবে যাদেরকে "হে কাফেররা" বলে সম্বোধন করা হয়েছে তারাও তাদের কুফরীর কারণে এ সম্বোধনের লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছে, তাদের ব্যক্তি সত্তার কারণে নয়। তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমৃত্যু কাফের থাকে তার জন্য এ সম্বোধন হবে চিরন্তন। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনবে তার প্রতি আর এ সম্বোধন আরোপিত হবে না।

(ঙ) অনেক মুফাস্সিরের মতে এ সূরায় "হে কাফেররা" সম্বোধন কেবলমাত্র কুরাইশদের এমন কিছু লোককে করা হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দীনের ব্যাপারে সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এবং যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে (সা) বলে দিয়েছিলেন, এরা ঈমান আনবে না। দু'টি কারণে তারা এ মত অবলম্বন করেছেন।

প্রথমত, সামনের দিকে বলা হয়েছে لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (যার বা যাদের ইবাদাত তোমরা করো আমি তার বা তাদের ইবাদাত করি না)। তাদের মতে এ উক্তি ইহুদি ও খৃস্টানদের জন্য সঠিক নয়। কেননা, তারা আল্লাহর ইবাদাত করে। দ্বিতীয়ত, সামনের দিকে একথাও বলা হয়েছে ঃ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করছি)। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হচ্ছে, এ সূরা নাযিলের সময় যারা কাফের ছিল এবং পরে ঈমান আনে তাদের ব্যাপারে এ উক্তি সত্য নয়। কিন্তু এ উভয় যুক্তির কোন সারবত্তা নেই। অবশ্যি এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আমি পরে করবো। তা থেকে জানা যাবে, এগুলোর যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। তবে এখানে এ যুক্তির গলদ স্পষ্ট করার জন্য শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করি, যদি শুধুমাত্র উল্লেখিত লোকদেরকেই এ সূরায় সম্বোধন করা হয়ে থাকে তাহলে তাদের মরে শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ সূরার তেলাওয়াত জারী থাকার কি কারণ থাকতে পারে? কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের পড়ার জন্য স্থায়ীভাবে কুরআনে এটি লিখিত থাকারই বা কি প্রয়োজন ছিল?

২. সারা দুনিয়ার কাফের মুশরিকরা যেসব উপাস্যের উপাসনা, আরাধনা ও পূজা করে, ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া, জীবিত ও মৃত মানুষের আত্মা তথা ভূত-প্রেত, চাঁদ, সূর্য, তারা, জীব-জন্তু, গাছপালা, মাটির মূর্তি বা কাল্পনিক দেব-দেবী সবই এর

অন্তরভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা যেতে পারে; আরবের মুশরিকরা মহান আল্লাহকেও তো মাবুদ ও উপাস্য বলে মানতো এবং দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিকরাও প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তও আল্লাহর উপাস্য হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করেনি। আর আহলি কিতাবরা তো আল্লাহকেই আসল মাবুদ বলে মানতো। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যতিক্রমের উল্লেখ না করেই এদের সমস্ত মাবুদের ইবাদাত করা থেকে সম্পর্কহীনতা ও দায়মুক্তির কথা ঘোষণা করা, যেখানে আল্লাহও তার অন্তরভুক্ত, কিভাবে সঠিক হতে পারে? এর জবাবে বলা যায়, আল্লাহকে অন্য মাবুদদের সাথে মিশিয়ে মাবুদ সমষ্টির একজন হিসেবে যদি অন্যদের সাথে তাঁর ইবাদাত করা হয় তাহলে তাওহীদ বিশ্বাসী প্রতিটি ব্যক্তি অবশ্যি নিজেকে এ ইবাদাত থেকে দায়মুক্ত ও সম্পর্কহীন ঘোষণা করবে। কারণ তার দৃষ্টিতে আল্লাহ মাবুদ সমষ্টির একজন মাবুদ নন। বরং তিনি একাই এবং একক মাবুদ। আর এ. সমষ্টির ইবাদাত আসলে আল্লাহর ইবাদাত নয়। যদিও আল্লাহর ইবাদাত এর অন্তরভুক্ত। কুরআন মজীদে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে একমাত্র সেটিই আল্লাহর ইবাদাত যার মধ্যে অন্যের ইবাদাতের কোন গন্ধও নেই এবং যার মধ্যে মানুষ নিজের বন্দেগীকে পুরোপুরি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে।

وَمَا أُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ (البينة : ٥)

"লোকদেরকে এ ছাড়া আর কোন হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা পুরোপুরি একমুখী হয়ে নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁর ইবাদাত করবে।

কুরআনের বহু জায়গায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে এবং অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন সূরা আন নিসা ১৪৫ ও ১৪৬, আল আ'রাফ ২৯, আয যুমার ২, ৩, ১১, ১৪ ও ১৫ এবং আল মু'মিন ১৪ ও ৬৪–৬৬ আয়াতসমূহ। এ বক্তব্য একটি হাদীসে কুদসীতেও উপস্থাপিত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক শরীকের অংশীদারিত্ব থেকে আমি সবচেয়ে বেশী মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করেছে যার মধ্যে আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করেছে, তা থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং আমার সাথে যাকে সে ঐ কাজে শরীক করেছে, ঐ সম্পূর্ণ কাজটি তারই জন্য (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ)। কাজেই আল্লাহকে দুই, তিন বা বহু ইলাহের একজন গণ্য করা এবং তাঁর সাথে অন্যদের বন্দেগী, উপাসনা ও পূজা করাই হচ্ছে আসল কুফরী এবং এ ধরনের কুফরীর সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করাই এ সূরার উদ্দেশ্য)

৩. এখানে মূলে مَا أَعْبُدُ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় مَا (মা) শব্দটি সাধারণত নিষ্প্রাণ বা বুদ্ধি–বিবেচনাহীন বস্তু বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যদিকে বুদ্ধি–বিবেচনা সম্পন্ন জীবের জন্য مَنْ (মান) শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ কারণে প্রশ্ন দেখা দেয়, এখানে مَنْ أَعْبُدُ না বলে مَا أَعْبُدُ বলা হলো কেন? মুফাস্‌সিরগণ সাধারণত এর চারটি জবাব দিয়ে থাকেন। এক, এখানে مَا শব্দটি مَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দুই, এখানে مَا শব্দটি الَّذِىْ (আললাযী) অর্থাৎ যে বা যাকে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিন, উভয়, বাক্যেই مَا শব্দটি মূল শব্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এখানে এর অর্থ হয় ঃ আমি সেই ইবাদাত করি না যা তোমরা করো। অর্থাৎ মুশরিকী ইবাদাত। আর

তোমরা সেই ইবাদাত করো না যা আমি করি অর্থাৎ তাওহীদবাদী ইবাদাত। চার, প্রথম বাক্যে যেহেতু مَا تَعْبُدُونَ বলা হয়েছে তাই দ্বিতীয় বাক্যে বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখার খাতিরে مَا أَعْبُدُ বলা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একই শব্দ বলা হয়েছে কিন্তু এর মানে এক নয়। কুরআন মজীদে এর উদাহরণ রয়েছে। যেমন সূরা আল বাকারার ১৯৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"যে ব্যক্তি তোমার ওপর বাড়াবাড়ি করে তুমিও তার ওপর তেমনি বাড়াবাড়ি করো যেমন সে তোমার ওপর করেছে।"

একথা সুস্পষ্ট যে, কারো বাড়াবাড়ির জবাবে ঠিক তেমনি বাড়াবাড়িমূলক আচরণকে আসলে বাড়াবাড়ি বলে না। কিন্তু নিছক বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই জবাবী কার্যকলাপকে বাড়াবাড়ি শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা তাওবার ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ "তারা আল্লাহকে ভুলে গেলো কাজেই আল্লাহ তাদেরকে ভুলে গেলেন।" অথচ আল্লাহ ভোলেন না। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাদেরকে উপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাদের ভুলে যাওয়ার জবাবে আল্লাহ ভুলে যাওয়া শব্দটি নিছক বক্তব্যের মধ্যে মিল রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

এ চারটি অর্থ যদিও এক এক দৃষ্টিতে যথার্থ এবং আরবী ভাষায় এসব অর্থ গ্রহণ করার অবকাশও রয়েছে তবুও যে মূল বক্তব্যটিকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য مَنْ أَعْبُدُ এর জায়গায় مَا أَعْبُدُ বলা হয়েছে তা এর মধ্য থেকে কোন একটি অর্থের মাধ্যমেও পাওয়া যায় না। আসলে আরবী ভাষায় কোন ব্যক্তির জন্য مَنْ শব্দটি ব্যবহার করে তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় এবং مَا শব্দটি ব্যবহার করে তার মাধ্যমে তার গুণগত সত্তা সম্পর্কে জানার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়। যেমন আমাদের ভাষায় কারো সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞেস করি, ইনি কে? তখন তার ব্যক্তি সত্তার পরিচিতি লাভ করাই হয় আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করি, ইনি কি? তখন আসলে আমরা চাই তার গুণগত পরিচিতি। যেমন তিনি যদি সেনাবাহিনীর লোক হন তাহলে সেখানে তার পদমর্যাদা কি? তিনি যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, তাহলে সেখানে তিনি রীডার, লেকচারার না প্রফেসর কোন পদে অধিষ্ঠিত আছেন? তিনি কোন্ বিষয়টি পড়ান? তার ডিগ্রী কি ইত্যাদি বিষয় জানাই হয় আমাদের উদ্দেশ্য। কাজেই যদি এ আয়াতে বলা হতো لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَنْ أَعْبُدُ তাহলে এর অর্থ হতো, তোমরা সেই সত্তার ইবাদাত করবে না যার ইবাদাত আমি করছি। এর জবাবে মুশরিক ও কাফেররা বলতে পারতো ঃ আল্লাহর সত্তাকে তো আমরা মানি এবং তার ইবাদাতও করি। কিন্তু যখন বলা হলো ঃ لَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ তখন অর্থ দাঁড়ালো ঃ যেসব গুণের অধিকারী মাবুদের ইবাদাত আমি করি সেইসব গুণের অধিকারী মাবুদের ইবাদাত তোমরা করবে না। এখানে মূল বক্তব্য এটিই। এরি ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন সব ধরনের কাফেরদের দীন থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। কারণ সব ধরনের কাফেরদের খোদা থেকে তাঁর খোদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের কারো খোদার ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হয়েছে। সে বিশ্ব–জগতের প্রভু

নয় বরং ইসরাঈলের প্রভু। একটি গোষ্ঠীর লোকদের সাথে তার এমন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যা অন্যদের সাথে নেই। সে হযরত ইয়াকুবের সাথে কুস্তি লড়ে কিন্তু তাকে আছাড় দিতে পারে না। তার উযাইর নামক একটি ছেলেও আছে। আবার কারো খোদা হযরত ঈসা মসিহ নামক একমাত্র পুত্রের পিতা। সে অন্যদের গুণাহের কাফ্‌ফারা দেবার জন্য নিজের পুত্রকে ক্রুশ বিদ্ধ করায়। কারোর খোদার স্ত্রী–সন্তান আছে। কিন্তু সে বেচারার শুধু কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। আবার কারো খোদা মানুষের রূপ ধারণ করে অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং মানুষের দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বুকে এবং মানুষের মতো কাজ করে যাচ্ছে। কারো খোদা নিছক অনিবার্য অস্তিত্ব অথবা সকল কার্যকারণের কারণ কিংবা প্রথম কার্যকারণ (First Cause)। বিশ্ব–জগতের ব্যবস্থাপনাকে একবার সচল করে দিয়ে সে আলাদা হয়ে গেছে। তারপর বিশ্ব–জাহান ধরাবাধা আইন মুতাবেক স্বয়ং চলছে। অতপর মানুষের সাথে তার ও তার সাথে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। মোটকথা, খোদাকে মানে এমন সব কাফেরও আসলে ঐ আল্লাহ মানে না যিনি সমগ্র বিশ্ব–জাহানের একক স্রষ্টা, মালিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও শাসক। তিনি বিশ্ব–জাহানের এ ব্যবস্থাপনার শুধু স্রষ্টাই নন বরং তার সার্বক্ষণিক পরিচালক। তাঁর হুকুম এখানে প্রতি মুহূর্তেই চলছে। তিনি সকল প্রকার দোষ, ত্রুটি, দুর্বলতা ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত। তিনি সব রকমের উপমা ও সাকার সত্তা থেকে পবিত্র, নজীর, সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য মুক্ত এবং কোন সাথী, সহকারী ও অংশীদারের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও মাবুদ হবার অধিকারে কেউ তাঁর সাথে শরীক নয়। তাঁর সন্তানাদি থাকা, কাউকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার এবং কোন পরিবার বা গোষ্ঠীর সাথে কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিটি সত্তার সাথে রিজিকদাতা, পালনকর্তা, অনুগ্রহকারী ও ব্যবস্থাপক হিসেবে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তিনি প্রার্থনা শোনেন ও তার জবাব দেন। জীবন–মৃত্যু, লাভ–ক্ষতি এবং ভাগ্যের ভাঙা–গড়ার পূর্ণ ক্ষমতার তিনিই একচ্ছত্র মালিক। তিনি নিজের সৃষ্টির কেবল পালনকর্তাই নন বরং প্রত্যেককে তার মর্যাদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী হিদায়াতও দান করেন। তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল এতটুকুই নয় যে, তিনি আমাদের মাবুদ এবং আমরা তাঁর পূজা অর্চনাকারী বরং তিনি নিজের নবী ও কিতাবের সাহায্যে আমাদের আদেশ নিষেধের বিধান দান করেন এবং তাঁর বিধানের আনুগত্য করাই আমাদের কাজ। নিজেদের কাজের জন্য তাঁর কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। মৃত্যুর পর তিনি পুনর্বার আমাদের ওঠাবেন এবং আমাদের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন। এসব গুণাবলী সম্পন্ন মাবুদের ইবাদাত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ করছে না। অন্যেরা খোদার ইবাদাত করলেও আসল ও প্রকৃত খোদার ইবাদাত করছে না। বরং তারা নিজেদের উদ্ভাবিত কাল্পনিক খোদার ইবাদাত করছে।

৪. একদল তাফসীরকারের মতে এ বাক্য দু'টিতে প্রথম বাক্য দু'টির বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। প্রথম বাক্য দু'টিতে যা কিছু বলা হয়েছে তাকে অত্যধিক শক্তিশালী ও বেশী জোরদার করার জন্য এটা করা হয়েছে। কিন্তু অনেক মুফাস্‌সির একে পুনরাবৃত্তি বলে মনে করেন না। তারা বলেন, এর মধ্যে অন্য একটি কথা বলা হয়েছে। প্রথম বাক্য দু'টিতে যে কথা বলা হয়েছে তা থেকে একথার বক্তব্যই আলাদা। আমার মতে, এ বাক্য দু'টিতে আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি নেই, এতটুকু কথা সঠিক বলে মেনে নেয়া যায়।

কারণ এখানে শুধুমাত্র "আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি" একথাটুকুর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আর আগের বক্তব্যে একথাটি যে অর্থে বলা হয়েছিল এখানে সে অর্থে এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। কিন্তু পুনরাবৃত্তি অস্বীকার করার পর মুফাস্‌সিরগণের এ দলটি এ দু'টি বাক্যের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা পরস্পর অনেক ভিন্নধর্মী। এখানে তাদের প্রত্যেকের বর্ণিত অর্থ উল্লেখ করে তার ওপর আলোচনা করার সুযোগ নেই। আলোচনা দীর্ঘ হবার আশংকায় শুধুমাত্র আমার মতে যে অর্থটি সঠিক সেটিই এখানে বর্ণনা করলাম।

প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ "আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করে আসছো।" এর বক্তব্য বিষয় দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "আর আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।" এ দু'টি বক্তব্যে দু'টি দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এক, আমি অমুক কাজ করি না বা করবো না বলার মধ্যে যদিও অস্বীকৃতি ও শক্তিশালী অস্বীকৃতি রয়েছে কিন্তু আমি উমুক কাজটি করবো না একথার ওপর অনেক বেশী জোর দেয়া হয়েছে। কারণ এর অর্থ হচ্ছে, সেটা এত বেশী খারাপ কাজ যে, সেটা করা তো দূরের কথা সেটা করার ইচ্ছা পোষণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুই, "যাদের ইবাদাত তোমরা করো" একথা বলতে কাফেররা বর্তমানে যেসব মাবুদদের ইবাদাত করে শুধুমাত্র তাদেরকে বুঝায়। বিপরীত পক্ষে "যাদের ইবাদাত তোমরা করেছো" বললে এমনসব মাবুদদের কথা বুঝায় যাদের ইবাদাত কাফেররা ও তাদের পূর্বপুরুষরা অতীতে করেছে। একথা সবাই জানে, মুশরিক ও কাফেরদের মাবুদদের মধ্যে হামেশা রদবদল ও কমবেশী হতে থেকেছে। বিভিন্ন যুগে কাফেরদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মাবুদের পূজা করেছে। সবসময় ও সব জায়গায় সব কাফেরের মাবুদ কখনো এক থাকেনি। কাজেই এখানে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের শুধু আজকের মাবুদদের থেকে নয়, তোমাদের পিতৃপুরুষদের মাবুদদের থেকেও দায়মুক্ত। এ ধরনের মাবুদদের ইবাদাত করার চিন্তাও মনের মধ্যে ঠাঁই দেয়া আমার কাজ নয়।

আর দ্বিতীয় বাক্যটির ব্যাপারে বলা যায়, যদিও ৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত এ বাক্যটির শব্দাবলী ও ৩ নম্বর আয়াতের শব্দাবলী একই ধরনের তবুও এদের উভয়ের মধ্যে অর্থের বিভিন্নতা রয়েছে। তিন নম্বর আয়াত সংশ্লিষ্ট বাক্যটি নিম্নোক্ত বাক্যটির পরে এসেছে ঃ "আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।" তাই এর অর্থ হয়, "আর না তোমরা সেই ধরনের গুণাবলী সম্পন্ন একক মাবুদের ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি।" আর পাঁচ নম্বর আয়াতে এই সংশ্লিষ্ট বাক্যটি নিম্নোক্ত বাক্যটির পরে এসেছেঃ "আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করেছো।" তাই এর মানে হয়, "আর না তোমরা সেই একক মাবুদের ইবাদাত করবে বলে মনে হচ্ছে যার ইবাদাত আমি করি।" অন্য কথায়, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের যাদের পূজা-উপাসনা করেছো তাদের পূজারী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর বহু মাবুদের বন্দেগী পরিহার করে একক মাবুদের ইবাদাত করার ব্যাপারে তোমাদের যে বিতৃষ্ণা সে কারণে তোমরা নিজেদের এ ভুল ইবাদাত-বন্দেগীর পথ ছেড়ে দিয়ে আমি যাঁর ইবাদাত করি তাঁর ইবাদাত করার পথ অবলম্বন করবে, এ আশাও করি না।

৫. অর্থাৎ আমার দীন আলাদা এবং তোমাদের দীন আলাদা। আমি তোমাদের মাবুদদের পূজা–উপাসনা–বন্দেগী করি না এবং তোমরাও আমার মাবুদের পূজা–উপাসনা করো না। আমি তোমাদের মাবুদদের বন্দেগী করতে পারি না এবং তোমরা আমার মাবুদের বন্দেগী করতে প্রস্তুত নও। তাই আমার ও তোমার পথ কখনো এক হতে পারে না। এটা কাফেরদের প্রতি উদারনীতি নয় বরং তারা কাফের থাকা অবস্থায় চিরকালের জন্য তাদের ব্যাপারে দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষের ঘোষণাবাণী। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি যারা ঈমান এনেছে তারা দীনের ব্যাপারে কখনো তাদের সাথে সমঝোতা করবে না—এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্বশেষ ও চূড়ান্তভাবে নিরাশ করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এ সূরার পরে নাযিল হওয়া কয়েকটি মক্কী সূরাতে পর পর এ দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষ প্রকাশের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ "এরা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে তাহলে বলে দাও, আমার কাজ আমার জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার দায়–দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত।" (৪১ আয়াত) এ সূরাতেই তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী! বলে দাও, হে লোকেরা, যদি তোমরা আমার দীনের ব্যাপারে (এখানে) কোন রকম সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে (শুনে রাখো), আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের বন্দেগী করছো আমি তাদের বন্দেগী করি না বরং আমি শুধুমাত্র সেই আল্লাহর বন্দেগী করি যার কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু।" (১০৪ আয়াত) সূরা আশ শু'আরায় বলেছেন ঃ "হে নবী! যদি এরা এখন তোমার কথা না মানে তাহলে বলে দাও, তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত"। (২১৬ আয়াত) সূরা সাবায় বলেছেন ঃ "এদেরকে বলো, আমাদের ত্রুটির জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু করে যাচ্ছো সে জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। বলো, আমাদের রব একই সময় আমাদের ও তোমাদের একত্র করবেন এবং আমাদের মধ্যে ঠিকমতো ফায়সালা করবেন।" (২৫–২৬ আয়াত) সূরা যুমার–এ বলেছেন ঃ "এদেরকে বলো, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যাও। আমি আমার কাজ করে যেতে থাকবো। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর আসছে লাঞ্ছনাকর আযাব এবং কে এমন শাস্তি লাভ করছে যা অটল।" (৩৯–৪০ আয়াত) আবার মদীনা তাইয়েবার সমস্ত মুসলমানকেও এই একই শিক্ষা দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয় ঃ "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে রয়েছে একটি ভালো আদর্শ। (সেটি হচ্ছে ঃ) তারা নিজেদের জাতিকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আমরা তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদদের পূজা করো তাদের থেকে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদের কুফরী করি ও অস্বীকৃতি জানাই এবং যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনো ততক্ষণ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালীন শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।" (আল মুমতাহিনা ৪ আয়াত) কুরআন মজীদের একের পর এক এসব সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর তোমরা তোমাদের ধর্ম মেনে চলো এবং আমাকে আমার ধর্ম মেনে চলতে দাও—"লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন"–এর এ ধরনের কোন অর্থের অবকাশই থাকে না। বরং সূরা যুমার–এ যে কথা বলা হয়েছে, একে ঠিক সেই পর্যায়ে রাখা যায় যেখানে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী! এদেরকে বলে দাও, আমি তো আমার দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁরই ইবাদাত করবো, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যার যার বন্দেগী করতে চাও করতে থাক না কেন।" (১৪ আয়াত)।

এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কাফেরদের ধর্ম পরস্পর যতই বিভিন্ন হোক না কেন সামগ্রিকভাবে সমস্ত কাফেররা মূলত একই গোষ্ঠীভুক্ত। কাজেই তাদের মধ্যে যদি বংশ বা বিবাহের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোন কারণে এমন কোন সম্পর্ক থাকে যা একের সম্পত্তিতে অন্যের উত্তরাধিকারী স্বত্ব দাবী করে তাহলে একজন খৃষ্টান একজন ইহুদীর, একজন ইহুদী একজন খৃষ্টানের এক ধর্মের কাফের অন্য ধর্মের কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে। বিপরীত পক্ষে ইমাম মালিক, ইমাম আওযায়ী ও ইমাম আহমাদের মতে এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। তারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে এ মত পোষণ করেন। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ لا يتوارث اهل ملتين شتى "দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিশ হতে পারে না।" (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, দারে কুতনী)। প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম তিরমিযী হযরত জাবের (রা) থেকে, ইবনে হিব্বান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে এবং বাযযার আবু হুরাইরা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ বিষয়টি আলোচনা প্রসংগে হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম শামসুল আয়েম্মা সারাখসী লিখেছেন ঃ যে সমস্ত কারণে মুসলমানরা পরস্পরের ওয়ারিশ হয় সে সমস্ত কারণে কাফেররাও পরস্পরের ওয়ারিশ হতে পারে। আবার তাদের মধ্যে এমন কোন কোন অবস্থায়ও উত্তরাধিকার স্বত্ব জারী হতে পারে যে অবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে হয় না।...................... প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে দীন হচ্ছে দু'টি একটি সত্য দীন এবং অন্যটি মিথ্যা দীন। তাই তিনি বলেছেনঃ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ এই সাথে তিনি মানুষদেরও দু'দলে বিভক্ত করেছেন। একদল জান্নাতী এবং তারা হচ্ছে মু'মিন। আর একদল জাহান্নামী এবং সামগ্রিকভাবে তারা হচ্ছে কাফের সমাজ। এ দু'দলকে তিনি পরস্পরের বিরোধী গণ্য করেছেন তাই তিনি বলেছেন ঃ هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ (এই দু'টি পরস্পর বিরোধী দল। এদের মধ্যে রয়েছে নিজেদের রবের ব্যাপারে বিরোধ।—আল হজ্জ ১৯ আয়াত) অর্থাৎ সমস্ত কাফেররা মিলে একটি দল। তাদের বিরোধ ঈমানদার বা মু'মিনদের সাথে।..... তাদেরকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা মিল্লাতে তথা মানব গোষ্ঠীর অন্তরভুক্ত বলে আমরা মনে করি না। বরং মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা সবাই একটি মিল্লাতের অন্তরভুক্ত। কারণ মুসলমানরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে। অন্যদিকে তারা এসব অস্বীকার করে। এ জন্য তাদেরকে কাফের বলা হয়। মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা একই গোষ্ঠীভুক্ত হয় لا يتوارث اهل ملتين হাদীসটি আমি ইতিপূর্বে যে কথার উল্লেখ করেছি সেদিকেই ইংগিত করে। কারণ, "মিল্লাতাইন" (দুই মিল্লাত তথা দুই গোষ্ঠী) শব্দের ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে করে দিয়েছেন ঃ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم অর্থাৎ "মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না এবং কাফের হতে পারে না মুসলমানের ওয়ারিশ।" [আল মাবসূত ৩ খণ্ড, ৩০-৩২ পৃষ্ঠা। ইমাম সারাখসী এখানে যে হাদীসটির বরাত দিয়েছেন সেটি বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।]

আন নসর

১১০

নামকরণ

প্রথম আয়াত إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ-এর মধ্যে উল্লেখিত নসর (نصر) শব্দকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) একে কুরআন মজীদের শেষ সূরা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আর কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়নি।* (মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবী শাইবা ও ইবনে মারদুইয়া)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, এ সূরাটি বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময় মিনায় নাযিল হয়। এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বিখ্যাত ভাষণটি দেন। (তিরমিযী, বায়যাবী, বাইহাকী, ইবনে শাইবা, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু ইয়ালা ও ইবনে মারদুইয়া)। বাইহাকী কিতাবুল হজ্জ অধ্যায়ে হযরত সারাআ বিনতে নাবহানের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সময়ের প্রদত্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

---

* বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, এরপর কিছু বিচ্ছিন্ন আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সবশেষে কুরআনের কোন্ আয়াতটি নাযিল হয় সেটি চিহ্নিত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত বারাআ ইবনে আযেবের (রা) রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ সেটি হচ্ছে সূরা নিসার শেষ আয়াত يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাসের (রা) উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ সেই সর্বশেষ আয়াতটি হচ্ছে রিবা সম্পর্কিত আয়াত। অর্থাৎ যে আয়াতের মাধ্যমে সুদকে হারাম গণ্য করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে মারদুইয়া হযরত উমর (রা) থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন তা থেকেও ইবনে আব্বাসের এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এ হাদীসগুলোতে এটিকে শেষ আয়াত বলা হয়নি। বরং হযরত উমরের উক্তি হচ্ছে ঃ এটি সর্বশেষে নাযিল হওয়া আয়াতের অন্তরভুক্ত। আবু উবাইদ তাঁর ফাদায়েলুল কুরআন গ্রন্থে ইমাম যুহরীর এবং ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ রিবার আয়াত এবং দাইনের আয়াত (অর্থাৎ সূরা বাকারার ৩৮–৩৯ রুকূ') কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। নাসায়ী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাসের অন্য একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ সূরা বাকারার এ ২৮১ নম্বর আয়াতটি হচ্ছে কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। আল ফিরইয়াবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এতটুকু বাড়ানো হয়েছে ঃ এ আয়াতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের ৮১ দিন আগে নাযিল হয়। অন্যদিকে ইবনে আবী হাতেম এ সম্পর্কিত সাঈদ ইবনে যুবাইরের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে এ আয়াতটি নাযিল হওয়া ও রসূলের (সা) ওফাতের মধ্যে মাত্র ৯ দিনের ব্যবধানের কথা বলা হয়েছে। ইমাম আহমাদের মুসনাদ ও হাকেমের মুসতাদরাকে হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ সূরা তাওবার ১২৮–১২৯ আয়াত দু'টি সবশেষে নাযিল হয়।

"বিদায় হজ্জের সময় আমি রসূলুল্লাহ (সা)–কে একথা বলতে শুনেছি ঃ হে লোকেরা! তোমরা জানো আজ কোন দিন? লোকেরা জবাব দিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে আইয়ামে তাশরীকের মাঝখানের দিন। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, জানো এটা কোন জায়গা? লোকেরা জবাব দিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে মাশ'আরে হারাম। এরপর তিনি বলেন, আমি জানি না, সম্ভবত এরপর আমি আর তোমাদের সাথে মিলতে পারবো না। সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের মান–সম্মান পরস্পরের ওপর ঠিক তেমনি হারাম যেমন আজকের দিনটি ও এ জায়গাটি হারাম, যতদিন না তোমরা তোমাদের রবের সামনে হাযির হয়ে যাও এবং তিনি তোমাদেরকে নিজেদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। শোনো, একথাগুলো তোমাদের নিকটবর্তীরা দূরবর্তীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। শোনো আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এরপর আমরা মদীনায় ফিরে এলাম এবং তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল হয়ে গেল।"

এ দু'টি রেওয়ায়াত একত্র করলে দেখা যাবে, সূরা আন নসরের নাযিল হওয়া ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের মধ্যে ৩ মাস ও কয়েকদিনের ব্যবধান ছিল। কেননা ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখা যায়, বিদায় হজ্জ ও রসূলের (সা) ওফাতের মাঝখানে এ ক'টি দিনই অতিবাহিত হয়েছিল।

ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা মতে এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমাকে আমার মৃত্যুর খবর দেয়া হয়েছে এবং আমার সময় পূর্ণ হয়ে গেছে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত অন্যান্য রেওয়ায়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ (সা) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, তাবারানী, নাসায়ী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ বছর আমার ইন্তিকাল হবে। একথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, আমার বংশধরদের মধ্যে তুমিই সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে। একথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) হেসে ফেললেন। (ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া) প্রায় এই একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বাইহাকীতে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড় বড় জ্ঞানী ও সম্মানিত সাহাবীদের সাথে তাঁর মজলিসে আমাকে ডাকতেন। একথা বয়স্ক সাহাবীদের অনেকের খারাপ লাগলো। তাঁরা বললেন, আমাদের ছেলেরাও তো এ ছেলেটির মতো, তাহলে শুধুমাত্র এ ছেলেটিকেই আমাদের সাথে মজলিসে শরীক করা হচ্ছে কেন? (ইমাম বুখারী ও ইবনে জারীর খোলাসা করে বলেছেন যে, একথা বলেছিলেন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ) হযরত উমর (রা) বললেন, ইলমের ক্ষেত্রে এর যা মর্যাদা তা আপনারা জানেন। তারপর একদিন তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক সাহাবীদের ডাকলেন। তাঁদের সাথে আমাকেও ডাকলেন। আমি বুঝে ফেললাম তাদের মজলিসে

আমাকে শরীক করার যৌক্তিকথা প্রমাণ করার জন্য আজ আমাকে ডাকা হয়েছে। আলোচনার এক পর্যায়ে হযরত উমর (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ সূরাটির ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? কেউ কেউ বললেন, এ সূরায় আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য আসে এবং আমরা বিজয় লাভ করি তখন আমাদের আল্লাহর হামদ ও ইস্তিগফার করা উচিত। কেউ কেউ বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, শহর ও দুর্গসমূহ জয় করা। অনেকে নীরব রইলেন এরপর হযরত উমর (রা) বললেন, ইবনে আব্বাস তুমিও কি একথাই বলো? আমি বললাম ঃ না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে তুমি কি বলো। আমি বললাম ঃ এর অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাত। এ সূরায় জানানো হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে এবং বিজয় লাভ হবে তখন আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, এগুলোই হবে তার আলামত। কাজেই এরপর আপনি আল্লাহর হাম্দ ও ইস্তিগফার করুন। একথা শুনে হযরত উমর বললেন, তুমি যা বললে আমিও এ ছাড়া আর কিছুই জানি না। অন্য একটি রেওয়ায়াতে এর ওপর আরো একটু বাড়ানো হয়েছে এভাবে যে, হযরত উমর বয়স্ক বদরী সাহাবীদের বললেন ঃ আপনারা এ ছেলেকে এ মজলিসে শরীক করার কারণ দেখার পর আবার কেমন করে আমাকে তিরস্কার করেন? (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে মারদুইয়া, বাগাবী, বাইহাকী ও ইবনুল মুনযির)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে যে হাদীসগুলো আলোচনা করা হয়েছে তাতে একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে বলে দিয়েছিলেন, যখন আরবে ইসলামের বিজয় পূর্ণ হয়ে যাবে এবং লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে তখন এর মানে হবে, আপনাকে যে কাজের জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর তাঁকে হুকুম দেয়া হয়েছে, আপনি আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করতে থাকুন। কারণ তাঁরই অনুগ্রহে আপনি এতবড় কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর তাঁর কাছে এ মর্মে দোয়া করুন যে, এই বিরাট কাজ করতে গিয়ে আপনি যে ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটি করেছেন তা সব তিনি যেন মাফ করে দেন। এ ক্ষেত্রে একটুখানি চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোন ব্যক্তিই দুনিয়ার মানুষের একজন সাধারণ নেতা ও একজন নবীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাবেন। মানুষের একজন সাধারণ নেতা যে বিপ্লব করার জন্য কাজ করে যায় নিজের জীবদ্দশাতেই যদি সেই মহান বিপ্লব সফলকাম হয়ে যায় তাহলে এ জন্য সে বিজয় উৎসব পালন করে এবং নিজের নেতৃত্বের গর্ব করে বেড়ায়। কিন্তু এখানে আল্লাহর নবীকে আমরা দেখি, তিনি তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পুরো একটি জাতির আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, রাজনীতি ও সামরিক যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছেন। মূর্খতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে আপাদমস্তক ডুবে থাকা জাতিকে উদ্ধার করে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলেছেন যার ফলে তারা সারা দুনিয়া জয় করে ফেলেছে এবং সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্ব পদে আসীন হয়েছে। কিন্তু এতবড় মহৎ কাজ সম্পন্ন করার পরও তাঁকে উৎসব পালন করার নয় বরং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার

এবং তাঁর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করার হুকুম দেয়া হয়। আর তিনি পূর্ণ দীনতার সাথে সেই হুকুম পালন করতে থাকেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওফাতের পূর্বে سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ কোন কোন রেওয়ায়াতে এর শব্দগুলো হচ্ছে ঃ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ খুব বেশী করে পড়তেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই যে কথাগুলো পড়ছেন এগুলো কেমন ধরনের কালেমা। জবাব দিলেন, আমার জন্য একটি আলামত নির্ধারণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে, যখন আমি সেই আলামত দেখতে পাবো তখনই যেন একথাগুলো পড়ি এবং সেই আলামতটি হচ্ছে, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া)। প্রায় এ একই ধরনের কোন কোন রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার সময় নিজের রুকু' ও সিজদায় খুব বেশী করে এ শব্দগুলো পড়তেন ঃ سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ এটি ছিল কুরআনের (অর্থাৎ সূরা আন নসরের ব্যাখ্যা। তিনি নিজেই ব্যাখ্যাটি করেছিলেন) (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে জারীর)।

হযরত উম্মে সালামা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষের দিকে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তাঁর পবিত্র মুখে সর্বক্ষণ একথাই শুনা যেতোঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ যিকিরটি বেশী করে করেন কেন? জবাব দিলেন, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, তারপর তিনি এ সূরাটি পড়লেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রেওয়ায়াত করেন, যখন এ সূরাটি নাযিল হয় তখন থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত যিকিরটি বেশী করে করতে থাকেন ঃ

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ، سُبْحٰنَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ (ابن جرير ، مسند احمد –

ابن ابى حاتم)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরাতের জন্য শ্রম ও সাধনা করার ব্যাপারে খুব বেশী জোরেশোরে আত্মনিয়োগ করেন। এর আগে তিনি কখনো এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেননি। (নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া)।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যায় এবং বিজয় লাভ হয়,[১] আর (হে নবী!) তুমি (যদি) দেখ যে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দীন গ্রহণ করছে[২] তখন তুমি তোমার রবের হাম্‌দ সহকারে তাঁর তাসবীহ পড়ো[৩] এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত চাও।[৪] অবশ্যি তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী।

১. বিজয় মানে কোন একটি যুদ্ধ বিজয় নয়। বরং এর মানে হচ্ছে এমন একটি চূড়ান্ত বিজয় যার পরে ইসলামের সাথে সংঘর্ষ করার মতো আর কোন শক্তির অস্তিত্ব দেশের বুকে থাকবে না এবং একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বর্তমানে আরবে এ দীনটিই প্রাধান্য বিস্তার করবে। কোন কোন মুফাস্‌সির এখানে বিজয় মানে করেছেন মক্কা বিজয়। কিন্তু মক্কা বিজয় হয়েছে ৮ হিজরীতে এবং এ সূরাটি নাযিল হয়েছে ১০ হিজরীর শেষের দিকে। ভূমিকায় আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত সারাআ বিনতে নাবহানের (রা) যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা থেকে একথাই জানা যায়। এ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) যে একে কুরআন মজীদের সর্বশেষ সূরা বলেছেন, তাঁর এ বক্তব্যও এ তাফসীরের বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ বিজয়ের মানে যদি মক্কা বিজয় হয় তাহলে সমগ্র সূরা তাওবা মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়। তাহলে আন নসর কেমন করে শেষ সূরা হতে পারে? নিসন্দেহে মক্কা বিজয় এ দিক দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় ছিল যে, তারপর আরবের মুশরিকদের সাহস ও হিম্মত নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরপরও তাদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি–সামর্থ ছিল। এরপরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তায়েফ ও হুনায়েনের যুদ্ধ। আরবে ইসলামের পূর্ণাংগ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে আরো প্রায় দু'বছর সময় লেগেছিল।

২. অর্থাৎ লোকদের একজন দু'জন করে ইসলাম গ্রহণ করার যুগ শেষ হয় যাবে। তখন এমন এক যুগের সূচনা হবে যখন একটি গোত্রের সবাই এবং এক একটি বড় বড় এলাকার সমস্ত অধিবাসী কোন প্রকার যুদ্ধ–বিগ্রহ ও চাপ প্রয়োগ ছাড়াই স্বতস্ফূর্তভাবে

মুসলমান হয়ে যেতে থাকবে। নবম হিজরীর শুরু থেকে এ অবস্থার সূচনা হয়। এ কারণে এ বছরটিকে বলা হয় প্রতিনিধিদলের বছর। এ বছর আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে থাকে। তারা ইসলাম কবুল করে তাঁর মুবারক হাতে বাই'আত গ্রহণ করতে থাকে। এমনকি দশম হিজরীতে যখন তিনি বিদায় হজ্জ করার জন্য মক্কায় যান তখন সমগ্র আরব ভূমি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সারাদেশে কোথাও একজন মুশরিক ছিল না।

৩. হামদ মানে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও। আর তাসবীহ মানে আল্লাহকে পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং দোষ-ত্রুটিমুক্ত গণ্য করা। এ প্রসংগে বলা হয়েছে, যখন তুমি তোমার রবের কুদরতের এ অভিব্যক্তি দেখবে তখন তাঁর হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ পাঠ করবে। এখানে হামদ বলে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এ মহান ও বিরাট সাফল্য সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সময় বিন্দুমাত্রও ধারণা না জন্মায় যে, এসব তোমার নিজের কৃতিত্বের ফল। বরং একে পুরোপুরি ও সরাসরি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী মনে করবে। এ জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। মনে ও মুখে একথা স্বীকার করবে যে, এ সাফল্যের জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। আর তাসবীহ মানে হচ্ছে, আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হওয়ার বিষয়টি তোমার প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপর নির্ভরশীল ছিল—এ ধরনের ধারণা থেকে তাঁকে পাক ও মুক্ত গণ্য করবে। বিপরীত পক্ষে তোমার মন এ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকবে যে, তোমার প্রচেষ্টা ও সাধনার সাফল্য আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি তাঁর যে বান্দার থেকে চান কাজ নিতে পারতেন। তবে তিনি তোমার খিদমত নিয়েছেন এবং তোমার সাহায্যে তাঁর দীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছেন, এটা তাঁর অনুগ্রহ। এ ছাড়া তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পড়ার মধ্যে বিস্ময়েরও একটি দিক রয়েছে। কোন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলে মানুষ সুবহানাল্লাহ বলে। এর অর্থ হয়, আল্লাহর অসীম কুদরতে এহেন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। নয়তো এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তির ছিল না।

৪. অর্থাৎ তোমার রবের কাছে দোয়া করো। তিনি তোমাকে যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা করতে গিয়ে তোমার যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা যেন তিনি মাফ করে দেন। ইসলাম বান্দাকে এ আদব ও শিষ্টাচার শিখিয়েছে। কোন মানুষের দ্বারা আল্লাহর দীনের যতবড় খিদমতই সম্পন্ন হোক না কেন, তাঁর পথে সে যতই ত্যাগ স্বীকার করুক না কেন এবং তাঁর ইবাদাত ও বন্দেগী করার ব্যাপারে যতই প্রচেষ্টা ও সাধনা চালাক না কেন, তার মনে কখনো এ ধরনের চিন্তার উদয় হওয়া উচিত নয় যে, তার ওপর তার রবের যে হক ছিল তা সে পুরোপুরি আদায় করে দিয়েছে। বরং সবসময় তার মনে করা উচিত যে, তার হক আদায় করার ব্যাপারে যেসব দোষ-ত্রুটি সে করেছে তা মাফ করে দিয়ে যেন তিনি তার এ নগণ্য খেদমত কবুল করে নেন। এ আদব ও শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অথচ তাঁর চেয়ে বেশী আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনাকারী আর কোন মানুষের কথা কল্পনাই করা যেতে পারে না। তাহলে এ ক্ষেত্রে অন্য কোন মানুষের পক্ষে তার নিজের আমলকে বড় মনে করার অবকাশ কোথায়? আল্লাহর যে অধিকার তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা সে আদায় করে দিয়েছে এ

অহংকারে মত্ত হওয়ার কোন সুযোগই কি তার থাকে? কোন সৃষ্টি আল্লাহর হক আদায় করতে সক্ষম হবে, এ ক্ষমতাই তার নেই।

মহান আল্লাহর এ ফরমান মুসলমানদের এ শিক্ষা দিয়ে আসছে যে, নিজের কোন ইবাদাত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও দীনি খেদমতকে বড় জিনিস মনে না করে নিজের সমগ্র প্রাণশক্তি আল্লাহর পথে নিয়োজিত ও ব্যয় করার পরও আল্লাহর হক আদায় হয়নি বলে মনে করা উচিত। এভাবে যখনই তারা কোন বিজয় লাভে সমর্থ হবে তখনই এ বিজয়কে নিজেদের কোন কৃতিত্বের নয় বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহের ফল মনে করবে। এ জন্য গর্ব ও অহংকারে মত্ত না হয়ে নিজেদের রবের সামনে দীনতার সাথে মাথা নত করে হামদ, সানা ও তাসবীহ পড়তে এবং তাওবা ও ইসতিগফার করতে থাকবে।

আল লাহাব

১১১

নামকরণ

প্রথম আয়াতের লাহাব (لَهَبٍ) শব্দকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী হবার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু মক্কী যুগের কোন্ সময় এটি নাযিল হয়েছিল তা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে আবু লাহাবের যে ভূমিকা এখানে দেখা গেছে তা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এ সূরাটি এমন যুগে নাযিল হয়ে থাকবে যখন রসূলের (সা) সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে সে সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল এবং তার দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি ইসলামের অগ্রগতির পথে একটি বড় বাধার সৃষ্টি করেছিল। সম্ভবত কুরাইশরা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশের লোকদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে তাদের শে'বে আবু তালেবে (আবু তালেব গিরিপথ) অন্তরীণ করেছিল এবং একমাত্র আবু লাহাবই তার বংশের লোকদেরকে পরিত্যাগ করে শত্রুদের সাথে অবস্থান করছিল, তখনই এ সূরাটি নাযিল হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের এ অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে, আবু লাহাব ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। আর ভাতিজার মুখে চাচার প্রকাশ্য নিন্দাবাদ ততক্ষণ সংগত হতে পারতো না যতক্ষণ চাচার সীমা অতিক্রমকারী অন্যায়, জুলম ও বাড়াবাড়ি উন্মুক্তভাবে সবার সামনে না এসে গিয়ে থাকে। এর আগে যদি শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল করা হতো তাহলে লোকেরা নৈতিক দিক দিয়ে একে ত্রুটিপূর্ণ মনে করতো। কারণ ভাতিজার পক্ষে এভাবে চাচার নিন্দা করা শোভা পায় না।

পটভূমি

কুরআনে মাত্র এ একটি জায়গাতেই ইসলামের শত্রুদের কারো নাম নিয়ে তার নিন্দা করা হয়েছে। অথচ মক্কায় এবং হিজরাতের পরে মদীনায়ও এমন অনেক লোক ছিল যারা ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতার ক্ষেত্রে আবু লাহাবের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যক্তিটির এমনকি বিশেষত্ব ছিল যে কারণে তার নাম নিয়ে নিন্দা করা হয়েছে? একথা বুঝার জন্য সমকালীন আরবের সামাজিক অবস্থা অনুধাবন এবং সেখানে আবু লাহাবের ভূমিকা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাচীন যুগে যেহেতু সারা আরব দেশের সব জায়গায় অশান্তি, বিশৃংখলা, লুটতরাজ ও রাজনৈতিক অরাজকতা বিরাজ করছিল এবং শত শত বছর থেকে এমন অবস্থা চলছিল যার ফলে কোন ব্যক্তির জন্য তার নিজের বংশ ও রক্তসম্পর্কের আত্মীয়–পরিজনের সহায়তা ছাড়া নিজের ধন–প্রাণ ও ইজ্জত–আবরুর হেফাজত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। এ জন্য আরবীয় সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে আত্মীয়–স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে মহাপাপ মনে করা হতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এলেন তখন আরবের এ প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাবে কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য পরিবার ও তাদের সরদাররা তাঁর কঠোর বিরোধিতা করলেও বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব (হাশেমের ভাই মুত্তালিবের সন্তানরা) কেবল তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেনি বরং প্রকাশ্যে তাঁকে সমর্থন দিয়ে এসেছে। অথচ তাদের অধিকাংশই তাঁর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনেনি। কুরাইশের অন্যান্য পরিবারের লোকেরাও রসূলুল্লাহর (সা) রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়–স্বজনদের এ সমর্থন–সহযোগিতাকে আরবের নৈতিক ঐতিহ্যের যথার্থ অনুসারী মনে করতো। তাই তারা কখনো বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে এই বলে ধিক্কার দেয়নি যে, তোমরা একটি ভিন্ন ধর্মের আহবায়কের প্রতি সমর্থন দিয়ে নিজেদের পৈতৃক ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছো। তারা একথা জানতো এবং স্বীকারও করতো যে, নিজেদের পরিবারের একজন সদস্যকে তারা কোনক্রমেই শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে না। কুরাইশ তথা সমগ্র আরবের অধিবাসীরাই নিজেদের আত্মীয়ের সাথে সহযোগিতা করাকে একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে করতো।

জাহেলী যুগেও আরবের লোকেরা এ নৈতিক আদর্শকে অত্যন্ত মর্যাদার চোখে দেখতো। অথচ শুধু মাত্র একজন লোক ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতায় অন্ধ হয়ে এ আদর্শ ও মূলনীতি লংঘন করে। সে ছিল আবু লাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। রসূলের (সা) পিতা এবং এ আবু লাহাব ছিল একই পিতার সন্তান। আরবে চাচাকে বাপের মতই মনে করা হতো। বিশেষ করে যখন ভাতিজার বাপের ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল তখন আরবীয় সমাজের রীতি অনুযায়ী চাচার কাছে আশা করা হয়েছিল, সে ভাতিজাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসবে। কিন্তু এ ব্যক্তি ইসলাম বৈরিতা ও কুফরী প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে এ সমস্ত আরবীয় ঐতিহ্যকে পদদলিত করেছিল।

মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বসাধারণের কাছে দাওয়াত পেশ করার হুকুম দেয়া হলো এবং কুরআন মজীদে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হলো ঃ "সবার আগে আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখান।" এ নির্দেশ পাওয়ার পর সকাল বেলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠে বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করে বললেন يا صباحاه (হায়, সকাল বেলার বিপদ!) আরবে এ ধরনের আওয়াজ এমন এক ব্যক্তি দিয়ে থাকে যে ভোর বেলার আলো আঁধারীর মধ্যে কোন শত্রুদলকে নিজেদের গোত্রের ওপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতে দেখে থাকে। রসূলুল্লাহর (সা) এ আওয়াজ শুনে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কে আওয়াজ দিচ্ছে?

বলা হলো মুহাম্মাদ (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আওয়াজ দিচ্ছেন। একথা শুনে কুরাইশদের সমস্ত পরিবারের লোকেরা দৌড়ে গেলো তাঁর দিকে। যে নিজে আসতে পারতো সে নিজে এসে গেলো এবং যে নিজে আসতে পারতো না সে তার একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। সবাই পৌঁছে গেলে তিনি কুরাইশের প্রত্যেকটি পরিবারের নাম নিয়ে ডেকে ডেকে বললেন ঃ হে বনী হাশেম! হে বনী আবদুল মুত্তালিব! হে বনী ফেহর! হে বনী উমুক! হে বনী উমুক! যদি আমি তোমাদের একথা বলি, এ পাহাড়ের পেছনে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য, তাহলে আমার কথা কি তোমরা সত্য বলে মেনে নেবে? লোকেরা জবাব দিল, হ্যাঁ, আমরা কখনো আপনার মুখে মিথ্যা কথা শুনিনি। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, আগামীতে কঠিন আযাব আসছে। একথায় অন্যকেউ বলার আগে তাঁর নিজের চাচা আবু লাহাব বললো ঃ تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا "তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি এ জন্য আমাদের ডেকেছিলে?" অন্য একটি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে, সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ছুঁড়ে মারার জন্য একটি পাথর উঠিয়েছিল। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে জারীর ইত্যাদি)।

ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ আবু লাহাব একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, যদি আমি তোমার দীন গ্রহণ করি তাহলে এর বদলে আমি কি পাবো? তিনি জবাব দিলেন, অন্যান্য ঈমানদাররা যা পাবে আপনিও তাই পাবেন। আবু লাহাব বললো ঃ আমার জন্য কিছু বাড়তি মর্যাদা নেই? জবাব দিলেন ঃ আপনি আর কি চান? একথায় সে বললো ঃ تَبًّا لِهٰذَا الدِّيْنِ تَبًّا اَنْ اَكُوْنَ وَهٰؤُلَاءِ سَوَاءً "সর্বনাশ হোক এ দীনের যেখানে আমি ও অন্যান্য লোকেরা একই পর্যায়ভুক্ত হবে।" (ইবনে জারীর)

মক্কায় আবু লাহাব ছিল রসূলুল্লাহর (সা) নিকটতম প্রতিবেশী। উভয়ের ঘরের মাঝখানে ছিল একটি প্রাচীর। এ ছাড়াও হাকাম ইবনে আস (মারওয়ানের বাপ), উকবা ইবনে আবু মুঈত, আদী ইবনে হামরা ও ইবনুল আসদায়েল হুযালীও তাঁর প্রতিবেশী ছিল। এরা বাড়িতেও রসূলুল্লাহকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিত না। তিনি যখন নামায পড়তেন, এরা তখন ওপর থেকে ছাগলের নাড়িভূড়ি তাঁর গায়ে নিক্ষেপ করতো। কখনো তাঁর বাড়ির আঙিনায় রান্নাবান্না হতো এরা হাঁড়ির মধ্যে ময়লা ছুঁড়ে দিতো। রসূলুল্লাহ (সা) বাইরে এসে তাদেরকে বলতেন, "হে বনী আবদে মান্নাফ! এ কেমন প্রতিবেশীসূলভ আচরণ?" আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (আবু সুফিয়ানের বোন) প্রতি রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজার সামনে কাঁটাগাছের ডাল পালা ছড়িয়ে রেখে দিতো। এটা ছিল তার প্রতিদিনের স্থায়ী আচরণ। যাতে রসূলুল্লাহ (সা) বা তাঁর শিশু সন্তানরা বাইরে বের হলে তাদের পায়ে কাঁটা বিঁধে যায়। (বায়হাকী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, ইবনে আসাকির ও ইবনে হিশাম)।

নবুওয়াত লাভের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই মেয়েকে আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতাইবার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের পরে যখন তিনি ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন আবু লাহাব তার দুই

ছেলেকে বলে, তোমরা মুহাম্মাদের (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েদের তালাক না দিলে আমার পক্ষে তোমাদের সাথে দেখা–সাক্ষাত হারাম হয়ে যাবে। কাজেই দু'জনেই তাদের স্ত্রীদের তালাক দেয়। উতাইবা জাহেলিয়াতের মধ্যে খুব বেশী অগ্রসর হয়ে যায়। সে একদিন রসূলুল্লাহর (সা) সামনে এসে বলে ঃ আমি وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ এবং الَّذِي دَنَا فَتَدَلَّىٰ অস্বীকার করছি। একথা বলে তাঁর দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। থুথু তাঁর গায়ে লাগেনি। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার কুকুরদের মধ্য থেকে একটি কুকুর এর ওপর চাপিয়ে দাও। এরপর উতাইবা তার বাপের সাথে সিরিয়া সফরে রওয়ানা হয়। সফরকালে রাতে তাদের কাফেলা এক জায়গায় অবস্থান করে। স্থানীয় লোকেরা জানায়, সেখানে রাতে হিংস্র জানোয়ারদের আনাগোনা হয়। আবু লাহাব তার কুরাইশী সাথীদের বলে, আমার ছেলের হেফাজতের ভালো ব্যবস্থা করো। কারণ আমি মুহাম্মাদের (সা) বদ দোয়ার ভয় করছি। একথায় কাফেলার লোকেরা উতাইবার চারদিকে নিজেদের উটগুলোকে বসিয়ে দেয় এবং তারা নিজেরা ঘুমিয়ে পড়ে। গভীর রাতে একটি বাঘ আসে। উটদের বেষ্টনী ভেদ করে সে উতাইবাকে ধরে এবং সেখানেই তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে খেয়ে ফেলে (আল ইসতিআব লি ইবনে আবদিল বার, আল ইসাবা লি ইবনে হাজার, দালায়েলুন নুবুওয়া লি আবী নাঈম আল ইসফাহানী ও রওদুল উনুফ লিস সুহাইলী)। বর্ণনাগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন বর্ণনাকারী তালাকের ব্যাপারটি নবুওয়াতের ঘোষণার পরের ঘটনা বলেন। আবার কোন কোন বর্ণনাকারীর মতে "তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব" এর নাযিলের পরই তালাকের ঘটনাটি ঘটে। আবার আবু লাহাবের এ তালাক দানকারী ছেলেটি উতবা ছিল না উতাইবা—এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর উতবা ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন, একথা প্রমাণিত সত্য। তাই আবু লাহাবের এ তালাকদানকারী ছেলেটি যে উতাইবা ছিল, এতে সন্দেহ নেই।

সে যে কেমন জঘন্য মানসিকতার অধিকারী ছিল তার পরিচয় একটি ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেলে হযরত আবুল কাসেমের ইন্তিকালের পর তাঁর দ্বিতীয় ছেলে হযরত আবদুল্লাহরও ইন্তিকাল হয়। এ অবস্থায় আবু লাহাব তার ভাতিজার শোকে শরীক না হয়ে বরং আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৌঁড়ে কুরাইশ সরদারদের কাছে পৌঁছে যায়। সে তাদেরকে জানায় ঃ শোনো, আজ মুহাম্মাদের (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম নিশানা মুছে গেছে। তার এ ধরনের আচরণের কথা আমরা ইতিপূর্বে সূরা কাউসারের ব্যাখায় উল্লেখ করে এসেছি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে যেখানে ইসলামের দাওয়াত দিতে যেতেন আবু লাহাবও তাঁর পেছনে পেছনে সেখানে গিয়ে পৌঁছতো এবং লোকদের তাঁর কথা শুনার কাজে বাধা দিতো। রাবী'আহ ইবনে আব্বাদ আদদীলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি একদিন আমার আব্বার সাথে যুল–মাজাযের বাজারে যাই। তখন আমার বয়স ছিল কম। সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখি। তিনি বলছিলেন ঃ "হে লোকেরা! বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। একথা বললেই তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে।" এ সময় তাঁর পেছনে পেছনে এক ব্যক্তি বলে চলছিল, "এ ব্যক্তি মিথ্যুক, নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।" আমি জিজ্ঞেস করি, এ লোকটি কে? লোকেরা

বললো, ওঁর চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ ও বায়হাকী) এ একই বর্ণনাকারী হযরত রাবীআহ (রা) থেকে আর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। তিনি প্রত্যেকটি গোত্রের শিবিরে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ "হে বনী অমুক! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল। তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করো না। তোমরা আমাকে সত্য নবী বলে মেনে নাও এবং আমার সাথে সহযোগিতা করো। এভাবে আল্লাহ আমাকে যে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন তা আমি পূর্ণ করতে পারবো।" তাঁর পিছে পিছে আর একটি লোক আসছিল এবং সে বলছিল ঃ "হে বনী অমুক! এ ব্যক্তি নিজে যে নতুন ধর্ম ও ভ্রষ্টতা নিয়ে এসেছে লাত ও উযযার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তোমাদের সেদিকে নিয়ে যেতে চায়। এর কথা একদম মেনো না এবং এর পেছনেও চলো না।" আমি আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ লোকটি কে? তিনি বললেন ঃ এ লোকটি ওঁরই চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী) তারেক ইবনে আবদুল্লাহ আল মাহারেবীর (রা) রেওয়ায়াতও প্রায় এ একই ধরনের। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ যুল মাজাযের বাজারে দেখলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বলে যাচ্ছেন, "হে লোকেরা! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তাহলে সফলকাম হয়ে যাবে।" ওদিকে তাঁর পিছে পিছে একজন লোক তাঁকে পাথর মেরে চলছে। এভাবে তাঁর পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি বলে চলেছে, " এ মিথ্যুক, এর কথা শুনো না।" আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বললো ঃ ওঁরই চাচা আবু লাহাব। (তিরমিযী)

নবুওয়াতের সপ্তম বছরে কুরাইশদের সমস্ত পরিবার মিলে যখন বনি হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট করলো এবং এ পরিবার দু'টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থনে অবিচল থেকে আবু তালেব গিরিপথে অন্তরীণ হয়ে গেলো তখন একমাত্র আবু লাহাবই নিজের পরিবার ও বংশের সহগামী না হয়ে কুরাইশ কাফেরদের সহযোগী হলো। এ বয়কট তিন বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে অনেক সময় অনাহারে থাকতে হয়েছে। কিন্তু আবু লাহাবের ভূমিকা ছিল মারমুখী। বাইর থেকে মক্কায় কোন বাণিজ্য কাফেলা এলে আবু তালেব গিরিপথে অন্তরীণদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনতে যেতো। আবু লাহাব তখন চিৎকার করে বণিকদেরকে বলতো ঃ ওদের কাছে এতো বেশী দাম চাও যাতে ওরা কিনতে না পারে। এ জন্য তোমাদের যত টাকা ক্ষতি হয় তা আমি দেবো। কাজেই তারা বিরাট দাম হাঁকতো। ক্রেতা মহাসংকটে পড়তো। শেষে নিজের অনাহারের কষ্ট বুকে পুষে রেখে খালি হাতে পাহাড়ে ফিরে যেতে হতো ক্ষুধা কাতর সন্তানদের কাছে। তারপর আবু লাহাব সেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেই পণ্যগুলোই বাজার দরে কিনে নিতো। (ইবনে সা'দ ও ইবনে হিশাম)

এই সূরায় যে ব্যক্তিটির নাম নিয়ে নিন্দা করা হয়েছে এগুলো ছিল তারই কর্মকাণ্ড। বিশেষ করে এর প্রয়োজন এ জন্য দেখা দিয়েছিল যে, মক্কার বাইরের আরবের যেসব লোকেরা হজ্জের জন্য আসতো অথবা বিভিন্ন স্থানে যেসব বাজার বসতো সেখানে যারা জমায়েত হতো, তাদের সামনে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের

চাচা তাঁর পিছনে ঘুরে ঘরে তাঁর বিরোধিতা করতো তখন বাইরের লোকদের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়তো। কারণ আরবের প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে কোন চাচা বিনা কারণে অন্যদের সামনে তার নিজের ভাতিজাকে গালিগালাজ করবে, তার গায়ে পাথর মারবে এবং তার প্রতি দোষারোপ করবে এটা কল্পনাতীত ছিল। তাই তারা আবু লাহাবের কথায় প্রভাবিত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যেতো। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হবার পর যখন আবু লাহাব রাগে অন্ধ হয়ে আবোলতাবোল বকতে লাগলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতার ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সে নিজের ভাতিজার শত্রুতায় অন্ধ হয়ে গেছে।

তাছাড়া নাম নিয়ে নিজের চাচার নিন্দা করার পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের ব্যাপারে কারো মুখ চেয়ে কোন প্রকার সমঝোতা বা নরম নীতি অবলম্বন করবেন, এ আশা চিরতরে নির্মূল হয়ে গেলো। যখন প্রকাশ্যে ঘোষণার মাধ্যমে রসূলের চাচার নিন্দা করা হলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো, এখানে কোন কিছু রেখে ঢেকে করার অবকাশ নেই। এখানে ঈমান আনলে পরও আপন হয়ে যায় এবং ইসলামের বিরোধিতা ও কুফরী করলে আপনও হয়ে যায় পর। এ ব্যাপারে অমুকের ছেলে, অমুকের ভাই বা অমুকের বাপের কোন গুরুত্ব নেই।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ⦾۱ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ⦾۲
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ⦾۳ وَّامْرَاَتُهٗ ۖ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ⦾۴ فِىْ
جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ⦾۵

ভেঙে গেছে আবু লাহাবের হাত এবং ব্যর্থ হয়েছে সে।[১] তার ধন-সম্পদ এবং যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজে লাগেনি।[২] অবশ্যই সে লেলিহান আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এবং (তার সাথে) তার স্ত্রীও,[৩] লাগানো ভাঙানো চোগলখুরী করে বেড়ানো যার কাজ,[৪] তার গলায় থাকবে খেজুর ডালের আঁশের পাকানো শক্ত রশি।[৫]

১. আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল উয্যা। তাকে আবু লাহাব বলে ডাকার কারণ, তার গায়ের রং ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল সাদা লালে মেশানো। লাহাব বলা হয় আগুনের শিখাকে। কাজেই আবু লাহাবের মানে হচ্ছে আগুন বরণ মুখ। এখানে তার আসল নামের পরিবর্তে ডাক নামে উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, মূল নামের পরিবর্তে ডাকনামেই সে বেশী পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ, তার আবদুল উয্যা (অর্থাৎ উয্যার দাস) নামটি ছিল একটি মুশরিকী নাম। কুরআনে তাকে এ নামে উল্লেখ করা পছন্দ করা হয়নি। তৃতীয় কারণ, এ সূরায় তার যে পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে তার এ ডাকনামই বেশী সম্পর্কিত।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ -এর অর্থ কোন কোন তাফসীরকার করেছেন, "ভেঙে যাক আবু লাহাবের হাত" এবং وَتَبَّ শব্দের মানে করেছেন, "সে ধ্বংস হয়ে যাক" অথবা "সে ধ্বংস হয়ে গেছে।" কিন্তু আসলে এটা তার প্রতি কোন ধিক্কার নয়। বরং এটা একটা ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে ভবিষ্যতে যে ঘটনাটি ঘটবে তাকে অতীত কালের অর্থ প্রকাশক শব্দের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মানে, তার হওয়াটা যেন এত বেশী নিশ্চিত যেমন তা হয়ে গেছে। আর আসলে শেষ পর্যন্ত তাই হলো যা এ সূরায় কয়েক বছর আগে বর্ণনা করা হয়েছিল। হাত ভেঙে যাওয়ার মানে শরীরের একটি অংশ যে হাত সেটি ভেঙে যাওয়া নয়। বরং কোন ব্যক্তি যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে

তাতে পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়াই এখানে বুঝানো হয়েছে। আর আবু লাহাব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যথার্থই নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। কিন্তু এ সূরাটি নাযিল হবার মাত্র সাত আট বছর পরেই বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশদের অধিকাংশ বড় বড় সরদার নিহত হয়। তারা সবাই ইসলাম বিরোধিতা ও ইসলামের প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে আবু লাহাবের সহযোগী ছিল। এ পরাজয়ের খবর মক্কায় পৌঁছার পর সে এত বেশী মর্মাহত হয় যে, এরপর সে সাত দিনের বেশী জীবিত থাকতে পারেনি। তারপর তার মৃত্যুও ছিল বড়ই ভয়াবহ ও শিক্ষাপ্রদ। তার শরীরে সাংঘাতিক ধরনের ফুসকুড়ি (Malignant Pustule) দেখা দেয়। রোগ সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। মরার পরও তিন দিন পর্যন্ত তার ধারেকাছে কেউ ঘেঁসেনি। ফলে তার লাশে পচন ধরে। চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। শেষে লোকেরা তার ছেলেদেরকে ধিক্কার দিতে থাকে। একটি বর্ণনা অনুসারে তখন তারা মজুরীর বিনিময়ে তার লাশ দাফন করার জন্য কয়েকজন হাবশীকে নিয়োগ করে এবং তারা তার লাশ দাফন করে। অন্য এক বর্ণনা অনুসারে, তারা গর্ত খুঁড়ে লম্বা লাঠি দিয়ে তার লাশ তার মধ্যে ফেলে দেয় এবং ওপর থেকে তার ওপর মাটি চাপা দেয়। যে দীনের অগ্রগতির পথ রোধ করার জন্য সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সন্তানদের সেই দীন গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তার আরো বেশী ও পূর্ণ পরাজয় সম্পন্ন হয়। সর্বপ্রথম তার মেয়ে দাররা হিজরাত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আর মক্কা বিজয়ের পর তার দুই ছেলে উতবা ও মু'আত্তাব হযরত আব্বাসের (রা) মধ্যস্থতায় রসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে বাইআত করেন।

২. আবু লাহাব ছিল হাড়কৃপণ ও অর্থলোলুপ। ইবনে আসীরের বর্ণনা মতে, জাহেলী যুগে একবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, সে কা'বা শরীফের কোষাগার থেকে দু'টি সোনার হরিণ চুরি করে নিয়েছে। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে সেই হরিণ দু'টি অন্য একজনের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় তবুও তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনার ফলে তার সম্পর্কে মক্কার লোকদের মনোভাব উপলব্ধি করা যায়। তার ধনাঢ্যতা সম্পর্কে কাজী রশীদ ইবনে যুবাইর তাঁর "আযযাখায়ের ওয়াত'তুহাফ" (الذخائر والتحف) গ্রন্থে লিখেছেন : কুরাইশদের মধ্যে যে চারজন লোক এক কিনতার (এক কিনতার= দুশো আওকিয়া আর এক আওকিয়া = সোয়া তিন তোলা কাজেই এক কিনতার সমান ৮০ তোলার সেরের ওজনে ৮ সের ১০ তোলা) সোনার মালিক ছিল আবু লাহাব তাদের একজন। তার অর্থ লোলুপতা কি পরিমাণ ছিল বদর যুদ্ধের সময়ের ঘটনা থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। এ যুদ্ধে তার ধর্মের ভাগ্যের ফায়সালা হতে যাচ্ছিল। কুরাইশদের সব সরদার এ যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য রওয়ানা হয়। কিন্তু আবু লাহাব নিজে না গিয়ে নিজের পক্ষ থেকে আস ইবনে হিশামকে পাঠায়। তাকে বলে দেয়, তার কাছে সে যে চার হাজার দিরহাম পায় এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে এর বদলে তার সেই ঋণ পরিশোধ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। এভাবে সে নিজের ঋণ আদায় করার একটা কৌশল বের করে নেয়। কারণ আস দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। ঋণ পরিশোধের কোন ক্ষমতাই তার ছিল না।

কোন কোন তাফসীরকার مَا كَسَبَ শব্দটিকে উপার্জন অর্থে নিয়েছেন। অর্থাৎ নিজের অর্থ থেকে সে যে মুনাফা অর্জন করেছে তা তার উপার্জন। আবার অন্য কয়েকজন তাফসীরকার এর অর্থ নিয়েছেন সন্তান-সন্ততি। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সন্তানরা মানুষের উপার্জন (আবু দাউদ ও ইবনে আবী হাতেম)। এ দু'টি অর্থই আবু লাহাবের পরিণতির সাথে সম্পর্কিত। কারণ সে মারাত্মক ফুসকুড়ি রোগে আক্রান্ত হলে তার সম্পদ তার কোন কাজে লাগেনি এবং তার সন্তানরাও তাকে অসহায়ভাবে মৃত্যু বরণ করার জন্য ফেলে রেখে দিয়েছিল। তার ছেলেরা তার লাশটি মর্যাদা সহকারে কাঁধে উঠাতেও চাইল না। এভাবে এ সূরায় আবু লাহাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল লোকেরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা সত্য হতে দেখলো।

৩. আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম ছিল "আরদা"। "উম্মে জামীল" ছিল তার ডাক নাম। সে ছিল আবু সুফিয়ানের বোন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে সে তার স্বামী আবু লাহাবের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। হযরত আবু বকরের (রা) মেয়ে হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ এ সূরাটি নাযিল হবার পর উম্মে জামীল যখন এটি শুনলো, সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজে বের হলো। তার হাতের মুঠোয় পাথর ভরা ছিল রসূলুল্লাহকে (সা) গালাগালি করতে করতে নিজের রচিত কিছু কবিতা পড়ে চলছিল। এ অবস্থায় সে কা'বা ঘরে পৌঁছে গেলো। সেখানে রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু বকরের (রা) সাথে বসেছিলেন। হযরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! দেখুন সে আসছে। আমার আশংকা হচ্ছে, সে আপনাকে দেখে কিছু অভদ্র আচরণ করবে। তিনি বললেন, সে আমাকে দেখতে পাবে না। বাস্তবে হলোও তাই। তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও সে তাঁকে দেখতে পেলো না। সে আবু বকরকে (রা) জিজ্ঞেস করলো, শুনলাম তোমার সাথী আমার নিন্দা করেছে। হযরত আবু বকর (রা) জবাব দিলেন ঃ এ ঘরের রবের কসম, তিনি তো তোমার কোন নিন্দা করেননি। একথা শুনে সে ফিরে গেলো—(ইবনে আবী হাতেম, সীরাতে ইবনে হিশাম। বাযযারও প্রায় একই ধরনের একটি রেয়ায়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন)। হযরত আবু বকরের (রা) এ জবাবের অর্থ ছিল, নিন্দা তো আল্লাহ করেছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি।

৪. মূল শব্দ হচ্ছে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, "কাঠ বহনকারিনী।" মুফাস্সিরগণ এর বহু অর্থ বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ইবনে যায়েদ, যাহহাক ও রাবী ইবনে আনাস বলেন ঃ সে রাতের বেলা কাঁটা গাছের ডালপালা এনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজায় ফেলে রাখতো। তাই তাকে কাঠ বহনকরিনী বলা হয়েছে। কাতাদাহ, ইকরামা, হাসান বসরী, মুজাহিদ ও সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ সে লোকদের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চোগলখুরী করে বেড়াতো। তাই আরবী প্রবাদ অনুযায়ী তাকে কাঠ বহনকারিনী বলা হয়েছে। কারণ যারা এর কথা ওর কাছে বলে এবং লাগানো ভাঙানোর কাজ করে ফিতনা-ফাসাদের আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে আরবরা তাদেরকে কাঠ বহনকারিনী বলে থাকে। এ প্রবাদ অনুযায়ী "হাম্মালাতাল হাতাব" শব্দের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে, "যে লাগানো ভাঙানোর কাজ করে।" সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের পিঠে গোনাহের বোঝা বহন করে আরবী

প্রবাদ অনুসারে তার সম্পর্কে বলা হয়, فُلَانٌ يَحْطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ (অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি নিজের পিঠে কাঠ বহন করছে)। কাজেই হাম্মালাতাল হাতাব (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) মানে হচ্ছে, "গোনাহের বোঝা বহনকারিনী।" মুফাস্‌সিরগণ এর আরো একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে, আখেরাতে তার এ অবস্থা হবে। অর্থাৎ সেখানে যে আগুনে আবু লাহাব পুড়তে থাকবে তাতে সে (উম্মে জামীল) কাঠ বহন করে এনে ফেলতে থাকবে।

৫. তার গলার জন্য জীদ (جِيد) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যে গলায় অলংকার পরানো হয়েছে তাকে জীদ বলা হয়। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, হাসান বসরী ও কাতাদা বলেন ঃ সে একটি অতি মূল্যবান হার গলায় পরতো এবং বলতো, লাত ও উয্‌যার কসম, এ হার বিক্রি করে আমি এর মূল্য বাবদ পাওয়া সমস্ত অর্থ মুহাম্মাদের (সা) বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কাজ করার জন্য ব্যয় করবো। এ কারণে জীদ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাঙ্গার্থে। অর্থাৎ এ অলংকার পরিহিত সুসজ্জিত গলায়, যেখানে পরিহিত হার নিয়ে সে গর্ব করে বেড়ায়, কিয়ামতের দিন সেখানে রশি বাঁধা হবে। এটা ঠিক সমপর্যায়েরই ব্যাঙ্গাত্মক বক্তব্য যেমন কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে ঃ بَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ "তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।"

তার গলায় বাঁধা রশিটির জন্য حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সে রশিটি হবে 'মাসাদ" ধরনের। অভিধানবিদ ও মুফাস্‌সিরগণ এ শব্দটির বহু অর্থ বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কিত একটি বক্তব্য হচ্ছে, খুব মজবুত করে পাকানো রশিকে মাসাদ বলা হয়। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, খেজুর গাছের (ডালের) ছাল থেকে তৈরি রশি মাসাদ নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে, এর মানে খেজুরের ডালের গোড়ার দিকের মোটা অংশ থেঁতলে যে সরু আঁশ পাওয়া যায় তা দিয়ে পাকানো রশি অথবা উটের চামড়া বা পশম দিয়ে তৈরি রশি। আর একটি বক্তব্য হচ্ছে, এর অর্থ লোহার তারের পাকানো রশি।

আল ইখলাস

১১২

নামকরণ

ইখলাস শুধু এ সূরাটির নামই নয়, এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ, এখানে খালেস তথা নির্ভেজাল তাওহীদের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরার ক্ষেত্রে সাধারণত সেখানে ব্যবহৃত কোন শব্দের মাধ্যমে তার নামকরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু এ সূরাটিতে ইখলাস শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই এর এ নামকরণ করা হয়েছে এর অর্থের ভিত্তিতে। যে ব্যক্তি এ সূরাটির বক্তব্য অনুধাবন করে এর শিক্ষার প্রতি ঈমান আনবে, সে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করে খালেস তাওহীদের আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করবে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্কী ও মাদানী হবার ব্যাপারে মতভেদ আছে। এ সূরাটি নাযিল হবার কারণ হিসেবে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতেই এ মতভেদ দেখা দিয়েছে। নীচে পর্যায়ক্রমে সেগুলো উল্লেখ করছি ঃ

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশ পরিচয়* আমাদের জানান। একথায় এ সূরাটি নাযিল হয়। (তাবারানী)।

(২) আবুল আলীয়াহ হযরত উবাই ইবনে কাবের (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশ পরিচয় আমাদের জানান। এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, তিরমিযী, বুখারী ফিত তারীখ, ইবনুল মুনযির, হাকেম ও বায়হাকী) এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস আবুল আলীয়ার মাধ্যমে ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে হযরত উবাই ইবনে কা'বের বরাত নেই। ইমাম তিরমিযী একে অপেক্ষাকৃত বেশী নির্ভুল বলেছেন।

* আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোন অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় লাভ করতে হলে তারা বলতো, اِنْسِبْهُ لَنَا (এর বংশধারা আমাদের জানাও) কারণ তাদের কাছে পরিচিতির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হতো বংশধারার। সে কোন্ বংশের লোক? কোন্ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত? একথা জানার প্রয়োজন হতো। কাজেই তারা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর রব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হলো তিনি কে এবং কেমন, তখন তারা তাঁকে একই প্রশ্ন করলো। তারা প্রশ্ন করলো, اِنْسِبْ لَنَا رَبَّكَ অর্থাৎ আপনার রবের নসবনামা (বংশধারা) আমাদের জানান।

(৩) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, এক গ্রামীণ আরব (কোন কোন হাদীস অনুযায়ী লোকেরা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বংশধারা আমাদের জানান। এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন (আবু ইয়ালা, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, তাবারানী ফিল আওসাত, বায়হাকী ও আবু নু'আইম ফিল হিলইয়া)।

(৪) ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন, ইহুদীদের একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়। তাদের মধ্যে ছিল কা'ব ইবনে আশরাফ ও হুই ইবনে আখতাব প্রমুখ লোকেরা। তারা বলে, "হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার যে রব আপনাকে পাঠিয়েছেন তিনি কেমন সে সম্পর্কে আমাদের জানান।" এর জবাবে মহান আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন। (ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আদী, বায়হাকী ফিল আসমায়ে ওয়াস সিফাত)

এ ছাড়াও ইমাম ইবনে তাইমিয়া কয়েকটি হাদীস তাঁর সূরা ইখলাসের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(৫) হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, খয়বারের কয়েকজন ইহুদী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে, "হে আবুল কাসেম! আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নূরের পরদা থেকে, আদমকে পচাগলা মাটির পিণ্ড থেকে, ইবলিসকে আগুনের শিখা থেকে, আসমানকে ধোঁয়া থেকে এবং পৃথিবীকে পানির ফেনা থেকে তৈরি করেছেন। এখন আপনার রব সম্বন্ধে আমাদের জানান (অর্থাৎ তিনি কোন বস্তু থেকে সৃষ্ট?)" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার কোন জবাব দেননি। তারপর জিব্রীল (আ) আসেন। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, "হুওয়াল্লাহু আহাদ" (তিনি আল্লাহ এক ও একক)............

(৬) আমের ইবনুত তোফায়েল রসূলুল্লাহকে (সা) বলে ঃ "হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদের কোন জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছেন? তিনি জবাব দেন, "আল্লাহর দিকে।" আমের বলে ঃ "ভালো, তাহলে তার অবস্থা আমাকে জানান। তিনি সোনার তৈরি, না রূপার অথবা লোহার?" একথার জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়।

(৭) যাহহাক, কাতাদাহ ও মুকাতেল বলেন, ইহুদীদের কিছু আলেম রসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসে। তারা বলে ঃ "হে মুহাম্মাদ! আপনার রবের অবস্থা আমাদের জানান। হয়তো আমরা আপনার ওপর ঈমান আনতে পারবো। আল্লাহ তাঁর গুণাবলী তাওরাতে নাযিল করেছেন। আপনি বলুন, তিনি কোন্ বস্তু দিয়ে তৈরি? কোন গোত্রভুক্ত? সোনা, তামা, পিতল, লোহা, রূপা, কিসের তৈরি? তিনি পানাহার করেন কি না? তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে কার কাছ থেকে পৃথিবীর মালিকানা লাভ করেছেন? এবং তারপর কে এর উত্তরাধিকারী হবে? এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।

(৮) ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নাজরানের খৃষ্টানদের সাতজন পাদরী সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাঁকে বলে ঃ "আমাদের বলুন, আপনার রব কেমন? তিনি কিসের তৈরি?"

তিনি বলেন, "আমার রব কোন জিনিসের তৈরি নন। তিনি সব বস্তু থেকে আলাদা।" এ ব্যাপারে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।

এ সমস্ত হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ (সা) যে মাবুদের ইবাদাত ও বন্দেগী করার প্রতি লোকদের আহবান জানাচ্ছিলেন তার মৌলিক সত্তা ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক প্রশ্ন করেছিল। এ ধরনের প্রশ্ন যখনই এসেছে তখনই তিনি জবাবে আল্লাহর হুকুমে লোকদেরকে এ সূরাটিই পড়ে শুনিয়েছেন। সর্বপ্রথম মক্কায় কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরা তাঁকে এ প্রশ্ন করে। তাদের এ প্রশ্নের জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। এরপর মদীনা তাইয়েবায় কখনো ইহুদী, কখনো খৃষ্টান আবার কখনো আরবের অন্যান্য লোকেরাও রসূলুল্লাহকে (সা) এই ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। প্রত্যেকবারই আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা হয় জবাবে এ সূরাটি তাদের শুনিয়ে দেবার। ওপরে উল্লেখিত হাদীসগুলোর প্রত্যেকটিতে একথা বলা হয় যে, এর জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। এর থেকে এ হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী একথা মনে করার কোন সংগত কারণ নেই। আসলে হচ্ছে কোন বিষয় সম্পর্কে যদি পূর্ব থেকে অবতীর্ণ কোন আয়াত বা সূরা থাকতো তাহলে পরে রসূলুল্লাহর (সা) সামনে যখনই সেই একই বিষয় আবার উথাপিত হতো তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত আসতো, এর জবাব উমুক আয়াত বা সূরায় রয়েছে অথবা এর জবাবে লোকদেরকে উমুক আয়াত বা সূরা পড়ে শুনিয়ে দাও। হাদীসসমূহের রাবীগণ এ জিনিসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, যখন উমুক সমস্যা দেখা দেয় বা উমুক প্রশ্ন উথাপিত হয় তখন এ আয়াত বা সূরাটি নাযিল হয়। একে বারংবার অবতীর্ণ হওয়া অর্থাৎ একটি আয়াত বা সূরার বারবার নাযিল হওয়াও বলা হয়।

কাজেই সঠিক কথা হচ্ছে, এ সূরাটি আসলে মক্কী। বরং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে একে মক্কায় একেবারে প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত করা যায়। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কুরআনের কোন বিস্তারিত আয়াত তখনো পর্যন্ত নাযিল হয়নি। তখনো লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর দিকে দাওয়াতের বার্তা শুনে জানতে চাইতো : তাঁর এ রব কেমন, যাঁর ইবাদাত–বন্দেগী করার দিকে তাদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে। এর একেবারে প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত হবার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে, মক্কায় হযরত বেলালকে (রা) তার প্রভু উমাইয়া ইবনে খালাফ যখন মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার ওপর চিৎ করে শুইয়ে তার বুকের ওপর একটা বড় পাথর চাপিয়ে দিতো তখন তিনি "আহাদ" "আহাদ" বলে চিৎকার করতেন। এ আহাদ শব্দটি এ সূরা ইখলাস থেকেই গৃহীত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ সম্পর্কিত যেসব হাদীস ওপরে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর ওপর এক নজর বুলালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তখন দুনিয়ার মানুষের ধর্মীয় চিন্তা–ভাবনা ও ধ্যান–ধারণা কি ছিল তা জানা যায়। মূর্তি পূজারী মুশরিকরা কাঠ, পাথর, সোনা, রূপা ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের তৈরি খোদার কাল্পনিক মূর্তিসমূহের পূজা করতো। সেই মূর্তিগুলোর আকার, আকৃতি ও

দেহাবয়ব ছিল। এ দেবদেবীদের রীতিমত বংশধারাও ছিল। কোন দেবী এমন ছিল না যার স্বামী ছিল না আবার কোন দেবতা এমন ছিল না যার স্ত্রী ছিল না। তাদের খাবার দাবারেরও প্রয়োজন দেখা দিতো। তাদের পূজারীরা তাদের জন্য এসবের ব্যবস্থা করতো। মুশরিকদের একটি বিরাট দল খোদার মানুষের রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করায় বিশ্বাস করতো এবং তারা মনে করতো কিছু মানুষ খোদার অবতার হয়ে থাকে। খৃষ্টানরা এক খোদায় বিশ্বাসী হবার দাবীদার হলেও তাদের খোদার কমপক্ষে একটি পুত্র তো ছিলই এবং পিতা পুত্রের সাথে খোদায়ী সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে রুহুল কুদুসও (জিব্রীল) অংশীদার ছিলেন। এমন কি খোদার মা–ও ছিল এবং শাশুড়ীও। ইহুদিরাও এক খোদাকে মেনে চলার দাবীদার ছিল কিন্তু তাদের খোদাও বস্তুসত্তা ও মরদেহ এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলীর উর্ধে ছিল না। তাদের এ খোদা টহল দিতো, মানুষের আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করতো। নিজের কোন বান্দার সাথে কুশ্‌তিও লড়তো। তার একটি পুত্রও (উযাইর) ছিল। এ ধর্মীয় দলগুলো ছাড়া আরো ছিল মাজূসী—অগ্নি উপাসক ও সাবী—তারকা পূজারীর দল। এ অবস্থায় যখন লোকদেরকে এক ও লা–শরীক আল্লাহর আনুগত্য করার দাওয়াত দেয়া হয় তখন তাদের মনে এ প্রশ্ন জাগা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যে, সেই রবটি কেমন, সমস্ত রব ও মাবুদদেরকে বাদ দিয়ে যাকে একমাত্র রব ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেবার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে? এটা কুরআনের অলৌকিক প্রকাশভংগীরই কৃতিত্ব। এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে কুরআন মূলত আল্লাহর অস্তিত্বের এমন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা পেশ করে দিয়েছে, যা সব ধরনের মুশরিকী চিন্তা ও ধ্যান–ধারণার মূলোৎপাটন করে এবং আল্লাহর সত্তার সাথে সৃষ্টির গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি গুণকেও সংযুক্ত করার কোন অবকাশই রাখেনি।

শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব

এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এ সূরাটি ছিল বিপুল মহত্বের অধিকারী। বিভিন্নভাবে তিনি মুসলমানদেরকে এ গুরুত্ব অনুভব করাতেন। তারা যাতে এ সূরাটি বেশী করে পড়ে এবং জনগণের মধ্যে একে বেশী করে ছড়িয়ে দেয় এ জন্য ছিল তাঁর এ প্রচেষ্টা। কারণ এখানে ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক আকীদাকে (তাওহীদ) এমন ছোট ছোট চারটি বাক্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যা শুনার সাথে সাথেই মানুষের মনে গেঁথে যায় এবং তারা সহজেই মুখে মুখে সেগুলো আওড়াতে পারে। রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকদের বলেছেন, এ সূরাটি কুরআনের এক–তৃতীয়াংশের সমান—এ মর্মে হাদীসের কিতাবগুলোতে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, তিরমিযী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী ইত্যাদি কিতাবগুলোতে বহু হাদীস আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরাইরা, আবু আইয়ুব আনসারী, আবুদদারদা, মু'আয ইবনে জাবাল, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, উবাই ইবনে কা'ব, কুলসুম বিনতে উকবাহ ইবনে আবী মু'আইত, ইবনে উমর, ইবনে মাস'উদ, কাতাদাহ ইবনুন নু'মান, আনাস ইবনে মালেক ও আবু মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুফাসসিরগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তির বহু

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তবে আমাদের মতে সহজ, সরল ও পরিষ্কার কথা হচ্ছে, কুরআন মজীদ যে দীন ও জীবন ব্যবস্থা পেশ করে তার ভিত্তি রাখা হয়েছে তিনটি বুনিয়াদী আকীদার ওপর। এক, তাওহীদ। দুই, রিসালাত। তিন, আখেরাত। এ সূরাটি যেহেতু নির্ভেজাল তাওহীদ তত্ব বর্ণনা করেছে তাই রসূলুল্লাহ (সা) একে কুরআনের এক–তৃতীয়াংশের সমান গণ্য করেছেন।

হযরত আয়েশার (রা) একটি রেওয়ায়াত বুখারী ও মুসলিম এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবগুলোতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অভিযানে এক সাহাবীকে সরদারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। তিনি সমগ্র সফরকালে প্রত্যেক নামাযে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পড়ে কিরআত শেষ করতেন। এটা যেন তার স্থায়ী রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফিরে আসার পর তার সাথীরা রসূলুল্লাহর (সা) কাছে একথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করো, সে কেন এমনটি করেছিল? তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন ঃ এতে রহমানের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এর পাঠ আমার অত্যন্ত প্রিয়। রসূলুল্লাহ (সা) একথা শুনে লোকদের বলেন ঃ اخبروه ان الله تعالى يحبه "তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন।"

প্রায় এ একই ধরনের ঘটনা বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী কুবার মসজিদে নামায পড়াতেন। তাঁর নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যেক রাকাআতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ পড়তেন। তারপর অন্য কোন সূরা পড়তেন। লোকেরা এ ব্যাপারে আপত্তি উঠায়। তারা বলেন, তুমি এ কেমন কাজ করছো, প্রথমে قُلْ هُوَ اللَّهُ পড়ো তারপর তাকে যথেষ্ট মনে না করে আবার তার সাথে আর একটি সূরা পড়ো? এটা ঠিক নয়। শুধুমাত্র "কুল হুওয়াল্লাহ" পড়ো অথবা একে বাদ দিয়ে অন্য একটি সূরা পড়ো। তিনি জবাব দেন, আমি এটা ছাড়তে পারবো না। তোমরা চাইলে আমি তোমাদের নামায পড়াবো অথবা ইমামতি ছেড়ে দেবো। কিন্তু লোকেরা তাঁর জায়গায় আর কাউকে ইমাম বানানোও পছন্দ করতো না। অবশেষে ব্যাপারটি রসূলুল্লাহর (সা) সামনে আসে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথীরা যা চায় তা করতে তোমার বাধা কোথায়? কোন্ জিনিসটি তোমাকে প্রত্যেক রাকআতে এ সূরাটি পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বলেন ঃ এ সূরাটিকে আমি খুব ভালোবাসি। রসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন ঃ حُبُّكَ اِيَّاهَا اَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ "এ সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।"

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

বলো,[১] তিনি আল্লাহ,[২] একক।[৩] আল্লাহ কারোর ওপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল।[৪] তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন।[৫] এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।[৬]

১. এখানে 'বলো' শব্দের মাধ্যমে প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তাঁকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার রব কে? তিনি কেমন? আবার তাঁকেই হুকুম দেয়া হয়েছিল, প্রশ্নের জবাবে আপনি একথা বলুন। কিন্তু রসূলের (সা) তিরোধানের পর এ সম্বোধনটি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। রসূলুল্লাহকে (সা) যে কথা বলার হুকুম দেয়া হয়েছিল এখন সে কথা তাকেই বলতে হবে।

২. অর্থাৎ আমার যে রবের সাথে তোমরা পরিচিত হতে চাও তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। এটি প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের সামনে আমি কোন নতুন রব নিয়ে আসিনি। অন্যসব মাবুদদের ইবাদাত ত্যাগ করে কোন নতুন মাবুদের ইবাদাত করতে আমি তোমাদের বলিনি। বরং আল্লাহ নামে যে সত্তার সাথে তোমরা পরিচিত তিনি সেই সত্তা। আরবদের জন্য 'আল্লাহ' শব্দটি কোন নতুন ও অপরিচিত শব্দ ছিল না। প্রাচীনতম কাল থেকে বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার প্রতিশব্দ হিসেবে তারা আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করে আসছিল। নিজেদের অন্য কোন মাবুদ ও উপাস্য দেবতার সাথে এ শব্দটি সংশ্লিষ্ট করতো না। অন্য মাবুদদের জন্য তারা "ইলাহ" শব্দ ব্যবহার করতো। তারপর আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যে আকীদা ছিল তার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছিল আবরাহার মক্কা আক্রমণের সময়। সে সময় কা'বাঘরে ৩৬০টি উপাস্যের মূর্তি ছিল। কিন্তু এ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য মুশরিকরা তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল। অর্থাৎ তারা নিজেরা ভালোভাবে জানতো, এ সংকটকালে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্তাই তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। কা'বাঘরকেও তারা এসব ইলাহের সাথে সম্পর্কিত করে বায়তুল আ-লিহাহ (ইলাহ-এর বহুবচন) বলতো না বরং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে একে বলতো বায়তুল্লাহ। আল্লাহ সম্পর্কে আরবের মুশরিকদের আকীদা কি ছিল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তা বলা হয়েছে। যেমন ঃ সূরা

যুখরুফে বলা হয়েছে ঃ "যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তাদেরে পয়দা করেছে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" (৮৭ আয়াত)

সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে ঃ "যদি তুমি এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশসমূহ ও যমীনকে কে পয়দা করেছে এবং চাঁদ ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা বলবে আল্লাহ।......আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলেন এবং কার সাহায্যে মৃত পতিত জমিকে সঞ্জীবতা দান করলেন, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আল্লাহ।" (৬১–৬৩ আয়াত)।

সূরা মু'মিনূনে বলা হয়েছে ঃ "এদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জানো, এ যমীন এবং এর সমস্ত জনবসতি কার? এরা অবশ্যি বলবে আল্লাহর।......এদেরকে জিজ্ঞেস করো, সাত আকাশ ও মহাআরশের মালিক কে? এরা অবশ্যি বলবে, আল্লাহ।....... এদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জেনে থাকো প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর কার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত? আর কে আশ্রয় দান করেন এবং কার মোকাবিলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারেন না? এরা নিশ্চয়ই বলবে, এ ব্যাপারটি তো একমাত্র আল্লাহরই জন্য।" (৮৪–৮৯ আয়াত)

সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে ঃ "এদেরকে জিজ্ঞেস করো কে তোমাদের আকাশ ও যমীন থেকে রিযিক দেন? তোমরা যে শ্রবণ ও দৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হয়েছো এগুলো কার ইখতিয়ারভুক্ত? আর কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? এবং কে এ বিশ্বব্যবস্থাপনা চালাচ্ছেন? এরা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ।" (৩১ আয়াত)।

অনুরূপভাবে সূরা ইউনুসের আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "যখন তোমরা জাহাজে আরোহণ করে অনুকূল বাতাসে আনন্দ চিত্তে সফর করতে থাকো আর তারপর হঠাৎ প্রতিকূল বাতাসের বেগ বেড়ে যায়, চারদিক থেকে তরংগ আঘাত করতে থাকে এবং মুসাফিররা মনে করতে থাকে, তারা চারদিক থেকে ঝনঝা পরিবৃত হয়ে পড়েছে, তখন সবাই নিজের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নিয়ে তাঁরই কাছে দোয়া করতে থাকো এই বলে ঃ "হে আল্লাহ যদি তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হবো। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে দেন তখন এই লোকেরাই সত্যচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।"

সূরা বনী ইসরাঈলে একথাটিরই পুনরাবৃত্তি এভাবে করা হয়েছে ঃ "যখন সমুদ্রে তোমাদের ওপর বিপদ আসে তখন সেই একজন ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা সবাই হারিয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি তোমাদের বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে দেন তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।" (৬৭ আয়াত)।

.. এ আয়াতগুলো সামনে রেখে চিন্তা করুন, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার সেই রব কে এবং কেমন, যার ইবাদাত বন্দেগী করার জন্য আপনি আমাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন? তিনি এর জবাবে বললেন ঃ هُوَ اللّٰهُ তিনি আল্লাহ। এ জবাব থেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়, যাকে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ও সারা বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা, প্রভু, আহারদাতা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক বলে মানো এবং কঠিন সংকটময় মুহূর্তে অন্য সব মাবুদদের পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য করার

আবেদন জানাও, তিনিই আমার রব এবং তাঁরই ইবাদাত করার দিকে আমি তোমাদের আহবান জানাচ্ছি। এ জবাবের মধ্যে আল্লাহর সমস্ত পূর্ণাংগ গুণাবলী আপনা আপনি এসে পড়ে। কারণ যিনি এ বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা, যিনি এর বিভিন্ন বিষয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করেন, যিনি এর মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণীর আহার যোগান এবং বিপদের সময় নিজের বান্দাদের সাহায্য করেন তিনি জীবিত নন, শুনতে ও দেখতে পান না, স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন, সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী নন, করুণাময় ও স্নেহশীল নন এবং সবার ওপর প্রাধান্য বিস্তারকারী নন, একথা আদতে কল্পনাই করা যায় না।

৩. ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে উলামায়ে কেরাম هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ বাক্যটির বিভিন্ন বিশ্লেষণ দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে যে বিশ্লেষণটি এখানকার সাথে পুরোপুরি খাপ খায় সেটি হচ্ছে ঃ هُوَ উদ্দেশ্য (Subject) اَللّٰهُ তার বিধেয় (Predicate) এবং اَحَدٌ তার দ্বিতীয় বিধেয়। এ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, তিনি (যাঁর সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন করছো) আল্লাহ, একক। অন্য অর্থ এও হতে পারে এবং ভাষারীতির দিক দিয়ে এটা ভুলও নয় যে, তিনি আল্লাহ এক।

এখানে সর্বপ্রথম একথাটি বুঝে নিতে হবে যে, এ বাক্যটিতে মহান আল্লাহর জন্য "আহাদ" শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা আরবী ভাষায় এ শব্দটির একটি অস্বাভাবিক ব্যবহার। সাধারণত অন্য একটি শব্দের সাথে সম্বন্ধের ভিত্তিতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যেমন ঃ يَوْمُ الْاَحَدِ "সপ্তাহের প্রথম দিন।" অনুরূপভাবে فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ "তোমাদের কোন একজনকে পাঠাও।" অথবা সাধারণ নেতিবাচক অর্থে এর ব্যবহার হয়। যেমন ঃ مَاجَاءَنِىْ اَحَدٌ "আমার কাছে কেউ আসেনি।" কিংবা ব্যাপকতার ধারণাসহ প্রশ্ন সূচক বাক্যে বলা হয়। যেমন ঃ هَلْ عِنْدَكَ اَحَدٌ "তোমার কাছে কি কেউ আছে?" অথবা এ ব্যাপকতার ধারণাসহ শর্ত প্রকাশক বাক্যে এর ব্যবহার হয় যেমন ঃ اِنْ جَاءَكَ اَحَدٌ "যদি তোমার কাছে কেউ এসে থাকে।" অথবা গণনায় বলা হয়। যেমন ঃ اَحَدٌ ، اِثْنَانِ ، اَحَدَ عَشَرَ "এক, দুই, এগার।" এ সীমিত ব্যবহারগুলো ছাড়া কুরআন নাযিলের পূর্বে আরবী ভাষায় اَحَدٌ (আহাদ) শব্দটির গুণবাচক অর্থে ব্যবহার অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা জিনিসের গুণ প্রকাশ অর্থে "আহাদ" শব্দের ব্যবহারের কোন নজির নেই। আর কুরআন নাযিলের পর এ শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অস্বাভাবিক বর্ণনা পদ্ধতি স্বতস্ফূর্তভাবে একথা প্রকাশ করে যে, একক ও অদ্বিতীয় হওয়া আল্লাহর বিশেষ গুণ। বিশ্ব-জাহানের কোন কিছুই এ গুণে গুণান্বিত নয়। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই।

তারপর মুশরিক ও কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর রব সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেছিল সেগুলো সামনে রেখে দেখুন, هُوَ اللّٰهُ বলার পর اَحَدٌ বলে কিভাবে তার জবাব দেয়া হয়েছে ঃ

প্রথমত, এর মানে হচ্ছে, তিনি একাই রব। তাঁর 'রবুবিয়াতে' কারো কোন অংশ নেই। আর যেহেতু ইলাহ (মাবুদ) একমাত্র তিনিই হতে পারেন যিনি রব (মালিক ও প্রতিপালক) হন, তাই 'উলুহীয়াতে'ও (মাবুদ হবার গুণাবলী) কেউ তাঁর সাথে শরীক নেই।

দ্বিতীয়ত, এর মানে এও হয় যে, তিনি একাই এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা। এ সৃষ্টিকর্মে কেউ তাঁর সাথে শরীক নয়। তিনি একাই সমগ্র বিশ্ব–রাজ্যের মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি একাই বিশ্ব–ব্যবস্থার পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। নিজের সমগ্র সৃষ্টিজগতের রিযিক তিনি একাই দান করেন। সংকটকালে তিনি একাই তাদের সাহায্য করেন ও ফরিয়াদ শোনেন। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের এসব কাজকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর কাজ বলে মনে করো, এসব কাজে আর কারো সামান্যতম কোন অংশও নেই।

তৃতীয়ত, তারা একথাও জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি কিসের তৈরি? তাঁর বংশধারা কি? তিনি কোন প্রজাতির অন্তরভুক্ত? দুনিয়ার উত্তরাধিকার তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন? এবং তাঁর পর কে এর উত্তরাধিকারী হবে? আল্লাহ তাদের এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব একটিমাত্র "আহাদ" শব্দের মাধ্যমে দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে : (১) তিনি এক আল্লাহ চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর আগে কেউ আল্লাহ ছিল না এবং তাঁর পরেও কেউ আল্লাহ হবে না। (২) আল্লাহর এমন কোন প্রজাতি নেই, যার সদস্য তিনি হতে পারেন। বরং তিনি একাই আল্লাহ এবং তাঁর সমগোত্রীয় ও সমজাতীয় কেউ নেই। (৩) তাঁর সত্তা নিছক واحد এক নয় বরং احد একক, যেখানে কোন দিক দিয়ে একাধিক্যের সামান্যতম স্পর্শও নেই। তিনি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত কোন সত্তা নন। তাঁর সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করা যেতে পারে না। তার কোন আকার ও রূপ নেই। তা কোন স্থানের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয় এবং তার মধ্যে কোন জিনিস আবদ্ধ হতে পারে না। তাঁর কোন বর্ণ নেই। কোন অংগ–প্রত্যংগ নেই। কোন দিক নেই। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন–বিবর্তন ঘটে না। সকল প্রকার ধরন ও প্রকরণ মুক্ত ও বিবর্জিত তিনি একমাত্র সত্তা, যা সবদিক দিয়েই আহাদ বা একক। (এ পর্যায়ে একথাটি ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যে, আরবী ভাষায় "ওয়াহেদ" শব্দটিকে ঠিক তেমনিভাবে ব্যবহার করা হয় যেমনভাবে আমাদের ভাষায় আমরা "এক" শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকি। বিপুল সংখ্যা সম্বলিত কোন সমষ্টিকেও তার সামগ্রিক সত্তাকে সামনে রেখে "ওয়াহেদ" বা "এক" বলা হয়। যেমন এক ব্যক্তি, এক জাতি, এক দেশ, এক পৃথিবী, এমন কি এক বিশ্ব–জাহানও। আবার কোন সমষ্টির প্রত্যেক অংশকেও আলাদা আলাদাভাবেও "এক"–ই বলা হয়। কিন্তু "আহাদ" বা একক শব্দটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য ব্যবহার করা হয় না। এ জন্য কুরআন মজীদে যেখানেই আল্লাহর জন্য ওয়াহেদ (এক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই বলা হয়েছে : "ইলাহুন ওয়াহেদ" এক মাবুদ বা "আল্লাহুল ওয়াহেদুল কাহ্হার"—এক আল্লাহই সবাইকে বিজিত ও পদানত করে রাখেন। কোথাও নিছক "ওয়াহেদ" বলা হয়নি। কারণ যেসব জিনিসের মধ্যে বিপুল ও বিশাল সমষ্টি রয়েছে তাদের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিপরীত পক্ষে আহাদ শব্দটি একমাত্র আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ আল্লাহই একমাত্র সত্তা ও অস্তিত্ব যার মধ্যে কোন প্রকার একাধিক্য নেই। তাঁর একক সত্তা সবদিক দিয়েই পূর্ণাংগ।

৪. মূলে "সামাদ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ص م د ধাতু থেকে। আরবী ভাষায় এ ধাতুটি থেকে যতগুলো শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সেগুলোর ওপর নজর বুলালে এ শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা জানা যায়। যেমন : الصمد মনস্থ করা, ইচ্ছা করা। বিপুলায়তন বিশিষ্ট উন্নত স্থান এবং বিপুল ঘনত্ব বিশিষ্ট উন্নত মর্যাদা। উচ্চ

সমতল ছাদ। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত ও পিপসার্ত হয় না। প্রয়োজনের সময় যে সরদারের শরাণাপন্ন হতে হয়।

اَلصَّمَدُ : প্রত্যেক জিনিসের উঁচু অংশ। যে ব্যক্তির ওপরে আর কেউ নেই। যে নেতার আনুগত্য করা হয় এবং তার সাহায্য ছাড়া কোন বিষয়ের ফায়সালা করা হয় না। অভাবীরা যে নেতার শরণাপন্ন হয়। চিরন্তন। উন্নত মর্যাদা। এমন নিবিড় ও নিচ্ছিদ্র যার মধ্যে কোন ছিদ্র, শূন্যতা ও ফাঁকা অংশ নেই, যেখান থেকে কোন জিনিস বের হতে পারে না এবং কোন জিনিস যার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণার শিকার হয় না।

اَلْمُصْمَدُ : জমাট জিনিস, যার পেট নেই।

اَلْمُصَمَّدُ : যে লক্ষের দিকে যেতে মনস্থ করা হয়; যে কঠিন জিনিসের মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই।

بَيْتٌ مُصْمَدٌ : এমন গৃহ, প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য যার আশ্রয় নিতে হয়।

بِنَاءٌ مُصْمَدٌ : উঁচু ইমারত।

صَمَدَهُ وَصَمَدَ اِلَيْهِ صَمْدًا : ঐ লোকটির দিকে যাওয়ার সংকল্প করলো।

اَصْمَدَ اِلَيْهِ الْاَمْرَ : ব্যাপারটি তার হাতে সোপর্দ করলো; তার সামনে ব্যাপারটি পেশ করলো; বিষয়টি সম্পর্কে তার ওপর আস্থা স্থাপন করলো। (সিহাহ, কামূস ও লিসানুল আরব)।

এসব শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে "আল্লাহুস সামাদ" আয়াতটিতে উল্লেখিত "সামাদ" শব্দের যে ব্যাখ্যা সাহাবা, তাবেঈ ও পরবর্তীকালের আলেমগণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে নিচে আমরা তা উল্লেখ করছি :

হযরত আলী (রা), ইকরামা ও কা'ব আহবার বলেছেন : সামাদ হচ্ছেন এমন এক সত্তা যাঁর ওপরে আর কেউ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামাহ বলেছেন : তিনি এমন সরদার, নেতা ও সমাজপতি, যাঁর নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

এ প্রসংগে ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে : লোকেরা কোন বিপদে-আপদে যার দিকে সাহায্য লাভের জন্য এগিয়ে যায়, তিনি সামাদ। তাঁর আর একটি উক্তি হচ্ছে : যে সরদার তার নেতৃত্ব, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, ধৈর্য, সংযম, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণাতায় পূর্ণতার অধিকারী তিনি সামাদ।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন : যিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন, সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল, তিনিই সামাদ।

ইকরামার আর একটি বক্তব্য হচ্ছে : যার মধ্য থেকে কোন জিনিস কোনদিন বের হয়নি এবং বের হয়ও না আর যে পানাহার করে না, সে-ই সামাদ। এরই সমার্থবোধক উক্তি সা'বী ও মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী থেকেও উদ্ধৃত হয়েছে।

সুদ্দী বলেছেন ঃ আকাংখিত বস্তু লাভ করার জন্য লোকেরা যার কাছে যায় এবং বিপদে সাহায্য লাভের আশায় যার দিকে হাত বাড়ায়, তাকেই সামাদ বলে।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন ঃ যে নিজের সকল গুণ ও কাজে পূর্ণতার অধিকারী হয়।

রাবী ইবনে আনাস বলেছেন ঃ যার ওপর কখনো বিপদ–আপদ আসে না।

মুকাতেল ইবনে হাইয়ান বলেছেন ঃ যিনি সকল প্রকার দোষ–ত্রুটি মুক্ত।

ইবনে কাইসান বলেছেন ঃ অন্য কেউ যার গুণাবলীর ধারক হয় না।

হাসান বসরী ও কাতাদাহ বলেছেন ঃ যে বিদ্যমান থাকে এবং যার বিনাশ নেই। প্রায় এই একই ধরনের উক্তি করেছেন মুজাহিদ, মা'মার ও মুররাতুল হামদানী।

মুররাতুল হামদানীর আর একটি উক্ত হচ্ছে ঃ যে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং যা ইচ্ছা তাই করে; যার হুকুম ও ফায়সালা পূনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা কারো থাকে না।

ইবরাহীম নাখয়ী বলেছেন ঃ যার দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এগিয়ে যায়।

আবু বকর আমবারী বলেছেন ঃ সামাদ এমন এক সরদারকে বলা হয়, যার ওপরে আর কোন সরদার নেই এবং লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ে ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যার শরণাপন্ন হয়, অভিধানবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। আয যুজাজের বক্তব্য প্রায় এর কাছাকাছি। তিনি বলেছেন ঃ যার ওপর এসে নেতৃত্ব খতম হয়ে গেছে এবং নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকে যার শরণাপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় সামাদ।

এখন চিন্তা করুন, প্রথম বাক্যে "আল্লাহ আহাদ" কেন বলা হয়েছে এবং এ বাক্যে "আল্লাহুস সামাদ" বলা হয়েছে কেন? "আহাদ" শব্দটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলেছি, তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট—আর কারো জন্য এ শব্দটি আদৌ ব্যবহৃত হয় না। তাই এখানে "আহাদুন" শব্দটি অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে "সামাদ" শব্দটি অন্যান্য সৃষ্টির জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই "আল্লাহু সামাদুন" না বলে "আল্লাহুস সামাদ" বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, আসল ও প্রকৃত সামাদ হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টি যদি কোন দিক দিয়ে সামাদ হয়ে থাকে তাহলে অন্য দিক দিয়ে তা সামাদ নয়। কারণ তা অবিনশ্বর নয়—একদিন তার বিনাশ হবে। তাকে বিশ্লেষণ ও বিভক্ত করা যায়। তা বিভিন্ন উপাদান সহযোগে গঠিত। যে কোন সময় তার উপাদানগুলো আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোন কোন সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী হলেও সে নিজেও আবার কারো মুখাপেক্ষী। তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আপেক্ষিক, নিরংকুশ নয়। কারো তুলনায় সে শ্রেষ্ঠতম হলেও তার তুলনায় আবার অন্য কেউ আছে শ্রেষ্ঠতম। কিছু সৃষ্টির কিছু প্রয়োজন সে পূর্ণ করতে পারে, কিন্তু সবার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। বিপরীত পক্ষে আল্লাহর সামাদ হবার গুণ অর্থাৎ তাঁর মুখাপেক্ষীহীনতার গুণ সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ। সারা দুনিয়া তাঁর মুখাপেক্ষী তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার প্রত্যেকটি

জিনিস নিজের অস্তিত্ব, স্থায়ীত্ব এবং প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য সচেতন ও অবচেতনভাবে তাঁরই শরণাপন্ন হয়। তিনিই তাদের সবার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তিনি অমর, অজয়, অক্ষয়। তিনি রিযিক দেন—নেন না। তিনি একক—যৌগিক ও মিশ্র নন। কাজেই বিভক্তি ও বিশ্লেষণযোগ্য নন। সমগ্র বিশ্ব–জাহানের ওপর তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই তিনি নিছক "সামাদ" নন, বরং "আসসামাদ।" অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি মূলত সামাদ তথা অমুখাপেক্ষিতার গুণাবলীর সাথে পুরোপুরি সংযুক্ত।

আবার যেহেতু তিনি "আসসামাদ" তাই তাঁর একাকী ও স্বজনবিহীন হওয়া অপরিহার্য। কারণ এ ধরনের সত্তা একজনই হতে পারেন, যিনি কারো কাছে নিজের অভাব পূরণের জন্য হাত পাতেন না, বরং সবাই নিজেদের অভাব পূরণের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী হয়। দুই বা তার চেয়ে বেশী সত্তা সবার প্রতি অমুখাপেক্ষী ও অনির্ভলশীল এবং সবার প্রয়োজন পূরণকারী হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর "আসসামাদ" হবার কারণে তাঁর একক মাবুদ হবার ব্যাপারটিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ মানুষ যার মুখাপেক্ষী হয় তারই ইবাদাত করে। আবার তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, "আসসামাদ" হবার কারণে এটাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, যে প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা ও সামর্থই রাখে না, কোন সচেতন ব্যক্তি তার ইবাদাত করতে পারে না।

৫. মুশরিকরা প্রতি যুগে খোদায়ীর এ ধারণা পোষণ করে এসেছে যে, মানুষের মতো খোদাদেরও একটি জাতি বা শ্রেণী আছে। তার সদস্য সংখ্যাও অনেক। তাদের মধ্যে বিয়ে–শাদী এবং বংশ বিস্তারের কাজও চলে। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও এ জাহেলী ধারণা মুক্ত রাখেনি। তাঁর জন্য সন্তান সন্ততিও ঠিক করে নিয়েছে। তাই কুরআন মজীদে আরববাসীদের আকীদা বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, তারা ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহর কন্যা গণ্য করতো। তাদের জাহেলী চিন্তা নবীগণের উম্মাতদেরকেও সংরক্ষিত রাখেনি। তাদের মধ্যেও নিজেদের সৎ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করার আকীদা জন্ম নেয়। এ বিভিন্ন ধরনের কাল্পনিক চিন্তা–বিশ্বাসের মধ্যে দুই ধরনের চিন্তা সবসময় মিশ্রিত হতে থেকেছে। কিছু লোক মনে করেছে, যাদেরকে তারা আল্লাহর সন্তান গণ্য করছে তারা সেই মহান পবিত্র সত্তার ঔরসজাত সন্তান। আবার কেউ কেউ দাবী করেছে, যাকে তারা আল্লাহর সন্তান বলছে, আল্লাহ তাকে নিজের পালকপুত্র বানিয়েছেন। যদিও তাদের কেউ কাউকে (মাআ'যাল্লাহ) আল্লাহর পিতা গণ্য করার সাহস করেনি। কিন্তু যখন কোন সত্তা সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তিনি সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের দায়িত্বমুক্ত নন এবং তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তিনি মানুষ জাতীয় এক ধরনের অস্তিত্ব, তাঁর ঔরসে সন্তান জন্মলাভ করে এবং অপুত্রক হলে তার কাউকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন মানুষের মন তাঁকেও কারো সন্তান মনে করার ধারণা মুক্ত থাকতে পারে না। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, আল্লাহর বংশধারা কি? দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, কার কাছ থেকে তিনি দুনিয়ার উত্তরাধিকার লাভ করেছেন এবং তাঁর পরে এর উত্তরাধিকারী হবে কে?

এসব জাহেলী মূর্খতা প্রসূত ধারণা–কল্পনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলোকে যদি নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয়, তাহলে আরো কিছু জিনিসকেও মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন ঃ

এক ঃ আল্লাহ এক নয়, বরং আল্লাহর কোন একটি জাতি ও গোষ্ঠী আছে। তাদের সদস্যরা আল্লাহর গুণাবলী, কার্যকলাপ ও কর্তৃত্ব–ক্ষমতায় তাঁর সাথে শরীক। আল্লাহর কেবলমাত্র ঔরসজাত সন্তান ধারণা করে নিলে এ বিষয়টি অপরিহার্য হয় না, বরং কাউকে পালকপুত্র হিসেবে ধারণা করে নিলেও এটি অপরিহার্য হয়। কেননা কারো পালকপুত্র অবশ্যি তারই সমজাতীয় ও সমগোত্রীয়ই হতে পারে। আর (মা'আযাল্লাহ) যখন সে আল্লাহর সমজাতীয় ও সমগোত্রীয় হয়, তখনই সে আল্লাহর গুণাবলী সম্পন্নও হবে, একথা অস্বীকার করা যেতে পারে না।

দুই ঃ পুরুষ ও নারীর মিলন ছাড়া কোন সন্তানের ধারণা ও কল্পনা করা যেতে পারে না। বাপ ও মায়ের শরীর থেকে কোন জিনিস বের হয়ে সন্তানের রূপ লাভ করে—সন্তান বলতে একথাই বুঝায়। কাজেই এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তান ধারণা করার ফলে (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর একটি বস্তুগত ও শারীরিক অস্তিত্ব, তাঁর সমজাতীয় কোন স্ত্রীর অস্তিত্ব এবং তার শরীর থেকে কোন বস্তু বের হওয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তিন ঃ সন্তান উৎপাদন ও বংশধারা চালাবার কথা যেখানে আসে সেখানে এর মূল কারণ হয় এই যে, ব্যক্তিরা হয় মরণশীল এবং তাদের জাতির ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের সন্তান উৎপাদন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, এ সন্তানদের সাহায্যেই তাদের বংশধারা অব্যাহত থাকবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। কাজেই আল্লাহর সন্তান আছে বলে মনে করলে (নাউযুবিল্লাহ) তিনি নিজে যে মরণশীল এবং তাঁর বংশ ও তাঁর নিজের সত্তা কোনটিই চিরন্তন নয় একথা মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া সমস্ত মরণশীল ব্যক্তির মতো (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহরও কোন শুরু ও শেষ আছে, একথাও মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের ওপর যেসব জাতি ও গোত্র নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাদের ব্যক্তিবর্গ অনাদি–অনন্তকালীন জীবনের অধিকারী হয় না।

চার ঃ কারো পালকপুত্র বলবার উদ্দেশ্য এ হয় যে, একজন সন্তানহীন ব্যক্তি তার নিজের জীবনে কারো সাহায্যের এবং নিজের মৃত্যুর পর কোন উত্তরাধিকারের প্রয়োজন বোধ করে। কাজেই আল্লাহ কাউকে নিজের পুত্র বানিয়েছেন একথা মনে করা হলে সেই পবিত্র সত্তার সাথে এমন সব দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেগুলো মরণশীল মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়।

যদিও মহান আল্লাহকে "আহাদ" ও "আসসামাদ" বললে এসব উদ্ভট ধারণা–কল্পনার মূলে কুঠারঘাত করা হয়, তবুও এরপর "না তাঁর কোন সন্তান আছে, না তিনি কারো সন্তান"—একথা বলায় এ ব্যাপারে আর কোন প্রকার সংশয়–সন্দেহের অবকাশই থাকে না। তারপর যেহেতু আল্লাহর মহান সত্তা সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা–কল্পনা শিরকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্তরভুক্ত, তাই মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সূরা ইখলাসেই এগুলোর দ্ব্যর্থহীন ও চূড়ান্ত প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং বিভিন্ন জায়গায় এ

বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। এভাবে লোকেরা সত্যকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীচের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে ঃ

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ – النساء : ١٧١

"আল্লাহ–ই হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে, এ অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত–পাক–পবিত্র। যা কিছু আকাশসমূহের মধ্যে এবং যা কিছু যমীনের মধ্যে আছে, সবই তার মালিকানাধীন।" (আন নিসা, ১৭১)

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۝ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

"জেনে রাখো, এরা যে বলছে আল্লাহর সন্তান আছে, এটা এদের নিজেদের মনগড়া কথা। আসলে এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা।" (আস সাফ্‌ফাত, ১৫১–১৫২)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

"তারা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছে অথচ ফেরেশতারা ভালো করেই জানে এরা (অপরাধী হিসেবে) উপস্থাপিত হবে।" (আস সাফফাত, ১৫৮)

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ –

"লোকেরা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে তাঁর অংশ বানিয়ে ফেলেছে। আসলে মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।" (আয্‌ যুখরুফ, ১৫)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ – الانعام : ١٠٠ – ١٠١

"আর লোকেরা জিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে। অথচ তিনি তাদের স্রষ্টা। আর তারা না জেনে–বুঝে তাঁর জন্য পুত্র–কন্যা বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তারা যে সমস্ত কথা বলে তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র এবং তার উর্ধে তিনি অবস্থান করছেন। তিনি তো আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নির্মাতা। তাঁর পুত্র কেমন করে হতে পারে যখন তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।" (আল আনআম, ১০০–১০১)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ

"আর তারা বললো, দয়াময় আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন। তিনি পাক–পবিত্র। বরং (যাদেরকে এরা তাঁর সন্তান বলছে) তারা এমন সব বান্দা যাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে।" (আল আম্বিয়া, ২৬)

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِيُّ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

"লোকেরা বলে দিয়েছে, আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন আল্লাহ পাক–পবিত্র! তিনি তো অমুখাপেক্ষী। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এ বক্তব্যের সপক্ষে তোমাদের প্রমাণ কি? তোমরা কি আল্লাহর সম্পর্কে এমন সব কথা বলছো, যা তোমরা জানো না?" (ইউনুস, ৬৮)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ –

"আর হে নবী! বলে দাও, সেই আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না বাদশাহীতে কেউ তাঁর শরীক আর না তিনি অক্ষম, যার ফলে কেউ হবে তাঁর পৃষ্ঠপোষক।" (বনী ইসরাঈল, ১১১)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ۔

"আল্লাহ কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে দ্বিতীয় কোন ইলাহও নেই।" (আল মু'মিনূন, ৯১)

যারা আল্লাহর জন্য ঔরসজাত সন্তান অথবা পালকপুত্র গ্রহণ করার কথা বলে, এ আয়াতগুলোতে সর্বতোভাবে তাদের এহেন আকীদা–বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো এবং এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য যে সমস্ত আয়াত কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়, সেগুলো সূরা ইখলাসের অতি চমৎকার ব্যাখ্যা।

৬. মূলে বলা হয়েছে কুফূ (كفو) এর মানে হচ্ছে, নজীর, সদৃশ, সমান, সমমর্যাদা সম্পন্ন ও সমতুল্য। বিয়ের ব্যাপারে আমাদের দেশে কুফূ শব্দের ব্যবহার আছে। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হয়, সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে ছেলের ও মেয়ের সমান পর্যায়ে অবস্থান করা। কাজেই এখানে এ আয়াতের মানে হচ্ছে ঃ সারা বিশ্ব–জাহানে আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর সমমর্যাদা সম্পন্ন কিংবা নিজের গুণাবলী, কর্ম ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর সমান পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে এমন কেউ কোন দিন ছিল না এবং কোন দিন হতেও পারবে না।

মু'আওবিযাতাইন

(আল ফালাক ও আন নাস)

১১৩, ১১৪

নামকরণ

কুরআন মজীদের এ শেষ সূরা দু'টি আলাদা আলাদা সূরা ঠিকই এবং মূল লিপিতে এ সূরা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নামেই লিখিত হয়েছে, কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এত গভীর এবং উভয়ের বিষয়বস্তু পরস্পরের সাথে এত বেশী নিকট সম্পর্ক রাখে যার ফলে এদের একটি যুক্ত নাম "মু'আওবিযাতাইন" (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দু'টি সূরা) রাখা হয়েছে। ইমাম বায়হাকী তাঁর "দালায়েলে নবুওয়াত" বইতে লিখেছেন ঃ এ সূরা দু'টি নাযিলও হয়েছে একই সাথে। তাই উভয়ের যুক্তনাম রাখা হয়েছে "মু'আওবিযাতাইন"। আমরা এখানে উভয়ের জন্য একটি সাধারণ ভূমিকা লিখছি। কারণ, এদের উভয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী ও বক্তব্য সম্পূর্ণ একই পর্যায়ভুক্ত। তবে ভূমিকায় একত্র করার পর সামনের দিকে প্রত্যেকের আলাদা ব্যাখ্যা করা হবে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ও জাবের ইবনে যায়েদ বলেন, এ সূরা দু'টি মক্কী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ ধরনের একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্য একটি বর্ণনায় একে মাদানী বলা হয়েছে। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) ও কাতাদাহও একই উক্তি করেছেন। যে সমস্ত হাদীস এ দ্বিতীয় বক্তব্যটিকে শক্তিশালী করে তার মধ্যে মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে ঃ একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ ، لَمْ يُرَمِثْلُهُنَّ ، اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ-

"তোমরা কি কোন খবর রাখো, আজ রাতে আমার ওপর কেমন ধরনের আয়াত নাযিল হয়েছে? নজীরবিহীন আয়াত! কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরব্বিন নাস।"

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হিজরাতের পরে মদীনা তাইয়েবায় ইসলাম গ্রহণ করেন বলেই এ হাদীসের ভিত্তিতে এ সূরা দু'টিকে মাদানী বলার যৌক্তিকতা দেখা দেয়। আবু দাউদ ও নাসাঈ তাদের বর্ণনায় একথাই বিবৃত করেছেন। অন্য যে রেওয়ায়েতগুলো এ

বক্তব্যকে শক্তিশালী করেছে সেগুলো ইবনে সা'দ, মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম বায়হাকী, হাফেয ইবনে হাজার, হাফেয বদরুদ্দীন আইনী, আবদ ইবনে হুমায়েদ এবং আরো অনেকে উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলোতে বলা হয়েছে ঃ ইহুদিরা যখন মদীনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করেছিল এবং তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন এ সূরা নাযিল হয়েছিল। ইবনে সাদ ওয়াকেদীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, এটি সপ্তম হিজরীর ঘটনা। এরই ভিত্তিতে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাও এ সূরা দু'টিকে মাদানী বলেছেন।

কিন্তু ইতিপূর্বে সূরা ইখলাসের ভূমিকায় আমরা বলেছি, কোন সূরা বা আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয়, উমুক সময় সেটি নাযিল হয়েছিল। তখন এর অর্থ নিশ্চিতভাবে এ হয় না যে, সেটি প্রথমবার ঐ সময় নাযিল হয়েছেল। বরং অনেক সময় এমনও হয়েছে, একটি সূরা বা আয়াত প্রথমে নাযিল হয়েছিল, তারপর কোন বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুনর্বার তারই প্রতি বরং কখনো কখনো বারবার তার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছিল। আমাদের মতে সূরা নাস ও সূরা ফালাকের ব্যাপারটিও এ রকমের। এদের বিষয়বস্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, প্রথমে মক্কায় এমন এক সময় সূরা দু'টি নাযিল হয়েছিল যখন সেখানে নবী করীমের (সা) বিরোধিতা জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন মদীনা তাইয়েবায় মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকদের বিপুল বিরোধিতা শুরু হলো, তখন তাঁকে আবার ঐ সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ওপরে উল্লেখিত হযরত উকবা ইবনে আমেরের (রা) রেওয়ায়াতে একথাই বলা হয়েছে। তারপর যখন তাঁকে যাদু করা হলো এবং তাঁর মানসিক অসুস্থতা বেশ বেড়ে গেলো তখন আল্লাহর হুকুমে জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে আবার তাঁকে এ সূরা দু'টি পড়ার হুকুম দিলেন। তাই আমাদের মতে যেসব মুফাসসির এ সূরা দু'টিকে মক্কী গণ্য করেন তাদের বর্ণনাই বেশী নির্ভরযোগ্য। সূরা ফালাকের শুধুমাত্র একটি আয়াত وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ যাদুর সাথে সম্পর্ক রাখে, এ ছাড়া আল ফালাকের বাকি সমস্ত আয়াত এবং সূরা নাসের সবক'টি আয়াত এ ব্যাপারে সরাসরি কোন সম্পর্ক রাখে না। যাদুর ঘটনার সাথে এ সূরা দু'টিকে সম্পর্কিত করার পথে এটিও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কা মু'আয্‌যমায় এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে এ সূরা দু'টি নাযিল হয়েছিল। তখন ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বেই মনে হচ্ছিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন ভীমরুলের চাকে হাত দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর দাওয়াত যতই বিস্তার লাভ করতে থেকেছে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের বিরোধিতাও ততোই বেড়ে যেতে থেকেছে। যতদিন তাদের আশা ছিল, কোনরকম দেয়া-নেয়া করে অথবা ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে তাঁকে ইসলামী দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারা যাবে, ততদিন তো বিদ্বেষ ও শত্রুতার তীব্রতার কিছুটা কমতি ছিল। কিন্তু নবী করীম (সা) যখন দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন প্রকার আপোষ রফা করার প্রশ্নে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিলেন এবং সূরা আল কাফেরূনে তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিলেন—যাদের বন্দেগী তোমরা করছো

আমি তার বন্দেগী করবো না এবং আমি যার বন্দেগী করছি তোমরা তার বন্দেগী করো না, কাজেই আমার পথ আলাদা এবং তোমাদের পথও আলাদা—তখন কাফেরদের শত্রুতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। বিশেষ করে যেসব পরিবারের ব্যক্তিবর্গ (পুরুষ-নারী, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে) ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মনে তো নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে সবসময় তুষের আগুন জ্বলছিল। ঘরে ঘরে তাঁকে অভিশাপ দেয়া হচ্ছিল। কোন দিন রাতের আঁধারে লুকিয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। যাতে বনী হাশেমদের কেউ হত্যাকারীর সন্ধান পেয়ে আবার প্রতিশোধ নিতে না পারে এ জন্য এ ধরনের পরামর্শ চলছিল। তাঁকে যাদু-টোনা করা হচ্ছিল। এভাবে তাঁকে মেরে ফেলার বা কঠিন রোগে আক্রান্ত করার অথবা পাগল করে দেয়ার অভিপ্রায় ছিল। জিন ও মানুষদের মধ্যকার শয়তানরা সব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা চাচ্ছিল জন-মানুষের মনে তাঁর এবং তিনি যে দীন তথা জীবন বিধান ও কুরআন এনেছেন তার বিরুদ্ধে কোন না কোন সংশয় সৃষ্টি করতে। এর ফলে লোকেরা তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা করে দূরে সরে যাবে বলে তারা মনে করছিল। অনেক লোকের মনে হিংসার আগুন জ্বলছিল। কারণ তারা নিজেদের ছাড়া বা নিজেদের গোত্রের লোকদের ছাড়া আর কারো প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখতে পারতো না। উদাহরণ স্বরূপ, আবু জেহেল যে কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেটি ছিল তার নিজের ভাষায় ঃ "আমাদের ও বনী আবদে মান্নাফের (তথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার) মধ্যে ছিল পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। তারা মানুষকে আহার করিয়েছে, আমরাও আহার করিয়েছি। তারা লোকদেরকে সওয়ারী দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। তারা দান করেছে, আমরাও দান করেছি। এমন কি তারা ও আমরা মান-মর্যাদার দৌড়ে সমানে সমান হয়ে গেছি। এখন তারা বলছে কি, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে, তার কাছে আকাশ থেকে অহী আসে। আচ্ছা, এখন এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের সাথে কেমন করে মোকাবেলা করতে পারি? আল্লাহর কসম, আমরা কখনো তাকে মেনে নেবো না এবং তার সত্যতার স্বীকৃতি দেবো না।" (ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, ৩৩৭-৩৩৮ পৃষ্ঠা)

এহেন অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে ঃ এদেরকে বলে দাও আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রবের, সমুদয় সৃষ্টির দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট থেকে, রাতের আঁধার থেকে, যাদুকর ও যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকদের দুষ্কৃতি থেকে। আর এদেরকে বলে দাও, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত মানুষের রব, সমস্ত মানুষের বাদশা ও সমস্ত মানুষের মাবুদের কাছে। এমন প্রত্যেকটি সন্দেহ ও প্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে যা বার বার ঘুরে ফিরে আসে এবং মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে ও তাদেরকে প্ররোচিত করে। তারা জিন শয়তানদের মধ্য থেকে হতে পারে, আবার মানুষ শয়তানদের মধ্য থেকেও হতে পারে। এটা হযরত মূসার (আ) ঠিক সেই সময়ের কথার মতো যখন ফেরাউন ভরা দরবারে তাঁকে হত্যা করার সংকল্প প্রকাশ করেছিল। হযরত মূসা তখন বলেছিলেন ঃ

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ-

"আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি এমন ধরনের প্রত্যেক দাম্ভিকের মোকাবেলায় যে হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না" (আল মু'মিন, ২৭)

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ

"আর তোমরা আমার ওপর আক্রমণ করবে এ জন্য আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি।" (আদ দুখান, ২০)।

উভয় স্থানেই আল্লাহর এ মহান মর্যাদা সম্পন্ন পয়গম্বরদের নিতান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বিপুল উপায় উপকরণ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারীদের সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। উভয় স্থানেই শক্তিশালী দুশমনদের সামনে তাঁরা নিজেদের সত্যের দাওয়াত নিয়ে অবিচল ও দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দুশমনদের মোকাবেলা করার মতো কোন বস্তুগত শক্তি তাদের ছিল না। উভয় স্থানেই তাঁরা "তোমাদের মোকাবেলায় আমরা বিশ্ব-জাহানের রবের আশ্রয় নিয়েছি" এই বলে দুশমনদের হুমকি-ধমকি, মারাত্মক বিপজ্জনক কূট কৌশল ও শত্রুতামূলক চক্রান্ত উপেক্ষা করে গেছেন। মূলত যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, আল্লাহর শক্তি সব শক্তির সেরা, তাঁর মোকাবেলায় দুনিয়ার সব শক্তি তুচ্ছ এবং যে ব্যক্তি তাঁর আশ্রয় নিয়েছে তার সামান্যতম ক্ষতি করার ক্ষমতাও কারো নেই, একমাত্র সেই ব্যক্তিই এ ধরনের অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প ও উন্নত মনোবলের পরিচয় দিতে পারে এবং সে-ই একথা বলতে পারে ঃ সত্যের বাণী ঘোষণার পথ থেকে আমি কখনই বিচ্যুত হবো না। তোমাদের যা ইচ্ছা করে যাও। আমি তার কোন পরোয়া করি না। কারণ আমি তোমাদের ও আমার নিজের এবং সারা বিশ্ব-জাহানের রবের আশ্রয় নিয়েছি।

এ সূরা দু'টি কুরআনের অংশ কিনা

এ সূরা দু'টির বিষয়বস্তুও মূল বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য ওপরের আলোচনাটুকুই যথেষ্ট। তবুও হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থগুলোয় এদের সম্পর্কে এমন তিনটি বিষয়ের আলোচনা এসেছে যা মনে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে, তাই আমরা সে ব্যাপারটিও পরিষ্কার করে দিতে চাই । এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সেটি হচ্ছে, এ সূরা দু'টির কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত অথবা এর মধ্যে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ আছে? এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি এ সূরা দু'টিকে কুরআনের সূরা বলে মানতেন না এবং নিজের পাণ্ডুলিপিতে তিনি এ দু'টি সূরা সংযোজিত করেননি। ইমাম আহমাদ, বাযযার, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, আবু ইয়ালা, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হুমাইদী, আবু নু'আইয, ইবনে হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সহীহ সনদের মাধ্যমে একথা হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসগুলোতে কেবল একথাই বলা হয়নি যে, তিনি এই সূরা দু'টিকে কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ দিতেন বরং এই সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি বলতেন ঃ "কুরআনের সাথে এমন জিনিস মিশিয়ে ফেলো না যা কুরআনের অংশ নয়। এ সূরা দু'টি কুরআনের অন্তরভুক্ত নয় । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর মাধ্যমে একটি হুকুম দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, এ শব্দগুলোর মাধ্যমে

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।" কোন কোন রেওয়ায়াতে আরো বাড়তি বলা হয়েছে যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি পড়তেন না।

এ রেওয়ায়াতগুলোর কারণে ইসলাম বিরোধীরা কুরআনের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টির এবং (নাউযুবিল্লাহ) কুরআন যে বিকৃতিমুক্ত নয় একথা বলার সুযোগ পেয়ে গেছে। বরং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতো বড় সাহাবী যখন এই মত পোষণ করছেন যে, কুরআনের এ দু'টি সূরা বাইর থেকে তাতে সংযোজিত হয়েছে তখন না জানি তার মধ্যে আরো কত কি পরিবর্তন–পরিবর্ধন করা হয়েছে। এ ধরনের সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ তারা সহজেই পেয়ে গেছে। কুরআনকে এ ধরনের দোষারোপ মুক্ত করার জন্য কাযী আবু বকর বাকেল্লানী ও কাযী ইয়ায ইবনে মাসউদের বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ইবনে মাসউদ সূরা ফালাক ও সূরা নাসের কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি অস্বীকার করতেন না বরং তিনি শুধু এ সূরা দু'টিকে কুরআনের পাতায় লিখে রাখতে অস্বীকার করতেন। কারণ তাঁর মতে কুরআনের পাতায় শুধুমাত্র তাই লিখে রাখা উচিত যা লিখার অনুমতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এ জবাব ও ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ ইবনে মাসউদ (রা) এ সূরা দু'টির কুরআনের সূরা হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন, একথা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত। ইমাম নববী, ইমাম ইবনে হাযম, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী প্রমুখ অন্য কতিপয় মনীষী ইবনে মাসউদ যে এ ধরনের কোন কথা বলেছেন, একথাটিকেই সরাসরি মিথ্যা ও বাতিল গণ্য করেছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্যকে সনদ ছাড়াই রদ করে দেয়া কোন সুস্থ জ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, ইবনে মাসউদ (রা) সংক্রান্ত এ রেওয়ায়াত থেকে কুরআনের প্রতি যে দোষারোপ হচ্ছে তার জবাব কি ? এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করছি।

এক ঃ হাফেয বাযযার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে ইবনে মসউদ (রা) সংক্রান্ত এ রেওয়ায়াতগুলো বর্ণনা করার পর লিখেছেন ঃ নিজের এ রায়ের ব্যাপারে তিনি একান্তই নিঃসংগ ও একাকী। সাহাবীদের একজনও তাঁর এ বক্তব্য সমর্থন করেননি।

দুই ঃ সকল সাহাবী একমত হওয়ার ভিত্তিতে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মজীদের যে অনুলিপি তৈরি করেছিলেন এবং ইসলামী খেলাফতের পক্ষ থেকে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী পর্যায়ে পাঠিয়েছিলেন তাতে এ দু'টি সূরা লিপিবদ্ধ ছিল।

তিন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় কুরআনের যে কপির ওপর সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত তাতেই সূরা দু'টি লিখিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের (রা) একক রায় তাঁর বিপুল ও উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও সমগ্র উম্মাতের এ মহান ইজমার মোকাবেলায় কোন মূল্যই রাখে না।

চার ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি নিজে পড়তেন,

অন্যদের পড়ার আদেশ দিতেন এবং কুরআনের সূরা হিসেবেই লোকদেরকে এ দু'টির শিক্ষা দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দেখুন।

ইতিপূর্বে মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী ও নাসাঈর বরাত দিয়ে আমরা হযরত উকবা ইবনে আমেরের (রা) একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছি। এতে রসূলুল্লাহ (সা) সূরা ফালাক ও সূরা নাস সম্পর্কে তাঁকে বলেন ঃ আজ রাতে এ আয়াতগুলো আমার ওপর নাযিল হয়েছে। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত নাসায়ীর এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'টি সূরা ফজরের নামাযে পড়েন। ইবনে হিব্বানও এই হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন ঃ "যদি সম্ভব হয় তোমার নামাযসমূহ থেকে এ সূরা দু'টির পড়া যেন বাদ না যায়।" সাঈদ ইবনে মনসুর হযরত মু'আয ইবনে জাবালের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করিম (সা) ফজরের নামাযে এ সূরা দু'টি পড়েন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদ সহকারে আরো একজন সাহাবীর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী (সা) তাঁকে বলেন ঃ যখন তুমি নামায পড়বে, তাতে এ দু'টি সূরা পড়তে থাকবে। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈতে উকবা ইবনে আমেরের (রা) একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ "লোকেরা যে সূরাগুলো পড়ে তার মধ্যে সর্বোত্তম দু'টি সূরা কি তোমাকে শেখাবো না? তিনি আরজ করেন, অবশ্যি শিখাবেন। হে আল্লার রসূল! একথায় তিনি তাকে এ আল ফালাক ও আন নাস সূরা দু'টি পড়ান। তারপর নামায দাঁড়িয়ে যায় এবং নবী করীম (সা) এ সূরা দু'টি তাতে পড়েন। নামায শেষ করে তিনি তার কাছ দিয়ে যাবার সময় বলেন ঃ "হে উকাব (উকবা)! কেমন দেখলে তুমি?" এরপর তাকে হিদায়াত দিলেন, যখন তুমি ঘুমাতে যাও এবং যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠো তখন এ সূরা দু'টি পড়ো। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ তিরমিযী, নাসাঈতে উকবা ইবনে আমেরের (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের পর "মুআওবিযাত" (অর্থাৎ সূরা ইখলাস, সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাস) পড়তে বলেন। নাসায়ী ইবনে মারদুইয়ার এবং হাকেম উকবা ইবনে আমেরের আর একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নবী করিম (সা) সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন এবং আমি তাঁর পবিত্র পায়ে হাত রেখে সাথে সাথে যাচ্ছিলাম। আমি বললাম, আমাকে কি সূরা হূদ সূরা ইউসূফ শিখিয়ে দেবেন? বললেন ঃ "আল্লাহর কাছে বান্দার জন্য 'কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক—এর চাইতে বেশী বেশী উপকারী আর কোন জিনিস নেই।" নাসাঈ, বায়হাকী, বাগাবী ও ইবনে সা'দ আব্দুল্লাহ ইবনে আবেস আল জুহানীর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করিম (সা) আমাকে বলেছেন ঃ "ইবনে আবেস, আমি কি তোমাকে জানাবো না, আশ্রয় প্রার্থীরা যতগুলো জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনগুলো?" আমি বললাম, অবশ্যি বলবেন হে আল্লাহর রসূল! বললেন ঃ "কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক" ও "কুল আউযু বিরব্বিন নাস" সূরা দু'টি।" ইবনে মারদুইয়া হযরত ইবনে সালমার রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ যে সূরাগুলো সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন তা হচ্ছে", কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন নাস।"

এখানে প্রশ্ন দেখা যায়, এ দু'টি কুরআন মজীদের সূরা নয়, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এ ধরনের ভুল ধারণার শিকার হলেন কেমন করে? দু'টি বর্ণনা একত্র করে দেখলে আমরা এর জবাব পেতে পারি।

একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন, এটিতো আল্লাহর একটি হুকুম ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেয়া হয়েছিল, আপনি এভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান। অন্য বর্ণনাটি বিভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম বুখারী সহীহ আল বুখারীতে, ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর মুসনাদে, হাফেজ আবু বকর আল হুমাইদী তাঁর মুসনাদে, আবু নু'আইম তাঁর আল মুসতাখরাজে এবং নাসাঈ তাঁর সুনানে যির ইবনে জুবাইশের বরাত দিয়ে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন সহকারে কুরআনী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হযরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন। যির ইবনে হুবাইশ বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত উবাইকে (রা) বললাম, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তো এমন এমন কথা বলেন। তাঁর এ উক্তি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? তিনি জবাব দিলেন ঃ "আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, 'কুল' (বলো), কাজেই আমিও বলেছি 'কুল।' তাই আমরাও তেমনিভাবে বলি যেভাবে রসূলুল্লাহ (সা) বলতেন।" ইমাম আহমাদের বর্ণনা মতে হযরত উবাইয়ের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ "আমি সাক্ষ দিচ্ছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, জিব্রীল আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেছিলেন, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক" তাই তিনিও তেমনি বলেন। আর জিব্রীল (আ) 'কুল আউজু বিরব্বিন নাস' বলেছিলেন, তাই তিনিও তেমনি বলেন। কাজেই রসূল (সা) যেভাবে বলতেন আমরাও তেমনি বলি।" এ দু'টি বর্ণনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) উভয় সূরায় 'কুল' (বলো) শব্দ দেখে এ ভুল ধারণা করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "আউযু বিরব্বিল ফালাক (আমি সকাল বেলার রবের আশ্রয় চাচ্ছি) ও "আউযু বিরব্বিন নাস" (আমি সমস্ত মানুষের রবের আশ্রয় চাচ্ছি) বলার হুকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি রসূলে করিমকে (সা)–এর এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) মনে এ সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি রসূলের (সা) সামনে প্রশ্ন রেখেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন ঃ জিব্রীল আলাইহিস সালাম যেহেতু 'কুল' বলেছিলেন তাই আমিও 'কুল' বলি। একথাটিকে এভাবেও ধরা যায় যদি কাউকে হুকুম দেয়ার উদ্দেশ্য থাকে এবং তাকে বলা হয়, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি, তাহলে এ হুকুমটি পালন করতে গিয়ে এভাবে বলবে না যে, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি।" বরং সে ক্ষেত্রে 'বলো' শব্দটি বাদ দিয়ে "আমি আশ্রয় চাচ্ছি' বলবে। বিপরীত পক্ষে যদি উর্ধতন শাসকের সংবাদবাহক কাউকে এভাবে খবর দেয়, "বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি" এবং এ পয়গাম তার নিজের কাছে রেখে দেবার জন্য নয় বরং অন্যদের কাছেও পৌছে দেবার জন্য দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তিনি লোকদের কাছে এ পয়গামের শব্দগুলো, হুবহু পৌঁছে দেবেন। এর মধ্য থেকে কোন একটি শব্দ বাদ দেবার অধিকার তাঁর থাকবে না। কাজেই এ সূরা দু'টির সূচনা 'কুল' শব্দ দিয়ে করা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটি অহীর কালাম এবং কালামটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যেভাবে নাযিল হয়েছিল ঠিক

সেভাবেই লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন। এটি শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া একটি হুকুম ছিল না। কুরআন মজীদে এ দু'টি সূরা ছাড়াও এমন ৩৩০টি আয়াত আছে যেগুলো 'কুল' শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে 'কুল' (বলো) থাকা একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, এগুলো অহীর কালাম এবং যেসব শব্দ সহকারে এগুলো নবী করিম (সা)–এর ওপর নাযিল হয়েছিল হুবহু সেই শব্দগুলো সহকারে লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া তাঁর জন্য ফরয করা হয়েছিল। নয়তো প্রত্যেক জায়গায় 'কুল' (বলো) শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু সেই শব্দগুলোই বলতেন যেগুলো বলার হুকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি এগুলো কুরআনে সংযোজিত করতেন না। বরং এ হুকুমটি পালন করার জন্য শুধু মাত্র সেই কথাগুলোই বলে দেয়া যথেষ্ট মনে করতেন যেগুলো বলার হুকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

এখানে সামান্য একটু চিন্তা–ভাবনা করলে একথা ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরামকে ভুল–ত্রুটি মুক্ত মনে করা এবং তাদের কোন কথা সম্পর্কে 'ভুল' শব্দটি শুনার সাথে সাথেই সাহাবীদের অবমাননা করা হয়েছে বলে হৈ চৈ শুরু করে দেয়া কতইনা অর্থহীন। এখানে দেখা যাচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–এর মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর কুরআনের দু'টি সূরা সম্পর্কে কত বড় একটি ভুল হয়ে গেছে। এতবড় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর যদি এমনি একটি ভুল হয়ে যেতে পারে তাহলে অন্যদেরও কোন ভুল হয়ে যাওয়া সম্ভব। আমরা ইলমী তথা তাত্বিক গবেষণার জন্য এ ব্যাপারে যাচাই–বাছাই ও পর্যালোচনা করতে পারি। তবে যে ব্যক্তি ভুলকে ভুল বলার পর আবার সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁদের প্রতি ধিক্কার ও নিন্দাবাদে মুখর হবে সে হবে একজন মস্তবড় জালেম। এ "মু'আওবিযাতাইন" প্রসংগে মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা)–এর রায়কে ভুল বলেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই কথা বলার দুঃসাহস করেননি যে, (নাউযুবিল্লাহ) কুরআনের দু'টি সূরা অস্বীকার করে তিনি কাফের হয়ে গিয়েছিলেন।

নবী করীমের (সা) ওপর যাদুর প্রভাব

এ সূরাটির ব্যাপারে আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করা হয়েছিল। তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ যাদুর প্রভাব দূর করার জন্য জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে তাঁকে এ সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক বুদ্ধিবাদীদের অনেকে এ ব্যাপারটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ হাদীসগুলো মেনে নিলে সমস্ত শরীয়াতটাই সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। কারণ, নবীর ওপর যদি যাদুর প্রভাব পড়তে পারে এবং এ হাদীসগুলোর দৃষ্টিতে তাঁর ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল, তাহলে আমরা জানি না বিরোধীরা যাদুর প্রভাব ফেলে তাঁর মুখ থেকে কতো কথা বলিয়ে এবং তাঁকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিয়েছে। আর তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যেইবা কি পরিমাণ জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কতটা যাদুর প্রভাবে ছিল তাও আমরা জানি না। বরং তাদের বক্তব্য হচ্ছে, একথা সত্য বলে মেনে নেয়ার পর যাদুরই মাধ্যমে নবীকে নবুওয়াতের দাবী করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল কি না এবং যাদুরই প্রভাবে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হয়ে তাঁর কাছে

ফেরেশতা এসেছে বলে মনে করেছিলেন কিনা একথাও নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে না। তাদের আরো যুক্তি হচ্ছে, এ হাদীসগুলো কুরআন মজীদের সাথে সংঘর্ষশীল। কারণ, কুরআন মজীদে কাফেরদের এ অভিযোগ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা নবীকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলেছে ঃ

يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا-

"জালেমরা বলেন, তোমরা নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির আনুগত্য করে চলছো।" (বনি ইসরাঈল, ৪৭) আর এ হাদীসগুলো কাফেরদের এ অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ করছে। অর্থাৎ এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণ হচ্ছে, সত্যই নবীর ওপর যাদু করা হয়েছিল।

এ বিষয়টির ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হলে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, মূলত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল বলে কি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে? আর যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে তা কি ছিল এবং কতটুকু ছিল? তারপর যেসব আপত্তি করা হয়েছে, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে সেগুলো উত্থাপিত হতে পারে কি না, তা দেখতে হবে।

প্রথম যুগের মুসলিম আলেমগণ নিজেদের চিন্তা ও ধারণা অনুযায়ী ইতিহাস বিকৃত অথবা সত্য গোপন করার প্রচেষ্টা না চালিয়ে চরম সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বরং যা কিছু ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে তাকে হুবহু পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এ সত্যগুলো থেকে যদি কেউ বিপরীত ফলাফল গ্রহণে উদ্যোগী হয় তাহলে তাদের সংগৃহীত এ উপাদানগুলোর সাহায্যে সে যে বিপুলভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে এ সম্ভাবনার কোন পরোয়াই তারা করেননি। এখন যদি কোন একটি কথা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিপুল সংখ্যক ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণীর ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তাহলে তা মেনে নিলে অমুক অমুক ত্রুটি ও অনিষ্টকারিতা দেখা দেবে এ অজুহাত দেখিয়ে ইতিহাসকে মেনে নিতে অস্বীকার করা কোন ন্যায়নিষ্ঠ পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না। অনুরূপভাবে ইতিহাস থেকে যতটুকু সত্য বলে প্রমাণিত হয় তার ওপর কল্পনার ঘোড়া দৌড়িয়ে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজের আসল আকৃতি থেকে অনেকগুণ বাড়িয়ে পেশ করাও ঐতিহাসিক সততার পরিচায়ক নয়। এর পরিবর্তে ইতিহাসকে ইতিহাস হিসেবে মেনে নিয়ে তার মাধ্যমে কি প্রমাণ হয় ও কি প্রমাণ হয় না তা দেখাই তার কাজ।

ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে যদি ভুল প্রমাণ করা যেতে পারে তাহলে দুনিয়ার কোন একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকেও সঠিক প্রমাণ করা যাবে না। হযরত আয়েশা (রা) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইমাম আহমাদ, আবদুর রাজ্জাক, হুমাইদী, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে সা'দ, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, আবদ ইবনে হুমাইদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এত বিভিন্ন ও বিপুলসংখ্যক সনদের মাধ্যমে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে,

এর এক একটি বর্ণনা, 'খবরে ওয়াহিদ'–এর পর্যায়ভুক্ত হলেও মূল বিষয়বস্তুটি 'মুতাওয়াতির' বর্ণনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন হাদীসে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সেগুলো একত্র করে এবং একসাথে গ্রথিত ও সুসংবদ্ধ করে সাজিয়ে গুছিয়ে আমরা এখানে একটি ঘটনা আকারে তুলে ধরছি।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন। এ সময় সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে খয়বর থেকে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো। তারা আনসারদের বনি যুরাইক গোত্রের বিখ্যাত যাদুকর লাবীদ ইবনে আ'সমের সাথে সাক্ষাত করলো।[১] তারা তাকে বললো, মুহাম্মাদ (সা) আমাদের সাথে যা কিছু করেছেন তা তো তুমি জানো। আমরা তাঁর ওপর অনেকবার যাদু করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হতে পারিনি। এখন তোমার কাছে এসেছি। কারণ তুমি আমাদের চাইতে বড় যাদুকর। তোমার জন্য এ তিনটি আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) এনেছি। এগুলো গ্রহণ করো এবং মুহাম্মাদের ওপর একটি শক্ত যাদুর আঘাত হানো। এ সময় একটি ইহুদী ছেলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাজ করতো। তার সাথে যোগসাজশ করে তারা রসূলুল্লাহর (সা) চিরুনীর একটি টুকরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো। তাতে তাঁর পবিত্র চুল আটকানো ছিল সেই চুলগুলো ও চিরুনীর দাঁতের ওপর যাদু করা হলো। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, লাবীদ ইবনে আ'সম নিজেই যাদু করেছিল। আবার কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে— তার বোনেরা ছিল তার চেয়ে বড় যাদুকর। তাদের সাহায্যে সে যাদু করেছিল যাহোক এ দু'টির মধ্যে যে কোন একটিই সঠিক হবে। এ ক্ষেত্রে এ যাদুকে একটি পুরুষ খেজুরের ছড়ার আবরণের[২] নীচে রেখে লাবীদ তাকে বনী যুরাইকের যারওয়ান বা যী–আযওয়ান নামক কূয়ার তলায় একটি পাথর চাপা দিয়ে রাখলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়তে পূর্ণ এক বছর সময় লাগলো। বছরের শেষ ছয় মাসে মেজাজে কিছু পরিবর্তন অনুভূত হতে থাকলো। শেষ চল্লিশ দিন কঠিন এবং শেষ তিন দিন কঠিনতর হয়ে গেলো। তবে এর সবচেয়ে বেশী যে প্রভাব তাঁর ওপর পড়লো তা কেবল এতটুকুই যে, দিনের পর দিন তিনি রোগা ও নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগলেন। কোন কাজের ব্যাপারে মনে করতেন, করে ফেলেছেন অথচ তা করেননি। নিজের স্ত্রীদের সম্পর্কে মনে করতেন, তিনি তাদের কাছে গেছেন অথচ আসলে তাদের কাছে যাননি। আবার কোন কোন সময় নিজের দৃষ্টির ব্যাপারেও তাঁর সন্দেহ হতো। মনে করতেন কোন জিনিস দেখেছেন অথচ আসলে তা দেখেননি। এসব প্রভাব তাঁর নিজের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি তাঁর ওপর দিয়ে কি ঘটে যাচ্ছে তা অন্যেরা জানতেও

১. কোন কোন বর্ণনাকারী তাকে ইহুদী বলেছেন। আবার কেউ বলেছেন, মুনাফিক ও ইহুদীদের মিত্র। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সে ছিল বনী যুরাইকের অন্তরভুক্ত। আর বনী যুরাইক ইহুদীদের কোন গোত্র ছিল না, একথা সবাই জানে। বরং এটি ছিল খাযরাজদের অন্তরভুক্ত আনসারদের একটি গোত্র। তাই বলা যেতে পারে, সে মদীনাবাসী ছিল, কিন্তু ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল অথবা ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ সহযোগী হবার কারণে কেউ কেউ তাকে ইহুদী মনে করে নিয়েছিল। তবুও তার জন্য মুনাফিক শব্দ ব্যবহার করার কারণে জানা যায়, বাহ্যত সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতো।

২. শুরুতে খেজুরের ছড়া একটি আবরণের মধ্যে থাকে। পুরুষ খেজুরের আবরণের রং হয় মানুষের রংয়ের মতো। তার গন্ধ হয় মানুষের শুক্রের গন্ধের মতো।

পারেনি। কিন্তু নবী হিসেবে তাঁর ওপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় তার মধ্যে সামান্যতম ব্যাঘাতও সৃষ্টি হতে পারেনি। কোন একটি বর্ণনায়ও একথা বলা হয়নি যে, সে সময় তিনি কুরআনের কোন আয়াত ভুলে গিয়েছিলেন। অথবা কোন আয়াত ভুল পড়েছিলেন। কিংবা নিজের মজলিসে, বক্তৃতায় ও ভাষণে তাঁর শিক্ষাবলীতে কোন পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। অথবা এমন কোন কালাম তিনি অহী হিসেবে পেশ করেছিলেন যা আসলে তাঁর ওপর নাযিল হয়নি। কিংবা তাঁর কোন নামায তরক হয়ে গেছে এবং সে সর্ম্পকে তিনি মনে করেছেন যে, তা পড়ে নিয়েছেন অথচ আসলে তা পড়েননি। নাউযুবিল্লাহ, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটে গেলে চারদিকে হৈচৈ পড়ে যেতো। সারা আরব দেশে খবর ছড়িয়ে পড়তো যে নবীকে কেউ কাৎ করতে পারেনি। একজন যাদুকরের যাদুর কাছে সে কাৎ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা এ অবস্থায় পুরোপুরি সমুন্নত থেকেছে। তার ওপর কোন প্রভাব পড়েনি। কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এ জিনিসটি অনুভব করে পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। শেষে একদিন তিনি হযরত আয়েশার কাছে ছিলেন। এ সময় বার বার আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে থাকলেন। এ অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। জেগে উঠে হযরত আয়েশাকে বললেন, আমি যে কথা আমার রবের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত আশেয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কি কথা? জবাব দিলেন, "দু'জন লোক (অর্থাৎ দু'জন ফেরেশতা দু'জন লোকের আকৃতি ধরে) আমার কাছে এলো। একজন ছিল মাথার দিকে, আরেকজন পায়ের দিকে। একজন জিজ্ঞেস করলো, এঁর কি হয়েছে? অন্যজন জবাব দিল, এঁর ওপর যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন জিজ্ঞেস করলো, কে করেছে? জবাব দিল, লাবীদ ইবনে আ'সম। জিজ্ঞেস করলো, কোন জিনিসের মধ্যে করেছে? জবাব দিল, একটি পুরুষ খেজুরের ছড়ার আবরণে আবৃত চিরুনী ও চুলের মধ্যে। জিজ্ঞেস করলো, তা কোথায় আছে? জবাব দিল, বনী যুরাইকের কূয়া যী-আযওয়ানের (অথবা যী-যারওয়ান) তলায় পাথর চাপা দেয়া আছে। জিজ্ঞেস করলো, তাহলে এখন এ জন্য কি করা দরকার? জবাব দিল, কূয়ার পানি সেঁচে ফেলতে হবে। তারপর পাথরের নিচ থেকে সেটি বের করে আনতে হবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে ইয়াসির (রা) ও হযরত যুবাইরকে (রা) পাঠালেন। তাদের সাথে শামিল হলেন হযরত জুবাইর ইবনে ইয়াস আযযুরাকী ও কায়েস ইবনে মিহসান আযযুরাকী (অর্থাৎ বনি যুরাইকের দুই ব্যক্তি)। পরে নবী (সা) নিজেও কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন। পানি তোলা হলো। কূয়ার তলা থেকে কথিত আবরণটি বের করে আনা হলো। তার মধ্যে চিরুনী ও চুলের সাথে মিশিয়ে রাখা একটি সূতায় এগারটি গিরা দেয়া ছিল। আর ছিল মোমের একটি পুতুল। তার গায়ে কয়েকটি সুঁই ফুটানো ছিল। জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, আপনি সূরা আল ফালাক ও আন নাস পড়ুন। কাজেই তিনি এক একটি আয়াত পড়তে যাচ্ছিলেন, সেই সাথে এক একটি গিরা খুলে যাচ্ছিল এবং পুতুলের গা থেকে এক একটি সুঁইও তুলে নেয়া হচ্ছিল। সূরা পড়া শেষ হতেই সমস্ত গিরা খুলে গেলো, সমস্ত সুঁই উঠে এলো এবং তিনি যাদুর প্রভাবমুক্ত হয়ে ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছে গেলেন যেমন কোন ব্যক্তি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল তারপর তার বাঁধন খুলে গেলো। তারপর তিনি লাবীদকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে তার দোষ স্বীকার করলো এবং তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। কারণ, নিজের ব্যক্তিসত্তার জন্য তিনি কোনদিন কারো ওপর প্রতিশোধ নেননি।

শুধু এই নয়, তিনি এ বিষয়টি নিয়ে কোন কথাবার্তা বলতেও অস্বীকৃতি জানালেন। কারণ তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করেছেন, কাজেই এখন আমি কারো বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করতে চাই না।

এ হলো এ যাদুর কাহিনী। এর মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই যা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি তাঁকে আহত করা যেতে পারে, যেমন ওহোদের যুদ্ধে হয়েছিল, যদি তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে পড়েন, যেমন বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত, যদি তাঁকে বিচ্ছু কামড় দেয়, যেমন অন্যান্য হাদীসে পাওয়া যায় এবং নবী হবার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর সাথে যে সংরক্ষণের ওয়াদা করেছিলেন, যদি এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিও তার পরিপন্থী না হয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হতেও পারেন। এতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। নবীর ওপর যাদুর প্রভাব পড়তে পারে, একথা কুরআন মজীদ থেকেও প্রমাণিত। সূরা আরাফেও ফেরাউনের যাদুকরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ হযরত মুসা (আ)–এর মোকাবিলায় তারা এলো। তারা সেখানে এ মোকাবিলা দেখতে উপস্থিত হাজার হাজার লোকের দৃষ্টিশক্তির ওপর যাদু করলো (سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ)। সূরা ত্বা–হায় বলা হয়েছে ঃ তারা যেসব লাঠি ও রশি ছুঁড়ে দিয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে শুধু সাধারণ লোকেরাই নয়, হযরত মূসাও মনে করলেন সেগুলো সাপের মতো তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে এবং তিনি এতে ভীত হয়ে পড়লেন। এমন কি মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এই মর্মে অহী নাযিল করলেন যে, ভয় পেয়ো না, তুমিই বিজয়ী হবে। তোমার লাঠিটা একটু ছুঁড়ে ফেলো।

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى
فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى - قُلْنَا لَاتَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى
وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ - طٰهٰ : ٦٦–٦٩

এখানে যদি আপত্তি উত্থাপন করে বলা হয়, এ ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদের দোষারোপকেই সত্য প্রমাণ করা হলো। তারা তো নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলতো। এর জবাবে বলা যায়, তিনি কোন যাদুকরের যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এ অর্থে মক্কার কাফেররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলতো না। বরং তাঁকে যাদুর প্রভাবে পাগল করে দিয়েছিল এবং নবুওয়াতের দাবী ছিল তাঁর এ পাগলামীরই বহিঃপ্রকাশ। আর এ পাগলামীর বশবর্তী হয়েই তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের গল্প শুনিয়ে যেতেন। একথা সুস্পষ্ট, যে বিষয় ইতিহাস থেকে প্রমাণিত, যে যাদুর প্রভাব শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিসত্তার ওপর পড়েছিল, তাঁর নবীসত্তা ছিল এর আওতার সম্পূর্ণ বাইরে। তেমন ধরনের কোন বিষয়ের সাথে এ আপত্তি সম্পৃক্ত হতে পারে না।

এ প্রসংগে একথাও উল্লেখযোগ্য, যারা যাদুকে নিছক কাল্পনিক জিনিস মনে করেন, যাদুর প্রভাবের কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয় বলেই তারা এ ধরনের মত পোষণ করেন। কিন্তু দুনিয়ায় এমন বহু জিনিসই রয়েছে যেগুলো অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে

ধরা পড়ে, কিন্তু সেগুলো কিভাবে হয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার অক্ষমতার ফলে একথা অপরিহার্য হয়ে ওঠে না যে, আমরা যে জিনিসটি বিশ্লেষণ করতে অক্ষম সেটিকে আমাদের অস্বীকার করতে হবে। আসলে যাদু একটি মনস্তাত্বিক প্রভাব। শারীরিক প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিগুলো যেভাবে শরীরের সীমা অতিক্রম করে মনকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি যাদুর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিও মনের সীমা পেরিয়ে শরীরকেও প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ভয় একটি মনস্তাত্বিক জিনিস। কিন্তু শরীরের ওপর এর প্রভাব যখন পড়ে গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে যায় এবং দেহ থর থর করে কাঁপতে থাকে। আসলে যাদু প্রকৃত সত্তায় কোন পরিবর্তন ঘটায় না। তবে মানুষের মন ও তার ইন্দ্রিয়গুলো এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করতে থাকে, বুঝি প্রকৃত সত্তার পরিবর্তন হয়েছে। হযরত মূসার দিকে যাদুকররা যেসব লাঠি ও রশি ছুঁড়ে ফেলেছিল সেগুলো সত্যি সাপে পরিণত হয়নি। কিন্তু হাজার হাজার লোকের চোখে এমন যাদুর প্রভাব পড়লো যে, তারা সবাই এগুলোকে সাপ মনে করলো। এমন কি হযরত মূসার ইন্দ্রিয়ানুভূতিও এ যাদুর প্রভাব মুক্ত থাকতে পারেনি। অনুরূপভাবে কুরআনের সূরা আল বাকারার ১০২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ বেবিলনে হারুত ও মারুতের কাছে লোকেরা এমন যাদু শিখতো যা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতো। এটাও ছিল একটি মনস্তাত্বিক প্রভাব। আর তাছাড়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লোকেরা যদি এ কাজে সফলতা না পেতো তাহলে তারা এর খরিদ্দার হতো না। একথা ঠিক, বন্দুকের গুলী ও বোমারু বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বোমার মতো যাদুর প্রভাবশালী হওয়াও আল্লাহর হুকুম ছাড়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু হাজার হাজার বছর থেকে যে জিনিসটি মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা দিচ্ছে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিছক একটি হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান

এ সূরা দু'টির ব্যাপারে তৃতীয় যে প্রশ্নটি দেখা দেয়, সেটি হচ্ছে এই যে, ইসলামে কি ঝাড়–ফুঁকের কোন অবকাশ আছে? তাছাড়া জাড়–ফুঁক যথার্থই কোন প্রভাব ফেলে কি না? এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে, বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে ঘুমাবার আগে বিশেষ করে অসুস্থ অবস্থায় সূরা আল ফালাক ও আন নাস এবং কোন কোন হাদীস অনুযায়ী এ দু'টির সাথে আবার সূরা ইখলাসও তিন তিন বার করে পড়ে নিজের দুই হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেখানে যেখানে তাঁর হাত যেতে পারে—সব জায়গায় হাত বুলাতেন। শেষ বারে রোগে আক্রান্ত হবার পর যখন তাঁর নিজের পক্ষে এমনটি করা সম্ভবপর ছিল না তখন হযরত আয়েশা (রা) এ সূরাগুলো (স্বেচ্ছাকৃতভাবে বা নবী করীমের হুকুমে) পড়তেন এবং তাঁর মুবারক হাতের বরকতের কথা চিন্তা করে তাঁরই হাত নিয়ে তাঁর শরীরে বুলাতেন। এ বিষয়বস্তু সম্বলিত রেওয়ায়াত নির্ভুল সূত্রে বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও মুআত্তা ইমাম মালিকে হযরত আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আর রসূলের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)–এর চাইতে আর কারো বেশী জানার কথা নয়।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গীটি ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)–এর একটি সুদীর্ঘ রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তার শেষের দিকে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে যারা না দাগ দেয়ার চিকিৎসা করে, না ঝাড়–ফুঁক করায় আর না শুভাশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে। (মুসলিম) হযরত মুগীরা ইবনে শোবার (রা) বর্ণনা মতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দাগ দেয়ার চিকিৎসা করালো এবং ঝাড়–ফুঁক করালো সে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল থেকে িঃসম্পর্ক হয়ে গেলো। (তিরমিযী) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশটি জিনিস অপছন্দ করতেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ঝাড়–ফুঁক করা, তবে সূরা আল ফালাক ও আন নাস অথবা এ দু'টি ও সূরা ইখলাস ছাড়া (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম)। কোন কোন হাদীস থেকে একথাও জানা যায় যে, প্রথম দিকে রসূলে করীম (সা) ঝাড় ফুঁক করা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিছেলেন, কিন্তু পরে শর্ত সাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই শর্তগুলো হচ্ছে ঃ এতে কোন শিরকের আমেজ থাকতে পারবে না। আল্লাহর পবিত্র নাম বা তাঁর পবিত্র কালামের সাহায্যে ঝাড়–ফুঁক করতে হবে। কালাম বোধগম্য হতে হবে এবং তার মধ্যে কোন গুনাহর জিনিস নেই একথা জানা সম্ভব হতে হবে। আর এই সঙ্গে ভরসা ঝাড়–ফুঁকের ওপর করা যাবে না এবং তাকে রোগ নিরাময়কারী মনে করা যাবে না। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে এ মর্মে যে, আল্লাহ চাইলে এ ঝাড়–ফুঁকের মাধ্যমেই সে রোগ নিরাময় করবেন। এ ব্যাপারে শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পর এখন হাদীসের বক্তব্য দেখুন।

তাবারানী 'সগীর' গ্রন্থে হযরত আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ একবার নামায পড়ার সময় রসূলে করীমকে (সা) বিচ্ছু কামড় দেয়। নামায শেষ করে তিনি বলেন, বিচ্ছুর ওপর আল্লাহর লানত, সে না কোন নামাযীকে রেহাই দেয়, না আর কাউকে। তারপর পানি ও লবন আনান। যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়েছিল সেখানে নোনতা পানি দিয়ে ডলতে থাকেন আর কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন নাস পড়তে থাকেন।

ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনাও হাদীসে এসেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের ওপর এ দোয়া পড়তেন ঃ

اُعِيذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ –

"আমি তোমাদের দু'জনকে প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক এবং বদনজর থেকে আল্লাহর ত্রুটিমুক্ত কালেমাসমূহের আশ্রয়ে দিয়ে দিচ্ছি।"

(বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

উসমান ইবনে আবিল আস সাকাফী সম্পর্কে সামান্য শব্দের হেরফের সহকারে মুসলিম, মুআত্তা, তাবারানী ও হাকেমে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে তাতে বলা

হয়েছে ঃ তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নালিশ করেন, আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি তখন থেকেই একটা ব্যথা অনুভব করছি। এ ব্যথা আমাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। নবী (সা) বলেন, যেখানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে তোমার ডান হাতটা রাখো। তারপর তিনবার বিসমিল্লাহ পড়ো এবং সাতবার এ দোয়াটা পড়ে সেখানে হাত বুলাও أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ "আমি আল্লাহ ও তাঁর কুদরতের আশ্রয় চাচ্ছি সেই জিনেসের অনিষ্টকারিতা থেকে যাকে আমি অনুভব করছি এবং যার লেগে যাওয়ার ভয়ে আমি ভীত।" মুআত্তায় এর ওপর আরো এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, উসমান ইবনে আবিল আস বলেন, এরপর আমার সে ব্যথা দূর হয়ে যেতে থাকে এবং আমার ঘরের লোকদেরকেও আমি এটা শিখাই।

মুসনাদে আহমাদ ও তাহাবী গ্রন্থে তালক ইবনে আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতেই আমাকে বিচ্ছু কামড় দেয়। তিনি কিছু পড়ে আমাকে ফুঁক দেন এবং কামড়ানো জায়গায় হাত বুলান।

মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিব্রীল এসে জিজ্ঞেস করেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?" জবাব দেন হাঁ জিব্রীল বলেন,

بِاسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيٍ يُّؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّكُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ –

"আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন প্রত্যেকটি জিনিস থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেকটি নফস ও হিংসুকের হিংসা দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় দান করুন। আমি তাঁর নামে আপনাকে ঝাড়ছি।"

প্রায় এ একই ধরনের আর একটি বর্ণনা মুসনাদে আহমাদে হযরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ নবী করীম (সা) অসুস্থ ছিলেন। আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। দেখলাম তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। বিকেলে দেখতে গেলাম, দেখলাম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। কিভাবে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছেন তা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, জিব্রীল এসেছিলেন এবং কিছু কালেমা পড়ে আমাকে ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন (তাতেই আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি)। তারপর তিনি প্রায় ওপরের হাদীসে উদ্ধৃত কালেমাগুলোর মতো কিছু কালেমা শুনালেন। মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রা) থেকেও এমনি ধরনের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসার (রা) বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত হাফসা (রা) বলেন ঃ একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমার কাছে শিফা* নামের এক মহিলা বসেছিলেন।

* ভদ্র মহিলার আসল নাম ছিল লাইলা। কিন্তু তিনি শিফা বিনতে আবদুল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন। হিজরাতের আগে মুসলমান হন। তাঁর সম্পর্ক ছিল কুরাইশদের বনি আদী বংশের সাথে। হযরত উমরও (রা) এ বংশের অন্তরভুক্ত ছিলেন। এভাবে তিনি ছিলেন হযরত হাফসার (রা) আত্মীয়া।

তিনি পিঁপড়া বা মাছি প্রভৃতির দংশনে ঝাড়-ফুঁক করতেন। রসূলে করীম (সা) বললেন ঃ হাফসাকেও এ আমল শিখিয়ে দাও। শিফা বিনতে আবদুল্লাহর এ সংক্রান্ত একটি রেওয়ায়াত ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি হাফসাকে যেমন লেখাপড়া শিখিয়েছো তেমনিভাবে এ ঝাড়-ফুঁকের আমলও শিখিয়ে দাও।

মুসলিমে আউফ ইবনে মালেক আশজায়ীর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন ঃ জাহেলিয়াতের যুগে আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, তোমরা যে জিনিস দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করো তা আমার সামনে পেশ করো। তার মধ্যে যদি শিরক না থাকে তাহলে তার সাহায্যে ঝাড়ায় কোন ক্ষতি নেই।

মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঝাড়-ফুঁক নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তারপর হযরত আমর ইবনে হাযমের বংশের লোকেরা এলো। তারা বললো, আমাদের কাছে এমন কিছু আমল ছিল যার সাহায্যে আমরা বিচ্ছু (বা সাপ) কামড়ানো রোগীকে ঝাড়তাম, কিন্তু আপনি তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তারপর তারা যা পড়তো তা তাঁকে শুনালো। তিনি বললেন, "এর মধ্যে তো আমি কোন ক্ষতি দেখছি না। তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে তাহলে তাকে অবশ্যি তা করা উচিত।" জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) দ্বিতীয় হাদীসটি মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ হাযম পরিবারের লোকেরা সাপে কামড়ানো রোগীর নিরাময়ের একটা প্রক্রিয়া জানতো। রসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে তা প্রয়োগ করার অনুমতি দেন। মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজায় হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতটিও একথা সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের একটি পরিবারকে প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর কামড়ে ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসলিমেও হযরত আনাস (রা) থেকে প্রায় এ একই ধরনের একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বিষাক্ত প্রাণীদের কামড়, পিঁপড়ার দংশন ও নজর লাগার জন্য ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম হযরত উমাইর মাওলা আবিল লাহাম (রা) থেকে একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমি একটি আমল জানতাম। তার সাহায্যে আমি ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তা পেশ করলাম। তিনি বললেন, উমুক উমুক জিনিস এ থেকে বের করে দাও, এরপর যা থাকে তার সাহায্যে তুমি ঝাড়তে পারো।

মুআত্তায় বলা হয়েছে হযরত আবু বকর (রা) তাঁর মেয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে গেলেন। দেখলেন তিনি অসুস্থ এবং একটি ইহুদী মেয়ে তাঁকে ঝাড়-ফুঁক করছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব পড়ে ঝাড়ো। এ থেকে জানা গেলো, আহলি কিতাবরা যদি তাওরাত বা ইঞ্জিলের আয়াত পড়ে ঝাড়-ফুঁক করে তাহলে তা জায়েয।

এখন ঝাড়–ফুঁক উপকারী কি না এ প্রশ্ন দেখা দেয়। এর জবাবে বলা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহার করতে কখনো নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক রোগের ঔষধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমরা রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ ব্যবহার করো। রসূল (সা) নিজেও লোকদেরকে কোন কোন রোগের ঔষধ বলে দিয়েছেন। হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত 'কিতাবুত তিব" (চিকিৎসা অধ্যায়) পাঠ করলে একথা জানা যেতে পারে। কিন্তু ঔষধও আল্লাহর হুকুম ও অনুমতিক্রমেই উপকারী হতে পারে। নয়তো ঔষধ ও চিকিৎসা যদি সব অবস্থায় উপকারী হতো তাহলে হাসপাতালে একটি রুগীও মরতো না। এখন চিকিৎসা ও ঔষধের সাথে সাথে যদি আল্লাহর কালাম ও তাঁর আসমায়ে হুসনা (ভালো ভালো নাম) থেকে ফায়দা হাসিল করা যায় অথবা যেসব জায়গায় চিকিৎসার কোন সুযোগ সুবিধা নেই সেখানে যদি আল্লাহর কালামের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর পবিত্র নাম ও গুণাবলীর সহায়তা লাভ করা হয় তাহলে এ পদক্ষেপ একমাত্র বস্তুবাদীরা ছাড়া আর কারো কাছে বিবেক বিরোধী মনে হবে না।* তবে যেখানে চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহার করার সুযোগ সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয় সেখানে জেনে বুঝেও তা গ্রহণ না করে শুধুমাত্র ঝাড়–ফুঁকের ওপর নির্ভর করা কোনক্রমেই সঠিক পদক্ষেপ বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। আর এভাবে একদল লোককে মাদুলি তাবীজের দোকান খুলে সুযোগ মতো দু'পয়সা কামাই করার অনুমতিও কোনক্রমেই দেয়া যেতে পারে না।

এ ব্যাপারে অনেকে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় উদ্ধৃত হয়েছে। বুখারীতে উদ্ধৃত ইবনে আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনাও এর সমর্থন করে। এতে বলা হয়েছে ঃ রসূলে করীম (সা) কয়েকজন সাহাবীকে একটি অভিযানে পাঠান। হযরত আবু সাঈদ খুদরীও (রা) তাঁদের সাথে ছিলেন। তাঁরা পথে একটি আরব গোত্রের পল্লীতে অবস্থান করেন। তারা গোত্রের লোকদের কাছে তাঁদের মেহমানদারী করার আবেদন জানান। কিন্তু তারা অস্বীকার করে। এ সময় গোত্রের সরদারকে বিচ্ছু কামড় দেয়। লোকেরা এ মুসাফির দলের কাছে এসে আবেদন জানায়, তোমাদের কোন ঔষধ বা আমল জানা থাকলে আমাদের সরদারের চিকিৎসা করো। হযরত

* বস্তুবাদী দুনিয়ার অনেক ডাক্তারও একথা স্বীকার করেছেন যে, দোয়া ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ মানসিক সংযোগ রোগীদের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর উপাদান। আমার নিজের জীবনেও আমি এ ব্যাপারে দু'বার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ১৯৪৮ সালে কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় আমার মূত্রনালিতে একটি পাথর সৃষ্টি হয়। ষোল ঘন্টা পর্যন্ত পেশাব আটকে থাকে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ! আমি জালেমদের কাছে চিকিৎসার জন্য আবেদন করতে চাই না। তুমিই আমার চিকিৎসা করো। কাজেই পেশাবের রাস্তা থেকে পাথরটি সরে যায় এবং পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত সরে থাকে। তারপর ১৯৬৮ সালে সেটি আবার কষ্ট দিতে থাকে। তখন অপারেশন করে তাকে বের করে ফেলা হয়। আর একবার ১৯৫৩ সালে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় আমি কয়েক মাস থেকে দু'পায়ের গোছায় দাদে আক্রান্ত হয়ে ভীষণ কষ্ট পেতে থাকি। কোন রকম চিকিৎসায় আরাম পাচ্ছিলাম না। গ্রেফতারীর পর আল্লাহর কাছে ১৯৪৮ সালের মতো আবার সেই একই দোয়া করি। এরপর কোন প্রকার চিকিৎসা ও ঔষধ ছাড়াই সমস্ত দাদ একেবারে নির্মূল হয়ে যায়। তারপর আর কখনো এ রোগে আক্রান্ত হইনি।

আবু সাঈদ বলেন, আমরা জানি ঠিকই, তবে যেহেতু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করেছো, তাই আমাদের কিছু দেবার ওয়াদা না করলে আমরা চিকিৎসা করবো না। তারা একটি ছাগলের পাল (কোন কোন বর্ণনা মতে ৩০টি ছাগল) দেবার ওয়াদা করে। ফলে হযরত আবু সাঈদ সরদারের কাছে যান। তার ওপর সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিতে থাকেন এবং যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়েছে সেখানে নিজের মুখের লালা মলতে থাকেন।* অবশেষে বিষের প্রভাব খতম হয়ে যায়। গোত্রের লোকেরা তাদের ওয়াদা মতো ছাগল দিয়ে দেয়। কিন্তু সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে বলতে থাকেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস না করে এ ছাগলগুলো থেকে কোন ফায়দা হাসিল করা যাবে না। কারণ, এ কাজে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিনা তাতো জানা নেই। কাজেই তাঁরা নবী করীমের (সা) কাছে আসেন এবং সব ঘটনা বয়ান করেন। তিনি হেসে বলেন, তোমরা কেমন করে জানলে এ সূরা ঝাড়-ফুঁকের কাজেও লাগতে পারে? ছাগল নিয়ে নাও এবং তাতে আমার ভাগও রাখো।

কিন্তু তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীস থেকে মাদুলি, তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে রীতিমতো চিকিৎসা করার জন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার অনুমতি প্রমাণ করার আগে তদানীন্তন আরবের অবস্থাও সামনে রাখতে হবে। তৎকালীন আরবের এ অবস্থার চাপেই হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এ কাজ করেছিলেন। রসূলে করীমও (সা) একে শুধু জায়েযই ঘোষণা করেননি বরং এতে নিজের অংশ রাখার হুকুমও দিয়েছিলেন, যাতে তার জায়েয ও নাজায়েয হবার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট লোকদের মনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আরবের অবস্থা সেকালে যেমনটি ছিল আজকেও তেমনটিই রয়ে গেছে। পঞ্চাশ, একশো, দেড়শো মাইল চলার পরও একটি জনবসতি চোখে পড়ে না। জনবসতিগুলোও ছিল ভিন্ন ধরনের। সেখানে কোন হোটেল, সরাইখানা বা দোকান ছিল না। মুসাফিররা এক জনবসতি থেকে রওয়ানা হয়ে কয়েকদিন পরিশ্রম করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অন্য বসতিতে পৌঁছে যে খাবার-দাবার কিনে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবে, এ ধরনের কোন ব্যবস্থাও সেকালে ছিল না। এ অবস্থায় আরবের প্রচলিত রীতি ছিল, মুসাফিররা এক জনবসতি থেকে আর এক জনবসতিতে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরাই তাদের মেহমানদারী করতো। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালে মুসাফিরদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে উঠতো। কাজেই এ ধরনের কার্যকলাপ আরবে অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করা হতো। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সাহাবীগণের এহেন কার্যকলাপকে বৈধ গণ্য করেন। গোত্রের লোকেরা যখন মুসাফিরদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন তাদের সরদারের চিকিৎসা করতেও তাঁরা অস্বীকার করেন এবং পরে বিনিময়ে কিছু দেয়ার শর্তে তাঁর চিকিৎসা করতে রাজী হন। তারপর তাদের একজন আল্লাহর ওপর ভরসা করে সূরা ফাতেহা পড়েন এবং সরদারকে ঝাড়-ফুঁক করেন। এর ফলে সরদার সুস্থ হয়ে ওঠে। ফলে গোত্রের লোকেরা চুক্তি মোতাবেক পারিশ্রমিক এনে তাঁদের সামনে হাযির করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হালাল গণ্য করেন।

* হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) যে এ আমলটি করেছিলেন এ ব্যাপারে অধিকাংশ হাদীসে সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। এমন কি হযরত আবু সাঈদ নিজে এ অভিযানে শরীক ছিলেন কি না একথাও সেখানে সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু তিরমিযী বর্ণিত হাদীসে এ দু'টি কথাই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

বুখারী শরীফে এ ঘটনা সম্পর্কিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) যে রেওয়ায়াত আছে তাতে রসূলে করীমের (সা) বক্তব্যে বলা হয়েছে ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتب الله তোমরা অন্য কোন আমল না করে আল্লাহর কিতাব পড়ে পারিশ্রমিক নিয়েছো, এটা তোমাদের জন্য বেশী ন্যায়সংগত হয়েছে। তাঁর একথা বলার কারণ হচ্ছে, অন্যান্য সমস্ত আমলের তুলনায় আল্লাহর কালাম শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া এভাবে আরবের সংশ্লিষ্ট গোত্রটির ওপর ইসলাম প্রচারের হকও আদায় হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কালাম এনেছেন তার বরকত তারা জানতে পারে। যারা শহরে ও গ্রামে বসে ঝাড়-ফুঁকের কারবার চালায় এবং একে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করে তাদের জন্য এ ঘটনাটিকে নজীর বলে গণ্য করা যেতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও প্রথম যুগের ইমামগণের মধ্যে এর কোন নজীর পাওয়া যায় না।

সূরা ফাতেহার সাথে এ সূরা দু'টির সম্পর্ক

সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাস সম্পর্কে সর্বশেষ বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে, এ সূরা দু'টির সাথে কুরআনের প্রথম সূরা আল ফাতেহার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কুরআন মজীদ যেভাবে নাযিল হয়েছে, লিপিবদ্ধ করার সময় নুযুলের সেই ধারাবাহিকতার অনুসরণ করা হয়নি। তেইশ বছর সময়-কালে বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এর আয়াত ও সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। বর্তমানে আমরা কুরআনকে যে আকৃতিতে দেখছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাকে এ আকৃতি দান করেননি বরং কুরআন নাযিলকারী আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী এ আকারে তাকে বিন্যস্ত করেছেন। এ বিন্যাস অনুযায়ী কুরআনের সূচনা হয় সূরা ফাতেহা থেকে এবং সমাপ্তি হয় আল ফালাক ও আন নাসে এসে। এখন উভয়ের ওপর একবার দৃষ্টি বুলালে দেখা যাবে, শুরুতে রাব্বুল আলামীন, রহমান রহীম ও শেষ বিচার দিনের মালিক আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করে বান্দা নিবেদন করছে, আমি তোমারই বন্দেগী করি, তোমারই কাছে সাহায্য চাই এবং তোমার কাছে আমি যে সবচেয়ে বড় সাহায্যটা চাই সেটি হচ্ছে এই যে, আমাকে সহজ-সরল-সত্য পথটি দেখিয়ে দাও। জবাবে সোজা পথ দেখাবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে পুরো কুরআন মজীদটি নাযিল করা হয়। একে এমন একটি বক্তব্যের ভিত্তিতে শেষ করা হয় যখন বান্দা সকাল বেলার রব, মানব জাতির রব, মানব জাতির বাদশাহ ও মানব জাতির ইলাহ মহান আল্লাহর কাছে এ মর্মে আবেদন জানায় যে, সে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রত্যেকটি ফিতনা ও অনিষ্টকারিতা থেকে সংরক্ষিত থাকার জন্য একমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে জিন ও মানব জাতির অন্তরভুক্ত শয়তানদের প্ররোচনা থেকে সে একমাত্র তাঁর-ই আশ্রয় চায়। কারণ, সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে সে-ই হয় সবচেয়ে বড় বাধা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সূরা ফাতেহার সূচনার সাথে এই শেষ দুই সূরার যে সম্পর্ক তা কোন গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির অগোচরে থাকার কথা নয়।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

বলো,[১] আশ্রয় চাচ্ছি[২] আমি প্রভাতের রবের,[৩] এমন প্রত্যেকটি জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।[৪] এবং রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়।[৫] আর গিরায় ফুঁৎকারদানকারীদের (বা কারিনীদের) অনিষ্টকারিতা থেকে।[৬] এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন সে হিংসা করে।[৭]

১. রিসালাতের প্রচারের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর মাধ্যমে যে পয়গাম নাযিল হয় قُلْ (বলো) শব্দটি যেহেতু তার একটি অংশ, তাই একথাটি প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে উচ্চারিত হলেও তার পরে প্রত্যেক মু'মিনও এ সম্বোধনের আওতাভুক্ত হয়।

২. আশ্রয় চাওয়া কাজটির তিনটি অপরিহার্য অংশ রয়েছে। এক, আশ্রয় চাওয়া। দুই, যে আশ্রয় চায়। তিন, যার কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়। আশ্রয় চাওয়ার অর্থ, কোন জিনিসের ব্যাপারে ভয়ের অনুভূতি জাগার কারণে নিজেকে তার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অন্য কারো হেফাজতে চলে যাওয়া, তার অন্তরাল গ্রহণ করা, তাকে জড়িয়ে ধরা বা তার ছায়ায় চলে যাওয়া। আশ্রয়প্রার্থী অবশ্যি এমন এক ব্যক্তি হয়, যে অনুভব করে যে, সে যে জিনিসের ভয়ে ভীত তার মোকাবেলা করার ক্ষমতা তার নেই। বরং তার হাত থেকে বাঁচার জন্য তার অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। তারপর যার আশ্রয় চাওয়া হয় সে অবশ্যি এমন কোন ব্যক্তিত্ব বা সত্তা হয় যার ব্যাপারে আশ্রয় গ্রহণকারী মনে করে সেই ভয়ংকর জিনিস থেকে সে-ই তাকে বাঁচাতে পারে। এখন এক প্রকার আশ্রয়ের প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কার্যকারণের জগতে কোন অনুভূত জড় পদার্থ, ব্যক্তি বা শক্তির কাছে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন দুর্গের আশ্রয় নেয়া, গোলাগুলীর বর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য পরিখা, বালি ভর্তি থলের প্রাচীর বা

ইটের দেয়ালের আড়াল নেয়া, কোন শক্তিশালী জালেমের হাত থেকে বাঁচার জন্য কোন ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করা অথবা রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কোন গাছ বা দালানের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া। এর বিপরীতে দ্বিতীয় প্রকারের আশ্রয় হচ্ছে, প্রত্যেক ধরনের বিপদ, প্রত্যেক ধরনের বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে কোন অতি প্রাকৃতিক সত্তার আশ্রয় এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা যে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অননুভূত পদ্ধতিতে তিনি আশ্রয় গ্রহণকারীকে অবশ্যি সংরক্ষণ করতে পারবেন।

শুধু এখানেই নয়, কুরআন ও হাদীসের যেখানেই আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার কথা এসেছে, সেখানেই এ বিশেষ ধরনের আশ্রয় চাওয়ার অর্থেই তা বলা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে এ ধরনের আশ্রয় প্রার্থনা না করাটাই তাওহীদী বিশ্বাসের অপরিহার্য অংগ। মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সত্তা যেমন জিন, দেবী ও দেবতাদের কাছে এ ধরনের আশ্রয় চাইতো এবং আজো চায়। বস্তুবাদীরা এ জন্য বস্তুগত উপায়–উপকরণের দিকে মুখ ফিরায়। কারণ, তারা কোন অতি প্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু মু'মিন যেসব আপদ–বিপদ ও বালা–মুসিবতের মোকাবেলা করার ব্যাপারে নিজেকে অক্ষম মনে করে, সেগুলোর ব্যাপারে সে একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ ফিরায় এবং একমাত্র তাঁরই সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থনা করে। উদাহরণ স্বরূপ মুশরিকদের ব্যাপরে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ -

"আর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানব জাতির অন্তরভুক্ত কিছু লোক জিন জাতির অন্তরভুক্ত কিছু লোকের কাছে আশ্রয় চাইতো।" (আল জিন, ৬) এর ব্যাখ্যায় আমরা সূরা জিনের ৭ টীকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করছি। তাতে বলা হয়েছে ঃ আরব মুশরিকদের যখন কোন রাতে কোন জনমানবহীন উপত্যকায় রাত কাটাতে হতো তখন তারা চিৎকার করে বলতো ঃ "আমরা এ উপত্যকার রবের (অর্থাৎ এ উপত্যকার ওপর কর্তৃত্বশালী জিন বা এ উপত্যকার মালিক) আশ্রয় চাচ্ছি।" অন্যদিকে, ফেরাউন সম্পর্কে, বলা হয়েছে ঃ হযরত মূসার (আ) পেশকৃত মহান নিশানীগুলো দেখে (فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ) "নিজের শক্তি সামর্থের ওপর নির্ভর করে সে সদর্পে নিজের ঘাড় ঘুরিয়ে থাকলো।" (আয যারিয়াত, ৩৯)। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ বিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ তারা বস্তগত, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন জিনিসের ভীতি অনুভব করলে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে। কাজেই হযরত মারয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ যখন অকস্মাৎ নির্জনে আল্লাহর ফেরেশতা একজন মানুষের বেশ ধরে তাঁর কাছে এলেন (তিনি তাঁকে আল্লাহর ফেরেশতা বলে জানতেন না) তখন তিনি বললেন ঃ

أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا -

"যদি তোমার আল্লাহর ভয় থাকে, তাহলে আমি দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।" (মারয়াম, ১৮) হযরত নূহ (আ) যখন আল্লাহর কাছে অবাস্তব দোয়া করলেন এবং জবাবে আল্লাহ তাঁকে শাসালেন তখন তিনি সংগে সংগেই আবেদন জানালেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْـئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ

"হে আমার রব! যে জিনিস সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই তেমন কোন জিনিস তোমার কাছে চাওয়া থেকে আমি তোমার পানাহ চাই।" (হুদ, ৪৭) হযরত মূসা (আ) যখন বনি ইসরাঈলদের গাভী যবেহ করার হুকুম দিলেন এবং তারা বললো, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন? তখন তিনি তাদের জবাবে বললেন ঃ

اَعُوْذُ بِـاللّٰـهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْـجٰـهِلِـيْنَ

"আমি মূর্খ–অজ্ঞদের মতো কথা বলা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।"
(আল বাকারাহ, ৬৭)

হাদীস গ্রন্থগুলোতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব "তাআউউয" উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলো এ একই পর্যায়ের। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর নিম্নোক্ত দোয়াগুলো দেখা যেতে পারে ঃ

عـن عائـشـة ان الـنـبى صـلـى الله عليه وسلـم كان يـقول فـى دعـائـه

اَللّٰـهُـمَّ اِنِّـى اَعُـوْذُبِـكَ مِـنْ شَرِّ مَـاعَـمِلْتُ وَمِـنْ شَرِّ مَـالَمْ اَعْـمَلْ (مـسـلـم)

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দোয়াগুলোতে বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি যেসব কাজ করেছি এবং যেসব কাজ করিনি তা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। অর্থাৎ কোন খারাপ কাজ করে থাকলে তার খারাপ ফল থেকে পানাহ চাই এবং কোন কাজ করা উচিত ছিল কিন্তু তা আমি করিনি, যদি এমন ব্যাপার ঘটে থাকে তাহলে তার অনিষ্ট থেকেও তোমার পানাহ চাই। অথবা যে কাজ করা উচিত নয় কিন্তু তা আমি কখনো করে ফেলবো, এমন সম্ভাবনা থাকলে তা থেকেও তোমার আশ্রয় চাই।" (মুসলিম)

عن ابـن عـمـر رض كـان مـن دعـآءِ رسـول اللّٰه صـلـى اللّٰه عـلـيـه وسـلـم

اَللّٰـهُـمَّ اِنِّـى اَعُـوْذُبِـكَ مِـنْ زَوَالِ نِـعْـمَـتِكَ وَتَـحَـوُّلِ عَـافِـيَـتِـكَ وَفَـجَـاْءَةِ نِـقْـمَـتِـكَ وَجَـمِـيْـعِ سَـخَـطِـكَ (مـسـلـم)

"ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দোয়া ছিল ঃ হে আল্লাহ! তোমার যে নিয়ামত আমি লাভ করেছি তা যাতে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয়, তোমার কাছ থেকে যে নিরাপত্তা আমি লাভ করেছি তা থেকে যাতে আমাকে বঞ্চিত না করা হয়, তোমার গযব যাতে অকস্মাৎ আমার ওপর আপতিত না হয় সে জন্য এবং তোমার সব ধরনের অসন্তুষ্টি থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি" (মুসলিম)।

عـن زيـدبـن ارقـم كـان رسـول اللّٰـه صـلـى اللّٰـه عـلـيـه وسـلـم يـقـول اللّٰـهُـمَّ

اِنِّـى اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَّيَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَّتَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَّ يُسْتَجَابُ (مسلم)

"যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ যে ইলম উপকারী নয়, যে হৃদয় তোমার ভয়ে ভীত নয়, যে নফস কখনো তৃপ্তি লাভ করে না এবং যে দোয়া কবুল করা হয় না, আমি সেসব থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি" (মুসলিম)।

عَنْ ابى هريرة كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهُ بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ (ابو داود)

'হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি ক্ষুধা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। কারণ, মানুষ যেসব জিনিসের সাথে রাত অতিবাহিত করে তাদের মধ্যে ক্ষুধা সবচেয়ে খারাপ জিনিস। আর আত্মসাৎ থেকে তোমার আশ্রয় চাই। কারণ এটা বড়ই কলুষিত হৃদয়ের পরিচায়ক।" (আবু দাউদ)।

عَنْ انس ان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم كان يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْاَسْقَامِ (ابو داود)

"হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি শ্বেতকুষ্ঠ, উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ ও সমস্ত খারাপ রোগ থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" (আবু দাউদ)

عن عائشة ان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكمات اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ –

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত কথাগুলো সহ দোয়া চাইতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আগুনের ফিত্না এবং ধনী ও দরিদ্র হওয়ার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই" (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

عن قطبة بن مالك كان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ (ترمزى)

"কুতবাহ ইবনে মালেক বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! আমি অসৎ চরিত্র, অসৎ কাজ ও অসৎ ইচ্ছা থেকে তোমার আশ্রয় চাই।"

শাকাল ইবনে হুমাইদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমাকে কোন দোয়া বলে দিন। জবাবে তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ –

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার শ্রবণশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার বাকশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে এবং আমার যৌন ক্ষমতার অনিষ্ট থেকে।" (তিরমিযী ও আবু দাউদ)।

عَنْ انس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (وفى رواية لمسلم) وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ (بخارى ومسلم)

"আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, কুড়েমি, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আর তোমার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। (মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ) আর ঋণের বোঝা থেকে এবং লোকেরা আমার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, এ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حُكَيْمِ السُّلَمِيَّةِ سمعتُ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقول مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّه شَيْئٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ ذٰلِكَ الْمَنْزِلِ (مسلم)

"খাওলা বিনতে হুকাইম সুলামীয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন নতুন মনযিলে নেমে একথাগুলো বলবে—আমি সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর নিষ্কলংক কালেমাসমূহের আশ্রয় চাই, সেই মনযিল থেকে রওয়ানা হবার আগে পর্যন্ত তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না।" (মুসলিম)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে যেভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন হাদীস থেকে তার কয়েকটি নমুনা এখানে আমরা তুলে ধরলাম। এ থেকে জানা যাবে, প্রতিটি বিপদ–আপদ ও অনিষ্টকারিতার মোকাবেলায় আল্লাহর কাছে আশ্রয়

চাওয়াই মু'মিনের কাজ। অন্য কারো কাছে নয়। তাছাড়া আল্লাহর প্রতি বিমুখ ও অনির্ভর হয়ে নিজের ওপর ভরসা করাও তার কাজ নয়।

৩. মূলে رَبِّ الْفَلَقِ (রব্বিল ফালাক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "ফালাক" শব্দের আসল মানে হচ্ছে ফাটানো, চিরে ফেলা বা ভেদ করা। কুরআন ব্যাখ্যাদাতাদের বিপুল সংখ্যক অংশ এ শব্দটির অর্থ গ্রহণ করেছেন, রাতের অন্ধকার চিরে প্রভাতের শুভ্রতার উদয় হওয়া। কারণ, আরবীতে "ফালাকুস সুবহ" (فَلَقُ الصبح) শব্দ "প্রভাতের উদয়" অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কুরআনেও মহান আল্লাহর জন্য فَالِقُ الْإِصْبَاحِ (ফালেকুল ইসবাহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে, "যিনি রাতের আঁধার চিরে প্রভাতের উদয় করেন।" (আল আন'আম, ৯৬) "ফালাক" শব্দের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে সৃষ্টি করা। কারণ দুনিয়ায় যত জিনিসই সৃষ্টি হয়, সবগুলোই কোন না কোন জিনিস ভেদ করে বের হয়। বীজের বুক চিরে সব ধরনের গাছ ও উদ্ভিদের অংকুর বের হয়। সব ধরনের প্রাণী মায়ের গর্ভাশয় চিরে অথবা ডিম ফুটে কিংবা অন্য কোন আবরণ ভেদ করে বের হয়। সমস্ত ঝরণা ও নদী পাহাড় বা মাটি চিরে বের হয়। দিবস বের হয় রাতের আবরণ চিরে। বৃষ্টির ধারা মেঘের স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে নামে। মোটকথা, অস্তিত্ব জগতের প্রতিটি জিনিস কোন না কোনভাবে আবরণ ভেদ করার ফলে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে। এমনকি পৃথিবী ও সমগ্র আকাশ মণ্ডলও প্রথমে একটি স্তূপ ছিল, তারপর তাকে বিদীর্ণ করে পৃথক পৃথক অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا এ আকাশ ও পৃথিবী সবকিছুই স্তূপীকৃত ছিল, পরে আমি এদেরকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি। (আল আম্বিয়া, ৩০) কাজেই এ অর্থের প্রেক্ষিতে ফালাক শব্দটি সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। এখন এর প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় চাচ্ছি। আর দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে এর মানে হবে, আমি সমগ্র সৃষ্টি জগতের রবের আশ্রয় চাচ্ছি। এখানে আল্লাহর মূল সত্তাবাচক নাম ব্যবহার না করে তাঁর গুণবাচক নাম "রব" ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ, আশ্রয় চাওয়ার সাথে আল্লাহর "রব" অর্থাৎ মালিক, প্রতিপালক, প্রভু ও পরওয়ারদিগার হবার গুণাবলীই বেশী সম্পর্ক রাখে। তাছাড়া "রব্বুল ফালাক" এর অর্থ যদি প্রভাতের রব ধরা হয় তাহলে তাঁর আশ্রয় চাওয়ার মানে হবে, যে রব অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে প্রভাতের আলো বের করে আনেন আমি তাঁর আশ্রয় নিচ্ছি। এর ফলে তিনি বিপদের অন্ধকার জাল ভেদ করে আমাকে নিরাপত্তা দান করবেন। আর যদি এর অর্থ সৃষ্টিজগতের রব ধরা হয়, তাহলে এর মানে হবে, আমি সমগ্র সৃষ্টির মালিকের আশ্রয় নিচ্ছি। তিনি নিজের সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আমাকে বাঁচাবেন।

৪. অন্য কথায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আমি তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি। এ বাক্যে চিন্তা করার মতো কয়েকটি বিষয় আছে। প্রথমত অনিষ্টকারিতা সৃষ্টির ব্যাপারটিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি। বরং সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর অনিষ্টকারিতাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে সৃষ্টির সাথে। অর্থাৎ একথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ যে অনিষ্টকারিতাসমূহ সৃষ্টি করেছেন সেগুলো থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ কোন সৃষ্টিকে অনিষ্টকারিতার জন্য সৃষ্টি

করেননি। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজ কল্যাণকর এবং কোন না কোন কল্যাণমূলক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই হয়ে থাকে। তবে সৃষ্টির মধ্যে তিনি যেসব গুণ সমাহিত করে রেখেছেন, যেগুলো তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন, সেগুলো থেকে অনেক সময় এবং অনেক ধরনের সৃষ্টি থেকে প্রায়ই অনিষ্টকারিতার প্রকাশ ঘটে।

দ্বিতীয়ত, যদি শুধু একটি মাত্র বাক্য বলেই বক্তব্য শেষ করে দেয়া হতো এবং পরবর্তী বাক্যগুলোতে বিশেষ বিশেষ ধরনের সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আলাদা আলাদাভাবে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করার কথা নাই–বা বলা হতো তাহলেও এ বাক্যটি বক্তব্য বিষয় পুরোপুরি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ, এখানে সমস্ত সৃষ্টিলোকের অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে নেয়া হয়েছে। এই ব্যাপকভাবে আশ্রয় চাওয়ার পর আবার কতিপয় বিশেষ অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা স্বতস্ফূর্তভাবে এ অর্থই প্রকাশ করে যে, আমি স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর প্রত্যেকটি সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি, তবে বিশেষভাবে সূরা আল ফালাকের অবশিষ্ট আয়াতসমূহে ও সূরা আন নাসে যেসব অনিষ্টকারিতার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো এমন পর্যায়ের যা থেকে আমি আল্লাহর নিরাপত্তা লাভের বড় বেশী মুখাপেক্ষী।

তৃতীয়ত, সৃষ্টিলোকের অনিষ্টকারিতা থেকে পানাহ লাভ করার জন্য সবচেয়ে সংগত ও প্রভাবশালী আশ্রয় চাওয়ার ব্যাপার যদি কিছু হতে পারে, তবে তা হচ্ছে তাদের স্রষ্টার কাছে আশ্রয় চাওয়া। কারণ, তিনি সব অবস্থায় নিজের সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন। তিনি তাদের এমন সব অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে জানেন যেগুলো আমরা জানি, আবার আমরা জানিনা এমনসব অনিষ্টকারিতা সম্পর্কেও তিনি জানেন। কাজেই তাঁর আশ্রয় হবে, যেন এমন সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের কাছে আশ্রয় গ্রহণ যার মোকাবেলা করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। তাঁর কাছে আশ্রয় চেয়ে আমরা দুনিয়ার প্রত্যেকটি সৃষ্টির জানা–অজানা অনিষ্টকারিতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। তাছাড়া কেবল দুনিয়ারই নয়, আখেরাতের সকল অনিষ্টকারিতা থেকেও পানাহ চাওয়াও এর অন্তরভুক্ত হয়েছে।

চতুর্থত, অনিষ্টকারিতা শব্দটি ক্ষতি, কষ্ট, ব্যথা ও যন্ত্রণার জন্যও ব্যবহার করা হয়। আবার যে কারণে ক্ষতি, কষ্ট, ব্যথা ও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় সে জন্যও ব্যবহার করা হয়। যেমন রোগ, অনাহার, কোন যুদ্ধে বা দুর্ঘটনায় আহত হওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া, সাপ–বিচ্ছু ইত্যাদি দ্বারা দংশিত হওয়া, সন্তানের মৃত্যু শোকে কাতর হওয়া এবং এ ধরনের আরো অন্যান্য অনিষ্টকারিতা প্রথমোক্ত অর্থের অনিষ্টকারিতা। কারণ, এগুলো যথার্থই কষ্ট ও যন্ত্রণা। অন্যদিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুফরী, শির্‌ক এবং যেসব ধরনের গোনাহ ও জুলুম দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্টকারিতা। কারণ, এগুলোর পরিণাম কষ্ট ও যন্ত্রণা। যদিও আপাত দৃষ্টিতে এগুলো সাময়িকভাবে কোন কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয় না বরং কোন কোন গোনাহ বেশ আরামের। সেসব গানাহ করে আনন্দ পাওয়া যায় এবং লাভের অংকটাও হাতিয়ে নেয়া যায়। কাজেই এ দু'অর্থেই অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়।

পঞ্চমত, অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাওয়ার মধ্যে আরো দু'টি অর্থও রয়েছে। যে অনিষ্ট ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, হে আল্লাহ! তাকে খতম করে দাও। আর যে অনিষ্ট এখনো হয়নি, তার সম্পর্কে বান্দা দোয়া করছে, হে আল্লাহ! এ অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো।

৫. সৃষ্টিজগতের অনিষ্টকারিতা থেকে সাধারণভাবে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার পর এবার কয়েকটি বিশেষ সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে বিশেষভাবে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। মূল আয়াতে غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'গাসেক' (غَاسِقٍ) এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অন্ধকার। কুরআনে এক জায়গায় বলা হয়েছে : اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ "নামায কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত।" (বনি ইসরাঈল, ৭৮)

আর 'ওয়া কাবা' (وَقَبَ) মানে হচ্ছে, প্রবেশ করা বা ছেয়ে যাওয়া। রাতের অন্ধকারের অনিষ্টকারিতা থেকে বিশেষ করে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ অপরাধ ও জুলুম রাতের অন্ধকারেই সংঘটিত হয়। হিংস্র জীবেরাও রাতের আঁধারেই বের হয়। আর এ আয়াতগুলো নাযিল হবার সময় আরবে রাজনৈতিক অরাজকতা যে অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল তাতে রাতের চিত্র তো ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। তার অন্ধকার চাদর মুড়ি দিয়ে লুটেরা ও আক্রমণকারীরা বের হতো। তারা জনবসতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো লুটতরাজ ও খুনাখুনি করার জন্য যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ নাশের চেষ্টা করছিল, তারাও রাতের আঁধারেই তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। কারণ, এভাবে হত্যাকারীকে চেনা যাবে না। ফলে তার সন্ধান লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই রাতের বেলা যেসব অনিষ্টকারিতা ও বিপদ-আপদ নাযিল হয় সেগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। এখানে আঁধার রাতের অনিষ্টকারিতা থেকে প্রভাতের রবের আশ্রয় চাওয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্মতম সম্পর্ক রয়েছে তা কোন গভীর পর্যবেক্ষকের দৃষ্টির আড়ালে থাকার কথা নয়।

এ আয়াতের ব্যাখার ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে হযরত আয়েশার (রা) একটি বর্ণনা এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, রাতে আকাশে চাঁদ ঝলমল করছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে তার দিকে ইশারা করে বললেন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাও : هٰذَا الْغَاسِقُ اِذَا وَقَبَ অর্থাৎ এ হচ্ছে সেই গাসেক ইযা ওয়াকাব (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়া)। এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, ইযা ওয়াকাব (اِذَا وَقَبَ) মানে হচ্ছে এখানে اِذَا خَسَقَ (ইযা খাসাকা) অর্থাৎ যখন তার গ্রহণ হয়ে যায় অথবা চন্দ্রগ্রহণ তাকে ঢেকে ফেলে। কিন্তু কোন হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, যখন রসূলুল্লাহ (সা) চাঁদের দিকে এভাবে ইশারা করেছিলেন তখন চন্দ্রগ্রহণ চলছিল। আরবী আভিধানিক অর্থেও اِذَا وَقَبَ কখনো اِذَا خَسَفَ হয় না। তাই আমার মতে এ হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে : চাঁদের উদয় যেহেতু রাতের বেলায়ই হয়ে থাকে এবং দিনের বেলা চাঁদ আকাশের গায়ে থাকলেও উজ্জ্বল থাকে না, তাই রসূলুল্লাহ (সা) উক্তির অর্থ হচ্ছে—এর (অর্থাৎ চাঁদের) আগমনের সময় অর্থাৎ রাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। কারণ, চাঁদের আলো আত্মরক্ষাকারীর জন্য ততটা সহায়ক হয় না, যতটা সহায়ক হয় আক্রমণকারীর জন্য আর তা অপরাধীকে যতটুকু সহায়তা করে, যে অপরাধের শিকার হয় তাকে ততটুকু সহায়তা করে না। এ জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ انتشرت الشياطين فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمه العشاء -

"যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন শয়তানরা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই শিশুদেরকে তখন ঘরের মধ্যে রাখো এবং নিজেদের গৃহপালিত পশুগুলোও বেঁধে রাখো, যতক্ষণ রাতের আঁধার খতম না হয়ে যায়।"

৬. মূলে نَفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। 'উকাদ' (عُقَد) শব্দটি "উকদাতুন" (عقدة) শব্দের বহুবচন। এর মানে হচ্ছে গিরা। যেমন সূতা বা রশিতে যে গিরা দেয়া হয়। নাফস (نفث) মানে ফুঁক দেয়া। নাফফাসাত (نَفّٰثٰتِ) হচ্ছে নাফফাসাহ (نفاثه)–এর বহুবচন। এ শব্দটিকে علامه এর ওজনে ধরা হলে এর অর্থ হবে খুব বেশী ফুঁকদানকারী। আর স্ত্রীলিংগে এর অর্থ করলে দাঁড়ায় খুব বেশী ফুঁকদানকারিনীরা অথবা ফুঁকদানকারী ব্যক্তিবর্গ বা দলেরা। কারণ আরবীতে "নফস" (ব্যক্তি) ও "জামায়াত" (দল) স্ত্রীলিংগ অধিকাংশ তথা সকল মুফাস্‌সিরের মতে গিরায় ফুঁক দেয়া শব্দটি যাদুর জন্য রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ, যাদুকর সাধারণত কোন সূতায় বা ডোরে গিরা দিতে এবং তাতে ফুঁক দিতে থাকে। কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমি পুরুষ যাদুকর বা মহিলা যাদুকরদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য প্রভাতের রবের আশ্রয় চাচ্ছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যখন যাদু করা হয়েছিল, তখন জিব্রীল আলাইহিস সালাম এসে তাঁকে সূরা আল ফালাক ও আন নাস পড়তে বলেছিলেন। এ হাদীসটি থেকেও ওপরের অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এ সূরা দু'টির এ একটি বাক্যই সরাসরি যাদুর সাথে সম্পর্ক রাখে। আবু মুসলিম ইসফাহানী ও যামাখশারী 'নাফফাসাত ফিল উকাদ' বাক্যাংশের অন্য একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, এর মানে হচ্ছে ঃ মেয়েদের প্রতারণা এবং পুরুষদের সংকল্প, মতামত ও চিন্তা–ভাবনার ওপর তাদের প্রভাব বিস্তার। একে তারা তুলনা করেছেন যাদুকরের যাদুকর্মের সাথে। কারণ, মেয়েদের প্রেমে মত্ত হয়ে পুরুষদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেন মনে হয় কোন যাদুকর তাদেরকে যাদু করেছে। এ ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত রসাত্মক হলেও পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাদাতাগণ এর যে ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন, এটি সেই স্বীকৃত ব্যাখ্যার পরিপন্থী। আর ইতিপূর্বে আমরা ভূমিকায় এ দু'টি সূরা নাযিলের যে সমকালীন অবস্থার বর্ণনা দিয়ে এসেছি তার সাথে এর মিল নেই।

যাদুর ব্যাপারে অবশ্যি একথা জেনে নিতে হবে, এর মধ্যে অন্য লোকের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলার জন্য শয়তান, প্রেতাত্মা বা নক্ষত্রসমূহের সাহায্য চাওয়া হয়। এ জন্য কুরআনে একে কুফরী বলা হয়েছে।

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ

"সুলাইমান কুফরী করেনি। বরং শয়তানরা কুফরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো।" (আল বাকারা, ১০২) কিন্তু তার মধ্যে কোন কুফরী কালেমা বা শিরকী কাজ না থাকলেও তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এমন সাতটি কবীরা গোনাহের অন্তরভুক্ত করেছেন, যা মানুষের আখেরাত বরবাদ করে দেয়। এ

প্রসংগে বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকর জিনিস থেকে দূরে থাকো। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কি? বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু, আল্লাহ যে প্রাণ নাশ হারাম করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া সেই প্রাণ নাশ করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পত্তি গ্রাস করা, জিহাদে দুশমনের মোকাবিলায় পালিয়ে যাওয়া এবং সরল সতীসাধ্বী মু'মিন মেয়েদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের দোষারোপ করা।

৭. হিংসার মানে হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ যে অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব বা গুণাবলী দান করেছে তা দেখে কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে জ্বালা অনুভব করে এবং তার থেকে ওগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেয়া হোক, অথবা কমপক্ষে তার থেকে সেগুলো অবশ্যি ছিনিয়ে নেয়া হোক এ আশা করতে থাকে। তবে কোন ব্যক্তি যদি আশা করে, অন্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতিও তাই করা হোক, তাহলে এটাকে হিংসার সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। এখানে হিংসুক যখন হিংসা করে অর্থাৎ তার মনের আগুন নিভাবার জন্য নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেয়, সেই অবস্থায় তার অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। কারণ, যতক্ষণ সে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না ততক্ষণ তার জ্বালা-পোড়া তার নিজের জন্য খারাপ হলেও যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে তার জন্য এমন কোন অনিষ্টকারিতায় পরিণত হচ্ছে না, যার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া যেতে পারে। তারপর যখন কোন হিংসুক থেকে এমন ধরনের অনিষ্টকারিতার প্রকাশ ঘটে তখন তার হাত থেকে বাঁচার প্রধানতম কৌশল হিসেবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। এই সাথে হিংসুকের অনিষ্টকারিতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আরো কয়েকটি জিনিসও সহায়ক হয়। এক, মানুষ আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং আল্লাহ না চাইলে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, একথায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে। দুই, হিংসুকের কথা শুনে সবর করবে। বেসবর হয়ে এমন কোন কথা বলবে না বা কাজ করতে থাকবে না, যার ফলে সে নিজেও নৈতিকভাবে হিংসুকের সাথে একই সমতলে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। তিন, হিংসুক আল্লাহভীতি বিসর্জন দিয়ে বা চরম নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যতই অন্যায়-অশালীন আচরণ করতে থাকুক না কেন, যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে সে যেন সবসময় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। চার, তার চিন্তা যেন কোন প্রকারে মনে ঠাঁই না দেয় এবং তাকে এমনভাবে উপেক্ষা করবে যেন সে নেই। কারণ, তার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাওয়াই হিংসুকের হাতে পরাজয় বরণের পূর্ব লক্ষণ। পাঁচ, হিংসুকের সাথে অসদ্ব্যবহার করা তো দূরের কথা, কখনো যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে যে হিংসাকারীর সাথে সদ্ব্যবহার ও তার উপকার করতে পারে, তাহলে তার অবশ্যি তা করা উচিত। হিংসুকের মনে যে জ্বালাপোড়া চলছে, প্রতিপক্ষের এ সদ্ব্যবহারে তা কতটুকু প্রশমিত হচ্ছে বা হচ্ছে না সেদিকে নজর দেবার কোন প্রয়োজন নেই! ছয়, যে ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা হচ্ছে সে তাওহীদের আকীদা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে তার ওপর অবিচল থাকবে। কারণ, যে হৃদয়ে তাওহীদের আকীদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে আল্লাহর ভয়ের সাথে অপর কারো ভয় স্থান লাভ করতে পারে না।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلَٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের প্রকৃত মাবুদের কাছে,[১] এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে বারবার ফিরে আসে,[২] যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে, সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।[৩]

১. এখানেও সূরা আল ফালাকের মতো 'আউযু বিল্লাহ' বলে সরাসরি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার পরিবর্তে আল্লাহর তিনটি গুণের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর আশ্রয় নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ তিনটি গুণের মধ্যে একটি হচ্ছে, তাঁর রাব্বুন নাস অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির প্রতিপালক, মালিক ও প্রভু হওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তাঁর মালিকুন নাস অর্থাৎ সমস্ত মানুষের বাদশাহ, শাসক ও পরিচালক হওয়া। তৃতীয়টি হচ্ছে, তাঁর ইলাহুন নাস অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির প্রকৃত মাবুদ হওয়া। (এখানে একথা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, ইলাহ শব্দটি কুরআন মজীদে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, এমন বস্তু বা ব্যক্তি যার ইবাদাত গ্রহণ করার কোন অধিকারই নেই কিন্তু কার্যত তার ইবাদাত করা হচ্ছে। দুই, যার ইবাদাত গ্রহণ করার অধিকার আছে এবং যিনি প্রকৃত মাবুদ, লোকেরা তার ইবাদাত করুক বা না করুক। (আল্লাহর জন্য যেখানে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এ দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে)।

এ তিনটি গুণের কাছে আশ্রয় চাওয়ার মানে হচ্ছে : আমি এমন এক আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, যিনি সমস্ত মানুষের রব, বাদশাহ ও মাবুদ হবার কারণে তাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন, যিনি নিজের বান্দাদের হেফাজত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যথার্থই এমন অনিষ্টের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারেন, যার হাত থেকে নিজে বাঁচার এবং অন্যদের বাঁচাবার জন্য আমি তাঁর শরণাপন্ন হচ্ছি। শুধু এতটুকুই নয় বরং যেহেতু তিনিই রব, বাদশাহ ও ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যার কাছে আমি পানাহ চাইতে পারি এবং প্রকৃতপক্ষে যিনি পানাহ দেবার ক্ষমতা রাখেন।

২. মূলে وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে وسواس এর মানে হচ্ছে, বারবার প্ররোচনা দানকারী। আর "ওয়াসওয়াসাহ" মানে হচ্ছে, একের পর এক এমন পদ্ধতিতে মানুষের মনে কোন খারাপ কথা বসিয়ে দেয়া যে, যার মনে ঐ কথা বসিয়ে দেয়া হচ্ছে, ওয়াসওয়াসাহ সৃষ্টিকারী যে তার মনে ঐ কথা বসিয়ে দিচ্ছে তা সে অনুভবই করতে পারে না। ওয়াসওয়াসাহ শব্দের মধ্যেই বারবার হবার অর্থ রয়েছে, যেমন 'যালযালাহ' (ভূমিকম্প) শব্দটির মধ্যে রয়েছে, বারবার ভূকম্পনের ভাব। যেহেতু মানুষকে শুধুমাত্র একবার প্রতারণা করলেই সে প্রতারিত হয় না বরং তাকে প্রতারিত করার জন্য একের পর এক প্রচেষ্টা চালাতে হয়, তাই এ ধরনের প্রচেষ্টাকে 'ওয়াসওয়াসাহ' (প্ররোচনা) এবং প্রচেষ্টাকারীকে 'ওয়াসওয়াস' (প্ররোচক) বলা হয়। এখানে আর একটি শব্দ এসেছে খান্নাস। خناس এর মূল হচ্ছে খুনুস। خنوس এর মানে প্রকাশিত হবার পর আবার গোপন হওয়া অথবা সামনে আসার পর আবার পিছিয়ে যাওয়া। আর "খান্নাস" যেহেতু বেশী ও অত্যধিক বৃদ্ধির অর্থবোধক শব্দ, তাই এর অর্থ হয়, এ কাজটি বেশী বেশী বা অত্যধিক সম্পন্নকারী। একথা সুস্পষ্ট, প্ররোচনাদানকারীকে প্ররোচনা দেবার জন্য বারবার মানুষের কাছে আসতে হয়। আবার এই সঙ্গে যখন তাকে খান্নাসও বলা হয়েছে তখন এ দু'টি শব্দ পরস্পর মিলিত হয়ে আপনা আপনি এ অর্থ সৃষ্টি করেছে যে, প্ররোচনা দান করতে করতে সে পিছনে সরে যায় এবং তারপর প্ররোচনা দেবার জন্য আবার বারবার ফিরে আসে। অন্য কথায় একবার তার প্ররোচনা দান করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সে ফিরে যায়। তারপর সেই প্রচেষ্টা চালাবার জন্য বারবার সে ফিরে আসে।

"বারবার ফিরে আসা প্ররোচনাকারীর অনিষ্ট"—এর অর্থ বুঝে নেয়ার পর এখন তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার অর্থ কি, একথা চিন্তা করতে হবে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, আশ্রয় প্রার্থনাকারী নিজেই তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছে। অর্থাৎ এ অনিষ্ট তার মনে যেন কোন প্ররোচনা সৃষ্টি করতে না পারে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পথের দিকে আহবানকারীদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিই লোকদের মনে কোন প্ররোচনা সৃষ্টি করে বেড়ায় তার অনিষ্ট থেকে সত্যের আহবায়ক আল্লাহর আশ্রয় চায়। সত্যের আহবায়কের ব্যক্তি সত্তার বিরুদ্ধে যেসব লোকের মনে প্ররোচনা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার নিজের পক্ষে তাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে খুঁটে খুঁটে তাদের প্রত্যেকের বিভ্রান্তি দূর করে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করার যে কাজ সে করে যাচ্ছে তা বাদ দিয়ে প্ররোচনাকারীদের সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করার এবং তাদের অভিযোগের জবাব দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করাও তার পক্ষে সঙ্গত নয়। তার বিরুদ্ধবাদীরা যে পর্যায়ে নেমে এসেছে তার নিজের পক্ষেও সে পর্যায়ে নেমে আসা তার মর্যাদার পরিপন্থি। তাই মহান আল্লাহ সত্যের আহবায়কদের নির্দেশ দিয়েছেন, এ ধরনের অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর শরণাপন্ন হও এবং তারপর নিশ্চিন্তে নিজেদের দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করো। এরপর এদের মোকাবেলা করা তোমাদের কাজ নয়, রবুন নাস, মালিকুন নাস ও ইলাহুন নাস সর্বশক্তিমান আল্লাহরই কাজ।

এ প্রসঙ্গে একথাটিও অনুধাবন করতে হবে যে, ওয়াসওয়াসাহ বা প্ররোচনা হচ্ছে অনিষ্ট কর্মের সূচনা বিন্দু। যখন একজন অসতর্ক বা চিন্তাহীন মানুষের মনে তার প্রভাব পড়ে, তখন প্রথমে তার মধ্যে অসৎকাজ করার আকাংখা সৃষ্টি হয় তারপর আরো প্ররোচনা দান করার পর এ অসৎ আকাংখা অসৎ ইচ্ছায় পরিণত হয়। এরপর প্ররোচনার প্রভাব

বাড়তে থাকলে আরো সামনের দিকে গিয়ে অসৎ ইচ্ছা অসৎ সংকল্পে পরিণত হয়। আর তারপর এর শেষ পদক্ষেপ হয় অসৎকর্ম। তাই প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার অর্থ হবে, অনিষ্টের সূচনা যে স্থান থেকে হয়, মহান আল্লাহ যেন সেই স্থানেই তাকে নির্মূল করে দেন।

প্ররোচনা দানকারীদের অনিষ্টকারিতাকে অন্য এক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রথমে তারা খোলাখুলি কুফরী, শিরূক, নাস্তিকতা বা আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আল্লাহপন্থীদের সাথে শত্রুতার উস্কানী দেয়। এতে ব্যর্থ হলে এবং মানুষ আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করে গেলে তারা তাকে কোন না কোন বিদআতের পথ অবলম্বনের প্ররোচনা দেয়। এতেও ব্যর্থ হলে তাকে গোনাহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এখানেও সফলতা অর্জনে সক্ষম না হলে মানুষের মনে এ চিন্তার যোগান দেয় যে, ছোট ছোট সামান্য দু'চারটে গানাহ করে নিলে তো কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ এভাবে এ ছোট গানাহ–ই যদি বিপুল পরিমাণে করতে থাকে তাহলে বিপুল পরিমাণ গোনাহে মানুষ ডুবে যাবে। এ থেকেও যদি মানুষ পিঠ বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে শেষমেশ তারা চেষ্টা করে মানুষ যেন আল্লাহর সত্য দীনকে শুধুমাত্র নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে দেয় তাহলে জিন ও মানুষ শয়তানদের সমস্ত দল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে লোকদেরকে উস্কানি দিতে ও উত্তেজিত করতে থাকে। তার প্রতি ব্যাপকভাবে গালিগালাজ ও অভিযোগ–দোষারোপের ধারা বর্ষণ করতে থাকে। চতুর্দিক থেকে তার দুর্নাম রটাবার ও তাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করতে তাকে। তারপর শয়তান সে সেই মর্দে মু'মিনকে ক্রোধান্বিত করতে থাকে। সে বলতে থাকে, এসব কিছু নীরবে সহ্য করে নেয়া তো বড়ই কাপুরুষের কাজ। ওঠো, এ আক্রমণকারীদের সাথে সংঘর্ষ বাধাও। সত্যের দাওয়াতের পথ রুদ্ধ করার এবং সত্যের আহবায়কদেরকে পথের কাঁটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করার জন্য এটি হয় শয়তানের শেষ অস্ত্র। সত্যের আহবায়কদেরকে পথের কাঁটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করার জন্য এটি হয় শয়তানের শেষ অস্ত্র। সত্যের আহবায়ক এ ময়দান থেকেও যদি বিজয়ীর বেশে বের হয়ে আসে তাহলে শয়তান তার সামনে নিরুপায় হয়ে যায়। এ জিনিসটি সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমরা কোন উস্কানী অনুভব করো তাহলে আল্লাহর পানাহ চাও।" (হা–মীম সাজদাহ, ৩৬)

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ –

"বলো, হে আমার রব! আমি শয়তানদের উস্কানী থেকে তোমার পানাহ চাচ্ছি।" (আল মু'মিনূন, ৯৭)

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ

"যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের অবস্থা এমন হয় যে, কখনো শয়তানের প্রভাবে কোন অসৎ চিন্তা তাদেরকে স্পর্শ করলেও তারা সঙ্গে সঙ্গেই সজাগ হয়ে যায় এবং

তারপর (সঠিক পথ) তাদের দৃষ্টি সমক্ষে পরিষ্কার ভেসে উঠতে থাকে।"

(আল আরাফ, ২০১)।

আর এ জন্যই যারা শয়তানের এই শেষ অস্ত্রের আঘাতও ব্যর্থ করে দিয়ে সফলকাম হয়ে বেরিয়ে আসে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ

"অতি সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ এ জিনিস লাভ করতে পারে না।"

(হা–মীম আস সাজদাহ, ৩৫)

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও সামনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, মানুষের মনে কেবল জিন ও মানুষ দলভুক্ত শয়তানরাই বাইর থেকে প্ররোচনা দেয় না বরং ভেতর থেকে মানুষের নিজের নফসও প্ররোচনা দেয়। তার নিজের ভ্রান্ত মতবাদ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিপথে পরিচালিত করে। তার নিজের অবৈধ স্বার্থ–লালসা তার ইচ্ছা, সংকল্প, বিশ্লেষণ ও মীমাংসা করার ক্ষমতাকে অসৎপথে চালিত করে। আর বাইরের শয়তানরাই শুধু নয়, মানুষের ভেতরের তার নিজের নফসের শয়তানও তাকে ভুল পথে চালায়। একথাটিকেই কুরানের এক জায়গায় বলা হয়েছে এভাবে وَنَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ "আর আমি তাদের নফস থেকে উদ্ভূত প্ররোচনাসমূহ জানি।" (কাফ, ১৬) এ কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক বহুল প্রচারিত ভাষণে বলেন ঃ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا "আমরা নফসের অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি।"

৩. কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এ শব্দগুলোর অর্থ হচ্ছে, প্ররোচণা দানকারীরা দুই ধরনের লোকদের মনে প্ররোচনা দান করে। এক, জিন এবং দুই, মানুষ। এ বক্তব্যটি মেনে নিলে এখানে নাস نَاس বলতে জিন ও মানুষ উভয়কে বুঝাবে এবং তাঁরা বলেন, এমনটি হতে পারে। কারণ, কুরআনে যখন رِجَالٌ (পুরুষরা) শব্দটি জিনদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন সূরা জিনের ৬ আয়াতে দেখা যায় এবং যখন نَفَرٌ (দল) শব্দটির ব্যবহার জিনদের দলের ব্যাপারে হতে পারে, যেমন সূরা আহকাফের ২৯ আয়াতে দেখা যায়, তখন পরোক্ষভাবে 'নাস' শব্দের মধ্যে মানুষ ও জিন উভয়ই শামিল হতে পারে। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। কারণ نَاس – انس ও اِنْسَانٌ শব্দগুলো আভিধানিক দিকে দিয়েই جِنّ (জিন) শব্দের বিপরীতধর্মী। জিন–এর আসল মানে হচ্ছে গোপন সৃষ্টি। আর জিন মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকে বলেই তাকে জিন বলা হয়। বিপরীত পক্ষে 'নাস' ও 'ইনস' শব্দগুলো মানুষ অর্থে এ জন্য বলা হয় যে, তারা প্রকাশিত, তাদের চোখে দেখা যায় এবং ত্বক দিয়ে, অনুভব করা যায়। সূরা কাসাসের ২৯ আয়াতে اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا বলা হয়েছে। এখানে اٰنَسَ (আ–নাসা) মানে رَأَى (রাআ) অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) "তূর পাহাড়ের কিনারে আগুন দেখেন।" সূরা আন নিসার ৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا "যদি তোমরা অনুভব করো, এতিম শিশুদের এখন বুঝসুঝ হয়েছে।

اٰنَسْتُمْ (আ–নাসতুম) মানে اَحْسَسْتُمْ (আহসাসতুম) বা رَاَيْتُمْ (রাআইতুম)। কাজেই আরবী ভাষার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 'নাস' শব্দটির মানে জিন হতে পারে না।

তাই এখানে আয়াতটির সঠিক মানে হচ্ছে, "এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে সে জিনদের মধ্য থেকে হোক বা মানুষদের মধ্য থেকে।" অর্থাৎ অন্য কথায় বলা যায়, প্ররোচনা দান করার কাজ জিন শয়তানরাও করে আবার মানুষ শয়তানরাও করে। কাজেই এ সূরায় উভয়ের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন থেকে এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় এবং হাদীস থেকেও। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِي بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا –

"আর এভাবে আমি জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, তারা পরস্পরের কাছে মনোমুগ্ধকর কথা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে।" (আল আন আম, ১১২)

আর হাদীসে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনে হিব্বান হযরত আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তখন তিনি মসজিদে বসেছিলেন। তিনি বললেন, আবু যার! তুমি নামায পড়েছো? আমি জবাব দিলাম, না। বললেন, ওঠো এবং নামায পড়ো। কাজেই আমি নামায পড়লাম এবং তারপর আবার এসে বসলাম। তিনি বললেন ঃ

يَا اَبَاذَرِّ تَعَوَّذْ بِا اللّٰهِ مِنْ شَرِّ شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ –

"হে আবু যার! মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর পানাহ চাও!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যেও কি আবার শয়তান হয়? বললেন, হাঁ।

শেষ কথা

আমি ১৩৬১ হিজরীর মুহররম মাসে (ঈসায়ী ১৯৪২ ফেব্রুয়ারি) তাফহীমুল কুরআন লেখার যে সুকঠিন দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছিলাম, তিরিশ বছর চার মাস পরে আজ তা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি—এ জন্য গভীর আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি নিজের এক নগণ্য বান্দাকে তাঁর পবিত্র কিতাবের খেদমত করার তাওফীক দান করেছেন। তাঁর প্রত্যেক্ষ অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ তাফসীর গ্রন্থে আমি যা কিছু সঠিক ও সত্য আলোচনা করেছি তা মূলত মহান আল্লাহর হিদায়াত ও পথনির্দেশনার বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। আর যেখানেই কুরআনের ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে আমি কোন ভুল করেছি, তা অবশ্যি আমার নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার কমতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে আলহামদুলিল্লাহ! আমি জেনে-বুঝে কোন ভুল করিনি। তাই আল্লাহর অনুগ্রহের দরবারে এতটুকু আশা রাখি, তিনি এটি মাফ করে দেবেন এবং আমার এ কাজের মাধ্যমে তাঁর বান্দারা হিদায়াত লাভ করার ক্ষেত্রে কোন সহায়তা লাভ করে থাকলে তাকে আমার মাগফেরাতের মাধ্যমে পরিণত করবেন। আলেম সমাজের কাছেও আমার আবেদন, আমার ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে তাঁরা যেন আমাকে অবহিত করেন। যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে যে কথাটির ভ্রান্তি আমার সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হবে, ইনশাআল্লাহ আমি তা শুধরে নেবো। কিতাবুল্লাহর ব্যাপারে জেনে-বুঝে কোন ভুল করার এবং কোন ভুল প্রমাণিত হবার পরও তার ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে আমি আল্লাহর পানাহ চাই।

এ কিতাবে আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমি নিজে কুরআনকে যেভাবে বুঝেছি, সাধারণ শিক্ষিত লোকদেরকে সেভাবে কুরআন বুঝাবার জন্য এখানে চেষ্টা করেছি। কুরআনের আসল তাৎপর্য ও মূল বক্তব্য এমন দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরতে চেয়েছি যার ফলে পাঠক কুরআনের অন্তস্থলে পৌঁছুতে সক্ষম হন। কুরআন ও তার নিছক অনুবাদগুলো পড়ে মানুষের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় জাগে সেগুলো দূর করা এবং যেসব প্রশ্নের উদয় হয় সেগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা আমি করেছি। কুরআন মজীদে যেসব কথা ইশারা-ইঙ্গিতে, চুম্বক বক্তব্যের মাধ্যমে এবং সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোকে সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা আমি চালিয়েছি।

শুরুতে বেশী লম্বা-চওড়া আলোচনা করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। তাই প্রথম জিলদের টীকাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারেই এসেছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমি যতই সামনে এগিয়ে যেতে থেকেছি ততই টীকায় বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছি। এমনকি পরবর্তী জিলদগুলো দেখে এখন প্রথমেরগুলোকে সবাই অসম্পূর্ণ মনে করতে শুরু করেছেন। কিন্তু কুরআন মজীদের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তির ফলে আমরা একটা ফায়দা হাসিল করতে পেরেছি। যে বিষয়ের ব্যাখ্যা এক জায়গায় অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, পরবর্তী সূরাগুলোতে তার পুনরাবৃত্তি হবার কারণে সেখানে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়েছে।

আমি আশা করি যারা কুরআন মজীদকে তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে শুধুমাত্র একবার পড়েই ক্ষান্ত হন না, তারা সমগ্র কিতাব দ্বিতীয়বার পড়ার সময় নিজেরাই অনুভব করবেন যে পরবর্তী সূরাগুলোর ব্যাখ্যাসমূহ পূর্ববর্তী সূরাগুলো অনুধাবন করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক প্রমাণিত হয়।

আবুল আ'লা
লাহোর,
২৪ রবিউস সানী, ১৩৯২ হিজরী
(৭ জুন, ১৯৭২ ইং)